বেদ ও ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য

Talkes delivered by Swami Samarpanananda on ***Veda*** before the students of Indian Spiritual Heritage Diploma Course at Ramakrishna Mission Vivekananda University, Belur Math in the year 2010

(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

বেদ – ২৩শে জানুয়ারী ২০১০

যদিও হিন্দু ধর্মের সমস্ত শাস্ত্রের জনক বেদ কিন্তু হিন্দু ধর্মের অন্যান্য শাস্ত্র থেকে বেদ সম্পূর্ণ আলাদা। সাধারণ মানুষের পক্ষে বেদ সত্যিই অত্যন্ত কঠিণ। বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যয়নের জন্য আচার্যের সংখ্যাও ইদানিং খুবই কম। কমে যাওয়ার পেছনেও অনেক কারণ আছে। তার প্রথম কারণ হচ্ছে বেদের পরিধি এত বিশাল যে এর বিশালত্বকে আমরা ধারণাই করতে পারব না, আধ্যয়ন করা তো তার পরের কথা। চারটি বেদের চারটে করে ভাগ আছে, সুতরাং যে ষোলটা ভাগ পাচ্ছি তার মধ্যে ঋকবেদের যে সংহিতা, তাতে শুধু মন্ত্রই আছে। কিন্তু শুধু মন্ত্র পড়লে বেদের কিছুই বোঝা যাবে না, সাথে সাথে ভাষ্য না পড়লে মন্ত্রগুলির সঠিক অর্থ অনুধাবন করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য হবে। বেদের উপরে ভাষ্য রচনা করার দুঃসাহস কেউ করেন না। কিন্তু সায়নাচার্য ঋকবেদের শুধু সংহিতার অর্থাৎ মন্ত্র অংশের ভাষ্য রচনা করে গেছেন। সায়নাচার্য শঙ্করাচার্যের পরবর্তি কালের, তাও আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগে। শঙ্করাচার্যও বেদের ভাষ্য রচনা করেননি, কিন্তু সায়নাচার্য পরে এই গুরু দায়ীত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তাও তিনি চারটি বেদের ঋকবেদের সংহিতার মন্ত্রগুলিকেই বেছে নিলেন ভাষ্য রচনা করার জন্য, আর তাতেই তার মোটা মোটা বারোটা খণ্ড লেগে গেল। ভাষ্য ছাড়া বেদের কিছুই বোঝা যায় না, যেগুলি খুবই সহজ সরল সেই মন্ত্রগুলিই আমরা সচরাচর আবৃত্তি করে থাকি। ম্যাক্সমুলার সায়নাচার্যের ভাষ্য পড়ে বেদের অনুবাদ করতে গিয়েও অনেক ক্ষেত্রে গোলমাল করে ফেলেছেন। এটা অবশ্য মানতে হবে যে চারটে বেদের মধ্যে ঋকবেদ সব থেকে বৃহৎ। তা সত্ত্বেও একটা জিনিষ বুঝতে হবে যে ঋকবেদের শুধু মন্ত্রের অর্থ লিখতে যদি বারোটা খণ্ড লাগে তাহলে আর বাকি ঋকবেদের তিনটে বিভাগ এবং সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদের চারটে করে যে বিভাগ আছে – মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ, বেদের এই সমগ্র পুঁথিগুলিকে যদি একসাথে রাখা হয় তাহলে পুরো একটা ঘরই ভরে যাবে। সুতরাং একজনের পক্ষে এক মনুষ্য জন্মে সমগ্র বেদকে অধ্যয়ন করা দুঃসাধ্য। এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে বেদের সামগ্রিক আলোচনা করাও তাই কখনই সম্ভব নয়। যারা বেদ নিয়ে চর্চা করেন তাঁরাও সমগ্র বেদের ব্যাপারে বলতে গেলে খেই হারিয়ে ফেলেন।

বেদের নিজস্ব একটা পৃথক ব্যাকরণ সহ একটি অভিধান আছে, যার শেষ সংস্করণ হয়েছে যিশু খ্রীষ্টের জন্মের চারশো বছর আগে। এর থেকে বোঝা যায় আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে বেদের ভাষা অপ্রচলিত হয়ে গেছে। সেই অপ্রচলিত ভাষাকে বোঝার জন্য আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে একটা অভিধান লেখা হয়েছিল। বেদকে কেন বেশির ভাগ লোকই বুঝতে পারে না, ভাষাগত কারণও তার মধ্যে অন্যতম। আরও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যে বেদের যে কত পুঁথি হারিয়ে গেছে তার কল্পনাই করা যায় না। যা আমাদের কাছে এখন আছে তার একটা ধারণা এখানে দেওয়া হল। সেইজন্য বেদের সামনে এসে মানুষ হাত-পা ছেড়ে অসহায় হয়ে বসে পড়ে। যারা গবেষণা করে খুব বড় বিশেষজ্ঞ হয়েছেন তারা একটু আধটু বোঝেন, আর দক্ষিণ ভারতে, বেনারসে এখনও কিছু কিছু ব্রাহ্মণ পরিবার আছেন যারা এখনও নিষ্ঠা সহকারে অধ্যয়ন করে বেদকে বংশপরম্পরায় ধরে রেখেছেন।

বেদের সামগ্রিক চিত্রকে তুলে আনা এখানে সম্ভব নয়, কিন্তু আমরা জানতে চেষ্টা করব বেদে মূলতঃ কি আছে, আর কিছু কিছু প্রচলিত মন্ত্রগুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে। বেদ আসলে কি বলতে চাইছে একবার সেই ব্যাপারে একটা স্পষ্ট ধারণা হয়ে গেলে ভারতীয় অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রগুলি অধ্যয়ন করার

সময় মূল জিনিষ গুলি বোঝার ক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধা হবে। যেমন গীতাতে এমন অনেক শ্লোক আছে যা কিছুতেই বোঝা যায় না কি বলতে চাইছে। বিভিন্ন আচার্যরা তাদের ভাষ্যে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করলেও পরিষ্কার হয় না, কিন্তু বেদের ধারণা ঠিকমত হয়ে গেলে তখন বোঝা যায় এই শ্লোকগুলি এই এই কারণে বলা হয়েছে। গীতার পঞ্চোদশ অধ্যায়ে আছে – *অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা,* এখানে মনে হবে হঠাৎ বৈশ্বানর কেন বলতে গেলেন, বেদ পড়লে বোঝা যায় এই এই কারণে বৈশ্বানর বলা হচ্ছে, বৈশ্বানর বললে এর আলাদা একটা মাত্রা যোগ হয়ে যায়। গীতাতে তৃতীয় আর চতুর্থ অধ্যায়ে অনেক প্রকারের যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে, একটি শ্লোকে বলা হচ্ছে – *কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবং*, এই ধরণের শ্লোকগুলি বেদের ধারণা যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ বোঝা যায় না, তা নাহলে শ্লোকগুলি মাথা থেকে হারিয়ে যাবে।

বহু কাল ধরে আমাদের মধ্যে একটা প্রচলিত ধারণা চলে আসছে যে শূদ্রদের বেদ শুনতে নেই। কিন্তু বেদেই একটা মন্ত্র আছে যা আমাদের এই বহু দিনের ধারণার উল্টো কথাই বলছে। যজুর্বেদের ছাব্বিশ অধ্যায়ে এই মন্ত্রের মূল তাৎপর্য হচ্ছে – একজন ঋষি প্রার্থনা করছেন যে হে ঈশ্বর, আমি যেন বেদের এই সুমধুর কথাগুলো, বেদের সুমহান তত্ত্বগুলি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, আমার সন্তানদের, অন্যের সন্তানদের, দেশে বিদেশের আপামর সাধারণ মানুষকে বলতে পারি। স্বামীজীর খুব প্রিয় মন্ত্র – *শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্যা পুত্রা*, এখানেও সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষের কথা বলা হচ্ছে। এটা একটা মারাত্মক ভুল ধারণা যে সবাইকে বেদ বলতে নেই। অনেক ঋষিরা চাইতেন যে আমার এই অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান যাতে মুর্খদের কাছে না যায়। কিন্তু এখানে ঋষি বলছেন আমি যেন আমার উপলব্ধ জ্ঞান সবাইকে বলতে পারি। পরের দিকে বেদ মুষ্টিমেয় কয়েকজন বোদ্ধাদের জন্য রেখে সাধারণ মানুষের জন্য প্রাচীর তুলে দিয়েছিল। মনুস্মৃতিতেই আবার বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ যেন না পড়িয়ে মরে যায় কিন্তু তবুও সে যেন অপাত্রে কখনই বিদ্যা দান না করে। কিন্তু বেদের মূল দর্শন যেখানে আছে সেখানে কিন্তু এই ধরণের প্রতিবন্ধকতা তৈরী করা হয়নি শুধু বিদ্যাকে অপাত্রে দান করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা ছিল। অপাত্রে দান করলে অনেক সমস্যা এসে যায়। দর্শনের গভীর তত্ত্বগুলি ভুল হাতে বা অপাত্রে চলে যাওয়াটা সামাজিকতার দিক থেকে ও আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে উভয় ক্ষেত্রেই বিপজ্জনক। যেমন গীতার খুব বিখ্যাত শ্লোক *'ন হন্যত হন্যমানে শরীর'* অর্থাৎ যাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে তিনি জানেন যে কেউ কারুকে বধ করেন না। এখন এই তত্ত্বটা যদি কোন মুর্খের কাছে চলে যায়, তখন সে বলতে পারে যে আত্মার যখন মৃত্যু নেই তখন আমি যাকেই বধ করি না কেন আমার পাপ লাগবে না। এইটাই হচ্ছে দর্শনের অপপ্রয়োগ। কারণ যাঁর আত্মজ্ঞান হয়েছে সে কখনই কাউকে বধ করতে যাবে না। ঠাকুর বলছেন 'যার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে তার আর বেতালা পা পড়ে না'। এটাকে আটকাবার জন্য আমাদের ঋষিরা বেদ উপনিষদের দর্শনের ক্ষেত্রে একটা প্রাচীর তুলে দিয়ে বললেন – যাদের এখনও প্রস্তুতি হয়নি তাদেরকে এই বিদ্যা দিও না।

অবশ্য সব সময়ই ধর্মকে যুগোপযুগী করে দেওয়া হয়, এটা না করলে ধর্মের অধঃপতন হয়ে যায়। স্বামীজী বলছেন ঠাকুরের আগমনের পর থেকে সত্যযুগ শুরু হয়েছে। শাস্ত্রের যে জিনিষগুলোকে এত দিন যাবৎ রুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল, সেই জিনিষগুলিকে এখন উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। বেদ এখন সবার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। স্বামীজী চেয়েছিলেন প্রত্যেক হিন্দুর বাড়িতে শালগ্রামের সাথে বেদেরও যেন পূজা হয়। শালগ্রাম মানে কুলদেবতার কথা বলা হচ্ছে। তার মানে সর্বোচ্চ বেদেরও পূজা হবে সাথে সাথে পারিবারিক কুল দেবতাদেরও পূজা হবে। আমরা এখন নিজের নিজের কুলদেবতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি। স্বামীজী এই সঙ্কীর্ণতা ভাঙ্গতে চেয়েছিলেন। কারণ পুরো বেদ ও উপনিষদের দর্শনকে যখন মানুষ বুঝে নেবে তখন ধর্মের বাহ্যিক ও অন্তরমুখী আচরণে আমূল পরিবর্তন এসে যাবে এবং ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ মানুষের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে যাবে।

স্বামীজীর খুব ইচ্ছে ছিলে সবাই যেন বেদ পড়তে পারে। এই কারণেই তিনি চেয়েছিলেন বেলুড় মঠে যেন একটি বেদ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। আজ বেলুড় মঠে বেদ বিদ্যালয় স্থাপন করে স্বামীজীর স্বপ্নকে

সার্থক করা হয়েছে। কিন্তু প্রথমেই এই বেদ বিদ্যালয় নিয়ে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষদের প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, প্রথমের দিকে যেসব আচার্যরা এসেছিলেন তাঁরা বললেন আমরা ব্রাহ্মণ ছাড়া বেদ পড়াব না। মঠ কর্তৃপক্ষ এতে আপত্তি করে দৃঢ় ভাবে স্বামীজীর ইচ্ছাকেই ধরে রইলেন – আমরা চাই বেদ যেন সবাই অধ্যয়ন করতে পারে। পরে কয়েক জন ব্রাহ্মণ রাজী হয়ে গেলেন। এখন বেলুড় মঠেরই নিজস্ব আচার্যরা বেদে অধ্যয়ন করাবার জন্য তৈরী হয়ে গেছেন।

হিন্দু জাতি বা ধর্ম বলতে যা বোঝায় তার সব কিছুই, বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা, পূজার বিভিন্ন পদ্ধতি, যাগ-যজ্ঞ, দর্শন সব কিছু সরাসরি বেদ থেকেই এসেছে, বেদের বাইরে কিছু পাওয়া যাবে না। হিন্দু ধর্মে এমন কোন কিছুই পাওয়া যাবে না যার কথা বেদে বলা হয়নি। এখন প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে হিন্দু ধর্মের পুরান, তন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ইত্যাদি যে সব বিভিন্ন শাস্ত্র রয়েছে তাহলে এদের সাথে বেদের কি সম্পর্ক। বেদ হচ্ছে সমস্ত শাস্ত্রের মূল। কিন্তু বেদে কিছু কিছু বিধিবাদ আছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বেদের সীমা রেখা টেনে দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে বেদের শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রসারিত করা সম্ভব হচ্ছিল না। তখন মহান আচার্যরা বেদের শিক্ষাকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য অন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। এই অনুভব থেকেই ভারতে হিন্দুধর্মের বিশাল শাস্ত্র সমুদয়ের সৃষ্টি হয়েছিল।

সব থেকে মজার ব্যাপার হল দুই হাজার বছর থেকে আজ পর্যন্ত হিন্দুরা বেদ বলে যে তাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ আছে জানলেও বেদকে চোখেই দেখেনি। কিন্তু কোন হিন্দুকেই পাওয়া যাবে না যে বেদের প্রতি তার অশ্রদ্ধা মনোভাব পোষণ করবে। হিন্দু মানেই তাকে বেদকে স্বীকার করতে হবে, যেটা বেদ বলবে সেটা করা হবে, যেটা বেদ বলবে না সেটা করা যাবে না। পরবর্তি কালে হিন্দু ধর্মের যত শাস্ত্র রচিত হয়েছে সব শাস্ত্রেই এই নিয়মকে অনুসরণ করা হয়েছে, অর্থাৎ বেদে যা বলা হয়েছে তাকেই অনুসরণ করা হয়েছে। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে হিন্দু কাকে বলা হয়? এই প্রশ্নের একটাই পরিষ্কার উত্তর – যে বেদকে ultimate authority বলে মনে করে। যিনি বেদ পড়েছেন তাকেই হিন্দু বলা হবে না, বেদের কথাই হচ্ছে শেষ কথা এই বিশ্বাস যার আছে সেই হিন্দু।

ভারতে দুই ধরণের দর্শনের আবির্ভাব হয়েছে – একটা হচ্ছে আস্তিক দর্শন আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে নাস্তিক দর্শন। আমরা সচরাচর মনে করি যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে তাকে আস্তিক বলা হয় আর যে ঈশ্বরকে মানে না তাকে নাস্তিক বলা হয়। কিন্তু যখন আমরা দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে যাব তখন দেখতে পাই দর্শনে আস্তিক কথার অর্থ হচ্ছে যিনি বেদকে ultimate authority হিসাবে মানেন আর যারা তাদের দর্শনে বেদের কথাকে শেষ কথা বলে মানে না তাদের দর্শনকে নাস্তিক দর্শন বলা হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে আস্তিক দর্শনে এমন অনেক দর্শন আছে যেখানে ঈশ্বর বলে কোন শব্দ তো নেইই আর তারা ঈশ্বরকেও মানে না। অথচ বেশির ভাগ মানুষ মনে করে যারাই হিন্দু ঋষি, দার্শনিক সবাই ঈশ্বর মানেন। কিন্তু খুব মনযোগ সহকারে যদি হিন্দু-দর্শনগুলিকে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে শঙ্করাচার্যের আগে পর্যন্ত এমন অনেক হিন্দু দার্শনিক ছিলেন যাঁরা আদপেই ঈশ্বর বলে কেউ আছেন বলে মানতেন না, অথচ তাঁরা ছিলেন প্রচণ্ড ধার্মিক ও উচ্চ আধ্যাত্মিক সম্পন্ন ব্যাক্তিত্ব। এর কারণ হচ্ছে বেদে আধ্যাত্মিক সত্তাকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এখানে বেদ উপনিষদ সব মিলিয়েই বলা হচ্ছে, সেই ব্যাখ্যাগুলিকে যে যেভাবে নিতে শুরু করবে, ঈশ্বরকে মানা না মানাটাও সেইভাবে নির্ধারিত হবে। কেউ যদি বলেন আমি ঈশ্বর মানিনা, তা সত্ত্বেও তিনি একজন উচ্চকোটির ঋষি হতে পারেন। তখনকার দিনে যাঁরা চার্বাক দর্শনের অনুগামী ছিলেন এবং পরবর্তি কালে বৌদ্ধ, জৈনরা বেদকে ultimate authority বলে মানতেন না। জৈন বা বৌদ্ধ দর্শন যদি খুব গভীর ভাবে অধ্যয়ন করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে বেদের আধ্যাত্মিক সত্তাকে তারা অস্বীকার করছে না, কিন্তু একটা জায়গাতে এসে তারা বেদের সাথে অমত প্রকাশ করছে। প্রথম যেটা হচ্ছে তারা বেদকে ultimate authority বলে মানবে না আর বেদের বর্ণপ্রথাকে বৌদ্ধ ধর্ম

মানে না। এই দুটো জিনিষকে মানেনা বলে বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু থেকে আলাদা। এই দুটো প্রভেদকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয় তখন বৌদ্ধ দর্শন পড়ার সময় বোঝাই যাবে না যে আমি বৌদ্ধ ধর্মের দর্শন পড়ছি না উপনিষদ পড়ছি।

পুরো বেদকে যদি খুব ভালো করে খতিয়ে দেখা হয়, তাহলে আমরা বেদে কি পাব? এই বিশাল গ্রন্থে এনারা এতো কথা কি বলছেন? তখন দেখা যাবে একটা জিনিষকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হয়েছে, আর তা হচ্ছে চতুর্বর্গ পুরুষার্থ। এই চতুর্বর্গ পুরুষার্থ বেদ থেকে এসে ধীরে ধীরে সমস্ত হিন্দুদের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। চতুর্বর্গ পুরুষার্থের পুরুষার্থ কথার অর্থ হচ্ছে জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য, প্রত্যেক মানুষের জীবনে চারটে উদ্দেশ্য – ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। অর্থ হচ্ছে যাদের লক্ষ্য জীবনে প্রচুর অর্থোপার্জন করব, জমি, বাড়ি, গাড়ি বানাব। কাম হচ্ছে যারা জীবনে প্রচুর ভোগ করতে চাইছে, ভালো খাবো, বেড়াব, দামী দামী সাজ-পোষাক দিয়ে নিজেকে সাজাব, আর সুখে থাকব। ধর্ম হচ্ছে পূজো, পাঠ, সকাল বিকেল মন্দিরে যাওয়া, ভোরে গঙ্গাস্নান, সাধুদের সেবা করা, দান ধ্যান করা ইত্যাদি। মোক্ষ হচ্ছে একমাত্র আত্মোপলব্ধিই যাদের লক্ষ্য।

এই চারটেকে কেন্দ্র করে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখা একটা আরেকটা থেকে আলাদা হয়ে যায়। যেমন কথামৃতে আমরা দেখতে পাই ঠাকুর অর্থ আর কামকে প্রায় পুরোপুরি বাদ দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু কথামৃতেই অনেক জায়গাতে ঠাকুরও কিন্তু সংসারীদের অর্থ সঞ্চয়ের কথা বলেছেন। ঠাকুর বলছেন টাকা দিয়ে কি হয়? সাধু সেবা হয়। আবার বলছেন দুটি সন্তান হয়ে গেলে স্বামী-স্ত্রী ভাইবোনের মত থাকবে। এখানে তো ঠাকুর দুটি সন্তানের কথা বলছেনই। ঠাকুর কিন্তু কোথাও কামিনী-কাঞ্চনকে প্রথমেই উড়িয়ে দিতে বলছেন না। আমরা একটা ভুল ধারণা করে রেখেছি যে ঠাকুর পুরোপুরি কামিনী-কাঞ্চনকে উড়িয়ে দিতে বলেছেন। নারী হচ্ছে মা, সৃষ্টি এদের থেকে চলছে – এই কথা ঠাকুরই বলছেন। ঠাকুর কার জন্য কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা বলছেন? ঠাকুরের কাছে বিভিন্ন থাকের মানুষ আসছেন। একটা থাক হচ্ছে যারা শুধুই উচ্চ আধ্যাত্মিক অনভূতির জন্য নিবেদিত। স্কুলে যখন বাচ্চারা ভর্তির জন্য আসে তাদের মধ্যে কিছু ছেলের মধ্যে অত্যন্ত মেধা, প্রচণ্ড বুদ্ধি দেখতে পাওয়া যায়, এদের প্রশিক্ষণ পুরোপুরি আলাদা হয়, অন্যান্য বাচ্চাদের থেকে এদের অনেক সামলে সুমলে রাখতে হয়। জাগতিক অর্থে আমরা যা বুঝে থাকি সে ধরণের কোন কিছু ঠাকুরের ছিল না, তাই ঠাকুরকে কখন আমরা দেখতে পাইনা যে তিনি কারুর রোগ ভালো করে দিচ্ছেন, কাউকে চাকরি করে দিচ্ছেন, মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, সন্তান হচ্ছে না ঠাকুর তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। কিন্তু এই ঠাকুরই আবার মথুরবাবুকে টাকা পয়সার অনেক ঝামেলা থেকে বাঁচিয়েছিলেন, নরেনকে বলেছেন তোর খাওয়া পড়ার অভাব হবে না। তিনি যাঁদেরকে পুরোপুরি টেনে নিয়েছিলেন, যাদের মাধ্যমে তিনি তাঁর অবতারত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করবেন, তাদের জন্যই তিনি সম্পূর্ণ ভাবে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা বলেছিলেন। এরা যদি কামিনী-কাঞ্চন না ত্যাগ করে তাহলে এরা এগোতে পারবে না আর অবতারের কাজের দায়ীত্ব নেওয়ার ক্ষমতাও হবে না। বাকীদের ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন, কর্ম কর, অর্থোপার্জন কর, তবে যাই করবে ধর্ম পথে করতে বললেন। কেন ধর্ম পথে করতে বললেন? এই কারণে যে এটাই এর স্বাভাবিক, আমি নিষেধ করলেও তুমি কর্মের পেছনে ছুটবে। সংসারীদের যেমন বলে দিতে হয় না যে টাকা সব খরচা করবেন না, ব্যাঙ্কে কিছু রাখবেন, সংসারীরা এমনিতেই অর্থ সঞ্চয় করবে।

এখন বেদে কেন অর্থ আর কামের কথা বলা হয়েছে? ঠাকুর কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা বলছেন অথচ বেদ চারটে পুরুষার্থের কথাই বলছে। আর পুরো বেদ, বিশেষ করে সংহিতাতে বলছে – প্রভু টাকা দাও, প্রভু সন্তান দাও। তাহলে কি ঠাকুর বেদবিরোধী কথা বলছেন? ঠাকুর যদি বেদবিরোধী কথা বলেন তাহলে হিন্দুরা প্রথমেই ঠাকুরকে ছুঁড়ে ফেলে দিত। এর উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ফিরে যেতে হবে, বিশেষ করে পুরানে যেখান দেখা যায় ব্রহ্মা প্রথম সৃষ্টি করলেন চার কুমারের – সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমারদের। ব্রহ্মার মানসপুত্র হওয়ার জন্য এই চার কুমারেরা ত্যাগ বৈরাগ্যতে পূর্ণ

ছিলেন। এঁরা জন্ম নিয়েই দেখছেন আমরা কোথায় সংসারে এসে ফেঁসে গেছি, সঙ্গে সঙ্গে কমণ্ডলু তুলে নিয়ে চার কুমার সংসার ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। ব্রহ্মা পড়ে গেলেন মহা মুস্কিলে, এত কষ্ট করে চারটে ছেলেকে সৃষ্টি করলাম যাতে এরা সৃষ্টিটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু সংসারকে ছেড়ে দিয়ে এরা তপস্যাতে চলে গেল। এখন সৃষ্টি চলবে কি করে? ব্রহ্মা তখন আবার নতুন করে সৃষ্টি করলেন। এবার যাদের সৃষ্টি করলেন যদিও এরা আগের চার কুমারের মত প্রচণ্ড বৈরাগ্যবান ছিলেন না, কিন্তু প্রায় ঐ রকমই হলেন। এরা বিয়ে করেছেন কিন্তু সংসার কার্যে কোন ভাবেই সম্পর্ক না রাখাতে সমস্যা দেখা দিল। এই রকম ঋষিদের আরও বড় সমস্যা হয়ে গেল। ঋষিরা বিয়েথা করে গৃহস্থধর্ম পালন করতেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁরা সন্তানের জনক হতে চাইতেন না। এই রকমই হয়, যাঁরাই খুব বেশি ধর্মপ্রাণ পুরুষ হন, তাঁদের মন কিছুতেই জাগতিক কোন ব্যাপারে দিতে চাননা। দেখা যেত গুরু যদি পূর্ণ ত্যাগী হতেন তখন তাঁর শিষ্যরাও গুরুর মত হয়ে যেতেন, সাংসারিক ব্যাপারে সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে কেমন একটা উদাস উদাস ভাবে থাকতেন। এইটাকে আটকানোর জন্য অর্থ আর কামের কথাও বলা হয়েছিল।

ভারতের এটা একটা জাতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে জাগতিক ব্যাপারে ভারতীয়রা কোন আগ্রহই অনুভব করত না, যার ফলে যারা আধ্যাত্মিক পথে অজ্ঞ ছিলেন তাদেরকে অলসতা আর নিষ্কর্মতা গ্রাস করে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন করে দিত। গত আট দশ বছর ধরে ভারতের লোকেরা বুঝতে পারল যে সুস্থ জীবন-যাপন করতে গেলে টাকা আয় করতে হবে আর টাকা অর্জন করতে গেলে খাটতে হবে। আমাদের দেশের এইটাই ছিল জাতীয় রোগ, এখানে প্রেমের কবিতা লিখে দেবে কিন্তু কিছুতেই অর্থ আর কামের জন্য খাটবে না। আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন ঋষি, আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা সব ঋষিদের কাছ থেকে পরম্পরা ভাবে এসেছে। ফলে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ আমাদের কাছে স্বাভাবিক। কিন্তু অন্য দিকে মনের মধ্যে কামিনী-কাঞ্চনের বীজ রয়েছে, বীজ না থাকলেতো সে মুক্ত পুরুষ হয়ে যেত, আকাঙ্খা রয়েছে কিন্তু খাটবে না, কায়িক শ্রমে সব সময় বিমুখ। কায়িক শ্রমবিমুখতার জন্য তাদেরকে জোর করে কাজে লাগাবার জন্য বলা হত – ওহে ভাই তুমি কি মোক্ষ লাভ করতে চাইছ? মোক্ষের কথা শুনেই বলবে – না না, ওসব মোক্ষ-টোক্ষতে আমার মোটেই বিশ্বাস নেই ওসব ফালতু কথা। তাহলে তুমি ধর্ম কর্ম কি করবে? ধর্ম! না না, শীতের মধ্যে ভোর চারটেয় গঙ্গাস্নান আমার দ্বারা হবে না। ঠিক আছে, তুমি যখন ধর্ম ও মোক্ষ কোনটাই পারবে না তখন তুমি অর্থ সাধন ও কাম সাধন কর। কিন্তু বেশির ভাগই অর্থ ও কাম সাধন না করে চাইত জীবন যেমন ভাবে চলছে চলতে থাকুক। ধর্ম ও মোক্ষ তো দূরের কথা এদের শরীর কাম সাধনেরও উপযুক্ত নয়, কারুর হজমের গোলমাল, কারুর ব্লাডপ্রেসার, কারুর হাঁপানি। তিন কিলো মিটার হাঁটতে দিলেই হাঁটু আর বুকে ব্যাথা হয়ে যাবে। খেতে দিলে বলবে আমার খাবারে তেল মশলা কম দেবেন ওগুলো আমার সহ্য হয় না, এ্যাসিড হয়ে যায়। আবার এদিকে ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সও সেই রকম আহামরি কিছু নেই। পরিষ্কার ভাবেই বোঝা যাচ্ছে এদের শারীরিক ও মানসিক গঠন কোন সাধনের পক্ষেই যোগ্য নয়। ভারতে বেশির ভাগই এই শ্রেণীর লোক। সেইজন্য আমাদের বেদ বলেছিল – এই চারটের মধ্যে যে কোন একটাকে উদ্দেশ্য করে কিছু একটা কর। তাই বেদ কোন আজেবাজে কথা মোটেও বলেনি। মোক্ষ সাধন হচ্ছে সব কিছু ছেড়ে দেওয়া, নিজের শরীর যে এত প্রিয় সেই শরীরের মমত্বকেও ত্যাগ করতে হবে। এখন ভোরবেলা শীতকালে গঙ্গাস্নান করলেই সর্দি-কাশি হয়ে যাবে, এই হচ্ছে আমাদের শরীরের অবস্থা, তাই বেদ বলল – তুমি তো বাপু এসব পারবে না, তাই অর্থ আর কামের জন্য লেগে পড়।

কিন্তু কাম ও অর্থ সাধন যে মন ও বুদ্ধি দিয়ে করবে সেই মন-বুদ্ধিই হয়ে আছে মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত। নির্দিষ্ট ভাবে কোন কিছুতেই একাগ্র হয়ে লেগে থাকতে চাইবে না। বেদ কাম ও অর্থ সাধনের পুরো ব্যাপারটাকে একটা নির্দিষ্ট দিকে নির্দেশ করে দিল। আর আমরা যা কিছুই করতে যাই না কেন আমাদের শেষ হাতিয়ার হচ্ছে মন। এই মন আর বুদ্ধি ছাড়া তো আমাদের কিছু নেই। ঈশ্বর উপলব্ধি এই মন বুদ্ধি দিয়েই করতে হবে, ভালো মন্দ যা কর্ম এই মন বুদ্ধি দিয়েই করতে হয়। এই মন বুদ্ধিই যখন আমাদের

প্রধান অস্ত্র তাই এই মন বুদ্ধিকে সর্বাগ্রে শাণিত করতে হবে। ঠাকুর বলছেন মানুষের মন হচ্ছে সরষের পুটলি, পুটলির মুখ খুলে সরষে ছড়িয়ে গেছে। বেদ এই ছড়ানো মনকে কুড়িয়ে আনতে সাহায্য করে। যখন আমরা কাম ও অর্থ সাধন করতে থাকি তখন এই সাধনই আমাদের মনকে কুড়িয়ে নিয়ে একাগ্র করে উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, এই সাধনের ফলে মানুষের মনে যে নানান কুবৃত্তি গুলি রয়েছে যেমন হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, লোভ, চাহিদা ইত্যাদি এগুলিকেও নিয়ন্ত্রণ করতে খুব সাহায্য করে। ভারতের বেশির ভাগই হচ্ছে নিষ্কর্মা প্রকৃতির লোক। আইটি সেক্টরে একটা কথা আছে – বলা হয় ভারতে চাকরির কোন অভাব নেই, এখানে অভাব কর্ম প্রবণতার।

এই কর্ম বিমুখতাকে কাটাবার জন্য বেদ এদের জন্য অর্থ আর কামের কথা বলল। এই অর্থ আর কামের সাধনা করে এদের চেতনা যখন একটু জাগ্রত হল তখন ধীরে ধীরে এদের মনকে ধর্মের দিকে নিয়ে যাবে। ধর্ম সাধন করার পর আস্তে আস্তে তাকে মোক্ষের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আরেক ধরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক আছে যারা খুব অতিরিক্ত মাত্রায় ছটফটে, এরা আবার প্রচণ্ড ক্ষমতা লোভী, মনে করে আমিই একা লুটেপুটে খাব। একদিকে এদের মনের ইতিবাচক আবেগ নেই, অন্য দিকে এরা আবার অন্যদের মত নিষ্কর্মাও নয় কিন্তু নেতিবাচক আবেগে মনটা আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। নেতিবাচক আবেগ মানে হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, লোভ, ঘৃণা ইত্যাদি। এরা বলবে – হ্যাঁ, আমি ধর্ম করব কিন্তু তার আগে আমি একে মেরে শেষ করব। যে চারিদিকে শত্রু তৈরী করে রেখেছে, একে মারব, তাকে শেষ করব, এই যাদের মনোভাব, এদের কি করে ধর্ম করতে বলবে! পৃথিবীর কোন ধর্মে কোথাও এদের ধর্মের দিকে মনটাকে ফিরিয়ে আনার কোন উপায়ের কথা বলা নেই। এদের মন সব সময় বিষিয়ে রয়েছে, এই ধরণের লোকের সব থেকে ভালো উদাহরণ হচ্ছে দুর্যোধণ, মেঘনাদ। দুর্যোধন আর মেঘনাদের মন সব সময় পাণ্ডবদের আর লক্ষণের বিরুদ্ধে হিংসায় পুড়ছে।

আপাত দৃষ্টিতে বলতে গেলে এদের জন্য ধর্ম নেই। সব ধর্মই এদের বলবে আগে তোমার মন থেকে এগুলো পরিষ্কার কর। কিন্তু বেদ সব সময় এদের জন্যও হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বেদ বলবে তুমি তোমার শত্রুকে মারতে চাও? তাহলে এই নাও আমার শত্রু মারণ যজ্ঞ, এই যজ্ঞ করলে তোমার শত্রু মরবেই। এখন সে শত্রুকে মারার জন্য পুরোদমে নেমে যাবে যজ্ঞ করতে। যেমন মেঘনাদ নেমে পড়ল লক্ষ্মণকে মারতে যজ্ঞ করতে। কিন্তু কি হল? যজ্ঞের ফল হবে কি হবে না আমাদের জানা নেই। কিন্তু মাঝ পথে কোন কারণে যজ্ঞটা পণ্ড হয়ে গেল। যজ্ঞ পণ্ড হয়ে যাওয়া, যজ্ঞ পণ্ড না হলে কি হত সেটা আমাদের কাছে গুরুত্ব নয়। গুরুত্বটা হচ্ছে, যজ্ঞের যে প্রস্তুতি পর্বে যজ্ঞাকর্তা খেটেখুটে যে এতো কিছুর যোগাড় করছে, এত আহুতি দিচ্ছে মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে, বিভিন্ন দেবতাদের আবাহন করা হচ্ছে, এর ফলে মনটা কিছু কিছু শোধরাতে থাকে।

শাস্ত্রতো বলে দিল তোমার মনে যা নোংরা আছে এটাকে পরিষ্কার না করলে তোমার কিছুই হবে না। আমিও জানি আমার মনে নোংরা আছে। একটা বাচ্চা ছেলেও জানে যে তার খেলার দিকে মন বেশি, লেখাপড়াতে মন কিছুতেই দিতে পারছে না, আর এটাও সে জানে মন দিয়ে পড়লেই ভালো রেজাল্ট করতে পারবে। সে যদি বলে আমি মন খেলাতে দিতে চাইছি না, লেখাপড়াতেই মন দিতে চাইছি কিন্তু আমার মন খেলাতেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি জানি আমার দুর্বলতা কোথায়, কিন্তু আমি এই দুর্বলতাকে কাটাতে পারছি না। তখন আমরা তাকে কি পথ দেখাব? কোন পথ আমাদের কাছে নেই? আমরা কোন পথ দেখাতে পারিনা। কিন্তু বেদ বলবে – হ্যাঁ উপায় আছে, তুমি এই এই যজ্ঞ কর। আবার অনেকে বলছে আমার কোন সন্তান নেই তাই একটা ব্যাথা বেদনায় মনটা খুব অস্থির হয়ে আছে, আমার যদি একটা সন্তান হয়ে যায় তাহলে আমার মনের অস্থিরতা কেটে গিয়ে মনের শান্তি হয়ে যাবে। বেদ তখন বলে দেবে – ঠিক আছে, তুমি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ কর। এখন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার জন্য কয়েক মাস থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে, এই উপোশ কর, এই এই জিনিষ খাবে না, এই এই দেবতার নামে পূজা দাও, রোজ এত স্নান কর,

ভূমিশয্যতে শয়ন করে। এটাই তপস্যা হয়ে গেল। এইভাবে কিছু ব্রত পালনের পর যজ্ঞের জন্য মনটাকে তৈরী করে নিল। এখন যজ্ঞ করে সন্তান হবে কি হবে না আমাদের জানা নেই। আলোচনা করতে করতে এর উত্তরও আমরা পেয়ে যাব। অনেক দিন আগে বেদের এই প্রসঙ্গে এক ব্রহ্মচারী বলছিল 'এগুলো সব ফালতু কথা, যজ্ঞ করলে কখন সন্তান হয় না কি? সব গাঁজাখুড়ির গপ্প'। স্বামী ভূতেশানন্দজী সেই সময় ব্রহ্মচারী ট্রেনিং সেন্টারে আচার্য ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড রসিক। ব্রহ্মচারীর এই কথা শুনে তিনি তাঁর স্বভাব সুলভ সুরে মজা করে বললেন 'একবার করে দেখই না'।

পুত্রেষ্টি যজ্ঞের প্রচুর দৃষ্টান্ত আমরা শাস্ত্রেই পাই, যেমন শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম পুত্রেষ্টি যজ্ঞ থেকে হয়েছিল। দ্রৌপদী, ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্মও যজ্ঞ থেকে হয়েছিল। দুর্যোধনের জন্ম যজ্ঞ থেকে। এত যে ঘটনার কথা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, ইচ্ছে করলে এগুলোকে কেউ বিরাটাকারের ধাপ্পা বলতে পারেন। কিন্তু বেদের বিভিন্ন যজ্ঞের ধারাণা পরবর্তি কালে এসে অন্য রূপ নিল। যজ্ঞের ধারণাটা আস্তে আস্তে পূজা পদ্ধতিতে এসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কাশীতে বিশ্বেশ্বরের কাছে মানত করে ভূবনেশ্বরী দেবী নরেন্দ্রনাথকে পেলেন। এইটাই বেদের সময়ে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ নামে করা হত। শুধু পুত্রেষ্টি যজ্ঞই নয়, যে কোন কিছুর জন্য, আমার বাড়িতে প্রায়ই চুরি হয়, যজ্ঞ কর তোমার বাড়িতে চুরি বন্ধ হয়ে যাবে, বাড়িতে সাপের উৎপাত হয়, সর্পযজ্ঞ করে দাও সাপের উপদ্রব কমে যাবে। স্বামীজী মজা করে বলছেন – তোমার যদি গরু হারিয়ে গিয়ে থাকে, সেটাও তুমি বেদে খুঁজে পাবে। বেদের সম্বন্ধে মানুষের এই রকমের ধারণাই ছিল। বেদের মন্ত্রগুলি এত শক্তিশালী যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নিয়ে ঠিকঠিক ভাবে উচ্চারণ করলে সেই মন্ত্র কাজ করবেই করবে। বেদ বলে দিচ্ছে তুমি এই যজ্ঞ করলে তোমার এই ফল লাভ হবে, কোন কিছুই এই ফল লাভকে আটকাতে পারবে না।

রামায়ণের একটি ঘটনার দ্বারা বেদমন্ত্রের শক্তি আর তার কার্যকারিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্র চৌদ্দ বছরের জন্য অযোধ্যা ছেড়ে বনবাসের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছেন। ভরত শ্রীরামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনার জন্য খুঁজতে গেছেন। যেতে যেতে সন্ধ্যে হয়ে গেছে, ভরত সৈন্য সামন্ত নিয়ে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে এক রাতের জন্য আশ্রয় নিয়েছেন। ভরদ্বাজ মুনি চিন্তায় পড়ে গেলেন, রাজা এসেছেন, সঙ্গে এত লোকজন, এদেরকে তো আর গাছের তলায় রাখা যায় না, আর সামান্য ফলমূল খাইয়ে অতিথি সৎকার করাও উপযুক্ত হবে না। ভরদ্বাজ মুনি তখন বেদ মন্ত্রের আবাহন করতে শুরু করলেন। বেদের ঋচাগুলি যখন আবাহন করতে লাগলেন তখন দেখা গেলে স্বর্গ থেকে বিভিন্ন রকমের খাদ্যসামগ্রী, পেয় পদার্থ আশ্রমে পড়তে লাগল। স্বর্গ থেকে অপ্সরারাও নেমে এসেছেন সবাইকে পরিচর্যা করবার জন্য। সৈন্যরা এই ধরণের সুস্বাদু খাবার, পানীয় কোন দিন চোখেই দেখেনি, তারপরে অপ্সরাদের সাথে নাচগান করার সুযোগ পেয়ে সৈন্যরা বলছে 'রামচন্দ্রই রাজা হোক কি ভরতই রাজা হোক তাতে আমাদের আর কি যায় আসে, আমরা এখানেই সুখে আছি, এই জায়গা ছেড়ে আমরা আর কোথাও যাবো না, এখানেই আমাদের জীবন সার্থক'। সকালের আলো ফুটতেই দেখে সব ভোঁ ভা, কিছুই নেই। বেদ মন্ত্র দিয়ে যে কোন জিনিষকেই নিয়ে আসা যায়, এই ধারণাটা আমাদের প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। হ্যারি পটারের মত ম্যাজিক কিছু নয়, সত্যি সত্যিই এই জিনিষই হবে।

আমাদের মূল কথা হচ্ছে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ধর্মপতের অনুপযুক্ত লোকেদের জন্য অর্থ আর কামের সাধনার ব্যাবস্থা বেদ করে দিয়েছে। হাজরাকে ঠাকুর কত গালাগাল দিয়ে বলছেন – হাজরার গর্ভধারিণী দেশে কত কষ্টে পড়ে আছে, এদিকে হাজরা এখানে লোকের কাছে চেয়ে চেয়ে বেড়ায়, আবার ধারকজ্জও করে রেখেছে। কই ঠাকুরতো হাজরাকে বলছেন না যে হরিনাম কর। কিন্তু তার বদলে বলছেন তোমার বাড়ির লোককে কি বামুনপাড়ার লোক এসে খাইয়ে যাবে। দেশে গিয়ে চাষবাস করে অর্থ রোজগারের দ্বারা মায়ের প্রতিপালনের কথাই ঠাকুর বলতে চাইছেন। ঠাকুর বলছেন কলিতে মানুষের অন্নগত প্রাণ, লোকেদের সময় খুব কম, এই অল্প সময়ের মধ্যে যদি সাধন ভজন করতে যায় তার হবে

না। আবার ঠাকুরের কাছে যেসব শুদ্ধসত্ত্ব ছোকরারা আসছে তাদের যাতে সময় নষ্ট না হয় তাই সরাসরি তাদের কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা বলে দিয়ে বলছেন ঈশ্বর দর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রত্যেক হিন্দুকেই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটের মধ্যে যে কোন একটাকে জীবনের উদ্দেশ্য করে সেইভাবে জীবন যাপন করতে হবে। অনেক টাকা যদি কেউ রোজগার করতে চায় তাতে কোন দোষ নেই। এইটাই হচ্ছে সকলের জন্য বেদের উপদেশ।

বেদ শব্দটা এসেছে বিদ্ ধাতু থেকে। যে কোন ভারতীয় ভাষায় শব্দের একটা root থাকে একে বলা হয় ধাতু। এই ধাতুর সাথে যখন প্রত্যয়াদি যুক্ত করা হয় তখন একটা শব্দের সৃষ্টি হয়। উল্টোপাল্টা কোন শব্দ উচ্চারণ করলেই তাকে প্রকৃত শব্দ বলা যাবে না, যেমন বলে দিল 'দুম্' এখন যদি দুম্ শব্দটা কোথা থেকে এসেছে, এর ইতিহাস যদি খুঁজতে যাওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে সংস্কৃতে এটা কোন শব্দই নয়। কেন শব্দ নয়? দুম্ টা হচ্ছে আসলে ধ্বনি, এর কোন ধাতু নেই। ধাতু না থাকলে তাকে শব্দ বলা যাবে না। যেমন সংস্কৃত এই শব্দটার অর্থ হচ্ছে সম্যক রূপে কৃ ধাতু। কৃ মানে করা, সম্যক রূপে করা মানে ভালো করে পরিষ্কার করে কিছু করা। সংস্কৃত ভাষাকে তাই খুব পরিষ্কার, সাফসুতরো ভাষা বলা হয়, এখানে কোন ধরণের কোন আবর্জন কিছু নেই। যে ভাষা যত বেশি গ্রামাঞ্চলে ব্যবহৃত হয় সেই ভাষাতে তত বেশি আবর্জন ঢুকে জংলী ভাষাতে পরিণত হয়ে যায়। ইংরাজী শব্দ টেনশানকে হিন্দী ভাষায় পাল্টে দিয়ে বলবে টেনশানিয়া। এগুলো কোন শব্দই নয় কেননা যে কোন শব্দের একটা ধাতু বা রুট থাকা চাই, তা নাহলে সেটাকে কোন শব্দ বলেই গণ্য করা হবে না, নিছক ধ্বনি মাত্রই থেকে যাবে। যে কোন ধাতুরও আবার একটা বিশেষ অর্থ আছে। পাণিনির ব্যাকারণ শাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী এই বিদ্ ধাতুর পাঁচটি অর্থ হয়। এই পাঁচটার মধ্যে একটা হচ্ছে জানা। এইভাবে সৃপ্ ধাতু থেকে এসেছে সর্প, সৃপ্ মানে যেটা সরে সরে যায়, গরু এসেছে গম্ ধাতু থেকে, গম্ মানে যে জিনিষটা চলে। বিদ্যা, বিদ্বান যত শব্দ আছে সব এই রকম বিদ্ ধাতু থেকে এসেছে। যখন যে কোন বিদ্যাকে জানা হয়, সে যে ধরণের বিদ্যাই হোক না কেন তাকেই বেদ বলা হয়, কারণ এর সবটাই হচ্ছে বিদ্ ধাতু থেকে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পণ্ডিতরা বেদের অর্থ করেছেন, স্বামীজীও বেদের অর্থ বলতে গিয়ে বলছেন – যে কোন জ্ঞান, যা কিছু বিদ্যা সেটাই হচ্ছে বেদ।

আমাদের কাছে বেদের একটা অর্থ হচ্ছে common noun সাধারণ নাম বা বিশেষ্য হিসেবে – যেমন ধনুর্বেদ, যেখানে ধনুর বিজ্ঞান বলা হয়েছে, আয়ুর্বেদ, যে বিদ্যার দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি করা যায়। এই ধরণের যত বিদ্যা আছে এগুলোকে বেদ বলা হচ্ছে সাধারণ নাম হিসাবে, যে কোন বিদ্যার সাথে বেদ নাম দিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার যখন গুণ বা বিশেষণ adjective রূপে ব্যবহার করা হয়, কোন জিনিষকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য বেদ শব্দকে ব্যবহার করা হয়, যেমন ভাগবতকে অনেক সময় বলা হয় পঞ্চম বেদ। চারটে বেদই আছে, কিন্তু পঞ্চম বেদ যখনই বলা হল তখন বেদ শব্দকে বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করে ভাগবতের সম্মান বাড়িয়ে দেওয়া হল। সব শেষে হচ্ছে proper noun, যখন proper noun হিসাবে ব্যবহার করা হয় তখন এই চারটে বেদকে – ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব বেদকে বোঝাবে।

প্রথমেই আমরা বলেছিলাম এই চারটে বেদের আবার চারটে করে ভাগ আছে – মন্ত্র বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ। মন্ত্র মানে এখানে সচারচর আমরা যেসব মন্ত্র বলি যেমন 'ওঁ নমঃ শিবায়' মন্ত্র বলি, এই মন্ত্রকে বোঝাচ্ছে না। মন্ত্রকে সংহিতাও বলা হয় – যদি বলা হয় ঋকবেদ সংহিতা তখন বুঝতে হবে এখানে ঋকবেদের অন্য কোন অংশের কথা বলা হচ্ছে না, ঋকবেদের শুধু মন্ত্র অংশের কথাই বলা হচ্ছে। সংহিতাতে বেশির ভাগই হচ্ছে বিভিন্ন দেবতাদের স্তুতি, এবং বিশেষ বিশেষ যজ্ঞের মন্ত্রগুলি দেওয়া আছে। বেদের ব্রাহ্মণ অংশের সাথে ব্রাহ্মণ জাতির কোন সম্পর্ক নেই। ব্রাহ্মণে সাধারণত মন্ত্র অংশে যা দেওয়া হয়েছে সেগুলিকেই বড় করে টীকাকারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে – যে যজ্ঞটা করা হবে সেই যজ্ঞটা কিভাবে করা হবে, কিভাবে যজ্ঞের বেদি তৈরী করা হবে ইত্যাদি। এর আগে যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের কথা বলা হয়েছিল, এই পুত্রেষ্টি যজ্ঞে কি কি মন্ত্র পাঠ করা হবে সেটা সংহিতাতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যজ্ঞটা

কি নিয়মে, কিভাবে করা হবে সেটা এই ব্রাহ্মণ অংশে পাওয়া যাবে। তৃতীয় হচ্ছে আরণ্যক। বয়স হয়ে গেলে যখন আর যজ্ঞ করতে পারবে না, তখন সে কিভাবে মানসিক যজ্ঞ করবে সেটাই আরণ্যকে বলা হয়েছে। যে যজ্ঞ গুলি আগে বাহ্যিক উপকরণ ও পুরোহিত ব্রাহ্মণদের দ্বারা সম্পন্ন করা হত এখন সেই যজ্ঞই মনে মনে কল্পনার দ্বারা করা হবে। সব শেষে আসছে উপনিষদ। এই রকম পরিষ্কার বিভাজন যে আগাগোড়াই মানা হয়েছে তা নয়, অনেক ক্ষেত্রেই মন্ত্র অংশটা ব্রাহ্মণে চলে গেছে আবার ব্রাহ্মণের কিছু কিছু মন্ত্র অংশে চলে গেছে। আবার যজুর্বেদে বিখ্যাত উপনিষদ ঈশোপনিষদ যেটা মন্ত্রের চল্লিশতম অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে, তার মাঝখান থেকে ব্রাহ্মণ অংশটা হারিয়ে গেছে। এই যে বিভাজনটা করা হয়েছে এটা সাধারণ ভাবে করা হয়েছে, সব সময় এই নিয়মটাই বরাবর অনুসরণ করা হয়নি। যেভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা হোক না কেন সবটাই মিলবে না, কিন্তু এই চারভাবে শ্রেণী বিভক্ত করলে মোটামুটি কাছাকাছি আসে।

বেদকে জানার ক্ষেত্রে দুই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গীকে মানা হয়, একটা হচ্ছে Western approach, ম্যাক্সমূলার, ডয়েটসনদের মত বড় বড় Indologists আরেকটা হচ্ছে আমাদের পরম্পরা traditional approach, এরা দুজন দুজনকে মানেনা। আমরা যে বেদ অধ্যয়ন করছি এটা পুরোপুরি ভারতীয় পরম্পরা দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে করা হচ্ছে। এই যে বলা হল যজুর্বেদে ঊনচল্লিশ অধ্যায় পর্যন্ত হচ্ছে মন্ত্র, অর্থাৎ এর বিভিন্ন অধ্যায়ের মন্ত্রগুলি বিভিন্ন যজ্ঞের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, আর হঠাৎ চল্লিশ অধ্যায়ে এসে ঈশোপনিষদ এসে গেল, যার মন্ত্র যজ্ঞে ব্যবহার করা হয় না। এখন যদি কেউ জিজ্ঞেস করে এই ঊনচল্লিশটা অধ্যায় হচ্ছে মন্ত্র অংশের আর চল্লিশ অধ্যায় হচ্ছে উপনিষদ এটা কে ঠিক করে দিয়েছে? কেউ বলতে পারবে না কে ঠিক করে দিয়েছে। আদিম কাল থেকে এটা এই ভাবেই চলে আসছে। কোথাও কোন গুরু বলে দিয়েছিল এই ঊনচল্লিশটা অধ্যায় হচ্ছে মন্ত্র আর চল্লিশতম অধ্যায়টা হচ্ছে উপনিষদ। সেই থেকে তার শিষ্য আবার তার শিষ্যকে বলেছে, এইভাবে গুরুশিষ্য পরম্পরায় চলে আসছে। গুরু পরম্পরায় হতে হতে শঙ্করাচার্যের কাছে এসেছে। এখন ঈশোপনিষদের উপর শঙ্করাচার্য ভাষ্য রচনা করে দিলেন। তাঁর ভাষ্যের প্রথম লাইনটাকেই অনেকে ধরতে পারে না, তিনি বলছেন – *কর্মসু অবিনিয়োগঃ*, অর্থাৎ এই অধ্যায় শুক্লযজুর্বেদের চল্লিশতম অধ্যায়, এই অধ্যায়কে যজ্ঞে যে ব্যবহার করা হয় না সেটা ঠিকই করা হয়। কেন কর্মে বা যজ্ঞে ব্যবহার করা হয় না বোঝাই যাবে না। তাহলে এই অধ্যায়টা কিসের জন্য? বলা হচ্ছে – এটা ধ্যানের জন্য, এইটা চলে আসবে উপাসনাতে।

এখানে অন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে আমাদের মাথায় রাখতে হবে, প্রথমে থেকেই বেদ গুরু পরম্পরায় চলে আসছে। এখন কোন গুরু তাঁর শিষ্যদের বলে দিলেন – তুমি সংহিতাটুকু মুখস্ত রাখো, তুমি ব্রাহ্মণটুকু, তুমি আরণ্যক আর তুমি উপনিষদের অংশটুকু মুখস্ত রাখো। এবারে পরে যে শিষ্য যে অংশের মন্ত্র মুখস্ত রেখেছিল সে আবার তার শিষ্যকে সেই মন্ত্রটা মুখস্ত করিয়ে যাচ্ছে। এখন মাঝখান থেকে যে ব্রাহ্মণ অংশটা মুখস্ত রেখেছিলে সে ভালো শিষ্য পেলো না, কিংবা সে মরে গেল। এরপর কি হবে? এইখান এসে ঐ বেদের ব্রাহ্মণ অংশটা গেল হারিয়ে। আর এই ভাবেই বেদের অনেক শাখা হারিয়ে গেছে। কেননা তাঁরা কিছু লিখে রাখতেন না।

পরের দিকে এনারা মন্ত্রটাকে খুব গুরুত্ব দিলেন আর আরণ্যককে ততটা গুরুত্ব দিতেন না। কারণ আরণ্যক যে জিনিষকে অবলম্বন করে তৈরী হয়েছিল সেটা মন্ত্র অংশে আগে থাকতেই আছে। আর যে উদ্দেশ্যকে সে নির্দেশ করছে সেটাও আগেই উপনিষদে নির্দেশ করে দিয়েছে। এই কারণে সব থেকে প্রথমে আরণ্যক অংশটাই নষ্ট হতে আরম্ভ করেছে, কেননা আরণ্যকের উপযোগিতাই কেউ সেইভাবে অনুভব করতেন না। একটা জিনিষ যত ব্যবহার হতে থাকবে সেটা তত প্রচলিত থাকবে, আরণ্যকের ব্যবহার কমে যাওয়াতে আস্তে আস্তে এটা অপ্রচলিত হতে থাকল। ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে দেখা গেল, এর মধ্যে বিভিন্ন কাহিনী আছে আর যজ্ঞ-যাগ কিভাবে করতে হবে তার বর্ণনা করা হয়েছে। পরের দিকে যজ্ঞ-যাগ করার জন্য যে নিয়মাবলী ছিল সেগুলো কল্পসূত্র, গৃহসূত্র ইত্যাদি নামে আলাদা অভিধান বানিয়ে নিয়েছিল। এর ফলে

ব্রাহ্মণের গুরুত্বও কমে গেল। পণ্ডিতেরা তখন করলেন কি একদিকে তাঁরা মন্ত্র মুখস্ত করতে থাকল আর অন্য দিকে উপনিষদকেও মুখস্ত রাখতে থাকল। যার ফলে মন্ত্র অংশ ও উপনিষদের অংশটা সহজে হারিয়ে যেতে পারল না। কিন্তু এই দুটো ব্রাহ্মণ আর আরণ্যক ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল। পরবর্তিকালে দেখা গেলে বেদের এই ব্রাহ্মণ আর আরণ্যক অংশ আমাদের পুরানাদি গ্রন্থে নানা আকারে ঢুকে গিয়ে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সেইজন্য আমরা কখনই বলতে পারিনা যে ব্রাহ্মণ আর আরণ্যক আমাদের ভারত থেকে সম্পূর্ণ ভাবে হারিয়ে গেছে। তবে এই দুটো অন্য ভাবে জায়গা করে নিয়ে এখনও আধ্যাত্মিক পিপাসু মানুষের অনেক চাহিদা পূরণ করে চলেছে।

যখন আমরা বেদ বলছি তখন মন্ত্র অংশকেই বোঝায়। যেমন যখন বলছি ঋকবেদ তখন ঋকবেদের মন্ত্র অংশকেই বোঝায়, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঋকবেদ বলতে পুরো চারটে অংশকেই ধরা হয়। অনেকে বলেন যে আমার ঋকবেদ মুখস্ত, তার মানে ঋকবেদের সংহিতা অংশটাই তার মুখস্ত। বেলুড় মঠে একজন আচার্য আছেন তাঁর যজুর্বেদের পুরোটাই মুখস্ত – মানে চারট অংশই, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ এই চারটেই মুখস্ত। আবার অনেকেই যারা বলছে বৈদিক দর্শন তখন বুঝতে হবে যে তারা আসলে উপনিষদের কথাই বলছে। যখন proper noun হিসাবে বলবে তখন বেদের তিন ধরণের অর্থ হয় – একটা হচ্ছে Samhita portion alone, Official portion alone and all four combined, বেদের অনেক রকমের আলাদা আলাদা অর্থ করা হয় আবার অনেক সময় উপনিষদকেই বেদ বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু মন্ত্রের কাজ আলাদা উপনিষদের কাজ আলাদা। কেউ যদি কঠোপনিষদ পড়ে থাকেন আর তাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে আপনি কি বেদ পড়েন? এখন সে যদি বলে হ্যাঁ, আমি বেদ পড়ি। এখন সে ভুল কিছু বলছে না, কঠোপনিষদ বেদেরই অংশ। কিন্তু যদি ঠিক ঠিক বলত হয় তাহলে বেদ বলতে এখন হয় মন্ত্র অংশকে বলা হবে অথবা এই চারটেকে মিলিয়েই (মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ) বেদ বলা হবে। এই সব কারণে বেদ পড়তে গেলে অনেক রকমের সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়।

বেদ – ২৪শে জানুয়ারী ২০১০

বেদে যে ধর্ম সাধনের কথা বলা হচ্ছে তা হল, শাস্ত্রোক্ত নৈষ্ঠিক কর্মানুষ্ঠান, শাস্ত্রে যে সব কর্মের কথা বলা হয়েছে সেই কর্মগুলির অনুষ্ঠান। যেমন যজ্ঞ-যাগ, পূজা অর্চনা ইত্যাদি সবই হচ্ছে ধর্ম সাধন। সব ধর্মেই নানা কর্মের কথা বলা হয়েছে, যেমন কোরানে কিছু কর্মের কথা বলা হয়েছে, যে কর্মের কথা শাস্ত্রে বলা আছে সেইগুলোকে নিষ্ঠাপুর্বক করাই হচ্ছে ধর্ম সাধন। মোক্ষ সাধনে ঠিক এর উল্টোটা হয়ে যায়। আমাদের সন্ন্যাস ধর্মে যা আছে বা উপনিষদে যা আছে সেটা অন্য ধর্ম থেকে তফাৎ। অন্যান্য ধর্মে সবাইকে ধর্মের নিয়ম আচারাদি পালন করতে হবে, কিন্তু আমাদের হিন্দু ধর্মে সন্ন্যাসীদের ধর্মের নিয়ম আচারকে অতিক্রম করতে হয়। ধর্মকে অতিক্রম করা মানে বিধর্মী হয়ে যাওয়া বোঝায় না, তারা ধর্মের ঐ স্তরকে অতিক্রম করে আধ্যাত্মিকতার আরো উন্নত স্তরে চলে যান। আচার নিয়মকে অতিক্রম করে সন্ন্যাসীরা একমাত্র আত্মানুভূতিতে মনকে লাগিয়ে দেন। অর্থ সাধন হচ্ছে টাকা-পয়সা, জমি-জায়গা এইগুলো অর্জন করার চেষ্টা করা। তবে যে কোন উপায়ে অর্জন করা নয়, পুরুষার্থ রূপে অর্থ সাধন হচ্ছে সৎ ভাবে, ধর্ম পথে এইগুলোকে অর্জন করার চেষ্টা। ধর্ম যদি এর মূলে না থাকে তাহলে তাকে অর্থ সাধন বলা হবে না। চতুর্বর্গ মানে চারটে লক্ষ্য আর চারটে আশ্রম হচ্ছে যারা আধ্যাত্মিক জীবন-যাপন করতে চান তাদের জন্য। শঙ্করাচার্য গীতার অস্টাদশ অধ্যায়ের ভাষ্যে বলছেন – বেশির ভাগ লোকেদের মধ্যে কামনা বাসনা বেশি মাত্রায় আছে, এদের জন্য এইসব ধর্ম কথা নয়। যে মুহুর্তে বর্ণাশ্রম বা পুরুষার্থের কথা বলা হবে তখনই ধরে নিতে হবে তার মধ্যে অনর্থ বা অধর্মের কিছু থাকবে না। নিজের খামখেয়ালি মত কিছু করা যাবে না একমাত্র শাস্ত্র যা যা বলে দিয়েছে তার বাইরে কিছু করা যাবে না।

বেদের যে আলাদা আলাদা নাম আছে সেই নামানুসারে বোঝা যাবে বেদকে কি অর্থে গ্রহণ করা হচ্ছে। বেদকে পাঁচ রকম ভাবে অর্থ করা হয় – নিগম, শ্রুতি, আমনায়, ত্রয়ী ও বেদ। বেদ কথার অর্থ আমরা আগেই বলেছি, বিদ্ ধাতু থেকে বেদ এসেছে, বিদ্ ধাতুর অর্থ হচ্ছে জানা। আস্তিক দর্শন আর নাস্তিক দর্শন সম্বন্ধে আমরা জেনে গেছি। এখন এই আস্তিক দর্শনের ছটি দর্শন আছে এদের একসঙ্গে বলা হয় ষড়্দর্শন। এই ছটি দর্শনের মধ্যে একটা দর্শন হচ্ছে মীমাংসা। মীমাংসকরা পুরো শক্তিটা বেদের উপরেই দিয়েছেন, বেদের ব্যাখ্যাতেই এদের গোটা দর্শন দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই দর্শন খুবই কঠিণ। তবে এটাই আশ্চর্যের যে, যদিও বেদ আমাদের শেষ কথা, আর মীমাংসকরা এই বেদকে নিয়েই তাদের দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করছেন, অথচ শঙ্করাচার্যের প্রধান প্রতিপক্ষ হচ্ছে এই মীমাংসকরা, তাঁর প্রধান লড়াই এদের সাথেই। আমাদের যখন শাস্ত্র পড়ান হয় তখন চারটে দর্শন পড়ানোর পরে মীমাংসা পড়ান হয়, একেবারে শেষে বেদান্ত পড়ান হয়ে থাকে। কেননা মীমাংসা দর্শন বুঝে নিলে পরে বেদান্ত পড়তে সহজ হয়। শঙ্কারাচার্যের সময় মীমাংসকদের বলা হত প্রধানমল্ল। মীমাংসা দর্শন এতো শক্তিশালী ছিল যে যদি কেউ মীমাংসকদের হারিয়ে দিতে পারে তাহলে ধরে নিতে হবে জগতের যত দর্শন আছে সবাইকে সে হারিয়ে দিয়েছে। কলকাতার যে সবথেকে বড় মল্লবীর সে যদি পাঞ্জাবে গিয়ে ওখানকার চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে দিতে পারে তাহলে পাঞ্জাবের সব মল্লবীরকেই হারিয়ে দেওয়া হল।

মীমাংসকদের হারাতে গিয়ে শঙ্করাচার্যকে খুব কঠিণ কঠিণ শক্তির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। প্রথমে তিনি খোঁজ নিলেন মীমাংসকদের প্রধান কে আছে। খোঁজ নিয়ে জানলেন যে তাদের প্রধান হচ্ছেন কুমারিল ভট্ট। কুমারিল ভট্টকে যখন তিনি খুঁজে বার করলেন তখন কুমারিল ভট্ট একটা অনুশোচনায় প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তুষের আগুনে নিজেকে আত্মাহুতি দিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষ করছেন। কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধ ধর্মকে জানার জন্য নিজের ধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মকে ভালো করে জেনে বুঝে, এদের দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটিকে আয়ত্ত করে নিয়ে পরে তিনি বৌদ্ধ ধর্মকে আক্রমণ করলেন, আর এমন আক্রমণ করলেন যে সারা ভারতে বৌদ্ধধর্মকে একেবারে নস্যাৎ করে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু নিজের ধর্মকে যেহেতু ত্যাগ করে বিধর্মী হয়েছিলেন সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তিনি নিজকে তুষাগ্নিতে আহুতি দিয়ে তিল

তিল করে পুড়তে পুড়তে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। শঙ্করাচার্য যখন কুমারিল ভট্টকে খুঁজতে খুঁজতে সেখান পৌঁছেছেন তখন কুমারিল ভট্ট একমাস ধরে একটু একটু করে পুড়ছেন। ঐ অবস্থাতে শঙ্করাচার্য গিয়ে তাঁকে গিয়ে বলছেন 'আমি আপনার সাথে তর্ক করতে এসেছি'। কুমারিল ভট্ট শঙ্করাচার্যকে তখন বলছেন 'আমারতো এই অবস্থা দেখছ, আমি তো এখন পুড়ছি, এই অবস্থাতে আমি তোমার সাথে কি আর তর্ক করব। তবে মিথিলাতে আমার শিষ্য মণ্ডন মিশ্র আছে, তুমি তাকে গিয়ে হারাও, ওকে হারালে আমাকেই হারান হবে'। শঙ্করাচার্য কুমারিল ভট্টের মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষ করে থেকে তাঁর মৃত্যুর পর ক্রিয়াকর্মাদি করিয়ে দিয়ে মিথিলাতে এসে মণ্ডন মিশ্রের কাছে এসে তাকে তর্কে আহ্বাণ করলেন। সাত দিন ধরে এই তর্ক চলেছিল। সাত দিন পর মণ্ডন মিশ্র নিজের পরাজয় স্বীকার করে শঙ্করাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়ে নিলেন। পরবর্তি কালে শঙ্করাচার্যের চারজন প্রধান শিষ্যের মধ্যে মণ্ডন মিশ্র একজন প্রধান শিষ্য হয়েছিলেন, তাঁর নাম হয়েছিল সুরেশ্বরাচার্য। মণ্ডন মিশ্রকে যেদিন শঙ্করাচার্য হারিয়ে দিলেন সেই দিন থেকে ভারতের প্রধান দর্শন হয়ে গেল বেদান্ত। শঙ্কারাচার্যের পর প্রায় তেরশো বছর ভারতের উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত বেদান্তকে কেউ হারাতে পারেনি। বেদান্তের মধ্যে প্রচুর শাখা-প্রশাখা আছে – দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ ইত্যাদি আর এদের প্রত্যেকের মধ্যে প্রচণ্ড বাদ-বিতণ্ডা লেগেই থাকে, কিন্তু অন্য দর্শন বা ধর্ম থেকে কেউ আক্রমণ করলে এরা সবাই এক জোট হয়ে পাল্টা আক্রমণ করবে।

বেদান্ত যতই শীর্ষে থাকুক, কিন্তু বেদের ব্যাপারে আজ পর্যন্ত আমরা যা কিছু পেয়েছি, আর এর যা কিছু ব্যাখ্যা আছে এর সবটাই হচ্ছে মীমাংসকদের অবদান। সেইজন্য বেদের ব্যাপারে মীমাংসা দর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বেদের বিভিন্ন মন্ত্রের, শব্দের অর্থ কিভাবে নেওয়া হবে, এই অর্থ কিভাবে কোথায় প্রয়োগ করা যাবে, এই শব্দ কেন ব্যবহার করা হয়েছে ইত্যাদি যে সব নিয়মগুলো আজকে আমরা পাচ্ছি এগুলোকে মীমাংসা দর্শন খুব যুক্তিসম্মত ও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তৈরী করে বেদকে তার নিজস্ব কাঠিণ্যতা আর ভীতি থেকে বার করে সবার ব্যবহারের উপযোগী করে দিয়েছে। সেইজন্য মীমাংসা খুব উচ্চকোটির দর্শন।

শ্রুতি – মীমাংসকরা শ্রুতিকে ব্যখ্যা করছে – *শ্রুয়তে ধর্ম অনয়া ইতি*। যে ধর্মোপদেশ গুরুমুখে শ্রবণ করা হয় তাকে শ্রুতি বলছে। যার তার কাছ থেকে যে কোন কিছু শুনে নিলেই শ্রুতি হবে না। গুরুর কাছ থেকে শোনা চাই আর যেটা শুনছে সেটা ধর্মের কথা হওয়া চাই, তবেই সেটা শ্রুতি হবে।

আমনায় – *আমনায়তে উপদিষ্যতে অনেন ইতি*। যে জিনিষ আদেশ দিচ্ছে। বেদ হচ্ছে – সে আদেশ দিচ্ছে, এইটা কর, এইভাবে কর, এখানে আদেশ দেওয়া হচ্ছে। বেদ আদেশ দিচ্ছে বলে বেদের আরকটি নাম হচ্ছে আমনায়। বেদ আর শাস্ত্রের এইখানেই পার্থক্য, শাস্ত্র আসছে শাস্ ধাতু থেকে, যা আমাদের কিছু আচরণ বিধি ঠিক করে দিচ্ছে, আমাদের আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু বেদ আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে না, আমাদের জীবনকে উচ্চ থেকে উচ্চতর অবস্থাতে নিয়ে যায়। তাই শাস্ত্রের স্থান বেদের থেকে একটু নীচে। রামকৃষ্ণ মঠ মিশনকে স্বামীজী দাঁড় করিয়ে গেছেন আর বর্তমান মঠ মিশনের অধ্যক্ষরা এই সংস্থাকে এখন চালাচ্ছেন – এখানে স্বামীজী হয়ে গেলেন বেদ আর অধ্যক্ষরা হচ্ছেন শাস্ত্র।

নিগম – নিগম হচ্ছে, যে ঐতিহ্য অনাদিকাল থেকে পরম্পরা ভাবে চলে আসছে। নিগম আর শ্রুতি প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। গুরুর কাছে ধর্মের যা কিছু শোনা হচ্ছে সেটাকে শ্রুতি বলা হয় আর পরম্পরা ভাবে যে আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য প্রবাহমান কাল থেকে চলে আসছে তাকেই নিগম বলা হচ্ছে।

ত্রয়ী – ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ এই তিনটেকে বেদ বলা হয়। আসলে বেদকে তিন ভাবে দেখা হয় – প্রথম হচ্ছে বেদকে পদ্য রূপে দেখা হয়। দ্বিতীয় হচ্ছে গদ্য রূপে আর তৃতীয় হচ্ছে সঙ্গীত রূপে, যেটাকে গান করা যায়। যে কোন সাহিত্য যখন রচিত হয় তখন এই তিনটির যে কোন একটি রূপে রচিত হয়ে থাকে – পদ্য, গদ্য ও গেয়। পদ্য আবার দুই রকমের হয় – একটা হচ্ছে পাঠমুক্ত আরেকটা হচ্ছে গেয়মুক্ত। পাঠমুক্ত হচ্ছে – কিছু কিছু কবিতা আবৃত্তি করতে খুব ভালো লাগে কিন্তু সেটাকে গান করা যায় না। আবার কিছু কিছু কবিতা আছে আবৃত্তি করতেও ভালো লাগে আবার সুরের ব্যবহার করে খুব সুন্দর গান করাও যায়। এই তিনটে রূপই আমরা বেদে পাই, যেমন – ঋকবেদ হচ্ছে পাঠমুক্ত, মানে শ্লোক রূপে। যজুর্বেদ হচ্ছে বেশিটাই গদ্যরূপে আর সামবেদ হচ্ছে গেয়মুক্ত, মানে গান করা যায়। এই তিনটে বৈশিষ্ট্যের জন্য বেদের আরেক নাম ত্রয়ী। আর অথর্ববেদ হচ্ছে পদ্য ও গদ্যের সংমিশ্রণ।

বেদকে ত্রয়ী কেন বলা হয় আমরা দেখলাম। যেহেতু বেদকে ত্রয়ী বলা হয় সেইজন্য পাশ্চাত্য দর্শনের পণ্ডিতরা বলেন প্রথমে তিনটি বেদ ছিল – ঋক, সাম ও যজু। যেহেতু অথর্ববেদ পরে রচনা করা হয়েছে তাই বেদকে চতুর্বেদ বলা যায় না। প্রাচ্যের পণ্ডিতরা এই মতকে অস্বীকার করেন। তাদের মতে ছন্দের তিনটে রূপ আছে, এই তিনটে ছন্দ তিনটে বেদে প্রতিফলিত হয়েছে, অথর্ববেদের বিশেষ কোন ছন্দ নেই। ঋকবেদের ছন্দকে বলা হয় ঋক, সামবেদের ছন্দকে বলা হয় সামগান আর যজুর্বেদে যে ছন্দ আছে তাকে বলা হয় যজুস্ ছন্দ। অথর্ববেদ হচ্ছে ঋক আর যজুস্ ছন্দের সংমিশ্রণ। অথর্ববেদে ছন্দের দিক থেকে আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য নেই বলে বেদকে ত্রয়ী বলা হচ্ছে। আমরা কিন্তু আমাদের পরম্পরা যে দৃষ্টিভঙ্গী সেটাকেই মানব।

বেদ – বেদ কথার অর্থ আমরা আগেই বলেছি। বেদ হচ্ছে যেটা দিয়ে জানা যায়। একটা মানুষের মনুষ্য জীবনে যা কিছু জানার আছে এই বেদ থেকেই সে সব জানতে পারে।

এই হচ্ছে বেদের চারটে নাম। একই জিনিষের বিভিন্ন নাম, আর প্রত্যেকটি নামের মধ্যে বেদের তাৎপর্য নিহিত রয়েছে, কোন ধরণের কল্পিত বা খেয়াল হল একটা কিছু নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে তা নয়। প্রত্যেকটি নামের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে – এই এই অর্থের জন্য বেদকে এই নামেও অভিহিত করা যায়।

শঙ্করাচার্য বেদের সংজ্ঞা দিচ্ছেন – *পরমাত্মানাং লভন্তে ইতি*। শঙ্করাচার্যের মতে যার দ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করা যায় তাকেই বেদ বলা হয়। মীমাংসকরা বেদের সংজ্ঞা দিচ্ছে – *শ্রুয়তে ধর্ম অনয়া ইতে*। বেদের এই দুটো সংজ্ঞাতেই বিরাট পার্থক্য এসে গেল। বেদের অর্থ দু দিকে চলে গিয়ে ভারতে দুটো দর্শনের জন্ম নিয়ে নিল। ধর্ম সাধন হচ্ছে যা আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে, আধ্যাত্মিক জীবন-যাপন করতে সাহায্য করছে আর আমাদের বাস্তবিক স্বরূপকে জানার একমাত্র লক্ষ্য করে যে সাধন করা হবে তাকে বলা হচ্ছে মোক্ষ সাধন। মীমাংসকরা বেদের সংজ্ঞা দিচ্ছে বেদের দ্বারা ধর্ম সাধন হয় আর শঙ্করাচার্য বেদের সংজ্ঞা দিচ্ছেন বেদের দ্বারা মোক্ষ সাধন হয়। বেদ অধ্যয়ন করতে গিয়ে যে নানান ধরণের সংশয় আসবে তার মূলে হচ্ছে বেদের এই দুটো বিপরীত সংজ্ঞা। যদিও আমাদের ষড়্দর্শন পুরোপুরি বেদের উপর আশ্রিত কিন্তু দুটি প্রধান দর্শন বেদের উপরে বেশি জোর দেয়, এর একটা হচ্ছে পূর্বমীমাংসা আর দ্বিতীয় হচ্ছে উত্তরমীমাংসা – একদল বলছে বেদ হচ্ছে ধর্মসাধন আরেক পক্ষ বলছে বেদ হচ্ছে পরমাত্মাকে জানার সাধন, পরমাত্মাকে জানার সাধনই হচ্ছে মোক্ষ সাধন।

ধর্মসাধনের সাথে মোক্ষের কোন সম্পর্কই নেই। কিন্তু ধর্মসাধনে মানুষ অনেক ভদ্র, নম্র, পবিত্র, মার্জিত হয়ে একজন ভালো মানুষে রূপান্তরিত হয়। সকালে উঠে গঙ্গা স্নান করা, জপ করা, উপোস করা এগুলো হচ্ছে ধর্মসাধন, এর সাথে পরমাত্মার সাধনের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু এগুলো করার ফলে

মানুষের মধ্যে অনেক ভালো সংস্কার তৈরী হয়ে একজন মানুষকে ভালো মানুষ হতে সহায়তা করে। এখন জপও করছে আবার ঝগড়া মারামারিও করছে, তা এটা ভালো না খারাপ? জপ না করার থেকে এটা অনেক ভালো। মিথ্যা কথাও বলে আবার মন্দিরেও যায়। তার স্বভাবে আছে সেতো মিথ্যে কথা বলবেই কিন্তু তাই বলে কি সে মন্দিরে যাওয়া ছেড়ে দেবে। এখানে সে ধর্মসাধন করছে, এই ধর্মসাধন করতে করতে ধীরে ধীরে তার মিথ্যে কথা বলাটা বন্ধ হয়ে যাবে। শ্রীমার জীবনে তেলোভেলোর মাঠে ডাকাতের ঘটনা আমাদের সবারই জানা আছে। কালীকে পূজা দিয়ে ডাকাতি করত, ডাকাতি করে আবার এসে মা কালীকে পূজা করত। এখন আরেকজন ডাকাতি করছে সে এসব কিছুই করছে না, এ কিন্তু কোন দিনই ডাকাতি ছাড়তে পারবে না, যদিও বা ছাড়ে সে ভালো মানুষ হতে পারবে না, অন্য কোন খারাপ কিছু করতে থাকবে। কিন্তু যে কালীকে পূজা করে ডাকাতি করছে, যেদিন সে ডাকাতি করা ছেড়ে দেবে সেদিন থেকে সে এক অন্য মানুষ হয়ে যাবে। আজকে তেলোভেলো গ্রামে মায়ের বিরাট মন্দির হয়েছে, যারা ডাকাতি করত তারাই আজ ভক্ত হয়ে গেছে। অন্যান্য ধর্ম থেকে হিন্দু ধর্মের এইটাই হচ্ছে বিশেষত্ব – তুমি যাই কর, চুরি কর আর ডাকাতি কর, তোমার মনটাকে ভগবানের দিকে দাও, তাতেই আস্তে আস্তে তোমার কর্মগুলি পাল্টাতে থাকবে।

ধর্মসাধনে আমাদের দুটো ভালো জিনিষ হচ্ছে – একটা হচ্ছে সে ভালো মানুষ হয়ে যাচ্ছে আর যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে আমাদের কর্মটা পাল্টাতে থাকে। কর্ম পাল্টে গেলে মানুষের কাম আর অর্থে সিদ্ধিটা আসতে থাকে। অর্থোপার্জনে যে বাধাগুলো ছিল সেগুলো সরে যায়, এখন সে চেষ্টা করলেই প্রচুর অর্থ রোজগার করতে পারবে। এরপরে আসছে কাম লাভ, কাম মানে শুধু পুরুষ-নারী সম্পর্ককেই বোঝায় না, যে কোন ধরণের সুখ ভোগকে কাম বলা হয় – ভালো খাওয়া, ভালো থাকার জায়গা, ভালো পোষাক, গাড়ি, যে কোন ভোগই হচ্ছে কাম। ধর্মসাধনে এগুলো ভোগ করার শক্তিটা বেড়ে যায়। আমরা মনে করি বেশি ধর্মসাধন করলে মাথা খারাপ হয়ে যায়, কিন্তু না, উল্টোটাই হয়। যার দিনকাল খুব খারাপ যাচ্ছে সে যদি খুব করে ধর্মসাধন করে তাহলে তার ঐ খারাপ অবস্থাটা কেটে যায়। এখনও দেখা যায় কারুর যদি সময় খারাপ যাচ্ছে তাকে বলা হয় একদিন সত্যনারায়ণের পূজো দাও, কিংবা রোজ এক অধ্যায় করে চণ্ডীপাঠ কর, হনুমান চল্লিশা পাঠ কর সব ভালো হয়ে যাবে। সত্যি সত্যিই ভালো হয়ে যায়, কারণ যে বাজে কর্মগুলো আছে সেগুলি এই শুভ কর্মের দ্বারা কেটে যায়। যেসব বাচ্চারা খুব চঞ্চল, অবাধ্য, এদের যদি জোর করে রোজ জগন্নাথের আটকে প্রসাদ আর একটু গঙ্গাজল খাইয়ে দেওয়া হয় কিছুদিন পরে দেখা যায় এদের স্বভাবটা আগের থেকে অনেক শান্ত হয়ে গেছে। একদিনে হবে না, সময় লাগবে, কিন্তু ফল দেবেই।

মীমাংসকরা এইগুলোও বলছেন যে তোমার চরিত্র পাল্টে যাবে, তোমার কর্মের গোলমালগুলো ঠিক হয়ে গিয়ে কামসিদ্ধি ও অর্থসিদ্ধি হবে। কিন্তু মীমাংসকদের কাছে সব থেকে যেটা বেশি গুরুত্ব তা হচ্ছে, ধর্মসাধন ভালোভাবে করলে মৃত্যুর পরে তুমি উচ্চ স্বর্গে যাবে, তারপর স্বর্গ থেকে পরে যখন তোমার পতন হবে তখন তুমি কোন ভালো বংশে, ভালো বাড়িতে জন্ম গ্রহণ করবে। মীমাংসকদের মতে ধর্মসাধনে এই তিনটে জিনিষ হচ্ছে – তোমার স্বভাব পাল্টে গিয়ে তোমাকে ভালো মানুষ করতে সাহায্য করবে, দ্বিতীয় তোমার কর্মগুলি ঠিক হয়ে তোমার অর্থ ও কাম লাভের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং সব শেষে তৃতীয় যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তা হল তোমার ভেতরে যে সূক্ষ্ম শরীর রয়েছে সেটা তোমার মরার পর আরেকটা শরীর ধারণ করে উচ্চ থেকে উচ্চ স্বর্গে গিয়ে সে শরীরের মাধ্যমে আরো ভালো সুখ ভোগ করতে থাকবে। মীমাংসকরা মোক্ষ বলে কিছু মানেই না, মুক্তি বলে কিছু নেই। এদের কাছে ধর্মই হচ্ছে সব কিছু, কর্ম কর, ধর্মকার্জই হচ্ছে কর্ম, কর্ম করলেই এই জীবনে সুখ ভোগ করবে আর মৃত্যুর পর ভালো স্বর্গে যাবে, আবার সেখান থেকে তুমি আবার ভালো ঘরে জন্ম নেবে। এদের এইটাই মত – জন্ম নিচ্ছে মরে যাবে, আবার জন্ম নেবে আবার মরবে এইটাই চলতে থাকবে, মুক্তি-ফুক্তি বলে কিছু নেই। গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে

বলছেন – তুমি যদি মীমাংসকদের মত মনে কর আত্মা জন্মে নেবে আবার মরবে, তারপরে আবার জন্ম নেবে, তাহলেও তোমার শোক করা উচিৎ নয় – *অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্। তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি।।* মীমাংসকদের এইটাই হচ্ছে সিদ্ধান্ত – আত্মার জন্ম নেই মৃত্যু নেই, সৃষ্টিও অনাদিকাল চলতে থাকবে, আত্মাও জন্ম নিয়ে একটা শরীর ধারণ করবে আবার মৃত্যু হবে, মৃত্যুর পর তার কর্মানুসারে স্বর্গে যাবে, সেখান থেকে আবার জন্ম নেবে এইভাবেই কোটি কোটি বছর চলার পর সৃষ্টিতে প্রলয় হবে, প্রলয়ের পর আবার যখন কোটি কোটি বছর পর আবার সৃষ্টি হবে তখন আবার এই জন্ম-মৃত্যুর খেলা চলতে থাকবে, এর শেষ নেই। সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে মেঘ হয়ে চলে গেল আবার বৃষ্টি হয়ে নদী দিয়ে সেই জল প্রবাহ হয়ে সমুদ্রে এসে পড়ল, এইভাবে অনাদি কাল ধরে চলতেই থাকবে। এদের এই মতবাদকে খণ্ডন করা খুবই কষ্টসাধ্য, শঙ্করাচার্যকে এর জন্য প্রচুর খাটতে হয়েছিল। চার্বাক দর্শনে এগুলো কিছুই মানা হয় না, তাদের মতে মৃত্যুর পর সব শেষ।

চতুর্থ যে মতবাদ আছে সেটা মীমাংসকরা মানে না, কিন্তু যারা বেদান্তী তারা মানে। ধর্মসাধন আমাদের মোক্ষের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুতি করিয়ে দেয়। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা যে এত নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা কাজ করছে, পূজো করছে, সবাই কিন্তু এখানে মীমাংসকদের অনুসরণ করছে। এতে আমাদের মনটা পরিষ্কার করে দিচ্ছে। মনটা যখন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে তখন তাকে মোক্ষের দিকে এগিয়ে দেবে। আগেই বলা হয়েছে মীমাংসকরা এই মোক্ষ সাধনকে মানে না, বেদ থেকেই এরা বলবে, আর এর জন্য তাদের খুব জোড়াল যুক্তিও দাঁড় করিয়ে দেবে, আবহমান কাল থেকে এই বিতর্ক চলে আসছে। শঙ্করাচার্য বলছেনে – *পরমাত্মানাং লভন্তে ইতি*। কিন্তু পরমাত্মা বলে পূর্বমীমাংসকরা কিছু মানেই না। পূর্বমীমাংসকরা ঈশ্বর মানে না, ভগবান মানে না, পরমাত্মাকে মানছে না, তাহলে এরা আসলে কি মানে? এসব কিছুই মানে না। এদের কাছে আসল হচ্ছে ধর্ম সাধন। কর্ম কর্ম কর্ম, এ ছাড়া মীমাংসকরা আর কিছুই জানে না। পূর্বমীমাংসার দর্শন পুরোপুরি এটার উপরই দাঁড়িয়ে আছে। তারা মানুষ ছাড়া বলবে ভূত-প্রেত আছে আর আছে ইন্দ্রাদি দেবতা। এই ইন্দ্রাদি দেবতাদেরকেও যজ্ঞ দ্বারা পতন করিয়ে দেওয়া যাবে। পূর্বমীমাংসকরা বলছে আমি এমন মন্ত্র জানি যে এই মন্ত্র দিয়ে আমি ইন্দ্রকে টেনে নীচে নামিয়ে আনতে পারি। মহাভারতে এরা এটা করে দেখিয়ে দিয়েছে। জনমেজয় সর্পযজ্ঞ করার সময় যখন জানতে পারল যে তক্ষক ইন্দ্রের মুকুটে লুকিয়ে আছে, তখন পুরোহিতরা বলেছিল যে ইন্দ্রশুদ্ধু তক্ষককে যজ্ঞে টেনে নামিয়ে আন। ইন্দ্র বুঝতে পেরেই তার মুকুটটা খুলে ছুঁড়ে ফেলেছে। বেদের মন্ত্রগুলির এমন শক্তি আছে যে দেবতাদেরও বেঁধে নিয়ে আসতে পারে। এরা বিশ্বাস করত বেদের মন্ত্রের মধ্যেই রয়েছে সর্ব শক্তি। এই মন্ত্রকে যদি যজ্ঞে ঠিক ভাবে প্রয়োগ করা হয় তাহলে যে কোন কার্যসিদ্ধি সম্ভব। এদের কাছে মুক্তি বলে কিছু নেই, সেইজন্য এদের কাছে কর্মই হচ্ছে শেষ কথা। এই যে অনেকে বলে স্বর্গ বলে কিছু আছে নাকি? মৃত্যুর পর আবার কিছু হয় নাকি? মরে গেলেই সব শেষ। এদের এই ধরণের মত হাজার হাজার বছর আগে চার্বাক দর্শনে বলা হয়ে গেছে। চার্বাকরা বলে – যারা বেদ লিখেছে এরা হচ্ছে ধুর্ত, ভ্রষ্ট, নিশাচর দৈত্য। শুধু অর্থ রোজগার করবে, মাংস খাবে এই লোভে এরা বেদ লিখেছে। চার্বাকরা হচ্ছে ভারতের বস্তুবাদী দর্শনের জনক, আজ থেকে চার হাজার বছর আগেই এদের পুরো দর্শন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল, কম্যুনিষ্টরা নতুন কিছু কথা আজকে বলছে না। বেদের পণ্ডিতরা এগুলো খুব নির্বিকার ভাবেই গ্রহণ করেন, এরাও এর উপযুক্ত জবাব দিয়ে দেন। তাই আজকালকার কিছু বস্তুবাদী লোকেরা দুই একটা বই পড়ে আমাদের শাস্ত্রকে নিয়ে তর্ক করতে আসে তাদের জন্য একটাই কথা – ভাই তোমরা নতুন কথা কিছু বলছ না বেদের বিরুদ্ধে, আমাদের একটা পুরো দর্শনই এর উপরে বহু বছর আগে থাকতেই চলে আসছে।

মীমাংসকরা বেদের যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা, যা সমস্ত বেদ শিক্ষার্থীকে প্রথমেই মুখস্থ করতে হয় তা হচ্ছে – *মন্ত্র ব্রাহ্মণয়ো বেদানাম্ ধ্যেয়* – বেদের অর্থ হচ্ছে মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ। এই সংজ্ঞা থেকে

বোঝা যাচ্ছে মীমাংসকদের কাছে বেদ হচ্ছে শুধু মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ, বাকি যা আছে তা বেদ নয়। কারণ উপনিষদ বলছে শুধু আত্মতত্ত্বের কথা, কিন্তু আত্মতত্ত্ব দিয়ে তো আর ধর্ম সাধন হবে না। আরণ্যকেও কোন বাহ্যিক ক্রিয়াদি নেই, শুধু মনে মনে কল্পনা করলেই হবে। এখন এই দিয়েও ধর্ম সাধন হবে না। তাই মীমাংসকরা উপনিষদ আর আরণ্যককে বেদ বলে গ্রহণ করবে না। এখন মন্ত্র হচ্ছে – যজ্ঞে যেটা লাগবে সেটার বর্ণনা করা হয়েছে। আর ব্রাহ্মণে যজ্ঞ কি ভাবে হবে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই দুটোই ধর্ম সাধনের প্রধান অবলম্বন তাই এই দুটোকেই বেদ বলা হয়, তাই বলে উপনিষদ আর আরণ্যককে মীমাংসকরা উড়িয়ে দিচ্ছে না। তারা বলছে আরণ্যক আর উপনিষদেরও প্রয়োজনীয়তা আছে, এই দুটোকে উড়িয়ে দিলে চলবে না। এই দুটো হচ্ছে গৌণ। গৌণ এই কারণে, লোকেদের মন যাতে ধর্মসাধনে প্রবৃত্ত হয় তার জন্য বেদে আরণ্যক আর উপনিষদের কথা বলা হয়েছে। এই দুটো আমাদের প্রস্তুতি করিয়ে দিচ্ছে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ যাতে ঠিকভাবে করতে পারি। শঙ্করাচার্য এইটাকেই পুরোপুরি উল্টে দিয়ে বললেন – তুমি আগে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ অনুশীলন করে, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ অনুশীলন করে যখন তোমার মন শুদ্ধ হবে তখন তুমি উপনিষদে চলে আসতে পারবে।

বেদের উপরে আমরা এই দুটো পরিষ্কার বিভাজন দেখতে পাই। এই বিভাজনটাকে পরিষ্কার ভাবে ধরতে না পারলে বেদের কিছুই বুঝতে পারব না। দুটো বিভাজন হচ্ছে – মন্ত্র + ব্রাহ্মণ (প্রথম ভাগ) আর আরণ্যক + উপনিষদ (দ্বিতীয় ভাগ)। মীমাংসকরা অনেক জায়গায় আরণ্যককে ব্রাহ্মণের মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছে। আরণ্যকে খুব বেশি দর্শনের কথা নেই, দর্শনের দিকে নির্দেশ করে দিচ্ছে কিন্তু আলোচনা করেনি। এই কারণে মীমাংসকরা মন্ত্র আর ব্রাহ্মণকেই বেদ বলছে। পরের দিকে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীও মীমাংসকদের এই মত গ্রহণ করেছিলেন। এদের কাছে উপনিষদের কোন মূল্য নেই। উপনিষদের ব্যাপারে এরা বলছে – তোমার ভেতরে যে আত্মা আছে সেই আত্মার ভাবকে উপনিষদ জাগিয়ে দিচ্ছে। সেইজন্য তোমাকে আত্মসাধন করতে হবে। আত্মসাধন এদের মতে – ধর্মসাধন। ধর্মসাধন মানেই মন্ত্র আর ব্রাহ্মণের যজ্ঞ-যাগ। তুমি যজ্ঞ-যাগ কর তাহলে তোমার আত্মভাব জেগে যাবে। যজ্ঞ-যাগ কর, তিথি পূজাতে বেলুড় মঠে খিচুরী খাও, পয়লা জানুয়ারী কাশীপুর যাও, রোজ দুবেলা জপ কর এই সবই হচ্ছে ধর্মসাধন। মীমাংসকরা যেহেতু মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের মধ্যেই বেদকে বেঁধে রেখেছে সেইহেতু বেদের যে সনাতন দর্শন, তাকে সঙ্কুচিত করে দিয়েছে। শঙ্করাচার্য কিন্তু এই চারটেকেই বেদ বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী খুবই প্রাঞ্জল ও গভীর। শঙ্করচার্য যে দর্শন দিয়ে গেছেন সেখানে বোঝাই যায় শঙ্করের সাথে কারুরই বিরোধ নেই, হিন্দুধর্মের মত তিনি সবাইকে জায়গা করে দিয়েছেন, কাউকেই অস্বীকার করেন নি। মীমাংসকরা যেমন উপনিষদ ও আরণ্যককে বেদ বলেই মানেনা, শঙ্কর কিন্তু কোনটাকেই বেদ নয় বলছেন না, তিনি মন্ত্র-ব্রাহ্মণকেও বেদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলছেন। শঙ্করাচার্য বলছেন মন্ত্র-ব্রাহ্মণ ভালো করে অনুশীলন করলে তোমার মন শুদ্ধ হবে। মন যখন শুদ্ধ হবে তখনই তুমি বুঝতে পারবে উপনিষদ কি বলছে। রামকৃষ্ণ মঠ মিশনও একই কথা বলছে – এখানে মন্ত্র-ব্রাহ্মণের কথা বলছে না কিন্তু অন্য ভাবে বলছে – কাজ কর, কাজ কর, দেশের জন্য কাজ কর, সমাজের জন্য কাজ কর, আর্ত-পীড়িতদের জন্য কাজ কর। এইভাবে কাজ করতে করতে তোমার মন শুদ্ধ পবিত্র হবে, তখন ঠাকুরের নাম নিলে উপনিষদের তত্ত্ব কিছু কিছু ভেতরে যেতে শুরু করবে। কিছু না করে ফাঁকা আওয়াজে কিছুই হবে না। শঙ্করাচার্যের মত ও শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের আদর্শ এক, এখানে কোন বিরোধ নেই।

স্বামীজীর জীবনে একটা ঘটনা আছে, যে ঘটনাটা তিনি নিবেদিতাকে একটা চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন। স্বামীজী তখন ভারত পরিক্রমা করছেন। পরিক্রমা করতে করতে তিনি পাঞ্জাবে সিন্ধু নদের তীরে উপস্থিত হয়েছেন। সিন্ধু নদের তীরে একদিন ভোরবেলা তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সেই সময় তাঁর একটা দিব্যদর্শন হয়। তিনি দেখতে পান একটা হাল্কা কুয়াশা সিন্ধু নদের তীরে তাঁর সামনে ঢেকে রেখেছে। স্বামীজীর অনেক দিব্যদর্শন হত, কিন্তু তিনি কোথাও এগুলোকে বেশি উল্লেখ করেননি। এই একটা

দিব্যদর্শনের কথা তিনি নিবেদিতাকে বলে গেছেন। সেই কুয়াশার মধ্যে তিনি কবেকার এক বিরাট জটাজুট ও শশ্রুমণ্ডিত প্রাচীন বৃদ্ধ ঋষিকে দেখতে পেলেন। আর কুয়াশা যেন তরঙ্গাকারে ঢেউ পর ঢেউ এসে ঋষির উপর দিয়ে ভেসে যেতে লাগল। ঘুম থেকে জেগে গেলে যে রকম অনুভব হয়, সেই রকম স্বামীজীর যেন মনে হল তিনি ঘুম থেকে জেগে গেলেন আর তাঁর কানে সেই ঋষির উদাত্ত কন্ঠে উচ্চারিত বেদের একটি বিখ্যাত মন্ত্র ভেসে এল - *আবহি বরদে দেবী যৎচ্ছরিতম্ আবাদিনী গায়ত্রী ছন্দসাম্ মাতা ব্রহ্মযোনি নমহোস্তুতে*। এটা হচ্ছে বাগদেবীর আবাহনের মন্ত্র। স্বামীজী বৈদিক মন্ত্রের ছন্দ ও সুর জানতেন। স্বামীজী দেখলেন তিনি বেদের যে সুর জানেন তার থেকে ঋষি যে সুরে ও ছন্দে মন্ত্রোচ্চারণ করছে সেটা পুরো আলাদা। তাতে স্বামীজী একটু আশ্চর্য হয়ে গেলেন, কেননা আমরা যে পরম্পরা ভাবে বেদের মন্ত্রোচ্চারণ শুনে থাকি তার থেকে পুরোটা আলাদা একটা অন্য সুরে উচ্চারিত হচ্ছে। এখান থেকে স্বামীজী একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন। আগেকার দিনে ঋষিরা যে সুরে বেদের মন্ত্রোচ্চারণ করতেন তার সুর পুরো আলাদা ছিল। কিন্তু পরের দিকে ম্লেচ্ছরাও যখন বেদ পাঠ করার সুযোগ সুবিধা পেয়ে গেল তখন থেকে বেদমন্ত্রের উচ্চারন ও সুরটা পাল্টাতে থাকে। মন্ত্রের উচ্চারণ ও সুর যদি ঠিক না হয় তার প্রথম যেটা ফল হবে, মন্ত্র কিন্তু ঠিকঠাক কাজ করবে না, মন্ত্র পাঠের কোন ফল হবে না। স্বামীজী এখানে যে যুক্তি দেখিয়েছেন সেখানে কোথাও এতটুকু ফাঁকফোকর নেই, পুরোটাই যুক্তিপূর্ণ। স্বামীজী লিখছেন ঋষির কণ্ঠ থেকে যে সুরটা উদ্‌গারিত হয়েছিল সেটাই হচ্ছে ভারতের জাতীয় সুর। স্বামীজী আরও বলছেন শঙ্করাচার্যরেও এই রকম একটা দিব্যদর্শন হয়েছিল যেখানে তিনি ভারতের এই জাতীয় সুরটাকে জানতে পেরেছিলেন। বেদ আর উপনিষদের যে ঠিক ঠিক হৃৎস্পন্দন সেটাকে শঙ্করাচার্য ধরতে পেরেছিলেন। আর আজ আমিও বেদ ও উপনিষদ ঠিক কি বলতে চাইছে, তার মর্মবাণীকে উপলব্ধি করলাম। সেইজন্য বলা হয় ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে ঠিক ঠিক ভাবে জানতে হলে একমাত্র শঙ্করাচার্য আর স্বামীজীর মাধ্যমেই জানা যেতে পারে। ভারতের জাতীয় সুরটা কি? নানান ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যেও ভারত কেন এখনও স্বমহিমায় টিকে আছে, দেশ কোন দিকে যাচ্ছে, সেখানে স্বামীজীর কি ভূমিকা, এই সমগ্র চিত্রটা তাঁর পরিষ্কার হয়ে যায়। এই যে প্রাচীন বৈদিক যুগের ঋষির কণ্ঠে বেদ মন্ত্রের সুরের মুর্ছনা শুনলেন, সেই সুরের সঙ্গে গলা মেলালেন, তারপর থেকে তিনি পুরোপুরি পাল্টে গেলেন। এই ঘটনার পরেই তিনি গেছেন কন্যাকুমারী। ঠিক কোন্ সময়ে তাঁর এই দিব্যদর্শন হয়েছিল জানা যায় না। স্বামীজীর এই দিব্যদর্শনের তাৎপর্যকে যদি আমরা ঠিকঠিক বুঝতে পারি তখন বেদের ব্যাপার, বেদ কি, বেদ কেন এটা পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে যাবে। প্রত্যেক দেশেরই একটা নিজস্ব অন্তরের বাণী আছে, আমেরিকার আছে, জাপানের আছে, ইংল্যাণ্ডের আছে। ভারতের সুর হচ্ছে এই বেদের সুর, বেদে যা আছে সেটাই হচ্ছে ভারতের জাতীয় সুর। ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে জানতে হলে ভারতের এই জাতীয় সুরটাকে ধরতে হবে। যে মুহূর্তে আমাদের কারুর ব্যক্তিত্বের মধ্যে বেদে কি আছে, বেদ কি বলতে চাইছে বেদের এই সুরের একই তরঙ্গের মাধ্যমে প্রতিধ্বণীত হবে সেদিন থেকে সে মহান আধ্যাত্মিক পুরুষে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। সেদিন থেকে এনারা আর টাকা পয়সা মান সম্মানের দিকে ফিরেও তাকাবেন না। কিন্তু তাঁদের মধ্যে এমন একটা শক্তি এসে যায় যে শক্তিতে তাঁরা গোটা বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিতে পারেন। এই কারণেই স্বামীজী মহান আধ্যাত্মিক পুরুষ। অন্য এক দৈবী শক্তিতে শক্তিমান হয়ে তাঁরা জগতকে বহু বছর ধরে প্রভাবিত করে চলেন। ঠাকুরের এইটা ছিল। তিনিও একবার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে গেছেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেবেন্দ্রনাথকে বলছেন – তুমি বেদ থেকে কিছু বল। ঠাকুরের পুরো জীবনটাই হচ্ছে বেদ। তিনি বেদস্বরূপ ছিলেন, তাঁকে বলা হয় শ্রীরামকৃষ্ণ রূপী বেদ। বেদে যা আছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন তাইই। শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতরাষ্ট্রের যে রাষ্ট্রীয় সুর সেটাকে স্বামীজী বা শঙ্করাচার্যের মত ধরেননি, তিনিই স্বয়ং সেই রাষ্ট্রীয় সুর। স্বামীজী যখন সিন্ধুনদের তীরে সেই রাষ্ট্রীয় সুর শুনেছিলেন, সেই সুরই তিনি পেয়েছিলেন যখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে নিজের সব কিছু দিয়ে বরণ করেছিলেন। আমাদের বলা হয় শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরে থাকো তাহলেই সব হয়ে যাবে। শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরা মানে কি? শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে যে তাঁর ভাবতরঙ্গ সেইটাকে ধরা। যেদিন কেউ এটাকে ধরে নিতে পারবে সেদিনই সে আধ্যাত্মিক জগতের মহান ব্যাক্তিত্ব রূপে পরিগণিত হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের যে ছন্দ, যে ভাব, আর বেদের

যে ভাব ও ছন্দ দুটোই এক ছন্দ। ভারতের যে জাতীয় সুর একমাত্র ধ্বণিত হচ্ছে একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাক্তিত্বে। স্বামীজী এইটাকে ধরতে পেরেছিলেন। যেই কেউ এটাকে ধরে নিতে পারবে সাথে সাথে তারও ব্যাক্তিত্বে এই সুর বাজতে আরম্ভ করে দেবে।

বেদের মন্ত্রগুলো হচ্ছে সেই দিব্যশক্তির স্তুতি, এখানে যেমন বাকদেবীর স্তুতি করা হচ্ছে। দ্বিতীয় হচ্ছে এই মন্ত্রগুলো ঋষিরা অনুভূতির মাধ্যমে পেয়েছিলেন। পঁচিশ তিরিশ বছর সাধনার পর সাধনা করে করে তাঁরা যখন গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতেন সেই অবস্থায় এই মন্ত্রগুলো তাঁদের মনে উদ্ভাসিত হত। তারপর তিনি তাঁর নিজের শিষ্যদের বলতেন – হে তাত, আমি সেই সত্যকে জেনেছি, এই মন্ত্রটা পেয়েছি। এই বলে তিনি সেই মন্ত্রটা তাদেরকে শুনিয়ে বলতেন – এটা তোরা মুখস্ত করে তোদের হৃদয়ে ধ্যান করবি। আমি নদীর ধারে বসে আছি, একটা পাখি গাছে বসে গান করছে সেটা দেখে আমার মধ্যে একটা কল্পনা এলো আর এই কল্পনা থেকে একটা কবিতা লিখলাম, বেদ এই ভাবে কখনই রচিত হয়নি। যারা মনে করে বেদ কয়েকজন কবির মনের কল্পনার প্রতিচ্ছবি, এদের জন্য বেদ নয়। ঋষিরা যদি কিছু রচনা করতে চাইতেন তাহলে তিনি এর থেকে অনেক বিরাট কিছু রচনা করতে পারতেন। বিখ্যাত সাহিত্যিকদের মত বইয়ের পর বই তারা লিখতে যেতেন না। আমরাও যদি সারাটা জীবন সাধনা করে যাই তাহলে হয়তো এই রকম দুই একটা মন্ত্র পেতে পারি। কিন্তু ঋষিরা আরো অনেক বেশি পেতেন। কিন্তু ঋষিরা কখনই কোন অবস্থাতেই নিজের খুশি মত কবিতা লিখতে যেতেন না, ঋষিরা বরং তার থেকে ধ্যানের গভীরে গিয়ে বসে থাকতে চাইতেন। বসেই আছেন, কত ঋষি কিছু না পেয়েই হয়তো শরীর ছেড়ে দিয়েছিলেন। যিনি পেতেন তিনি আবার তাঁর শিষ্যকে দিয়ে যেতেন, যেমন এই ঋষি স্বামীজীকে দিয়ে গেলেন। এইভাবেই গুরু পরম্পরা চলে আসছে। এইটাই হচ্ছে ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনার মূল ভিত্তি। বই পড়ে আধ্যাত্মিক বিদ্যা উপার্জন করা যায় না। আমরা যে এখানে বেদের আলোচনা করছি এতে বেদের শব্দগুলিকে বাক্যরূপে দেওয়া যাবে মাত্র, বেদের প্রকৃত তাৎপর্যকে দর্শন করান যাবে না। বেদের এই ঐতিহ্য সম্প্রসারণ একমাত্র গুরু থেকে শিষ্যের মাধ্যমেই সম্ভব। সুফি সম্প্রদায়ের মুসলমানরাও এইটাকে মানে, এনারাও বলেন বই পড়ে সুফির ঐতিহ্য লাভ করা যায় না।

2nd half.

ইংরাজীতে যখন Veda লেখা হয় তখন তার একটা বিশেষ অর্থ হবে আবার যখন The Vedas লেখা হবে তখন তার আবার অন্য অর্থ হবে। যখন Veda বলা হয় তখন তার অর্থ হচ্ছে common noun, যেটা আমরা আগে আলোচনা করেছি আবার যখন The Vedas বলা হয় তখন চারটে বেদকে উল্লেখ করা হচ্ছে – ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব। প্রাচীন কাল থেকে দুটো মত চলে আসছে – একটা মতে বলছে যা কিছু আছে সব বেদেই আছে, তোমার গরু হারিয়ে গেছে, সেই গরুকে বেদে খুঁজবে, তার মানে যত ধরণের জ্ঞান হতে পারে সবই হচ্ছে বেদ। এইটাই হচ্ছে ভারতের প্রাচীন হিন্দুদের মত। যার ফলে যে কোন বিদ্যার নামের সাথে বেদকে জুড়ে দেওয়া হত যেমন – ধনুর্বেদ, আয়ুর্বেদ ইত্যাদি। ইদানিং কালে যেমন বিজ্ঞান শব্দকে জুড়ে দেওয়া হয় – environmental science, political science, management science etc. বেদকে যখন এইভাবে ব্যবহার করা হয় তখন common noun হিসাবে বলা হচ্ছে। যাকে এখন বিজ্ঞান বলে সম্বোধিত করা হচ্ছে তাকেই আমরা আগে বেদ বলতাম।

আমরা দেখেছি বিদ্ ধাতু থেকে বেদ শব্দের জন্ম হয়েছে, বিদ্ মানে যে কোন কিছুকে জানা। এখন যেকোন জিনিষকে জানার ব্যাপারকে বেদ কেন বলা হচ্ছে? সব ধর্মেই ঈশ্বর হচ্ছেন অনন্ত। পৃথিবীতে যতগুলি ধর্মীয় দর্শন আছে তার মধ্যে একটি দর্শন ঈশ্বরকে মানে না, সেই দর্শনটির নাম হল পূর্বমীমাংস। ঈশ্বরকে না মানলেও এরা দেবতাদের মানে। ইংরাজীতে বানানের মাধ্যমে খুব সুন্দর ভাবে দেবতা ও ভগবানের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। দেবতাদের ক্ষেত্রে গড্ শব্দে ছোট অক্ষরের ‘জী’ ব্যবহার করা হয় আর

ঈশ্বরের ক্ষেত্রে বড় অক্ষরের 'জী' লেখা হয় – (god – দেবতা আর God – ঈশ্বর)। দেবতারা হচ্ছেন সান্ত এঁদের ক্ষমতাও সীমিত। দেবতাদেরও পতন হয়, কিছুদিন দেবতা পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর তাদের সেখান থেকে পতন হয়ে যায় – এটা হচ্ছে মীমাংসকদের মত।

যারা ঈশ্বরকে মানেন, তাদের কাছে ঈশ্বর হচ্ছেন অনন্ত, আর জ্ঞান যেটা সেটা ঈশ্বরের সঙ্গে একীভূত হয়ে আছে। ঈশ্বর আর তাঁর জ্ঞানকে কখনই আলাদা করা যাবে না। আমরা বলি – তিনি হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ। সৎ, চিৎ আর আনন্দকে এক সঙ্গে করে বলা হয় সচ্চিদানন্দ। এর যে চিৎ অংশ তাকেই বলা হচ্ছে জ্ঞান বা চৈতন্য। ঈশ্বরেরই আরেকটি নাম হচ্ছে জ্ঞান বা চৈতন্য। বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে আছে – In the beginning there was word, and God was with word and word was God. গ্রীকের প্রাচীন দার্শনিকরা এই শব্দকে বলত Logos, পরে এই লোগোস্ থেকেই লজিক্ শব্দটা এসেছে। ভারতীয় দার্শনিকরা এইটাকে বলতেন শব্দ। বাংলার শব্দ আর সংস্কৃতের শব্দ এই দুটো আলাদা অর্থ। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত যত ধর্ম টিকে আছে তাদেরকে তিনটে বিভাগে বিভক্ত করা হয় – হিন্দু, পার্সি আর জুহুদী। জুহুদী হচ্ছে Jews, পার্সি হল Zoroastrian, ইদানিং কালে মুম্বাই অঞ্চলে এদের মুষ্টিমেয় কিছু সম্প্রদায় থেকে গেছে, এদের বেশির ভাগই আগে ছিল ইরানের দিকে। আর Jews রা ইরান থেকে আরো পশ্চিমের দিকে থাকত যে অঞ্চলটাকে বলা হয় land of somatic. এদের সেমেটিক বলা হয়। এই সেমেটিক ধর্ম থেকে প্রথমে Jews দের পরে খ্রীশ্চান আর সেখান থেকে পরের দিকে ইসলাম ধর্মের জন্ম হয়েছে – এদের মত হল প্রথমে ছিল শব্দ - In the beginning there was word and the word was with God – প্রথমে ছিল শব্দ, আর শব্দটা কোথায় ছিল? ঈশ্বরের সঙ্গে এক ছিল। এইটাকেই হিন্দুরা বলছে সচ্চিদানন্দম্ – এর 'সৎ; মানে হচ্ছে তিনি মানে ভগবান সব সময় আছেন, তাঁর কখন নাশ হয় না। আজকে ভগবান জন্ম নিলেন আর আগামীকাল তিনি মারা যাবেন, এই রকমটি ভগবানের হবে না। 'চিৎ' ভগবানের কখন জ্ঞান আছে আবার কখন তাঁর মধ্যে অজ্ঞান এসে গেছে, এইটাও হবে না, তিনি সব সময় চৈতন্যে পরিপূর্ণ। 'আনন্দম্' ভগবানের এই এখন আনন্দ হচ্ছে আবার পরে তাঁর মধ্যে নিরানন্দ ভাব এসে তাঁকে দুঃখ আচ্ছাদিত করে দিল, এইটাও ভগবানের মধ্যে দেখা যাবে না। তিনি হচ্ছেন সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ আর আনন্দস্বরূপ, এগুলো তাঁর স্বরূপ। যেমন সূর্যে আমরা কক্ষণ অন্ধকার কল্পনা করতে পারিনা ঠিক তেমনি ঈশ্বরের কক্ষণ অসৎ কল্পনা, অচিৎ কল্পনা আর নিরানন্দ কল্পনা করা যায় না।

আমাদের এখন আলোচ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে ভগবানের চিৎ। চিৎকে চৈতন্য বলা হলেও এর সঠিক অর্থ জ্ঞান – যেমন উপনিষদে বলা হয়েছে – সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্। ব্রহ্ম কি? তিনি হচ্ছেন সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত। বিভিন্ন ভাবে ভগবানের স্বরূপের বর্ণনা করা হচ্ছে। সেমেটিক ধর্মের মতে ঈশ্বর হচ্ছে God is with word, আর হিন্দু দর্শনের মতে ঈশ্বর হচ্ছেন সচ্চিদানন্দম্ মানে God is one with knowledge. কিন্তু সেমেটিকরা বলছে the word was God. মানে ভগবানের এটা একই রূপ নয়। যেমন আমরা বলি লাল ফুল বা হলুদ ফুল, লাল বা হলুদ হচ্ছে ফুলের গুণ একই রূপ নয়। কিন্তু সচ্চিদানন্দম্ বললে বোঝায় তিনি ঐটাই – তাঁর থেকে এটা আলাদা কোন গুণ কিছু নয়। Word was God এইটাই ভারতীয় প্রাচীন দর্শনে হয়ে যাচ্ছে শব্দব্রহ্ম। এই শব্দটা আমরা যে আম লিচু ঘর বাড়ি রাস্থা বলছি এই রকম কোন শব্দ নয়। ব্রহ্মই হচ্ছে আমাদের শেষ একমাত্র যা আছে, যাকে বলা হচ্ছে পরমসত্তা। এই পরমসত্তা যখন শব্দব্রহ্ম হন তখন তাঁর সৃষ্টির রচনা হতে থাকে। চৈতন্যকে কোন রূপ বা আকারে দেখা যায় না। ব্রহ্মের যখন ইচ্ছে হয় আমি এবার সৃষ্টি রচনা করব, প্রথমে তিনি শব্দব্রহ্ম হয়ে যান – এই জায়গাটাকেই সেমেটিকরা বলছে – word was one with God. এই শব্দব্রহ্ম যখন তিনি হয়ে যান প্রথম তিনি নাদরূপে সৃষ্টি করেন 'ওঁ'। এই ওঁ থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি হতে থাকে – উপনিষদে এই জিনিষটাকে বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আমরা শব্দ নিয়ে আলোচনা করছি। ঈশ্বর যদি অনন্ত হন তাহলে এই শব্দটাও অনন্ত, তাহলে জ্ঞানটাও অনন্ত। তাহলে বেদও অনন্ত, কেননা বেদ হচ্ছে জ্ঞান যেহেতু বিদ্ ধাতু থেকে এসেছে – খুবই সহজ যুক্তি। যে কোন জ্ঞান, যেটা জানার বিষয় সেটাই হচ্ছে বেদ। যে কৃষিবিদ্যা পড়ান হচ্ছে সেটাকেও এই একই কারণে আমরা বেদ বলতে পারি। নাচ, গান, এমনকি ক্রিকেট খেলার বিদ্যা, যে কোন জ্ঞানই হচ্ছে বেদ। সেইজন্য যারা প্রাচ্য দার্শনিক তারা সব সময় বলবেন – বেদ হচ্ছে অনন্ত। এইটাই হচ্ছে বেদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাহলে বাইবেল আর কোরানকে কি আমরা অনন্ত বলতে পারি? না বলতে পারিনা, কেননা বাইবেল আর কোরানের এই বৈশিষ্ট্য নেই। আমরা কথামৃতকে যতই বলি বেদস্বরূপ কিন্তু কথামৃতকে বেদ বলা যাবে না। কারণ কথামৃত সমগ্র জ্ঞানসমষ্টিকে তুলে আনছে না। বেদের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আর কথামৃতের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এক হতে পারে এই ব্যাপারে কোন দ্বিমত হবে না। কিন্তু ভারতে বেদ বলতে যা বোঝাবে সেটা কিন্তু কথামৃত কখনই নয়। কেন নয়? বেদ হচ্ছে সমগ্র জ্ঞানরাশির সমষ্টি। বাইবেল, কোরান, কথামৃততে সমগ্র জ্ঞানরাশির সমষ্টি নেই। তাই বেদের ধারে কাছে কোন ধর্মগ্রন্থই দাঁড়াতে পারবে না।

শ্রীমদ্ভাগবত গীতা হচ্ছে ভগবানের যোগের অবস্থার কথা। যোগাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ যে কথা বলেছেন সেই কথাগুলিকে গীতা ধরে রেখেছে। তাই গীতাকে one with God বলা যায় না, কিন্তু বেদ হছে one with God । আবার বেদের সংজ্ঞা অনুযায়ী যে কোন জ্ঞানই হচ্ছে বেদ, আর এই জ্ঞান কোথা থেকে আসছে? ভগবানের থেকে, তাই বাইবেল, কোরান, ধম্মপদ, কথামৃত সব গ্রন্থকেই বেদ বলা যাবে। ভারতীয় ভাবনা ধারণাতে, হিন্দুদের কাছে জাগতিক বিদ্যা বলে কিছু নেই। আমাদের কাছে যা কিছু বিদ্যা আছে সবই হচ্ছে আধ্যাত্মিক বিদ্যা। কেন? বিদ্যা হচ্ছে জ্ঞান, জ্ঞান হচ্ছে বেদ আর বেদ আর ঈশ্বর এক। যে কোন বিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা সমস্ত বিদ্যাই বেদ, এই বিদ্যার্জন করে যে কাজগুলো করা হবে সেটা যদি নিষ্কাম ভাবে করা হয় তখন এই বিদ্যাই আমাদের মোক্ষের দিকে নিয়ে যাবে। আবার বেদে যে যজ্ঞ-যাগের বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলিও যদি নিষ্কাম ভাবে করা হয় তাতেও আমাদের মোক্ষের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। যজ্ঞ-যাগের সাথে কৃষিকাজ, ডাক্তারি করা, শিক্ষকতা করা, রান্না করার একেবারেই কোন পার্থক্য নেই। আমাদের হিন্দুধর্মের উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সিদ্ধান্ত অনুসারে বেদের মন্ত্রোচ্চারণ আর কেমেস্ট্রির ফরমুলা মুখস্ত করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ইসলাম আর খ্রীশ্চানদের কাছে এটাই আবার বিরাট সমস্যা – এদের কাছে এই জগতের মালিক হচ্ছে আলাদা দুই ব্যাক্তি, একজন হলেন ভগবান আরেকজন হচ্ছে শয়তান। এই জগতকে কখন শয়তান চালাচ্ছে কখন ভগবান চালান। স্বামীজী মজা করে বলতেন – ভগবানের রাজত্বে শয়তান যেভাবে রাজত্ব করছে তাতে মনে হয় শয়তানেরই শক্তি আছে, আমি কিন্তু এই শয়তানকেই পূজা করব। এটা হচ্ছে তাদের সমস্যা। ভারতে খ্রীশ্চান আর ইসলাম ধর্মের অনুপ্রবেশেরে পর থেকে আমাদেরও এই সমস্যা এসে গেছে – এই কাজটা জাগতিক আর এই কাজটা আধ্যাত্মিক, এইভাবে আমাদের সনাতন ভাবধারা থেকে সরে আসছি। আমাদের কাছে জগতে যত নাম আছে সবই তাঁরই নাম আর যত রূপ আছে সব তাঁরই একেকটি রূপ। আমরা আলাদা কেন দেখছি, কারণ আমাদের মন এখন দূষিত হয়ে আছে। আমাদের হিন্দুদের কাছে জাগতিক বলে কিছুই হয় না, যা কিছু আছে সবটাই তিনি। তাই বলে কি আমরা যা খুশি তাই করতে পারব? তা কখনই হবে না। মাটি কত ভালো জিনিষ, বাতাস কত ভালো জিনিষ তাই বলে জলের মাছ কি ডাঙায় এসে থাকতে চাইলে থাকতে পারবে? মাছ যদি ডাঙায় এসে থাকতে চায় কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে মারা যাবে। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন – বাঘ নারায়ণ, তাই বলে বাঘকে আলিঙ্গন করতে যাবে না। কিছু নারায়ণ আছে তাদের দূর থেকে প্রণাম করে সরে আসতে হয়। কিন্তু সেও নারায়ণ, এই জ্ঞান থাকতে হবে। যতক্ষণ না আমরা এই অবস্থায় পৌঁছাচ্ছি বুঝতে হবে আমাদের জ্ঞান লাভ এখন হয়নি। যা কিছু আমরা ছাপা অক্ষরে পাচ্ছি, যা কিছু আমরা কর্ণে শ্রবণ করছি, যেগুলো জানা হয়ে গেছে, যেগুলো এখনও জানা হয়নি – এর সবটাই হচ্ছে বেদ,

বেদের বাইরে কিছু নেই। এই সমস্ত জ্ঞান ঈশ্বর থেকেই আসছে আর এই জ্ঞান আর ঈশ্বর এক। আমাদের শাস্ত্র মতে বেদ মানে এইটাই।

তারপর বেদের যে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তা হল – বেদ হচ্ছে সনাতন। যে জিনিষটা অনন্ত হবে স্বাভাবিক ভাবেই সেটা সনাতন হবে। সনাতন মানে যেটা অনন্তকাল ধরে চলে আসছে। কেউ যদি প্রশ্ন করেন বেদ কে রচনা করেছে তখন এই ধরণের মুর্খের মত প্রশ্ন আর একটিও হতে পারেনা। খ্রীশ্চানরা যাকে word বলছে আমরা তাকে বেদ বলছি। খ্রীশ্চানরা বলছে word was not created by any one তাই বেদও কখনও কেউ রচনা করতে পারে না। পতঞ্জলির যোগসূত্রে একটা সূত্র আছে সেখানে তিনি বলছেন বেদ বলতে যে শব্দরাশি বোঝাবে তা নয়, বেদ হচ্ছে জ্ঞানরাশি।

বেদকে সনাতন বলা হয়। আরেকটা যে শব্দ বেদের সাথে যুক্ত করা হয় তা হল – বেদ হচ্ছে অপৌরুষেয়। অপৌরুষেয় কথার অর্থ হলে, যে জিনিষ কোন মানুষের দ্বারা সৃষ্টি বা রচিত হয়নি। পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রে বলছেন যে শব্দ সনাতন নয়, শব্দ যে জ্ঞানকে প্রকাশ করছে সেই জ্ঞান হচ্ছে সনাতন। শব্দের বদলে আমাদের ঋষিরা আরেকটি শব্দ ব্যবহার করতেন তার নাম হচ্ছে স্ফোট, শব্দ আর স্ফোট সমার্থক। এখন যদি পঞ্চাশ জন লোককে রাম এই শব্দটা উচ্চারণ করতে বলা হয় তখন দেখা যাবে প্রত্যেকেরই রাম উচ্চারণ আলাদা হবে। আবার একই ভাষা এক জেলা থেকে অন্য জেলাতে এসে পাল্টে যাবে। আমাদের অনেকেই আত্মা শব্দকেই আত্তা উচ্চারণ করে। এখন আত্মাই বলুক আর আত্তাই বলুক আমরা বুঝেতে পারে সে কি বলতে চাইছে। এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে যে কোন শব্দের দুটো দিক আছে – একটা হচ্ছে তার বাহ্যিক আকার আর আরেকটি হচ্ছে শব্দের অন্তর্নিহিত ভাব। এখন যে আত্মা বলছে আর যে আত্তা বলছে আমরা কিন্তু বুঝে নিচ্ছি যে আত্তা বলছে সেও সেই আত্মার কথাই বলতে চাইছে। তার মানে শুধু উচ্চারণের সঙ্গে শব্দের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই, উচ্চারণটা হচ্ছে শব্দের বাহ্যিক রূপ, জামা কাপড়ের আড়ালে একটা শরীর আছে যেটা হচ্ছে আসল বস্তু। শব্দের আসল বস্তুটা হচ্ছে অন্তর্নিহিত ভাব, যেটাকে জ্ঞান বলা হচ্ছে। যে কোন শব্দেরই এই দুটো দিক থাকবেই। জলকে যেমন বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করা যায় কিন্তু জলের বিভিন্ন নাম একটা বস্তুকেই নির্দেশ করছে। বেদকে যখনই বলা হচ্ছে সনাতন ও অনন্ত তখন বেদকে শব্দের বাহ্যিক রূপের কথা বলা হচ্ছে না, এখানে বেদের অন্তর্নিহিত জ্ঞানের কথাকেই বলা হচ্ছে। যখন ‘ওঁ নমঃ শিবায়’ এই মন্ত্রটা বলা হল, তখন এটা হয়ে গেল মন্ত্রের বাহ্যিক রূপ। এই মন্ত্রের একটা অন্তর্নিহিত রূপও আছে। এখানে এই রূপটা কি – শিবের যে আসল স্বরূপ সেইটাকে জানার চেষ্টা। যিনি এই মন্ত্রের দ্বারা মন্ত্রের স্বরূপকে জেনে নিলেন, তিনি এখন ঐ মন্ত্রটাকে পাল্টে বলতে পারেন ‘ওঁ গং গণেশায় নমঃ’। এই মন্ত্রে বাহ্যিক রূপটা পাল্টে গেছে কিন্তু ভাবটা একই থেকে যাবে। এর মূল ভাবটা কি? সেই সচ্চিদানন্দম্। সেই এক সত্তাকে উদ্দেশ্য করে নির্দেশ করার জন্য কতকগুলি শব্দের ব্যবহার করা হচ্ছে। সে যে মন্ত্রই হোক না কেন, স্বামীজীর ওঁ হ্রীং ঋতম্ও এই একই নিয়মে সেই এক পরমসত্তাকে নির্দেশ করছে। এই যে বলছে ‘আবহী বরদে দেবী’ এখানেও বাকদেবীকে স্তুতি করা হচ্ছে, আবার এর মধ্যে পরমসত্তার জ্ঞানের কথাও রয়েছে।

এইটাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামীজী মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের কথা নিয়ে এসে বলছেন – তোমরা কি মনে কর মাধ্যাকর্ষণের জ্ঞান কোথাও পড়েছিল আর নিউটন এসে সেটাকে আবিষ্কার করলেন? মাধ্যাকর্ষণের জ্ঞান আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। একটা মজার জোক আছে – একটা ক্লাশে পড়ান হচ্ছে আটারশো সালে অক্সিজেন আবিষ্কার হয়েছিল। ক্লাশের একটি মেয়ে এইটা শুনেই গালে হাত দিয়ে চিন্তায় পড়ে গেছে। শিক্ষক তাকে জিজ্ঞেস করছে ‘তুমি কি ভাবছ’? মেয়েটি বলছে ‘আঠারশো সালের আগে মানুষ নিঃশ্বাস নিতো কিভাবে’? অক্সিজেন তো সব সময়েই রয়েছে। বেদের যে মন্ত্রগুলি আমরা পাচ্ছি এই মন্ত্রগুলিও আগে থাকতেই আছে। যুগ যুগ ধরে হিন্দুরা যে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করছে, এটাও আগে থাকতেই ছিল – ওঁ ভূর্ভবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং – এই সর্বলোকের যে মালিক তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলা

হচ্ছে, হে প্রভু তুমি আমার বুদ্ধিকে পরিশ্রুত করে আলোকিত করে দাও যাতে সমস্ত জ্ঞান আমার মধ্যে আসতে পারে। এটাও হচ্ছে একটা জ্ঞান, কতকগুলি শব্দের মধ্যে তাকে রূপ দেওয়া হচ্ছে। প্রভুর কাছে যখন প্রার্থনা করা হচ্ছে তখন তার বুদ্ধি প্রচোদিত হয়ে যায়। এই জ্ঞান বা ভাব নিয়ে যদি কোন বাচ্চা ইংরাজী ভাষায় প্রার্থনা করে তাহলেও কাজ হবে। পার্থক্য হচ্ছে গায়ত্রী মন্ত্র হচ্ছে সিদ্ধ মন্ত্র, ধ্যানের গভীরে গিয়ে উচ্চকোটির মহান ঋষি বিশ্বামিত্র এই মন্ত্রটাকে বের করে এনেছিলেন। আর বাচ্চা ছেলেটা যা বলছে সেটা কতকগুলি মামুলি শব্দের বিন্যাস মাত্র। কিন্তু সেও যদি এই জ্ঞানের ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে আবৃত্তি করে তাহলেও কাজ হবে। কারণ যে কোন জ্ঞান হচ্ছে সনাতন। মাধ্যাকর্ষণের জ্ঞানকে যে ভাষাতেই বলা হোক না কেন তার জ্ঞানটাতো আর পাল্টে যাবে না। শব্দ দিয়ে যে জ্ঞানের দিকে ইঙ্গিত করা হয় সেই জ্ঞানটা হচ্ছে সনাতন। এইটাই হচ্ছে পতঞ্জলির যোগসূত্রের ব্যাখ্যা।

এর আগে বলা হয়েছিল যে চার্বাকরা বলছে বেদ যারা লিখেছে তারা হচ্ছে – *ত্রয়ী বেদস্য কর্তার ধূর্ত ভ্রষ্ট নিশাচরঃ*। যখন বেদের ব্যাপারে কিছু বলতে হয় তখন সারা দেশ মীমাংসকরা যেটা বলছে সেটাকেই অনুসরণ করে। পূর্বমীমাংসকদের বিখ্যাত দার্শনিকের নাম হচ্ছে জৈমিনি। তিনি সূত্র আকারে বেদের বিষয়ে লিখে গেছেন, এর নাম হচ্ছে মীমাংসাসূত্র। এর প্রথম সূত্রই হচ্ছে – *অথাতো ধর্ম জিজ্ঞাসা* – আমরা এখন ধর্মের ব্যাপারটা জানব। চার্বাকদের বিরুদ্ধে মীমাংসকরা দুটো বড় যুক্তি নিয়ে এলেন। হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে বেদের বিরুদ্ধে যত ধরণের আক্রমণ হয়েছিল তাকে আটকাবার জন্য যে সব যুক্তিগুলিকে আনা হয়েছিল সেই যুক্তি গুলি আজ থেকে তিন হাজার বছর আগেই একটা নির্দিষ্ট ছকে দাঁড় করান হয়ে গিয়েছিল। তার ফলে এখন কারুর পক্ষে কোন প্রকার বেদবিরুদ্ধ কথা বলা বা বেদের বিরুদ্ধে কোন নতুন যুক্তি কে দাঁড় করান একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। মানুষের ভোগের ব্যাপার আগেও ছিল এখনও রয়েছে আর চিরদিনই মানুষের ভোগাকাঙ্ক্ষা থাকবে। সুতরাং যারা ভোগী তারা যোগীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে এটা কোন নতুন ব্যাপার নয়। ভোগীদের মধ্যেও অনেক বড় বড় তাত্ত্বিক নেতারা ছিলেন আর তাদের বেদবিরুদ্ধ যুক্তি গুলিও মারত্মক রকমের শক্তিশালী ছিল। এই যুক্তিগুলী খণ্ডন করার জন্য মীমাংসকরাও আর জোড়ালো যুক্তি দাঁড় করালেন। বেদ হচ্ছে জ্ঞানরাশি, আর জ্ঞানকে কখনই মানবজাতির পক্ষে তৈরী করা সম্ভব নয়। আমরা আবিষ্কার করতে পারি, জানতে পারি কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের মত একটা নিয়মকে আমরা বানাতে পারব না। এখন নিউটন এসে এই মাধ্যাকর্ষণের নিয়মটাকে আবিষ্কার করে তিনি কতকগুলি সিদ্ধান্ত করে নিলেন। পরে আইনস্টাইন এসে নিউটনের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে আরো কয়েকটা নতুন সিদ্ধান্ত দিয়ে নিয়ে এলে laws of relativity, এতে কি মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের কোন পরিবর্তন হবে? কক্ষণই হবে না। মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম যেমন চলছিল সেই একই নিয়মে চলতে থাকবে, বিজ্ঞানীদের নিজেদের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। সুতরাং বেদ হচ্ছে সেই জ্ঞান, তত্ত্ব যা অনাদিকাল থেকে চলে আসছে, তাই বেদকে বলা হচ্ছে সনাতন আর অনন্ত। দ্বিতীয় যে যুক্তিটা মীমাংসকরা নিয়ে আসেন তা হচ্ছে – মানুষ যখন কিছু রচনা করে তখন সেখানে নিজের নাম অবশ্যই দেবে। আজকে যদি আমি আপনি কিছু রচনা করে নাম না দিয়ে আমাদের বন্ধু বান্ধবদের শুনিয়ে দিলাম। তারপর যদি এই রচনাটা জনপ্রিয় হয়ে যায় তখন আমার বন্ধু বান্ধবরা বলবে যে 'এটা আমার এক বন্ধুর রচনা'। কিন্তু বেদের কোথাও আজ পর্যন্ত এইভাবেও কোন ধরণের একটা নামেরও উল্লেখ আমাদের নজরে পড়বে না। বেদের যে এত বিশাল কাণ্ড, যত পুঁথি এখনও যা হারিয়ে, নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও অবশিষ্ট রয়েছে, তাতেই একটা বিশাল ঘরে সঙ্কুলান হবে না। কিন্তু কোথাও একটা কারুর নাম পাওয়া যাবে না যে এগুলো কে রচনা করে গেছেন? এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে একজনের পক্ষে এই বিশাল বেদকে রচনা করা সম্ভবই নয়। তবে ভাষাকে বিশ্লেষণ করে ভাষাবিদরা বলছেন যে বেদ বিভিন্ন সময়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আবার কিছু মন্ত্র ইন্দ্রের, কিছু মন্ত্র বরুণ, অগ্নি এই রকম বিভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশ্য। যেটা থেকে বোঝা যায় যে বেদ একজন লোকের কাজ নয়। এখন বেদ যদি অনেক লোকের কাজ হয়ে থাকে তাহলে একজন লোক হয়তো ধাপ্পা দিতে পারে যে আমার নাম দিলাম না যাতে কেউ জানতে পারে যে আমি ধাপ্পা দিচ্ছি কিন্তু

এত লোক কখনই এই একই ভাবে ধাপ্পা দিতে পারে না। মীমাংসকরা চার্বাকদের বিরুদ্ধে এই যুক্তিই দিচ্ছে – যখন কেউ কিছু রচনা করে তখন সে তার নাম দিয়ে দেয়। বাল্মিকী যখন রামায়ণ রচনা করলেন তিনি নিজেই তাঁর নাম উল্লেখ করে দিয়ে বলেছেন – আমি এর রচয়িতা। ব্যাসদেব প্রথমে বেদের পুনর্বিন্যাস করে বলে দিলেন – বেদকে আমি এইভাবে বিন্যাস করে দিয়েছি মাত্র। কিন্তু পরে তিনি মহাভারত রচনা করে বললেন আমি মহাভারত রচনা করেছি। ভাগবতের ক্ষেত্রেও তিনি বললেন এটা আমার রচনা। সবাই নাম ব্যবহার করছেন কিন্তু বেদের ক্ষেত্রে কোন নাম কেউ ব্যবহার করলেন না। যখন কোন নিম্নমানের রচনা হয় তখন তার সাথে নিজের নামকে যুক্ত করতে না চাওয়াটা অযৌক্তিক মনে হবে না, কিন্তু সেই অর্থে বেদকে বেদবিরোধীরাও কেউ কখন কোন দিন স্বপ্নেও নিম্নমানের রচনা মনে করবে না। তাহলে কেন ঋষিরা তাঁদের নামকে বেদের সঙ্গে যুক্ত করলেন না? এই জিনিষটা তখনকার দিনের মানুষের কাছে পরিষ্কার ধারণা ছিল না। স্বামীজী পরে এসে এই জিনিষগুলিকে অনেক বেশি পরিষ্কার করে দিলেন। আমরা এর আগেও বলেছি যে – ঋষিরা ধ্যানের গভীরে গিয়ে অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার থেকে কিছু কিছু রত্ন পেয়ে গেলেন, তারপর তিনি সেটা তাঁর শিষ্যদের দিয়ে দিতেন। তিনি ভালো করে জানতে যে এটা আমার জিনিষ নয়, আর আমার সাধ্যেরও বাইরে এই রত্নকে আবিষ্কার করা। যেটা তাঁদের সাধ্যের মধ্যে নয় তার সাথে এনারা কখনই নিজেদের নামকে যুক্ত রাখতে চাইতেন না। এনারা মনে করতেন যে বেদের সব কিছু অন্য এক দিব্যশক্তির কাজ, যে কাজটা নিজের নয় তার সাথে নিজেদের নামকে যুক্ত করা তাঁদের চিন্তাতেও নিয়ে আসা একটা মারাত্মক গর্হিত কর্ম।

এই জিনিষটাকে ভালো করে বুঝতে হবে – শব্দ থেকে শব্দের জন্ম হয়। দুটো বাচ্চা ছেলে কথা কাটাকাটি করছে, একটা বাচ্চা আরেকটা বাচ্চাকে বলছে – তুই একটা গাধা। গাধা শব্দ শুনেই তার মনটা ক্রোধবৃত্তিতে ভরে গেল, সেও প্রত্যুত্তরে বলে দিল – তুই একটা প্যাঁচা। এ আবার বলছে – তুই আমাকে প্যাঁচা বললি, তাহলে তুই একটা ছাগল। এইভাবে শব্দ থেকে শব্দ জন্ম নিচ্ছে। সব সময় আমরা যে ধরণের কথাবার্তা বলি এর সবটাই শব্দ থেকে শব্দ জন্ম নিচ্ছে। বেশির ভাগ সাহিত্যিক, লেখক যা কিছু লিখছেন এও সেই শব্দ থেকে শব্দের জন্ম দিচ্ছেন। যত সংবাদপত্র ছাপা হচ্ছে সব শব্দ থেকে শব্দের জন্ম দিচ্ছে, ফলে কি হয় এক দিন কি দুদিন থাকবে তারপরে এই সব বই, খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন সব সের দরে বিক্রী হয়ে যাবে। কিন্তু যখনই শব্দ মৌন থেকে, নিস্তব্দতা থেকে জন্ম নেবে তখন সেই শব্দের মূল্য অনেক গুণ বেড়ে যায়। যাঁরা খুব বিখ্যাত কবি তাঁরা যে কবিতা রচনা করেন, সেই কবিতার শব্দগুলি মৌন থেকে জন্ম নেয়। আবার যখন ধ্যানের গভীর থেকে যে শব্দ গুলি আসে সেই শব্দগুলিই শাশ্বত বাণী হয়ে যায়। হাজার হাজার বছর ধরে সেই শব্দ জনমানসে গেঁথে থাকে। এইভাবে শব্দ তিন ভাবে জন্ম নেয় – শব্দ থেকে, মৌনতা থেকে আর ধ্যানের গভীর থেকে। যাঁরা সমাধিবান পুরুষ, সমাধি হল ধ্যানের আরও উচ্চ অবস্থা, সমাধিবান পুরুষরা যে কথাগুলি বলেন সেগুলো ভগবানরই কথা।

বেদের শব্দগুলো ধ্যানের গভীর থেকে এসেছে, একটা মন্ত্র, একটা শব্দ আসছে সেইটাই তাঁরা নিজেদের শিষ্যদের যখন দিচ্ছেন তখন তাঁরা নিজেদের নাম নিচ্ছেন না। একবারেই যে নাম নিতেন না তা নয়, আমরা যদি এখান থেকে ইতিহাসের দিকে একটু এগিয়ে আসি তাহলে দেখতে পাব যে বৈশাম্পয়নের খুব নামকরা শিষ্য ছিলেন যাজ্ঞবল্ক্য, তিনিও ছিলেন একজন খুব নামকরা ঋষি। একবার কোন একটা ঘটনায় গুরুর সাথে যাজ্ঞবল্কের ঝগড়া হয়ে যায়। একবার গুরুর অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য একটা গোহত্যা হয়ে গেছে। এখন তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। গুরু তখন যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রায়শ্চিত্তের জন্য যজ্ঞের আয়োজন করতে বললেন। যাজ্ঞবল্ক্য তখন গুরু কে বললেন – হে গুরুবর, আপনার কাছে একটা কথা আমি নিবেদন করতে চাই। আপনার শিষ্যরা সবাই অল্প বয়সী, এই ধরণের যজ্ঞের ব্যাপারে খুবই অপটু, আপনি আমার উপরে সব ভার দিয়ে দিন আমি একাই সব সুন্দর ভাবে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, আপনি কোন চিন্তা করবেন না। যাজ্ঞবল্কের এই কথা শুনে গুরু খুব রেগে গেলেন – তোমার এত অহঙ্কার! আর তুমি

আমার শিষ্যদের এতো ছোট করলে! তোমাকে আমি যা কিছু শিখিয়েছি সব আমাকে ফেরত দিয়ে দাও। যজ্ঞবল্ক্যও খুব অপমানিত বোধ করলেন, তিনি মনে মনে ভাবলেন – যে গুরু নিজের শিষ্যকে বুঝতে পারেনা, বুঝতে চায়না, এই রকম গুরুর শিষ্য হয়ে থেকে আমার কাজ নেই। যাজ্ঞবল্ক্য খুব তেজস্বী ছিলেন। এখন গুরুর কাছ থেকে লব্ধ জ্ঞান তাঁকে ফেরত দিয়ে দিতে হবে। তখন যাজ্ঞবল্ক্য পুরো যোগশক্তি লাগিয়ে বেদের যত জ্ঞান পেয়েছিলেন বমি করে তিনি সেটাকে বার করে দিলেন। এমন গুরু আর এমন বিদ্যাও আমি চাইনা। এখনতো মহা সমস্যা হয়ে গেল। যাজ্ঞবল্ক্য ছিলেন বৈশাম্পায়নের প্রধান শিষ্য, আর তিনি বৃদ্ধও হয়ে গেছেন। কেননা বেদ হচ্ছে গুরু-শিষ্য পরম্পরা বিদ্যা, এখন গুরু যেটা শেখাল শিষ্য সেটাকে থু করে ফেলে দিল, এখন কি হবে? যে বিদ্যাটা আমি শিষ্যকে দান করলাম সেটাতো নষ্ট হয়ে যাবে। তখন বৈশাম্পয়ন ঋষি তাঁর বাকি শিষ্যদের বললেন তোমরা তিতির পাখি হয়ে যাজ্ঞবল্ক্য যে বিদ্যাটা বমি করে দিয়েছে সেই বমিটা খেয়ে নাও। কেননা মানুষতো আর বমি খেতে পারেনা, পাখিরা খেতে পারে, তাই তাদের তিতির পাখি হয়ে বমিটা খেয়ে নিতে বলা হয়েছিল। এইভাবে যাজ্ঞবল্কের গুরুভাইদের মধ্যে বেদের জ্ঞানটা এসে গেল। তিতির পাখি হয়ে এরা এই বিদ্যাটা পেয়েছিল বলে বেদের এই শাখাটাকে বলা হয় তৈত্তিরীয় শাখা। এই তৈত্তেরীয় শাখা থেকেই তৈত্তেরীয় উপনিষদ এসেছে। আর এটা বমি করা বিদ্যা বলে এর নাম হয়ে গেল কৃষ্ণযজুর্বেদ, কেননা এই বিদ্যার মধ্যে সেই আগের শুদ্ধতা থাকল না বলে কৃষ্ণ বলা হয়েছে। আর যাজ্ঞবল্ক্য গুরুকে ত্যাগ করে বলল – এমন গুরুর আমার দরকার নেই, কোন মানুষকে আমি আর গুরু করব না, সাক্ষাৎ ভগবানই আমার গুরু হবেন। সেই আশ্রম পরিত্যাগ করে তিনি সূর্যোপসনা করতে থাকলেন। পরে সূর্য একটা বাজপাখি হয়ে যাজ্ঞবল্ক্যকে সে যে বিদ্যা বৈশাম্পায়নের কাছ থেকে পেয়েছিলেন সেই বিদ্যাটাই নতুন করে শিখিয়ে দিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য আবার বেদের পণ্ডিত হয়ে গেলেন। তিনি যে বিদ্যাটা পেলেন তার নাম হয়ে গেল শুক্লযজুর্বেদ, যেহেতু সূর্য থেকে এই বিদ্যাটা এসেছিল তাই এর নাম হয়ে গেল শুক্ল, আবার বাজপাখির কাছ থেকে শ্রবণ করেছিলেন বলে এর আরেকটা নাম বাজশনীয় সংহিতা, বাজপাখি হচ্ছে শক্তির প্রতীক। শুক্ল আর কৃষ্ণ যজুর্বেদের মন্ত্রগুলি মোটামুটি একই, শুধু এদের বিন্যাসটা অন্য রকম।

এই কাহিনীতে আমরা বেদের যে বৈশিষ্ট্যকে পাচ্ছি তা হল বেদ হচ্ছে পুরোপুরি একটা মুর্ত্ত রূপ। যে কারণে এই কাহিনীটাকে অবতারণা করা হল, ঋষিরা কোথাও নাম নিতেন না, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে যে ওনারা নাম ব্যবহার করেননি তা নয়, এইখানে শুক্লযজুর্বেদের ক্ষেত্রে যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন – এই বিদ্যাটা আমি পেয়েছি। অথচ তাঁর আগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের নাম কেউই জানে না। যাজ্ঞবল্ক্য কি পেয়েছিলেন? যে বিদ্যাটা তিনি আগে পেয়েছিলেন সেটাকেই তিনি আবার পুনরায় উদ্ধার করে বললেন আমি পেয়েছি। আমরা যদি অশুদ্ধ মনে বলি – যাজ্ঞবল্ক্য এখানে একটু কায়দা মেরে ঐখান থেকে নিয়ে পরে নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছে। তাই যদি হত, তাহলে বৈশাম্পয়ন ঋষি কি যাজ্ঞবল্ক্যকে ছেড়ে দিতেন? আমরা আজকে এই প্রশ্নগুলি করতে পারি, কিন্তু কই, তখনকার দিনেতো কেউ কোন রকম প্রশ্ন এই ব্যাপারে যাজ্ঞবল্ক্যকে করেনি। এই কারণে অনেকে চারটে বেদের জায়গায় পাঁচটা বেদ বলেন – যখন যজুর্বেদে আসবে তখন তারা এটাকে দুইভাগে বিভক্ত করে বলে শুক্লযজুর্বেদ ও কৃষ্ণযজুর্বেদ।

বেদ – ৩০শে জানুয়ারী ২০১০

পৃথিবীতে যত নামকরা ধর্মশাস্ত্র আছে, বেদ, বাইবেল, কোরান সব শাস্ত্রই একটা বিশেষ ভাবের অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই হয় কি, যখনই আমরা এই সব শাস্ত্রকে জাগতিক দৃষ্টিতে বিচার করতে বা বুঝতে যাব তখনই আমাদের অনেক গোলমাল হয়ে যাবে। ঋকবেদের প্রথম মন্ত্র হচ্ছে – অগ্নিমীডে পুরোহিতম্, এখন একে যখনই কবিতা রূপে অনুবাদ করতে যাওয়া হবে, তখনই এর ভাব নষ্ট হয়ে যাবে। বিদেশীরা এই মন্ত্রকে অনুবাদ করছে এই বলে যে – অগ্নি হচ্ছেন দেবতাদের পুরোহিত। এই অর্থেই বেদের প্রথম মন্ত্রের পুরোটাই সর্বনাশ হয়ে গেল। কারণ বেদের যে মূল কাঠামো প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে, সেই কাঠামোটাই এই অনুবাদে ভেঙ্গে খান্‌খান্ হয়ে গেল। বেদ হচ্ছে স্তব রূপে, প্রার্থনা আকারে। প্রার্থনা রূপে যদি হয় তাহলে আর এইভাবে অনুবাদ হবে না। প্রথমে সম্বোধন করতে হবে – হে অগ্নি দিয়ে। এখন যদি কেউ বলে – অগ্নি তুমিই পুরোহিত আর অন্য কেউ যদি বলে – হে অগ্নি তুমি পুরোহিত, এই দুটো কথার অর্থ পুরোটাই পাল্টে যায়।

এখন যদি বেদের এই মন্ত্রগুলিকে যে মুহূর্তে কোন কবির রচনা বলে মনে করা হবে তখন তার যে অনুবাদ হবে আর তার যে প্রভাব পরের জেনারেশানে পড়বে সেটা এক রকম হবে, আবার যে মুহূর্তে মনে হবে যে এই তত্ত্বটাকে ধ্যানের গভীরে প্রাপ্ত হয়েছে, তার প্রভাব ও অনুবাদ দুটোই অন্য মাত্রায় চলে যাবে। যে কোন জ্ঞানের দুটো দিক আছে – একটা দিক হচ্ছে তত্ত্ব আর অন্যটা হচ্ছে তথ্য। তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। ছোটবেলা থেকে আমরা তথ্যগুলো জেনে জেনে ভুলে গেছি যে তত্ত্ব বলেও কোন একটা ব্যাপার আছে। তত্ত্ব যেগুলো আমরা জানি, সেগুলো আমরা বাড়ির কাজে লাগাই। যেমন আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায় – এটা হচ্ছে তত্ত্ব, তথ্য নয়। এটা হচ্ছে জীবনের একটা বাস্তব সত্য যে আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়, এইটাই হচ্ছে তত্ত্ব, জ্ঞান। আবার কবিতা যখন লেখা হয় তার বেশির ভাগটাই হচ্ছে তথ্য। কবি লিখছেন – ওগো মৌমাছি তুমি ফুলে বসতে যেও না। এটা হচ্ছে একটা তথ্য। বেদ কিংবা গীতাতে বা বাইবেল কোরানে যা আছে তার কোনটাই তথ্য নয় এর সবটাই হচ্ছে তত্ত্ব। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায় এটা যেমন একটা তত্ত্ব ঠিক তেমনি বেদের প্রত্যেকটি কথাই হচ্ছে তত্ত্ব। তত্ত্ব আর তথ্যের এই পার্থক্য বোধ যার নেই সে যদি বেদ পড়ে তখন সে বেদকে এক রকম বুঝবে, আর যে এই দুটোর পার্থক্যকে বুঝে নিয়ে বেদ পড়বে তার বেদ উপলব্ধি অন্য রকমের হবে। একটা মানুষের শরীর আছে, সেই শরীরে হাত আছে, পা আছে, মাথা আছে তাতে বুদ্ধি আছে, এগুলো হচ্ছে সব তথ্য। ডাক্তাররা এদের সব খবর জানে। কিন্তু এই শরীরের মধ্যে একটা সত্তা আছে, সেই সত্তা হচ্ছে আত্মা, এই আত্মা আছে বলেই শরীরের এতো খেলা চলে। কথামৃতকে এই কারণে বেদ বলা হয়। কথামৃতকে পুরান বলা হয় না, তন্ত্র বলা হয় না। কথামৃতকে বলা হয় বেদরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ। কারণ বেদে কোন তথ্য নেই, বেদের সবটাই হচ্ছে তত্ত্ব, কথামৃতও হচ্ছে পুরোটাই তত্ত্ব। এই জিনিষটাকে না বুঝতে পারলে বেদকে ঠিক ঠিক বোঝা যাবে না। বেদে যা কিছু আছে সবটাই হচ্ছে সার বস্তু, essence, সেইজন্য এই কোর্সের নাম Essential of Spiritual Heritage of India. Essential কেন বলা হচ্ছে? যতটুকু না বললেই নয় ঠিক ততটুকুই বলা হয়েছে, যা বলা আছে এর পরেও যদি কিছু দেওয়া হয় সেটা দিলেও যা হবে না দিলেও কিছু হবে না।

বেদ, বাইবেল, কোরানে যা কিছু আছে সবটাই তত্ত্ব, তার মানে হচ্ছে এর বিরুদ্ধে কোন প্রশ্ন করা যাবে না। বাইবেলে যেমন বলা হচ্ছে – In the beginning there was word, and word was with God and word was God. শব্দই ভগবান। সাধারণ মানুষকে কিংবা কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের যদি বলা হয় শব্দই ভগবান, তারা হেসে উড়িয়ে দেবে, তারা এগুলিকে তথ্য হিসাবে জানে। কিন্তু যারা জানে তারা বলবে বেদ বাইবেল যা বলছে এগুলো ভগবানের কথা নয় এর প্রত্যেকটি শব্দই হচ্ছে ভগবান নিজে। শান্তি মন্ত্রে যেমন রোজ পাঠ করা হয় 'ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু', এটিও একটি বেদের মন্ত্র। এই মন্ত্রের শব্দগুলিও ভগবানের কথা, ভগবানের কথাই নয়, এই শব্দগুলিই হচ্ছে ভগবান। কারণ শুধুমাত্র

‘সহনাববতু’ এই এতটুকুর উপরেই যদি কেউ বছরের পর বছর ধ্যান করতে থাকে তাহলে একদিন সে যে কেবল ভগবানের সাক্ষাৎ করে নেবে তা নয়, সে ভগবানের সাথে এক হয়ে যাবে। ‘সহনাববতু’র অর্থটা কি? আমি আর আমার আচার্য এক সাথে প্রার্থনা করছি। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে যে একত্ব ভাবে রয়েছে এই একত্ব ভাবের উপরে যে ধ্যান করবে কিছু দিনের মধ্যেই তার হৃদয় এক আধ্যাত্মিক দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে যাবে। ‘মা বিদ্বিষাবহৈ’ – গুরুর প্রতি আমার যেন কোন বিদ্বেষ ভাব না আসে, গুরুরও আমার প্রতি যেন কোন বিদ্বেষ ভাব না থাকে। এই মন্ত্রগুলো ধ্যানের গভীর থেকে বেরিয়েছে। ধ্যানের গভীর থেকে একটা সত্য বেরিয়ে এসেছে, কি সেই সত্য? গুরু আর শিষ্যের মধ্যে পারস্পরিক যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ক সর্বদা শ্রদ্ধা, ভালোবাসাতে পরিপূর্ণ থাকবে। যদি গুরুর প্রতি শিষ্যের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস না থাকে আর গুরুর শিষ্যের প্রতি যদি ভালোবাসা না থাকে তাহলে কোন বিদ্যাই অর্জন করা যাবে না। বেশির ভাগ মানুষই মনে করে দীক্ষা নেওয়ার পর দিনে দুবার একশো আট বার জপ করলেই অনেক করে ফেলেছি, কিন্তু এতে কিছুই হয় না। যেদিন থেকে চব্বিশ ঘন্টা যদি কেউ জপ করতে পারবে সেদিন থেকে সে এগোতে শুরু করবে। ‘মা বিদ্বিষাবহৈ’ এই ভাবটাকেই যদি কেউ চব্বিশ ঘন্টা গভীর ভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে চিন্তন করতে থাকে তখন কিছু দিনের মধ্যেই জগৎ যে পর্দাটা দিয়ে সত্যকে আড়াল করে রেখেছে সেই পর্দাটা টেনে হিঁচড়ে ছিড়ে ফেলতে চাইবে। এটা যে শুধু ‘মা বিদ্বিষাবহৈ’ এর ক্ষেত্রেই হবে তা নয়, বেদের যে কোন মন্ত্রের উপর ধ্যান করলেই তাকে আধ্যাত্মিক পুরুষে রূপান্তরিত করে দেবে।

বেদের একটা মন্ত্র আছে, যারা জুয়া খেলে, তারা যদি ঐ মন্ত্রটা রোজ পাঠ করে তাহলে তার জুয়া খেলার বদ অভ্যাসের রোগটা নিরাময় হয়ে যায়। যারা জুয়া খেলে তারা যুধিষ্ঠেরের মত সব কিছুই, এমনকি তার স্ত্রীকেও জুয়াতে লাগিয়ে দেবে, এখন এই জুয়া খেলা থেকে তাকে কি করে বার করে আনা হবে। জুয়ার নেশা থেকে বাঁচার জন্য বেদ একটা মন্ত্র আবিষ্কার করল। পরবর্তি কালে যখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বেদের মন্ত্রগুলিকে সংস্কৃত থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ করতে গেলেন তখন এই মন্ত্রটাকে এক জুয়াড়ির জীবন-দুঃখের আত্মকথা বলে নিছক একটা কবিতা বলেই মনে করলেন। এনারা একবার ভেবে দেখল না যে টানা বত্রিশ বছর ব্রহ্মচর্য পালন করে ব্রাহ্মণরা এই বেদকে মুখস্ত করতেন, মোটামুটি আট বছর বয়সে একজন ব্রাহ্মণ সন্তান গুরুগৃহে বেদ অধ্যয়ন করে যেত, সেখান থেকে টানা বত্রিশ বছর ধরে বেদ অধ্যয়ন করতেন, তারপরে চল্লিশ বছর বয়স হলে তাঁরা বিবাহ করতেন, তার পরের বত্রিশ বছর বেদ মুখস্ত করাত, বর্তমান কালের কোন ব্রাহ্মণ সন্তান এই ধরণের কঠোরতা ও নিষ্টা কল্পনাই করতে পারবে না। এখনতো তিরিশ বছরের মধ্যে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, আর পাঁচ মিনিটও তারা বউকে ছাড়া কাটাতে পারে না। বত্রিশ বছর স্বল্পাহার, কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করে যৌবনের মূল্যবান সময়টাই তাঁরা গুরুগৃহে চতুর্বেদ মুখস্ত করতে কাটিয়ে দিতেন। তার পরের বত্রিশ বছর ধরে বেদ অধ্যয়ন করাতেন। বেদের জন্যই সারাটা জীবনকে উৎসর্গ করে দিতেন। কি করেই আর সংসার ধর্ম পালন করবে আর কিভাবেই বা ধনসম্পদ অর্জন করবে। এই কতকগুলি নিম্ন মানের কবিতা ‘ওহে মৌমাছি তুমি ফুলে বসো না’র মত কবিতা মুখস্ত করার জন্য একটা পুরো জাতি হাজার হাজার বছর ধরে তাঁদের জীবনপাত করে দেবেন? কখনই এই জিনিষ সম্ভব নয়। এইটাকে মানুষ যদি না বুঝতে পারে তাহলে সে কোন দিনই বেদের সার, হিন্দুরা বেদকে কেন এত শ্রদ্ধা, করে এর ধারণাই করতে পারবে না। এই জন্য বিদেশীদের বলা হয় – যদি ভাই তুমি বেদকে ঠিক বুঝতে চাও তাহলে আগে ভারতের যে কোন গ্রামে দু-চার বছর গিয়ে কাটাও। ম্যাক্সমুলার, যার বেদে এত অবদান, তিনি সারাটা জীবনে একবারও ভারতেই আসেননি। স্বামীজী তাঁর সঙ্গে দেখা করে একবার অন্তত ভারতে আসবার জন্য বলেছিলেন। তখন অবশ্য তিনি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি স্বামীজীকে বলেছিলেন – ভারত আমার স্বপ্নের দেশ, ওখানে গেলে আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে বলে আমি আর ভারতে গেলাম না। বিদেশীর কথা বাদ দেওয়া যায়, বেশির ভাবে হিন্দু যারা আছেন তাদেরই বেদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী এখনও বিদেশীদের তুলনায় কোন অংশেই স্বচ্ছ নয়।

শাস্ত্রকে বোঝার আগে বলা হয় প্রথমে শাস্ত্র পূজা করতে। সৈন্যবাহিনীতে ইদানিং কালেও প্রথা আছে তারা বছরে একদিন, বিশেষ করে দুর্গাপূজার সময়ে অস্ত্র পূজা করে। শাস্ত্রের প্রতি এই ধরণের সম্মান না থাকে তাহলে শাস্ত্রকে গ্রহণ করতে পারা যাবে না। ভারতে হিন্দুরাই যে শুধু বেদকে এইভাবে দেখেছিলেন তা নয়, বিদেশে খ্রীশ্চানরা বাইবেলকে এভাবেই দেখে, মুসলমানরা কোরানকে এভাবে শ্রদ্ধা করে। বেদ বাইবেলে যা আছে, ধ্যানের গভীরে যখন কোন সাধক চলে যান তখন তিনি দেখেন শাস্ত্রে যা যা বলা আছে সেটা সত্যিই তাই, শাস্ত্রের বাণী সেই ভগবানের কাছ থেকেই আসছে। নাসদীয়সুক্তে এই একই জিনিষ বলা হয়েছে – যা কিছু আছে সব ঈশ্বরের কাছ থেকে বেরোচ্ছে। যখন এই জিনিষটাকে মানুষ বুঝতে পেরে যায় তখন তার মনে শাস্ত্রের প্রতি প্রচণ্ড শ্রদ্ধার ভাব এসে যায়।

এরপর হচ্ছে বেদের প্রাচীনত্ব। বেদ হচ্ছে পৃথিবীর সব থেকে প্রাচীনতম সৃষ্টি। পাশ্চাত্য জগতে হোমারের ইলিয়ড ওডিসিকে প্রাচীনতম সাহিত্য বলা হয়। যিশু খ্রীষ্টের জন্মের সাতশ বছর আগে হোমারের আবির্ভাব। সেই তুলনায় বেদ আরো অনেক পুরানো। বেদের প্রাচীনত্বকে নিয়ে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের অনেক সমস্যা হয়ে যায়। আমরা আগেই বলেছি যে আমাদের ধর্মের চারটে ভাগ আছে – দর্শন, পুরান, তন্ত্র ও স্মৃতি। চারটে ভাগের জন্য আলাদা চার ধরণের শাস্ত্র আছে। কিন্তু অন্যান্য ধর্মে – খ্রীশ্চান, ইসলাম, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, জুদাই, জিউস ধর্মের ওরা এই চারটেকেই একটার মধ্যে মিশিয়ে রেখেছে। বর্তমানে কোন জায়গাটাতে তাদের দর্শন, কোন জায়গায় পুরান বা রীতি নীতি আছে বোঝা কঠিণ হয়ে গেছে। হিন্দু ধর্মের যত রকমের কাহিনী আছে, অসুর, দৈত্য, দশ হাতওয়াল ভগবানের কাহিনী সব পুরানের মধ্যে আলাদা ভাবে সন্নিবেশিত করা আছে। আবার বেদ উপনিষদে হিন্দু ধর্মের দর্শন বা তত্ত্বগুলিকে রাখা আছে, সেখানে কোথাও বলবে না যে ভগবানের হাজারটা হাত। কিন্তু হিন্দুদের মত এত কাহিনী আর কোন ধর্মে পাওয়া যাবে না, গল্প বানাতে হিন্দুদের মত জুড়ি মেলা ভার। অথচ কোন মননশীল হিন্দু কখনই এই কাহিনীগুলিকে অত গুরুত্ব দেবে না। এনারা ভালো করেই জানেন বোঝেন যে এই কাহিনীগুলো পরম তত্ত্ব নয়, এগুলোই আধ্যাত্মিক সত্য নয়। অন্যান্য ধর্মে পুরান দর্শনের মধ্যে মিশে যাওয়ার ফলে, বিশেষ করে খ্রীষ্ট ধর্মের বিরাট বড় সমস্যা দেখা দিল। বাইবেলে যে এই পৃথিবীর সৃষ্টির তারিখের হিসাব করতে গিয়ে, যেটাতে নিউটনেরও যোগদান আছে, তাতে তারা একটা অদ্ভুৎ হিসাব দিয়ে বললেন ভগবান এই পৃথিবীর সৃষ্টি করেছেন ৪০৩২ বিসিইতে (Before Common Era) । খ্রীশ্চানরা এখনও ধারণা করে আছে যে এই পৃথিবী ৪০৩২ খ্রীষ্টপূর্বেই সৃষ্টি হয়েছে, মানে আজ থেকে প্রায় ছয় হাজার বছর আগে। বেদ কবে সৃষ্টি হয়েছে? হিন্দুরা বলছে আট থেকে নয় হাজার বছর আগে। খ্রীশ্চানরা তো হেসেই ফেলে, পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে ছয় হাজার বছর আগে তার আগে বেদ কি করে আসবে। খ্রীশ্চানরাও বুঝতে পারছে যে বেদ খুবই প্রাচীন, কিন্তু কত পুরনো তারা বলবে, যে যাই বলুক তারাতো ছয় হাজার বছরের আগে তো কিছুতেই যাবে না। এখন বিজ্ঞানীরা বলছে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে ১৫ বিলিয়ন বছর আগে, মানে পনেরোর পরে দশ বারোটা শূন্য দিলে যা সংখ্যা হবে তত বছর আগে পৃথিবীর জন্ম হয়েছে। বিজ্ঞানীদের এই তথ্যে খ্রীশ্চানদের মাথায় বাজ পড়ে গেছে, এরা এখন কিছুতেই পৃথিবীর জন্মের তারিখ বাইবেলের দেওয়া তারিখের সাথে মেলাতে পারছে না। যখন ম্যক্সমুলারদের মত পণ্ডিতরা এলেন, এনারা যে পরম্পরায় শিক্ষা-দীক্ষা পেয়েছেন, সেই পরম্পরা বলছে ভগবান এই পৃথিবীর সৃষ্টি করেছেন ছয় হাজার বছর আগে। হঠাৎ তাদের হাতে এলো বেদ, রামায়ণ, মহাভারতের মত প্রাচ্যের সব বই গুলো। ওনারা আগে জানতেন না যে ভারতে এই সব বই আছে। এই সব বই তাদের হাতে আসার পর এই বইগুলির তারিখ নির্ধারণ করতে গিয়ে তাদের মাথা গেলে ঘুরে। তারা বেদের তারিখ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে বেদের ভাষার উপরে, আর বেদের ঘটনাগুলিকে বিচার বিশ্লেষণ করতে লাগলেন। বিচার করতে গিয়ে দুম্ করে অনেক পেছনের দিকে চলে যেতে হয়েছিল।

ঠাকুর এসেছেন তাও দেড়শ বছর পেরিয়ে গেছে, রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সন্ন্যাসীরা অত্যন্ত বিদ্বদজন, তাঁরা তাঁদের জীবন পুরোপুরি এইখানেই নিবেদিত করে দিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত ঠাকুরের উপরে নির্দিষ্ট করে একটা কোন দর্শন বেরোল না। কেননা ঐ ক্ষমতাই এখনও কারুর হয়নি, কারণ একটা জিনিষকে জমতে সময় লাগে। সাহিত্যের একটা খাত থেকে আরেকটা খাতে যেতে সময় লাগে। ভাষার বিবর্তনও পাল্টাতে একটা সময় লাগে। বেদের দর্শন, সাহিত্য, ভাষা এইগুলিকে যখন তারা গবেষণা করতে শুরু করলেন আর সেইটা করে তারা একটা তারিখ দিয়ে বললেন – বেদ লেখা হয়েছিল ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বে। এনারা কিভাবে আর কোথা থেকে এই তারিখ বার করলেন আমাদের কারুর জানার কথা নয়। তাদের কাছে একটাই সমস্যা হচ্ছে বাইবেল। এরা যদি বেশি গভীরে গিয়ে বেদের সৃষ্টিকালকে ধরতে যায় তাহলে সেটা বাইবেলের বিরুদ্ধে চলে যাবে। গীতাকে নিয়েও তাদের এই একই সমস্যা হয়েছিল। গীতার সংক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র পরিসরে আধ্যাত্মিক জগতের সমস্ত তত্ত্বগুলিকে এত গভীর ও ছন্দোবদ্ধ ভাবে দেওয়া হয়েছে যে এখন যদি গীতাকে বাইবেলের আগে বলা হয় তাহলে বাইবেলের গুরুত্ব অনেক নেমে যাবে। তাই খ্রীশ্চান পণ্ডিতরা প্রাণপন চেষ্টা চালিয়ে গেছেন যে গীতা হচ্ছে খ্রীষ্টের অনেক পরে। কিন্তু ইতিহাসের তথ্যগুলিকে তো তারা অস্বীকার করতে পারছে না। তাই এত প্রাণপন চেষ্টা চালিয়েও আজকে তারা মেনেছে যে গীতা যিশুর জন্মের ছয়শো বছর আগে লেখা হয়েছিল। কিন্তু তথ্য বলছে গীতা যিশুর পনের'শ বছর আগে লেখা। ম্যাক্সমূলার যেটা বেদের তারিখ দিয়েছেন সেটা আসলে গীতার তারিখ।

মানুষ অপরকে বিচার করে নিজেকে দিয়ে, আমি যেমন অপরকে আমি তেমনই দেখব। আমরা যেটা দশ বছর আগে লিখেছি, দশ বছর পরে সেই লেখা অনেক পাল্টে যাবে। পঞ্চাশ বছর আগে সাহিত্যিকাররা যে ভাষায়, যেভাবে সাহিত্য রচনা করেছেন, আজকের সাহিত্যিকারের লেখা তার থেকে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে, আর এই পার্থক্য থেকে পরিষ্কার ধরা যায় কোনটা আগে আর কোনটা পরে। এই জিনিষটাকে অনুসরণ করে ম্যাক্সমূলাররা ঠিক করে ফেললেন যে বেদ খ্রীষ্টের পনের'শ বছরের আগে কোন এক সময়ে লেখা হয়েছিল। তার ফলে পাশ্চাত্যের যত পণ্ডিত আছে তারা ম্যাক্সমূলারের তারিখটাকে আঁকড়ে থাকল। পনের'শ বিসিইকে ধরলেও বেদ হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম দর্শন সাহিত।

আড়াই হাজার বছর আগে যোগসূত্রকার পতঞ্জলি একটা ব্যাকরণের উপরে ভাষ্য লিখেছিলেন, সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে সামবেদের এক হাজারটা শাখা আছে। এর বিভিন্ন শাখা লুপ্ত হতে হতে এখন সেই তুলনায় আমাদের কাছে সামবেদের মাত্র তিনটি শাখা টিকে আছে, ৯৯৭ টি শাখা হারিয়ে গেছে। সংক্ষেপে শাখা বলতে বোঝায়, একই সামবেদ যখন দশটা ব্রাহ্মণ পরিবারে থাকত তখন সেই বেদের কিছু মন্ত্র এই পরিবারে কিছু মন্ত্র অন্য অন্য পরিবারের মধ্যে থাকত, এরা সবাই বলবে আমরা সামবেদীয় কিন্তু আমাদের শাখা আলাদা। এই রকম ভাবে সামবেদের হাজারটা শাখা ছিল। সামবেদের মত অন্য তিনটি বেদের কত শাখা যে হারিয়ে গেছে কেউ বলতে পারবে না। কি করে বোঝা যায় যে হারিয়ে গেছে? যে শাখা গুলি রয়েছে তার কোথাও কোথাও উল্লেখ করা আছে এর এত শাখা ছিল, ওই বেদের এত শাখা ছিল।

ঋকবেদের শুধু সংহিতাতে কুড়ি হাজার চারশ সূক্ত রয়েছে, আর সব মিলিয়ে প্রায় নব্বুই হাজার লাইন বা পদ। মহাভারতে সাধারণত দুটো লাইনে একেকটা শ্লোক, কোথাও কোথাও চারটে লাইনেও শ্লোক আছে, মহাভারতে এক লক্ষ শ্লোক তাতেই মহাভারত এই বিশাল। ঋকবেদের শুধু সংহিতা হচ্ছে মহাভারতের অর্দ্ধেক, তারপর ঋকবেদের ব্রাহ্মণ আছে, আরণ্যক ও উপনিষদ আছে। এতেই বোঝা যায় যে বেদ কত বিশালাকারের হতে পারে। যদি আমরা ঠিক করে নিই যে আমি জীবনে বেদ ছাড়া আর কিছু পড়ব না, তাহলে ধরে নিতে হবে সারাটা জীবন বেদ পাঠ করতেই চলে যাবে। এই কারণেই আজকালকার দিনে কেউ সাহসই পায় না যে শুধু বেদ পড়বে। বেদপাঠ করা যে কত কঠিণ ছোট একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। সায়ানাচার্য যে বেদের ভাষ্য লিখেছিলেন, তিনি ঋকবেদের মন্ত্রের প্রত্যেকটি লাইনের ব্যাখ্যা

দিলেন, এই ভাষ্য পড়তেই আমরা কুল কিনারা হারিয়ে ফেলি, বইটা দেখলেই অনেকে হাঁফ ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ে। উনি কলম কাগজ দিয়ে এই বিশাল গ্রন্থ লিখলেন কিভাবে এটাই একটা আশ্চর্যের ব্যাপার। এখন বেদে একটি শব্দ আছে, পরের দিকে যে শব্দটি সংস্কৃতে অর্থ হয়ে গেল কন্যা। আবার কখন কখন বিশেষ অর্থে এই শব্দটির অর্থ হয় নর্তকী। সায়নাচার্য নিজের ভাষ্যে এই শব্দটির ব্যাখ্যা করছেন – এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে নর্তকী বিশেষ। শুধুমাত্র কন্যাও নয় আবার শুধু নর্তকীও নয়, এক বিশেষ ধরণের নর্তকী যার কোমর থেকে ওপরের দিকে কোন বস্ত্র নেই। সায়নাচার্যের এই ব্যাখ্যাকে কেউ মানতেই পারল না, সবাই বলতে লাগল তিনি কোথা থেকে এই শব্দের এই ব্যাখ্যা পেলেন, কেননা ভারতে এই ধরণের সংস্কৃতি কোন কালেই ছিল না। কিছু দিন আগে পাটলিপুত্রের কাছে এক জায়গায় প্রত্নতাত্ত্বিকরা খনন কার্য চালাতে গিয়ে বহু প্রাচীন কালের এক ধরণের নারী মুর্তি আবিষ্কার করলেন যে নারী মুর্তিগুলির কোমর থেকে ওপরের দিকে কোন বস্ত্র নেই। সায়নাচার্য ঠিক যে রকমটি বর্ণনা করেছিলনে হুবহু সেই নারীর মুর্তি। এখন যারা সায়নাচার্যকে গালাগাল দিয়েছিল তাদের মাথায় হাত পড়ে গেল, তারা দেখল আরে লোকটাতো ঠিকই বলেছিল, আর পাটলিপুত্রের আশেপাশে বৈদিক সভ্যতার বিকাশ হয়েছিলে এটা তাদেরও জানা আছে। সায়নাচার্যের কাছে পরম্পরা বিদ্যা ছিল, তিনি জানতেন এই শব্দের এই অর্থ। এখন আমরা যদি নিজেরা বেদকে পড়ে বুঝতে যাই তখন কি অবস্থা হবে বোঝাই যাচ্ছে, বেদকে বুঝে নেওয়ার কল্পনাই করতে পারব না।

সায়নাচার্য বেদের যা কিছু লিখেছেন তিনি যাস্ককে অবলম্বন করেই লিখেছিলেন। যাস্ক ছিলেন সাত খ্রীষ্টপূর্ব বছরের সময়কার পণ্ডিত। সায়নাচার্যের সাথে প্রায় দু- হাজার বছরের পার্থক্য। তার মানে দু-হাজারের বছরের মধ্যে বেদের উপরে কিছুই লেখা হয়নি। তাও যাস্ক বেদের শব্দগুলির উপরে শুধুমাত্র একটা অভিধাণ তৈরী করেছিলেন। দু-হাজারের মধ্যে সেই শব্দগুলো আরও কঠিণ হয়ে গেছে, নয়তো পাল্টে গেছে অথবা হারিয়ে গেছে। আজকে আমরা বেদের যা কিছু অর্থ বিচার করি তার পুরোপুরিটাই সায়নাচার্যের বিশাল এই বেদের ভাষ্যের উপরে ভিত্তি করে। সায়নাচার্যের কোন শব্দের ব্যাখ্যাকে যদি না বোঝা যায় তখন যাস্কের নিরুক্তে সেই শব্দের অর্থ খুঁজতে হবে। নিরুক্ত হচ্ছে বেদের শব্দগুলির অভিধাণ। সেখানেও যদি না বুঝতে পারে তাহলে তখনকার দিনের অন্যান্য বিষয়ের উপরে যারা ভাষ্য রচনা করেছেন তাদের সেই ভাষ্যে যদি এই শব্দটা পাওয়া যায়। যদি পাওয়া গেলো তো ভালো, সেখানে কি বলছে দেখে নেওয়া যাবে। কিন্তু না পাওয়া গেলে আর কোন উপায় নেই।

কেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা তাদের সমস্ত জীবন একেকটি বেদের জন্য নিঃশেষে দান করে দিলেন? কেন এখনও বেদকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়? তার কারণ, স্বামীজীর সেই বিখ্যাত উক্তিটাকে স্মরণ করতে হবে – কবে সেই দিন আসবে যেদিন ভারতের ঘরে ঘরে বেদের পূজা হবে। তার কারণ বেদ যদি না পড়া হয়, বেদ যদি না বুঝতে পারি তাহলে হিন্দু ধর্ম শেষ হয়ে যাবে। আমরা যদিও বলি বেদের সার পুরানে আছে, বেদের সার উপনিষদে আছে, কিন্তু শুধু সারকে জানলেই হবে না, আমাদের বেদের সামগ্রিক চিত্রটাকে সম্যক রূপে অবলোকন করতে পারলেই আমাদের ব্যাক্তিজীবন বা সমাজজীবনের সমস্ত নোংরা-আবর্জনাকে পরিষ্কার করতে পারব। বেদের পুরো জিনিষকে না জানলে এটা কখনই সম্ভব নয়। গরুর দুধটাই হচ্ছে সার, গরুর বাঁটটাই আসল, কিন্তু পুরো গরুটাকে ঠিক ঠিক পরিচর্যা করে সুস্থ সবল না করলে সারটাও পাওয়া যাবে না। গরুকে পরিচর্যা করতে গেলে গরুর শরীরের গঠণ কাঠামোটাকেও জানতে হবে। গরুর সমগ্র শরীরটারও আলাদা মূল্য আছে, যেটাকে কখনই উপেক্ষ করা যায় না। প্রথমে শঙ্করাচার্যের জন্য, পরে স্বামীজী উপনিষদের উপরে খুব জোর দেওয়ার ফলে উপনিষদের মন্ত্রগুলি সব বিভিন্ন সংস্থাগুলি বিশেষ করে গীতাপ্রেস, রামকৃষ্ণ মিশন থেকে বই আকারে বেরিয়ে যাওয়ায় উপনিষদ আর হারিয়ে যাবে না। গীতাও সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু বেদ যে তিমিরে ছিলে এখনও সেই তিমিরেই পড়ে আছে। একবার বেদ

যদি গীতা উপনিষদের মত ছড়িয়ে যায় তাহলে হিন্দু ধর্ম, শুধু হিন্দু ধর্মই নয়, গোটা ভারতবর্ষ আবার নতুন ভাবে সঞ্জীবনি শক্তিতে জাগ্রত হয়ে উঠে মানবকল্যাণকারী রাষ্ট্রে পরিণত না হয়ে থাকতে পারবে না।

হিন্দুরা প্রাচীনকাল থেকে বিশ্বাস করে আসছে যে ভগবানের নিঃশ্বাসের সাথে বেদ বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু বেদে এটা কোথাও বলছে না যে আমি ভগবানের নিঃশ্বাসের সাথে বেরিয়েছি। অনেক পরের দিকে পুরানে অবশ্য এটা বলা হয়েছে, আর পুরান থেকেই সমস্ত হিন্দু বিশ্বাস করে বসে আছে যে বেদ ভগবানের নিঃশ্বাসই বেদ। পুরান কেন বলতে গেল বেদ এইভাবে এসেছে? এখন হয় কি গ্রামের লোকের কাছে গিয়ে যদি বলা হয় – প্রথমে ছিল শব্দ, সেই শব্দ ভগবানের কাছে ছিল আর শব্দই ভগবান, গ্রামের লোকের হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে নয়তো বলবে কি আবোল-তাবোল কথা শুনতে এসেছি এর থেকে চল বাবা ক্ষেতে গিয়ে বেগুন লাগাই। উচ্চ দর্শনের তত্ত্ব কথাগুলো গ্রামের লোকের কাছে বলা আর পাথরের দেওয়ালে সামনে বলা একই ব্যাপার। কিন্তু গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যেও ধর্মভাব নিয়ে আসতে হবে। এখন এই ধর্মভাব এদের মধ্যে কিভাবে জাগানো যাবে? এদের মত করে তাদের ধর্মের কথা শোনাতে হবে। তাই সহজ করে পুরান বলে দিলে – ভগবানের নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেদ বেরিয়ে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে এক কথায় সবাই বুঝে নেবে। আধ্যাত্মিক দর্শনের কঠিণ দুর্বোধ্য পরম সত্যগুলিকে যখন সাধারণ মানুষকে বোঝান হয় তখন সেটা গল্পচ্ছলে বলা হয়। বেদ হচ্ছে শব্দ, মানে জ্ঞান, আর ভগবান এক – এই চরম সত্যটাকে বোঝাতে পুরান বলে দিল – ভগবানের নিঃশ্বাসের সাথে বেরোল চারটি বেদ। এইটাকে নিয়ে যখন তারা আরো চিন্তা ভাবনা করতে করতে একদিন সে বুঝতে পারবে যে বেদ হচ্ছে জ্ঞান আর জ্ঞান আর ভগবান এক, জ্ঞান ভগবান থেকেই এসেছে, আর সমস্ত জ্ঞানরাশি হচ্ছে বেদ, তাই বেদ ভগবান থেকেই এসেছে। আমাদের যেমন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, ঈশ্বরের কাছে জ্ঞানটাও সেই রকম। আমাদের মত ভগবানকে জ্ঞান আয়ত্ত করতে হচ্ছে না, জ্ঞানটা তাঁর স্বাভাবিক, সে যে কোন জ্ঞানই হোক না কেন, জাগতিক কিংবা আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ভগবানের থেকে কখনই তা আলাদা থাকে না। পুরানে আবার কোথাও কোথাও বলবে ব্রহ্মার চারটে মুখ থেকে চারটে বেদ বেরিয়েছে। যেহেতু সে কোন পুরুষের থেকে বের হয়নি তাই বেদকে বলা হয় অপৌরুষেয়।

মীমাংসকরা খুব সুন্দর যুক্তি দেখিয়ে বলে কেন বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়। মানুষ যখন কোন কিছু রচনা করে তখন সে বারে বারে যখনই সুযোগ পাবে তখনই সে সবাইকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবে আমি এই জিনিষটা রচনা করেছি। আর যদি কেউ প্রথম প্রথম কবিতা লেখে তখন হয় সে তার বন্ধুদের হারায় নয়তো তার বউএর সাথে বিচ্ছেদ হয়ে যায়। কোন কবি যখনই কিছু লিখবে তখনই সে সেটা কাউকে না শুনিয়ে ছাড়বে না। আর এত বিশাল বেদ যারা রচনা করেছেন তারা একবারও নিজেদের নাম কোথাও উল্লেখ করবেন না! পুরো বেদের কোথাও একটি কারুর নাম পাওয়া যায় না। যে কোন মানুষের কাছে তার সৃষ্টি নিজের থেকেও বেশি মূল্যবান মনে হয়। সেখানে বেদ এত বিশাল, যার কথাই হচ্ছে একটা ধর্মের, একটা জাতির শেষ কথা, সেটা রচনা যারা করেছেন তাঁরা কেউ তাঁদের নাম কোথাও উল্লেখ করলেন না। বাবা হয়তো খুব বিনয়ী হতে পারেন তাঁর ছেলেকে যখন বেদের মন্ত্রটা দিলেন তখন তিনি হয়তো তাঁর নাম বললেন না, কিন্তু পরে ছেলে যখন নাতিকে দেবে তখন কি তাকে বলবে না যে এটা তোমার ঠাকুর্দার আবিষ্কার। কিন্তু বেদের কোথাও, এই ধরণের উল্লেখও পাওয়া যায় না। এর কারণ আমরা আগে বলেছি – ধ্যানের গভীরে যখন এনারা এই মন্ত্রগুলি পেয়েছিলেন তখন তাঁরা অবাক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছেন, তাঁরা বুঝেছিলেন এই জিনিষ আমার দ্বারা রচনা করা কখনই সম্ভব নয়। শ্রীমা বলছেন – আমি ভাবি, আমি তো সেই কোন এক অচেনা গ্রামের রামচন্দ্র মুখোপধ্যায়ের নিরক্ষর মেয়ে, অথচ আমাকে কত লোকে দেখতে আসছে, তাদের কেউ আবার ডাক্তার উকিল, অধ্যাপক, তাই মনে হয় এর মধ্যে কিছু একটা আছে যার আকর্ষণে এতো লোক আসছে। শ্রীমা কি বলতে চাইছেন এতে? শ্রীমার মধ্যে এতটুকু অহঙ্কার নেই। ঠাকুরও বলছেন – আমাকে এত লোকে মানে জানে কিন্তু মাইরি বলছি আমরা এতটুকু অভিমান হয় না।

মানুষ চেষ্টা করে একটা স্তর পর্যন্ত যেতে পারে তার পরে যতটুকু এগোবে সে বুঝতে পারে এইটুকু আমার দ্বারা কখনই সম্ভব নয়, সে তখন হাত তুলে বলে দেয়, আমার যা কিছু সব তাঁরই খেলা। এই ধরণের বড় বড় কাজের দায়ীত্ব ভগবান যার তার কাঁধে চাপিয়ে দেননা। মানুষ যখন বুঝে নেয় এই কাজটা আমার ক্ষমতার বাইরে, তখন মানুষ বিনম্র হয়ে যায়। আজকাল বেশির ভাগ লোকেরাই হচ্ছে ঔদ্ধত, কেন ঔদ্ধত? কারণ তাদের কোন কৃতকৃত্যতা নেই। মানুষ যখন কৃতকৃত্য হয়ে যায় তখন ভগবান তাকে নিজের যন্ত্র করে নেন, আর তাকে তিনি আরও অনেক বেশি শক্তি দিয়ে দেন। যখন ঈশ্বর নিজে শক্তি দেন তখন মানুষ আঁতকে ওঠে, সে দেখে আমার থেকে এই জিনিষ কি করে বেরোচ্ছে, এটাতো আমার ক্ষমতার বাইরে। কেননা তার নিজস্ব ক্ষমতার দৌড় কতখানি তার জানা আছে। তখন সে মাথা নত করে নেয়, প্রকৃত বিনম্রতা তখন তার মধ্যে আসে। বেদের যারা ঋষিরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে এই ব্যাপারটাই হয়েছিল। ধ্যানের গভীরে যখন তাঁরা কিছু কিছু তত্ত্বকে, যেটাকে তিনি তাঁর চোখের সামনে দেখতেন সেটাকেই তিনি পরে শব্দাকারে প্রকাশ করছেন। আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলিকে তো মুখে বলে কিছু হয় না, এগুলি সবই অনভূতি সাপেক্ষ, তখন বেরিয়ে আসছে ওঁ ভুর্ভূবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। এখন এটা যদি একটা কবিতার পদ হয় তাহলে একজন কবির নাম থাকবে। মন্ত্র যদি হয় তাহলে কবির নাম হবে না, তখন এই মন্ত্রের দ্রষ্টার নাম হবে। আমরা এই মন্ত্রের দ্রষ্টা কে জানি – বিশ্বামিত্র ঋষি। বিশ্বামিত্র এই মন্ত্রের দ্রষ্টা, তাঁকে কখন এই মন্ত্রের রচয়িতা বা কবি বলা হয় না। তিনি নিজেও কখন বলছেন না যে আমি এই মন্ত্রের দ্রষ্টা। বেদে বিশ্বামিত্র হচ্ছে একটা বংশের নাম, একটা কুল বা গোত্র। এখন রামকুমার ব্যাণার্জী কিছু একটা লিখলেন আর রামকুমার না দিয়ে ব্যাণার্জী লিখলেন। এখন তার ছেলেও ব্যানার্জী লিখছে, নাতিও ব্যাণার্জী লিখছে, পরে বোঝা যাবে না আসল রচয়িতা কে। বিশ্বামত্র একটা গোত্র, একটা বংশের নাম। এখন কোন্ বিশ্বামিত্র এই মন্ত্রের দ্রষ্টা বলা খুবই মুশকিল।

মীমাংসকরা তাই বলে বেদ যদি মানুষের সৃষ্টি হত তাহলে তার রচয়িতার নাম থাকত। নাম যেহেতু নেই তাই তারা বলছেন বেদ অপৌরুষেয়। মীমাংসকরা ভগবান বা ঈশ্বর বেশি মানতেন না, তারা এটাকে মানেন যে বেদের ঋষিরা বেদের মন্ত্রগুলি ধ্যানের গভীরে পেয়েছিলেন। স্বামীজী সিন্ধু নদীর তীরে যখন ঋষির কণ্ঠে বেদ মন্ত্রের সুর শুনেছিলেন নিবেদিতাকে পরে বলছেন – ‘এ সুর আমার জানা ছিল না। অনেক আগে ভারত থেকে এই সুর লুপ্ত হয়ে গেছে’। এর আগেও আমরা আলোচনা করেছিলাম এখানে যদি অনেকে মিলে ‘চক’ শব্দটা উচ্চারণ করি তাহলে সবার উচ্চারণ আলাদা হয়ে গেলেও সবাই কি বলতে চাইছে বোঝা যাবে, কিন্তু এই চকের মূলে একটা সাধারণ সত্ত্বা রয়েছে, যেটা হচ্ছে চকের প্রকৃত আধ্যাত্মিক সত্তা। সেই শব্দটা যদি ঠিক ঠিক উচ্চারণ করা যায় তখন সত্যি সত্যিই চক এসে হাজির হয়ে যাবে। কারণ শব্দ আর বস্তু হচ্ছে এক। বৈদিক মতের যারা অনুগামী তাদের সবারই এইটাতে দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তাছাড়া স্বামীজীও এই কথা বলে গেছেন। যখনই সৃষ্টির লয় হয়ে যায় তখন সৃষ্টির সব কিছুই সমষ্টি শক্তিতে একীভূত হয়ে যায়। আমাদের বৈদিক ধর্মের এই তত্ত্বটা যখন আবিষ্কার হয়েছিল তার প্রায় সাত আট হাজার বছর পর আইনস্টাইনের $E=MC^2$ এর থিয়োরি এসেছে। স্বামীজীও আইনস্টাইনের আগে বলেছেন জড় শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। শক্তি যখন আর ঘনীভূত হয়ে যায় তখন শক্তি শব্দতে, শব্দ চিন্তাতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ধরুন এই জগতের লয়ের পরে আমি সাক্ষী হয়ে সব দেখছি, তখন আমি কিছুই দেখতে পাবো না, কেননা তখন না আছে জড়, না আছে শক্তি, না আছে শব্দ, তখন সব কিছু শুধু চিন্তা বা ভাব রূপে সূক্ষ্ম হয়ে বিরাজ করবে। চিন্তাকে তো কেউ দেখতে পায় না, আমাদের মনের মধ্যে সব রকমের চিন্তা রয়েছে, দুশ্চিন্তা, সুচিন্তা সবই রয়েছে কিন্তু এগুলোকে আমরা দেখতে পারিনা। ভারতীয় পরম্পরায় সৃষ্টি হচ্ছে – প্রথমে চৈতন্য, চৈতন্য জন্ম দিচ্ছে ভাব বা চিন্তাকে, চিন্তা থেকে জন্ম নিচ্ছে শব্দ, শব্দ জন্ম দিচ্ছে শক্তিকে, শক্তি জন্ম দিচ্ছে বিষয়ের। এই বিষয়টা জানা আমাদের পারস্পরিক চিন্তা ভাবনাকে পরিস্ফুট করার জন্য যেমন প্রয়োজন তেমনি আমাদের আধ্যাত্মিক অন্তর জগতের বিকাশের জন্যও প্রচণ্ড জরুরী।

পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় আমরা যেটাকে বিষয় বা object বলছি সেটাকে বলছে জড় বা matter, ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করেন বা যোগীরা যখন সৃষ্টি করেন তখন কিন্তু এভাবে হয়না। যেমন বাইবেলে আছে – Let there be light, and there was light, সমস্ত ব্যাপারটা এত দ্রুত হচ্ছে তখন এভাবেই হয়। বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণনা আছে ভরদ্বাজ ঋষি বলছেন সব খাওয়ার সামগ্রী, নর্তকীরা এসে যাক, সব সাথে সাথে এসে গেল। ভরদ্বাজ ঋষিতো তখন ডারউইনের বিবর্তনবাদের থিয়োরিকে অনুসরণ করে করলেন না, সরাসরি এসে গেল। তা লোকেরা বলবে এগুলো তো গাঁজাখুড়ির গল্প। গাঁজাখুড়ি বলতে পারে, কিন্তু এটা একটা তত্ত্ব বা ভাবকে সামনে নিয়ে আসছে। কি সেই ভাব? ঈশ্বর বা যোগীরা ইচ্ছে করলে সরাসরি যে কোন কিছুর সৃষ্টি করে দিতে পারেন। যোগীরা যে এগুলো করতে পারেন, এই জিনিষগুলি আমরা ঠাকুরের জীবনে, এমনকি স্বামীজীর জীবনেও অনেক দেখেছি। ঠাকুর, মা, স্বামীজী এনাদের মধ্যে সিদ্ধাই দেখিয়ে বেড়াব এই মনোভাব কখনই ছিল না, কিন্তু কোন কোন পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে তাঁরা ভালো মতই এগুলো প্রয়োগ করেছেন।

পাশ্চাত্যের ভোগসর্বস্ব আদর্শে জর্জরিত প্রত্যেক ভারতবাসীকে তার ধমনীর রক্ত প্রবাহে যে নিজস্ব ঐতিহ্য পরম্পরা প্রবাহিত হয়ে চলেছে সেই ঐতিহ্যকে জানাটা আজ খুবই বাঞ্ছনীয়। ভারতের আসল ধর্মটা কি আমরা প্রায় সকলেই ভুলে গেছি, সেটাকে জানা খুবই প্রয়োজন। সকালে বেলুড় মঠে আসলাম, মন্দিরে প্রণাম করে চরণামৃত আর বাতাসা প্রসাদ খেলাম, এটাই ধর্মের সব কিছু নয়, এগুলো ধর্মের খুবই নগণ্য জিনিষ। সঠিক ধর্মকে জানতে হলে আমাদের আরও গভীরে গিয়ে আমাদের চিন্তা বুদ্ধিকে খেলাতে হবে।

স্বামী-শিষ্য সংবাদে স্বামীজী শিষ্যকে বলছেন – পৃথিবীতে যত ঘট আছে সব ঘটকে যদি ভেঙ্গে দেওয়া হয়, এমনকি দু-হাজার বছর পর্যন্ত ঘট শব্দটাও ব্যবহার করা হল না, তাই বলে ঘটত্ব, ঘটের ভাবটা থেকে যাবে। ভগবানের যে মন, তাতে এই ঘটত্বের নাশ কখনই হবে না। ফলে কি হবে, সমস্ত ঘটকে নাশ করে দিলেও ঘট শব্দটা থেকে যাবে, ঘট শব্দটাকেও নাশ করে দেওয়া হল, তারপরেও ঘটত্ব ভাবটা থেকে যাবে। যত দিন ভগবান আছেন তত দিন ঘটত্বের নাশ কখনই হবে না। সেইজন্য ভগবান যে মুহূর্তে ইচ্ছা করবেন তখন আবার ঘটের আবির্ভাব হয়ে যাবে। তাই হিন্দুদের মতে জগতে বিনাশ বলে কিছু নেই। ভাবের বিনাশ নেই বলে সেখান থেকে আবার সব কিছু সাকার হয়ে যাওয়াটা কোন ব্যাপারই নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণকে যেভাবে আমরা দেখছি সেটাই সব কিছু নয়, তিনি মানুষের রূপ নিয়ে আছেন বলে তিনি কখনই মানুষ নন, তিনি হচ্ছেন একটা ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভাবের কখনই বিনাশ নেই। এই ভাবকে যখনই কেউ ধ্যানের মধ্যে চিন্তা করবে তখনই শ্রীরামকৃষ্ণ হাজির হয়ে যাবেন। বলা হয় বেদের মন্ত্র যখন ঠিক ঠিক উচ্চারণ করা হয় তখন সেই মন্ত্রগুলি মুর্তরূপ ধারণ করে, শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ঠিক ঠিক উচ্চারণ করা হবে তখন শ্রীরামকৃষ্ণও মুর্ত হয়ে উঠবেন। কেন এই রকমটি হবে? কারণ ভাব, শব্দ আর বিষয় হচ্ছে পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। পতঞ্জলি যোগসূত্রে একটি সূত্র আছে - *তজ্জপস্তদর্থভাবনম্* , পতঞ্জলি বলছেন কিভাবে আমরা ঈশ্বরে মন দেবো, *তজ্জপঃ* তার নাম জপ করতে বলছেন, আর *তদর্থভাবনম্,* তাঁর যে নামটা জপ করছি, সেই নামের অর্থ ভাবনা সাথে সাথে করতে হবে। এখানেও সেই শব্দ আর ভাবের কথাই বলা হচ্ছে। শব্দ আর ভাবকে যেই ঠিক ঠিক জুড়ে দেওয়া হবে বিষয় আপনা থেকেই এসে যাবে। কারুর যদি মনের সেই একাগ্র শক্তি থাকে তাহলে সে যে কোন কিছুর শব্দ আর ভাবকে নিয়ে ঠিক ঠিক উচ্চারণ করতে পারে তাহলে সেই জিনিষ তার কাছে চলে আসবে। এটাই হচ্ছে হিন্দু ঋষিদের অভিমত। এটা যে ঋষিরা কোন কিছুর কাল্পনিক চিন্তা থেকে এই অভিমত দিচ্ছেন তা নয়। ওনারা বলেন এগুলো আমাদের কাছে অতি নগণ্য ব্যাপার। সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় ঈশ্বর ছাড়া কিছুই নেই। ভগবান যখন সৃষ্টি করেন তখন কি তিনি বাস্তুকার আর রাজমিস্ত্রির মত নকশা বানিয়ে ইট, সিমেন্ট, বালি দিয়ে কিছু বানান? কখনই তিনি তা করতে যান না। ভগবান যেই বললেন সৃষ্টি হোক সেই মুহূর্তেই সব সৃষ্টি হয়ে যাবে। তাঁর ইচ্ছা মাত্রেই সব কিছু প্রকাশ হচ্ছে আবার তাঁর ইচ্ছা মাত্রেই সব কিছুর লয় হয়ে যাবে। খ্রীশ্চানদের কাছে এটাই

আবার সমস্যা হয়ে যায়, বাইবেলে আছে ভগবান আগে এটা করলেন তারপরে ওটা করলেন, এইভাবে হিসেব করে করতে গিয়ে তাদের একটা জায়গায় এসে সমস্যা হয়ে যায়। কেন তাদের এই সমস্যা? কারণ তাদের পরম্পরা নেই। আমাদের ভারতের যে পরম্পরা আছে, বেদের ঋষিদের যে পরম্পরা চলে আসছে, সেই ধরণের কোন পরম্পরা থাকলে তারা আর কোন সমস্যায় পড়ত না। Idea, Words and Objects are co-related. এইটাকে খ্রীশ্চানরা ধরতেই পারেনা বলে তারা সৃষ্টির ব্যাপারে যা বলে তার কোনটাই দাঁড়াতে পারে না। কথামৃতেও আমরা বেদের এই তত্ত্ব পাই। শব্দ ও বিষয় যে একই এই জিনিষটাকেই কথামৃতে বলছে নাম আর নামী অভেদ। নামটা হচ্ছে শব্দ আর নামীটা হচ্ছে বিষয় মানে object. শাস্ত্র পড়লে কথামৃতে ঠাকুরের কথাগুলো ঠিক ঠিক বোঝা যায়। নাম নামী অভেদ এই কথাটা কোথা থেকে এসেছে? বৈষ্ণব সম্প্রদায় থেকে। কথামৃতে যা পড়ছি সেই একই জিনিষে বেদেও পড়ছি। এই নাম-নামী থেকেই সৃষ্টি বেরোচ্ছে।

ভাবের অবস্থান হচ্ছে মনে, শব্দ আছে মুখে আর বিষয় আসছে কার্যে। যে চুরি করতে চাইছে সে প্রথমে মনে ভাবে আমি চুরি করব, তারপর তার মনের কথা তার নিজের লোকদের কাছে বলবে – আমি কিন্তু চুরি করব, চুরি করা ছাড়া আমার উপায় নেই। তারপর একদিন সে সুযোগ পেয়ে চুরি করতে যায়। এই তিনটে জিনিষ সব সময় পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। এই তিনটের মধ্যে আসল হচ্ছে ভাব। যে মন শুদ্ধ পবিত্র হয়, যে মন খুব একাগ্র, সেই মনের মধ্যে যে ভাব আসে সেই ভাব কার্যকর হবেই হবে। এইজন্য দেখা যায় সাধারণ লোকেরা সাধুর কাছে যায় আশীর্বাদ নিতে, মানে সাধু যদি কিছু বলে দেয় তাহলে সেটা হয়ে যাবে। অর্থাৎ সাধুর মনে যদি কোন বিচার আসে যে ওর ভালো হোক, তার ভালো হবেই। শুদ্ধ পবিত্র মনে যে ইচ্ছাটা জাগ্রত হবে সেই ইচ্ছাটা ফলপ্রসু হয়ে যায়। বেদ এবং বৈদিক রচনা এই দুটোর মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বেদ সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে তার ব্যাখ্যা করেছে আবার বেদ কিভাবে এসেছে সেটাও বেদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ঈশ্বরের মনে যে ভাব বা চিন্তা আছে সেটা যখনই সাকার রূপ ধারণ করবে তখন সেটা কোন আজগুবি কিছু হবে না, একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ছন্দোময় পরিকাঠামো তার থাকবে। বেদ ঈশ্বরের সৃষ্টির এই সামঞ্জস্যযুক্ত ও ছন্দোময় পরিকাঠামোটাকে ধরে রেখেছে, এরই বাহ্যিক প্রকাশ হচ্ছে এই সমগ্র জগৎ।

স্বামীজী বলছেন যে সৃষ্টির ঠিক আগে, যখন কোথাও কিছু নেই, ভগবান প্রথম ওঁ সৃষ্টি করেন। এই ওঁ শব্দের সাথে সাথেই প্রত্যেকটি বস্তুর সূক্ষ্মরূপ গুলি উদয় হয়ে যায়। কোথায় উদয় হচ্ছে? ভগবানের মনে। যেমনি সূক্ষ্মভূত গুলির উদয় হয়ে গেল তখন সেখান থেকে স্থূল জগতের প্রকাশ হওয়াতে আর কোন সমস্যাই থাকবে না। সৃষ্টির ব্যাপারে এটাই হচ্ছে বেদের মত। আমরা যদি কোন কিছু রচনা করতে যাই তখন আমাদের অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, নানা পন্থা অবলম্বন করে, এটা ওটা দিয়ে রচনা করতে হবে। আমরা বোতল শব্দটা উচ্চারণ করলে বোতলের সৃষ্টি হয়ে যাবে না, আমাকে প্রথমে খনি থেকে ক্রুড পেট্রোল তুলে আনতে হবে, সেই পেট্রোলকে শোধানাগারে পাঠিয়ে শোধন করতে হবে, তার থেকে পেট্রোলিয়াম বাই-প্রোডাক্টস গুলি আসবে, তারপর সেটা কারখানায় গিয়ে বোতল তৈরী হবে আর ভগবান বা যোগীরা যখন কোন কিছুর রচনা করেন তখন তাঁরা সরাসরি সেটাকে রচনা করে আমাদের সামনে প্রকাশ করে দেন, বলবেন ‘বোতল’ সঙ্গে সঙ্গে বোতল এসে যাবে। যোগীরা ইচ্ছে করলে তাঁরা একাধিক শরীর নিয়ে নিতে পারেন। এগুলো যোগীদের কাছে স্বাভাবিক, এই নিয়ে তাঁরা মাতামাতি বা নাচানাচি করেন না। আমাদের কাছে এগুলো অস্বাভাবিক লাগবে। একটা গ্রামের লোক, যে কোন দিনও রেফ্রিজারেটর দেখেনি তার কথাও শুনেনি, তাকে যদি ফ্রীজ থেকে বরফের টুকরো দিয়ে দেওয়া হয় সে অবাক হয়ে যাবে। বেদের ব্যাপার গুলো আমাদের কাছে ঐ গ্রামের লোকেদের মত। কিন্তু যাঁরা ঋষি, যোগী তাঁদের কাছে এগুলো একেবারেই মামুলি ব্যাপার যেমন আপনার কাছে ফ্রীজের বরফ। যারা বেদ অধ্যয়ন করতে আসেন তাদেরকে এই জিনিষগুলিকে আনুষ্ঠানিক ভাবে জানান হয়, কেননা আগে যা কিছু শুনেছি, তা যা বিশ্বাস

অবিশ্বাস রয়েছে, এখন তাকে সব মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বেদের শিক্ষাকে নিতে হবে। তাই তাকে প্রথমে বেদের বৈশিষ্ট্যগুলিকে বলে দেওয়া হয়। এইটা যা এতক্ষণ বলা হল, এগুলো হচ্ছে বেদের বৈশিষ্ট্য। সৃষ্টি কিভাবে হয় সেই ব্যাপারে এটাই হচ্ছে বেদের মূল বক্তব্য।

গীতাতে একটা শ্লোক আছে – *যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ (৯/২২)*।, ভগবান বলছেন – যাঁরা যোগী আমি তাঁদের জন্য ক্ষেম বয়ে নিয়ে আসি। গীতার ভাষ্যকার শ্রী মধুসুদন সরস্বতী তাঁর ভাষ্যে প্রশ্ন করে বলছেন – যাঁরা যোগী তাঁদের খাবার না হয় ভগবান বয়ে নিয়ে আসেন, কিন্তু যারা যোগী নয় তাদের খাবার কে দেন? আমরাই তো বলি সবই তাঁর ইচ্ছা, তাহলে তিনিই সবাইকে খাওয়াচ্ছেন, কিন্তু ভগবান গীতাতে বলছেন যোগীদের খাবার আমিই বহন করে আনি। তাহলে বাকিদের খাবার কে নিয়ে আসে? শ্রী মধুসুদন সরস্বতী বলছেন – ভগবানই সবাইকে দেন। কিন্তু যোগী ছাড়া বাকীদের পুরুষকারের মাধ্যমে দেন, মানি তাদেরকে দিয়ে খাটিয়ে নেন আর যোগীদের না খাটিয়েই দিয়ে দেন, এইটাই হচ্ছে তফাৎ। ভাষ্যকার বলছেন – যোগীদের না খাটিয়ে সব কিছু দেন, তা ভগবান তাঁদের কি দেন? যোগ সাধনের জন্য যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই তাঁদের তিনি নিজে থেকে দিয়ে দেন, তাই বলে বিলাসিতা করার জন্য কোন বিলাসসামগ্রী তাঁদের তিনি দেন না। বেলুড় মঠে ঠাকুরের তিথি পূজা হবে সেখান সন্ন্যাসীরা খেটেখুটে সব জোগাড় করতে যান না, ভক্তরাই সব জোগাড় করে দেন। কোথাও কোন সাধু যজ্ঞ করবে, দেখা যায় কেউ চাল দিয়ে গেল, কেউ ডাল দিচ্ছে, একেক জন ভক্ত একটার ভার নিয়ে নিচ্ছে, সাধু এখন নিশ্চিন্ত হয়ে নির্ভাবনায় যজ্ঞ করতে বসে গেল। এটা একটা ভাব – তুমি যোগী হয়েছ, তুমি আর সংসারে বেশি মন না দিয়ে আমাতে মন দাও, তোমার জীবন ধারণ আর সাধন-ভজনের জন্য যতটুকু যা দরকার হবে আমিই যোগাড় করে দেব। ঠাকুর নরেনকে বলছেন – তোর মোটা ভাত আর মোটা কাপড়ের অভাব হবে না। যোগীদের বলা হচ্ছে – তুমি যদি কিছু নাও পাও তার জন্য উতলা হয়ো না। কিন্তু যারা সংসারী তাদেরকে কিছু পেতে হলে খাটতে হবে।

বেদ – ৩১শে জানুয়ারী ২০১০

বেদের সময়কে যদি তিন হাজার কি দু হাজার এগিয়ে পিছিয়ে দেওয়া হয় তাহলে বেদের অনেক কিছুর গুরুত্ব পাল্টে যাবে। বেদে যা বলা হয়েছে তার উপরেই ভারতের ইতিহাস রচিত হয়, আবার ভারতের পরিচয় পেতে হলে বেদকে জানতে হয়, এই দুটোর মধ্যে একটা গভীর সংযোগ রয়েছে। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন – তোমরা এমন কোন সূত্র কি পেয়েছ যে আর্যরা ভারতের বাইরে থেকে এসে আক্রমণ করে পরে ভারতে বসবাস করতে আরম্ভ করল? সাহিত্য যখন রচনা করা হয়, তা আধ্যাত্মিকই হোক কিংবা ধর্মের কথাই হোক, কিন্তু পরবর্তি কালে এইটাই দেখা যায় যে বর্তমানের মধ্যে যে ঘটনা ঘটবে তার মধ্যেও বহু আগেকার কিছু কিছু ঘটনা প্রতিফলিত হবে। কিন্তু কোথাও এই ধরণের উল্লেখ নেই যে আর্যরা ভারতের বাইরে থেকে এসেছিল। ইদানিং কালে Voice of India নামে একটি সংস্থা হয়েছে যার মধ্যে অনেক বিদেশীরাও আছেন, এরা অনেক তথ্যমূলক বই লিখছেন যার মধ্যে অনেক পুরানো ধ্যান ধারণার উপরে প্রশ্ন করা হয়েছে।

ইদানিং কালের মধ্যে শেষ যিনি বেদের উপরে বিরাট কাজ করেছেন তিনি হচ্ছেন বাল গঙ্গাধর তিলক, তিনি বেদের উপরে অনেকগুলি বই লেখেন, তাতে বেদের অনেকগুলি মন্ত্রকে নিয়ে তিনি যুক্তির সাহায্যে দেখিয়েছেন যারা বেদ রচনা করেছিলেন তারা প্রথমে উত্তরমেরুর কাছাকাছি কোথাও ছিলেন। পৃথিবীতে কখনও কখনও উষ্ণতার প্রবাহ চলতে থাকে আবার কখনও কখনও শীতলতার প্রকোপ চলতে থাকে। প্রাকৃতিক কারণে এই ধরণের পরিবর্তন পৃথিবীতে মাঝে মাঝেই হয়ে থাকে। একটা সময় এসেছিল যখন পৃথিবীতে তুষারপাতের মাত্রা প্রচণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছিল, যেটাকে বলা হয় তুষার যুগ। কোন এক সময়ে ভূতাত্ত্বিকরা খনন কার্য করে বড় বড় হাতির অস্তিত্ব দেখতে পেয়েছিলেন, যার নাম হচ্ছে ম্যামথ। এদের শরীরের আকার সাধারণতঃ যে ধরণের হাতি এখন পাওয়া যায় তার থেকে দ্বিগুণাকৃতির। এই রকম একটা দুটো নয়, প্রচুর সংখ্যায় এই ধরণের ম্যামথের অস্তিত্ব পাওয়া গেল। কোন বিকৃত না হয়ে পুরো শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় বিজ্ঞানীরা ম্যামথগুলি পেয়েছিলেন। এটাতো কখনই সম্ভব নয় যে একটা এত বড় প্রাণীকে অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়েছে। এর রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন হয়তো কোন এক সময়ে স্বাভাবিক পর্যাবৃত্ত অনুযায়ী পৃথিবীতে হঠাৎ তুষার যুগের শুরু হয়ে যায়, আর তার ফলে এমন বরফ পড়তে শুরু হল যে এই প্রাণীগুলি কোথাও পালিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারেনি এবং বরফে ঢাকা পড়ে যায়। বরফের মধ্যেই তাদের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সংরক্ষণ হয়ে গেছে।

বাল গঙ্গাধর তিলক দুটো বই রচনা করেছেন, একটার নামে হচ্ছে Orayan আরেকটি বিখ্যাত বই লেখেন তার নাম হচ্ছে The Arctic Home of the Vedas। সেখানে তিলক বেদের একটা যজ্ঞের কথা উল্লেখ করছেন। এই যজ্ঞটি হচ্ছে ঊষার নামে। এই যজ্ঞে ব্রাহ্মণরা সূর্যোদয়ের আগে জলে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছেন – হে ঊষা, তুমি উদিত হও, কেন তোমার উদয় হচ্ছে না, আমরা সবাই ভীত, তুমি উদিত হয়ে আমাদের এই ভয়কে নিবারণ কর। এই যজ্ঞের আনুষাঙ্গিক সব কিছু বিচার করে বাল গঙ্গাধর তিলক বলছেন – এই যজ্ঞ ঊষাকালেই করতে হবে। যেমন কালীপূজা রাত্রের মধ্যেই শেষ করতে হবে। তিনি হিসেব করে দেখিয়েছেন যে ঊষা যজ্ঞ পুরো শেষ করতে আট ঘন্টা লাগে। কিন্তু ভারতের কোথাও আট ঘন্টা ঊষাকাল থাকে না। আট ঘন্টা ঊষাকাল একমাত্র উত্তরমেরুর কাছাকাছি কোথাও হতে পারে। কারণ ওখানে ছয় মাস দিন আর ছয় মাস রাত হয়। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের মাঝখানের সময়টা কমতে কমতে এক সময় আসবে যখন উত্তরমেরুতে অথবা উত্তরমেরু থেকে একটু নীচের দিকে নেমে এলে, অনেকক্ষণ ধরে ঊষাকাল পাওয়া যাবে। ভারতে ঋষিরদের পক্ষে যেটা সম্ভব নয় সেটাকে তাঁরা যজ্ঞরূপে কি করে করবেন, তারপরে আবার যজ্ঞের মন্ত্রগুলিকে বংশ পরম্পরায় মুখস্ত করে রাখবেনই বা

কেন। অথচ এনারা ঊষাযজ্ঞের কথা বলছেন আর তার অনুষ্ঠানও হত। তাহলে এনারা নিশ্চয়ই এমন জায়গাতে গিয়ে যজ্ঞ করতেন যেখানে ঊষাকাল আট ঘন্টা পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হবে। তাই এটা নিশ্চিত হওয়া যায় যে ঊষাযজ্ঞ নিশ্চয়ই উত্তরমেরুর কাছাকাছি কোন অঞ্চলে সম্পন্ন হত। তিলক এই ধরণের অনেক যুক্তির অবতারণা করেছে। তারপর ওরায়ণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলছেন যে ওরায়ণ হচ্ছে তারাসমূহ। বেদে যে সব তারমণ্ডলীর কথা বলা হয়েছে, এই তারাসমূহকে ভারতের কোন অঞ্চল থেকেই অবলোকন করা যায় না। এই তারাসমূহকে বেদের বর্ণনা অনুযায়ী দেখা যাবে একমাত্র যখন কেউ উত্তরমেরুর কোন অঞ্চল থেকে দেখবেন। এই ধরণের অনেক তথ্য তিনি তাঁর বেদের আলোচনার মধ্যে উল্লেখ করে আর্যদের ভারতের বাইরে থেকে অনুপ্রবেশের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

কিছু দিন আগে Bound Together নামে একটা বই বেরিয়েছে সেখানে লেখক বলছেন – বিশ্বে এখন জেনেটিক মানচিত্র তৈরী হয়ে গেছে। পৃথিবীর সব অঞ্চলের লোকেদের মধ্য থেকে এলোপাতাড়ি কিছু লোকের জিনের নমুনা সংগ্রহ করে এই জেনেটিক মানচিত্র তৈরী করছেন। এই মানচিত্র করে দেখা গেল যে মা যখন তার বাচ্চার জন্ম দেয় তখন বাচ্চার শরীরে অনেক জিনের পরিবর্তন হয় কিন্তু একটা বিশেষ জিন আছে যেটা কোন বাচ্চার ক্ষেত্রেই পরিবর্তন হয় না। বিশ্বের যত মহিলা আছে সব মহিলার মধ্যে একটা বিশেষ জিন আছে যেটা সব মহিলার মধ্যেই থাকবে। এই জিনটা, বলছে, মায়ের থেকে তার কন্যা ও পুত্র উভয় সন্তানে যায়। জেনেটিক মানচিত্রের সাহায্যে এই জিনটার উৎস খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে আফ্রিকার এক মহিলার মধ্যে এই জিনটাকে পাওয়া গেছে। বাইবেলের আদম ও ঈভের যে তত্ত্ব, এই আবিষ্কারের ফলে হয়ত সত্য প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে। তার মানে বলতে চাইছে বিশ্বে যত মহিলা আছে ঐ একটি মহিলা থেকে এসেছে। এই থিয়োরিকে এখন জেনেটিক বিজ্ঞানীরা সবাই স্বীকার করে নিয়েছে, এটা এখন আর থিয়োরি নয় এটাই ঘটনা। এই জিনটিকে কোন ভাবেই পরিবর্তন করা যায় না।

জিন মানচিত্রের সাহায্যে জিনের এখন এমন বিশ্লেষণ করা হচ্ছে যে একজন মানুষের পূর্বপুরুষদের পুরো ইতিহাসকে সাজিয়ে দেওয়া যাবে, কে কোথায় ছিল সব বলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এই বইটির লেখক নয়ন চন্দা নিজের জিনের নমুনা নাম ঠিকাণা গোপন করে এদের কাছে পাঠিয়েছিলেন পরীক্ষা করার জন্য। জিনের নমুনার রিপোর্ট যখন লেখা হচ্ছে তার প্রথমেই বলছে যে – যেখান থেকেই এই নমুনা আসুক না কেন, এই ব্যাক্তি হচ্ছেন কোন ভারতীয় বংশোদ্ভব। কারণ হচ্ছে ভারতে যারা আগে থাকতেই এসে গেছে, ভারতে এলেই তাদের জিন একটু একটু করে পাল্টাতে থাকে। কিন্তু আগের যে জিনগুলি ছিল সেটাও থাকবে, আবার তার আগেও যে জিনগুলি পাল্টেছিল সেটাও থাকবে। পাল্টে গিয়ে নতুন যেটা হয়েছে সেটার সাথে আগের আগের সব কয়টা জিনই থেকে যাবে। এই আগের আগের জিনগুলির রিডিং নিতে নিতে যত পেছনের দিকে যাবে ততই তার পুরো ইতিহাস বেরিয়ে আসবে। আমাদের শরীরের যে কোন একটা কোষের মধ্যে জেনেটিক ইতিহাস পুরোটাই পাওয়া যাবে। একটা গোটা জাতির ইতিহাসও এইভাবে বলে দেওয়া যাবে।

কলোম্বাস যখন আমেরিকাতে গিয়ে নামল তখন আমেরিকার নিগ্রো আদিবাসীদের দেখে তার মনে হল যেন একটা নতুন কোন জগতে এসে সে পৌঁছেছে। সেই থেকেই আমেরিকার নাম হয়ে গেল New World, কিন্তু কলম্বাসের উত্তরসূরীদের ছ'শ বছর লাগল জানতে যে এই নিগ্রো আফ্রিকানরাই হচ্ছে তাদের পূর্বজ। আফ্রিকানদেরই আজ জেনেটিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বলা হচ্ছে আমাদের সবার পূর্বজ। এটা হচ্ছে এখনকার প্রাণীবিজ্ঞানীদের মত। বিজ্ঞানীদের পক্ষে মুশকিল হচ্ছে আজকে যে তত্ত্বটাকে প্রামাণিক সত্য বলছে দু-দিন পরেই বলবে যে আগে হিসেবে একটু গোলমাল হয়ে গেছে, ঐ তত্ত্বটাকে এখন বাতিল করা হল। কিছু দিন আবহাওয়া বিজ্ঞানীর বলল যে আমাদের গঙ্গোত্রীর বরফ যে ভাবে গলতে শুরু করেছে তার ফলে আগামী পঞ্চাশ বছরে সব বরফ গলে যাবে। তার কয়েক বছর বাদে সেই বিজ্ঞানীরাই বলল যে আমাদের হিসাবে একটু গণ্ডগোল হয়ে গেছে, গঙ্গোত্রির বরফ এখন তিনশ বছরের মধ্যে কিছুই পরিবর্তন

হবে না। এতক্ষণ আমরা এই কথাগুলো আলোচনা করলাম এইজন্যই যে যদি আমরা এই Bound Together বইয়ের থিয়োরী অনুযায়ী বিচার করি তাহলে আর্যরা যে ভারতের বাইরে থেকেই এসেছিলেন এইটাকে মানতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

আমাদের যদি কোন কিছুর ব্যাখ্যার দরকার হয় তখন আমরা সেটাকে বিজ্ঞানীদের কাছে নিয়ে যাই। শিশুর মা বাবাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকে – এই গরুটা সাদা কেন, ঐ গরুটা কালো কেন, পাখি কেন ওড়ে, গরু কেন উড়তে পারে না, গরু কেন ঘাস খায় – প্রশ্নের শেষ নেই। ছোট্ট শিশুর কাছে বাবা মাই সব। বিজ্ঞানীরাও আজকে আমাদের কাছে বাবা-মা। ভারতে আগেকার দিনে এখনকার বিজ্ঞানীদের এই গুরু দায়ীত্বটা ছিল আধ্যাত্মিক পুরুষদের কাছে। মুনি-ঋষিদের সমস্যাটা ছিল অন্য ধরণের, তাঁরা ধ্যানের গভীরে একটা তত্ত্বকে উপলব্ধি করে নিলেন, কিন্তু তত্ত্বের আগে কিছু তথ্যও থেকে যায়, ওনারা এইটাকে জানতেনও না, জানবার প্রয়োজনও অনুভব করতেন না, আর জানার চেষ্টাও করতেন না, আর তাঁদের পক্ষে জানা সম্ভবও ছিল না। মনে করা যাক – একজন ঋষি হিমালয়ের কোন শৃঙ্গের উপরে বসে রয়েছেন, সেখান থেকে তিনি ইচ্ছা করলেই একটা পা শুধু বাড়িয়ে দেবেন আর সাথে সাথে আরেকটা শৃঙ্গে চলে যাবেন। তিনি যখন একটা শৃঙ্গ থেকে আরেকটা শৃঙ্গে এইভাবে ঘুরে বেড়ান তখন শৃঙ্গের নীচে পাহাড়ের উপত্যকায় কি আছে সেটা জানা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যারা পায়ে হেঁটে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে শৃঙ্গে যান তারা সব কিছু বলতে পারবেন কোথায় গ্রাম আছে, সেই গ্রামে কি ধরণের মানুষ থাকে, কোথায় কি ধরণের বৃক্ষাদি আছে, কোথায় বড় পাথর, কোথায় ছোট পাথর, কোথায় বালি ইত্যাদি। কিন্তু এই জিনিষগুলি ঋষিদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, কেননা তাঁরা ওপর ওপর দিয়ে এক শৃঙ্গের থেকে আরেক শৃঙ্গে যাতায়ত করেন। বিজ্ঞানী হচ্ছে পর্বত অভিযাত্রীদের মত।

এখন সাধারণ মানুষ তখনকার দিনে সব ধরণের অনুসন্ধিৎসা নিয়ে ঋষিদের কাছে হাজির হত সব কিছুর ব্যাখ্যা জানতে। ঋষিরা দেখলেন এদের যদি আমার মত করে ব্যাখ্যা করি তাহলে তারা বুঝতে পারবে না, তখন তাঁরা এদের মনের মত করে সহজ করে, কিছুটা যুক্তিকে আশ্রয় করে, মোটামুটি যুক্তিভিত্তিক একটা আখ্যায়িকার মাধ্যমে ধর্মের তত্ত্বগুলি বুঝিয়ে দিতেন। ঋষির যে শিষ্যরা তাঁর কাছে থাকত তারা ঐটাকেই মেনে নিত, আর অন্যান্যদের এটাকেই মেনে নেবার জন্য প্রচেষ্ট হতেন। তাদের অনুসন্ধিৎসু মনকে শান্ত করার জন্য এ ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না। এইভাবেই ভারতে পুরানাদি ধর্মীয় শাস্ত্রের জন্ম নিল।

আমাদের প্রত্যেকেরই জানতে ইচ্ছে করে প্রথমে কি ছিল। আমরা এই বর্তমান অবস্থায় কিভাবে এসেছি? সৃষ্টির রহস্য জানার আগ্রহ বরাবর মানুষের মধ্যে যেমন রয়েছে আর এই সৃষ্টির রহস্যকে বোঝাবার দায়ীত্ব যাদের ছিলে তাদেরও অনেক সমস্যা ছিল সাধারণ মানুষকে তার মত করে বোঝাবার ক্ষেত্রে। এটাকে বোঝাবার দায়ীত্ব যার কাছেই থাকুক না কেন, সে বিজ্ঞানীই হোন, আর ঐতিহাসিকই হোন আর আধ্যাত্মিক পুরুষই হোন সবার ক্ষেত্রেই এই সমস্যা ছিল। ভারতের যে আধ্যাত্মিক শাস্ত্রগুলি রয়েছে তার মধ্যে সৃষ্টির ব্যাখ্যা বিভিন্ন ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞানী তার মত করে একটা তত্ত্বকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, অন্যরাও একটা থিয়োরী দিয়েছেন। কিন্তু সৃষ্টি রহস্যের প্রকৃত সত্যটা কি? নাসদীয় সুক্তের শেষ ভাগে বলছেন – যিনি ভগবান তিনিই হয়তো জানেন কোথা থেকে এই সৃষ্টি এসেছে, অথবা হয়তো তিনিও জানেন না। কিন্তু গ্রামের সাধারণ লোককে যদি কোন ঋষি নাসদীয় সুক্তের ভাষায় এই কথা বলেন ভগবানই জানেন না তা আমি কি করে জানব, তাহলে ঋষিকে কে মানতে যাবে। যারা বালবুদ্ধি সম্পন্ন তাদের কাছে ঋষিরা হচ্ছেন সর্বজ্ঞ, তাঁরা যদি বলে দেন এই ব্যাপারটা আমি জানিনা, তাহলে তারা অবাক হয়ে যাবে যে এই পৃথিবী এমন জিনিষও আছে যেটা ঋষিরা জানেন না। বালবুদ্ধি যারা তারা এটা কখনই মানবে না যে ঋষিরা এইটা ছাড়া বাকি জিনিষগুলি জানেন, এই ভাব থাকলে তাদের মন থেকে ঋষিদের প্রতি শ্রদ্ধাটা হারিয়ে যেতে পারে। সেইজন্য ঋষি প্রতিম বিজ্ঞ লোকেরা এদের মনকে শান্ত করার

জন্য একটা কিছু তথ্য বলে দেন, অন্য দিকে এনারা মিথ্যে কথাও বলতে চাইতেন না। তাই একটা যুক্তি ভিত্তিক আখ্যায়িকার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতেন।

বেদে আর্যদের কে নিয়ে যে বিতর্ক চলে আসছে এটাও বেদের কোন কোন ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। বেদের রচনাকালটা আর্যদের ভারতে অনুপ্রবেশের কালের তত্ত্বের উপরে খুব বেশি নির্ভর করে। বেদে যে ধরণের সাহিত্যের প্রভাব দেখা যায় আর বেদে তখনকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্চার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তার সাথে যাদের আমরা অনার্য বলে আখ্যা দিই, তাদের জীবনচর্চার সাথে কোন ধরণের মিল পাওয়া যায় না, বেদের জীবনচর্চা অনার্যদের নয়।

আবার ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষার মিল প্রচুর পাওয়া যায়। ভাষার অনেক গ্রুপ আছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষা। সংস্কৃত, জুরাথ্রীষ্ট যারা পার্সি আর, লাতিন, যেখান থেকে ইংরাজী ভাষার উৎপত্তি হয়েছে, এই ভাষাগুলির মধ্যে প্রচুর মিল আছে। বাংলায় যেমন বাবাকে পিতাও বলা হয়, সংস্কৃতে পিতা হয়ে যায় পিতৃ, আর লাতিনে হয়ে যায় প্যাটার (pater) এর রুট এক। ঠিক তেমনি মাকে সংস্কৃতে বলছে মাতৃ, লাতিন হয়ে যায় মাতের (metr), রাজাকে সংস্কৃতে বলছে রাজ্ঞঃ আর ওদের হচ্ছে regal । এদের ধাতু একই ধাতু। এই ধরণের হাজার হাজার শব্দ আছে, যা সংস্কৃতে আর ইন্দো-ইউরোপিয়ানের ভাষাতে সাযুজ্য পাওয়া যায়। ভাষার এই ধরণের সাযুজ্যতা থেকে গবেষকরা স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এদের পূর্বপুরুষরা একই হতে হবে। একটা ভাষা রয়েছে সুদূর ইউরোপে আরেকটা ভাষা ব্যবহার হচ্ছে ভারতে, কিন্তু এদের পূর্বপুরুষের হচ্ছে এক, তখন কোথাও কোথাও এদের একটা মিল থাকতেই হবে। বেদের প্রাচীনত্বকে বিচার করার ক্ষেত্রে এই ধরণের অনেক ধরণের তথ্য, ঘটনাকে মেলাবার দরকার। বেদের রচনাকাল বেদের পক্ষেই অত্যন্ত জরুরি কেননা আমরা যদি বলে দিই বেদ কালকের রচনা তখন কিন্তু বেদের অর্থ একেবারেই পাল্টে যাবে।

এইভাবে বেদের রচনাকালের তারিখ নির্ণয় করার পরেও অনেক ফাঁক ফোঁকর থাকার সম্ভবনা সব সময়ই থেকে যাবে। তবে আমরা স্বামীজীর কথাকে বেশি গুরুত্ব দিই, স্বামীজী বলে গেছেন বেদ কম করে সাত আট হাজার বছর আগে রচিত হয়েছে, আর ইউরোপের পণ্ডিতরা, বিশেষ করে ম্যাক্সমূলারের মতে বেদ যিশুর জন্মের পনের'শ বছর আগে, মানে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে রচিত হয়েছিল। এই দুটোর মাঝামাঝি কোন সময়ে বেদের রচনাকালকে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যারা পরম্পরা উচ্চবর্ণের হিন্দু তারা বলবে – যখন সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকেই বেদ ভগবানের থেকে এসেছে, তার মানে বেদ রচনা হয়েছিল অনেক হাজার হাজার বছর আগে। আর যারা গোঁড়া হিন্দু তারা বেদের রচনাকালকে কয়েক লক্ষ বছর পেছনে নিয়ে যাবে। তাদের আবার নিজস্ব গ্রহ নক্ষত্রের হিসেব আছে, বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যালোচনা করে তারা বলবে বেদের রচনা কয়েক লক্ষ বছর আগে হয়েছিল। বিভিন্ন পণ্ডিত একটা পদ্ধতিকে আঁকড়ে থাকে অন্য কোন কিছুকে বিচারের মধ্যে আনতে চাইবে না। আমাদের এগুলো নিয়ে কাঁটাছেড়া করা উদ্দেশ্য নয়, আমাদের কাছে যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বেদ হচ্ছে ভারতে যা কিছু আছে তার সব কিছুর উৎস।

আরেকটা জিনিষ পণ্ডিতরা বলেন তা হল, আমাদের যে বর্ণমালা গুলো প্রথম লেখা হয়েছিল ছ'শ বছর খ্রীষ্টপূর্বে। ভারতে অনেকগুলি বর্ণমালা পাওয়া যায় কিন্তু তার সবার জননী হচ্ছে ব্রাহ্মী হরফ। এই কারণে ভারতের কিছু কিছু ভাষার বর্ণমালাতে যেমন বাংলা, আসামী, মণিপুরী বর্ণমালাতে অনেক মিল পাওয়া যায়। বেশির ভাগ বর্ণমালা যখন লেখা হয় তখন সেটা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে লেখা হয়। আবার কিছু কিছু বর্ণমালা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে লেখা হয়, যেমন উর্দু। ভারতেও আগে ডান দিক থেকে লেখা হত। কিন্তু পরের দিকে এই পদ্ধতিতে লেখাতে কিছু অসুবিধা হওয়ার জন্য ভারতে এর প্রচলন উঠে যায়। অন্য ভাবেও বর্ণমালাগুলিকে লেখার ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়, যেমন ওপর থেকে নীচের দিকে

লেখা, নামতাগুলি এইভাবে এখনও লেখা হয়ে থাকে। উর্দুকে ধরলে ভারতে এখন এই তিন ভাবেই লেখার পদ্ধতি চালু আছে।

বেদের ভাষার উচ্চারণের স্টাইলের সঙ্গে স্থানীয় ভাষার উচ্চারণের স্টাইল আলাদা। বেদের শব্দগুলিকে তিন ভাবে উচ্চারণ হয় – উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত, এই তিন রকমের সুরে বেদের মন্ত্রগুলি উচ্চারণ হত, উদাত্ত হচ্ছে উঁচুতে সুর, অনুদাত্তে সুর নীচে আর স্বরিতের বেলায় সমান থাকে । লেখার মাধ্যমে এই তিন ধরণের উচ্চারণগুলিকে চিহ্নিত করার কোন উপায় নেই। অনেক পরে বিশেষজ্ঞরা বললেন – ব্রাহ্মী হরফের কোন পরিবর্তন করার দরকার নেই, এই তিনটি স্বরকে বোঝাবার জন্য অক্ষরের মাথার উপরে একটা (।) চিহ্ন দিয়ে উদাত্ত আর অক্ষরের নীচে (-) চিহ্ন দিয়ে অনুদাত্তের উচ্চারণকে ব্যবহার করলেন।

এছাড়া দ্বিতীয় যে সমস্যাটা হয়েছিল, বেদের মন্ত্রগুলি এতো পবিত্র ভাবা হত যে এগুলিকে কোথাও লিখে রাখা হত না, যেমন দীক্ষার পরে বলে দেওয়া হয় গুরুর দেওয়া মন্ত্র কাউকে বলবে না, কোথাও লিখবে না। বেদের ক্ষেত্রে এই প্রথাটা অনেক দিন বজায় ছিল। পরে ম্যাক্সমূলার যখন প্রথম বেদের পুঁথি সংগ্রহ করতে শুরু করলেন তখন তিনি বলে দিলেন যে যারা বেদের পুঁথি গুলো লিখে দেবেন তার প্রত্যেকটির জন্য পাউণ্ড হিসাবে মূল্য ধরে দেওয়া হবে। তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এজেন্টরা সারা ভারতে লোক নিয়োগ করল তন্ন তন্ন করে বেদের পুঁথি সংগ্রহ করতে। যেসব পুঁথি সংগ্রহিত হচ্ছে সেগুলিকে আবার পণ্ডিতদের দিয়ে তার আসলত্বকে যাচাই করে নেওয়া হত। এইভাবে পণ্ডিতদের দিয়ে মিলিয়ে মিলিয়ে বেদের পুঁথিগুলি প্রথম ছাপা হতে লাগল। প্রথমের দিকে ভারতের পণ্ডিতরা খুব নিন্দা করতে লাগল যে বেদ ম্লেচ্ছদের হাতে চলে গেল, বেদকে ছাপাতে দিতেও পণ্ডিতরা খুব আপত্তি করেছিল। কিন্তু ছাপা হয়ে যখন বেদ বেরিয়ে এল, তখন পণ্ডিতরা যার যার নিজের নিজের পুঁথিগুলিকে ছাপার সঙ্গে মেলাতে লাগলেন যে নিজেরটা ঠিক আছে কিনা। এর মধ্যে একটা হয়েছিল যে বেশ কিছু পুঁথি পাওয়া যাচ্ছিল না, কিন্তু মন্ত্রগুলি ব্রাহ্মণদের মাথায় ছিল, পণ্ডিতরা মুখে বলে গিয়েছে আর এদের লোকেরা ঝরঝর করে লিখে নিয়ে পণ্ডিতদের দিয়ে আবার মিলিয়ে নিয়েছিল। এইভাবে বেদ ছাপা হয়ে গেল।

মজার ব্যাপার হল, চারটে বেদের সংহিতা গুলিকে যখন সংগ্রহ করা হল, সে আসাম থেকেই হোক, কি সুদূর কন্যাকুমারি বা কাশ্মীর থেকেই হোক, এই সব ব্রাহ্মণরা বিভিন্ন কারণে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছিটকে সরে গিয়েছিলেন, তাও কত হাজার বছর আগে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কারুর বেদের শব্দগুলির উচ্চারণে কোথাও এতটুকু পার্থক্য পাওয়া যায়নি। একটা সামান্য ঘটনা আমি যদি একজনকে বলি, তার কাছ থেকে সেই ঘটনার বিবরণ আরেকজনের কাছে যখন যাবে তখন ঘটনাটা পাল্টে যায়। আর সাত আট হাজার বছর ধরে শুধু সংহিতারই প্রায় নব্বুই হাজার লাইন শুধু মাথার মধ্যে মুখস্ত রেখে ভারতের চার কোণের ব্রাহ্মণদের উচ্চারণের কোথাও এক চুল অমিল পাওয়া গেল না। এতো শুধু সংহিতার কথা বলা হল, এরপরেও ব্রাহ্মণ, আরণ্যক আর উপনিষদ রয়েছে। একটা মাত্রে বর্ণে তফাৎ পেয়েছিল, তাও সেটা স্বরিত হবে না উদাত্ত হবে এই নিয়ে মত পার্থক্য হয়েছিল। বিদেশীরা অবাক হয়ে গিয়েছিল হাজার হাজার বছর ধরে নব্বুই হাজার লাইন মাথার মধ্যে গেঁথে রয়েছে কিভাবে, তাও এক প্রান্তের ব্রাহ্মণ অন্য প্রান্তের ব্রাহ্মণদের মধ্যে কোন রকমের পরিচয়ই নেই। আর এই বিদ্যাকে বংশের পরে বংশে হস্তান্তরিত হয়ে চলেছে। কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, নিষ্ঠা আর সাধনা ছাড়া এ জিনিষ কখনই সম্ভব নয়। ব্রাহ্মণরা কোন বাজে লোকেদের সঙ্গে মিশতেন না, হবিষ্যান্ন খেতেন, টাকা পয়সা রাখতেন না, কৃচ্ছ সাধন করে করে মন এতো পবিত্র হয়ে গিয়েছিল, যে জিনিষ আমরা এখন কল্পনাই করতে পারিনা। আজকে চারটে বেদকেই মুখস্ত করে রেখেছে এই রকম ব্রাহ্মণ পাওয়া খুব মুশকিল। এই কারণেও বেদকে অনেকে শ্রুতি বলেন, কখনই তাঁরা লিখতেন না, শুধু মুখস্ত করে মাথার মধ্যে বেদকে ধরে রেখেছিলেন। একাদশ শতাব্দিতে কাশ্মীর অঞ্চলে প্রথম বেদের পুঁথি পাওয়া গিয়েছিল। পুঁথি পাওয়া যাক আর নাইই পাওয়া যাক সব মাথায় ধরে

রাখা আছে, আর কারুর সাথে কোন তফাৎ নেই। পরের দিকে মহাভারতের ক্ষেত্রে কিছু তফাৎ পাওয়া যায়, উত্তর ভারতের মহাভারত আর দক্ষিণ ভারতের মহাভারতে প্রায় হাজার খানেক শ্লোকের তফাৎ পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতে যে মহাভারত পাওয়া যায় তাতে হাজার খানেক শ্লোক বেশি আছে। কিন্তু বেদের ক্ষেত্রে কোথাও এতটুকু অমিল পাওয়া যাবেনা, তাও আবার কোথাও লেখাও ছিল না। আবার পণ্ডিতরা একে অপরকে জানে না চেনে না। এই হচ্ছে আমাদের বেদ, কত শ্রদ্ধা, কত নিষ্টার সাথে বেদকে আমাদের পণ্ডিতরা সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন।

আজ বেদ সবার জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। ম্যাক্সমূলারের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। ম্যাক্সমূলার যদি বেদ না ছাপাতেন, ব্রাহ্মণ ছাড়া এই বেদ কেউ শুনবে কোন প্রশ্নই ছিল না। তবে রাজাদের কাছে বেদের কিছু পুঁথি সংগ্রহিত ছিল, সেগুলো অনেকে দেখতে পেতেন, আর কোন ভালো আধার পেলে গুরুরা বেদের কথা তাদের বলে দিতেন। চতুর্দশ শতক পর্যন্ত বেদ ব্রাহ্মণ ছাড়া বেদ পড়া কারুর পক্ষেই সম্ভব ছিল না। যদিও প্রথমের দিকে নিয়ম ছিল তিনটে বর্ণাশ্রমের লোকেরা বেদ পড়তে পারবে – ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আর বৈশ্য। কিন্তু পরের দিকে ব্রাহ্মণরা কাউকে বেদ বলতেনই না। ব্রাহ্মণরা ছিলেন খুব দরিদ্র, যজ্ঞ-যাগের সময় ব্রাহ্মণদে ডাকা হত, রাজারা বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের যে যজ্ঞ-যাগ করাতেন সেখানে যখন ব্রাহ্মণরা বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করতেন তখনই কেউ কেউ বেদকে শুনতে পেত। এছাড়া আর কোনভাবেই কেউ বেদ শুনতে পেতেন না।

ঋকবেদের দশটি ভাগ আছে, এগুলিকে বলা হয় মণ্ডল, অনেকগুলি সুক্ত নিয়ে একেকটি মণ্ডল হয়, আর কয়েকটা মন্ত্র নিয়ে সুক্ত হয়। বেদের যেটা প্রথম মন্ত্র আমরা পাই সেটা হচ্ছে – ***অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্***।। এইভাবে প্রথম সুক্তে নয়টি মন্ত্র আছে। ঈড়ের 'ঢ়' '∞' সংস্কৃতেই একমাত্র এই অদ্ভূত বর্ণের ব্যবহার হয়, এর উচ্চারণটাও লোকেরা এখন ভুলে গেছে, এটাকে 'রল' য়ের মত দেখালেও ল উচ্চারণ হবে না। সংস্কৃতে 'ঋ' উচ্চারণ প্রচণ্ড কঠিণ, ইংরেজীতে হৃষিকেশকে ঠিক ঠিক উচ্চারণ করলে 'হৃ'কে বানান করে লিখতে গেলে লেখা হয় hrui, কিন্তু যখন 'ঋ' একা থাকবে তখন উচ্চারণ করতে গেলে rui 'উ' দিয়ে শুরু হয়ে 'ই' তে গিয়ে শেষ হয়। ঠিক তেমনি 'জ্ঞ'র উচ্চারণও খুব কঠিণ আসলে 'জ্ঞ'এর মধ্যে 'জ' আর 'ণ' রয়েছে, সেইজন্য ইংরাজীতে লেখা হয় 'jn' এইভাবে। ঠিক সেই রকম এখানে 'ঈড়ে'র এটা 'র' আর 'ল' মিলিয়ে উচ্চারণ হবে, খুবই কঠিণ ব্যাপার সাধ্য। অনেক সংস্কৃত পণ্ডিত এটাকে 'ল' উচ্চারণ করবে আবার অনেক পণ্ডিত বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের পণ্ডিতরা 'ড' উচ্চারণ করেন। সংস্কৃতে এই ধরণের কিছু কিছু উচ্চারণ আছে যেগুলো আজকাল কেউ আর ঠিক ঠিক উচ্চারণ করতে পারেন না, এখন এই ধরণের অক্ষরও আর কোন ভাষাতেও পাওয়া যাবে না।

অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্।। এইটা টানা উচ্চারণ করাকে বলা হয় সংহিতা পাঠ। সংহিতা পাঠের পরে, মন্ত্রগুলিকে মুখস্ত করার জন্য প্রত্যেকটা শব্দকে ভেঙ্গে আলাদা আলাদা করে উচ্চারণ করে পাঠ করান হয়, কোন সন্ধি তখন থাকবে না, এটাকে বলে পদপাঠ। পদপাঠে এই মন্ত্রটাকে বলবে – অগ্নিম্ ঈড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবম্ ঋত্বিজম্ - সন্ধি যেখানে যেখানে থাকবে সেটাকে ভেঙ্গে আলাদা করে উচ্চারণ করা হয়। আমি যদি বলি – এখন আমি বেদ পাঠ করছি। তখন আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে – কি পাঠ করছ, সংহিতা পাঠ না পদপাঠ করছ? সংহিতা পাঠে আমাকে টানা মুখস্ত করে যেতে হয়, এতে প্রথমের দিকে উচ্চারণে ভুল হবে। সেইজন্য পরের ধাপে পদপাঠ করান হয়। পদপাঠের পরে হচ্ছে ঘনপাঠ। ঘনপাঠের খুব জটিল নিয়ম আছে, এখানেও সন্ধি ভেঙ্গে উচ্চারণ করা হয়। আমরা বর্তমান মন্ত্রটার প্রথম চারটে শব্দকে চারটে ভাগে বিভক্ত করে নিলাম – ক, খ, গ ও ঘ। এখন ঘনপাঠে বলবে ক+খ, খ+ক মানে প্রথমে বলবে অগ্নিম্(ক) ঈড়ে(খ), তারপরে বলবে ঈড়ে(খ) অগ্নিম্(ক)। তারপরে ক, খ ও গ, তারপরে করবে খ+গ, গ+খ, ক+খ+গ। পরের ধাপে আসবে খ+গ+ঘ, গ+ঘ, ঘ+গ, খ+গ+ঘ। শেষে আবার ক+খ+গ+ঘ। এখন এই মন্ত্রে প্রথম চারটে শব্দ হচ্ছে – অগ্নিম্(ক) ঈড়ে(খ)

পুরোহিতং(গ) যজ্ঞস্য(ঘ) – এখন এটার ঘনপাঠ কিভাবে হবে – অগ্নিম্ – অগ্নিম্ ঈড়ে – ঈড়ে অগ্নিম্ – অগ্নিম্ ঈড়ে – ঈড়ে পুরোহিতম্ – পুরোহিতম্ ঈড়ে – অগ্নিম ঈড়ে পুরোহিতম্ – পুরোহিতম্ যজ্ঞস্য – যজ্ঞস্য পুরোহিতম্ - ঈড়ে পুরোহিতম্ যজ্ঞস্য – অগ্নিম্ ঈড়ে পুরোহিতম্ যজ্ঞস্য – এইভাবে ঘনপাঠের মাধ্যমে বেদের সব মন্ত্রগুলি শিষ্যদের মুখস্ত করান হত।

তারপরে আরেক ধরণের পাঠ হয় যার নাম হচ্ছে অনুক্রমণী পাঠ। অনুক্রমণী পাঠ হচ্ছে সূচীপত্র পাঠের মত, ওপর থেকে প্রথম শব্দকে ধরে নীচের দিকে পাঠ করবে। যেমন ঋকবেদের প্রথম সুক্তে নটি মন্ত্র আছে এই নটি মন্ত্রের নটি লাইনের প্রথম শব্দগুলি ওপর থেকে নীচে পরপর পাঠ করবে – অগ্নিম্ অগ্নিঃ অগ্নিনা অগ্নে, অগ্নিহোতা যদ্ উপ রাজন্ত স। মন্ত্রগুলি যাতে ভুলে না যায় তার জন্য বিভিন ভাবে খুব বিজ্ঞান সম্মত ভাবে মুখস্ত করান হত। এইভাবে প্রত্যেকটি বেদের Indexing ব্রাহ্মণদের ঝাড়া মুখস্ত থাকত। সেইজন্য কোন মন্ত্রকে ভুলে যাবার কোন ধরণের সম্ভবনাই ছিল না। ৩২ বছর ধরে ব্রাহ্মণরা শুধু বেদ মুখস্ত করেই যেতেন। তার পরের ৩২ বছর বেদ মুখস্ত করাত, এইভাবেই তাঁদের মানবজীবনকে বেদের জন্য উৎসর্গ করে দিতেন। এইভাবে তাঁরা হাজার হাজার বছর ধরে বেদকে ধরে রেখেছেন, সেইজন্য এখনও আমরা বেদ অধ্যয়ন করার সুযোগ পাচ্ছি।

আমাকে যদি কেউ এক কোটি টাকা দিয়ে বলে – এই টাকাটা আমি আপনার নামে ব্যাঙ্কে রেখে দিলাম, কিন্তু আপনি এই টাকাতে কখন হাত দিতে পারবেন না। এখন এই টাকাতে আমার কি লাভ হবে? বাচ্চাকে দুটো টাকা দিয়ে মা মেলা দেখতে পাঠিয়ে বলে দিচ্ছে – টাকাটা কিন্তু খরচ করিস না। বাচ্চাটার এই দুটো টাকা থাকাও যা না থাকাও একই ব্যাপার। এখন এই বেদ আমরা কেউ শুনতে পারবো না, ছুঁতে পারব না, জানতে পারব না, তা এখন এই বেদ থাকলেই বা কি আর না থাকলেই বা তাতে আমাদের কি হবে। কারণ আমাদের কোন কাজেই তো বেদ লাগছে না। সেইজন্য আমাদের দিকে তাকিয়ে মুনি ঋষিরা এক নতুন ধরণের শাস্ত্র রচনা করলেন। এইভাবে রচিত হল রামায়ণ, মহাভারত, পুরানের মত যাবতীয় ধর্মীয় সাহিত্য। বেদের লেখাতে নিষেধ ছিল, কিন্তু এগুলোর ক্ষেত্রে লেখার কোন বাধা ছিল না। তার ফলে বেদের ব্যাপারে অনেক সমস্যা দূর হয়ে গেল। বেদকে প্রথম থেকেই, সে যে কোন কারণেই হোক, গুরুর আজ্ঞাতেই হোক বা গভীর উচ্চ আধ্যাত্মিক দর্শনের জন্যই হোক, অত্যন্ত পবিত্র গ্রন্থ বলে দেখা হত। এখন রামায়ণ, মহাভারত, পুরানের রচনার পর বেদের পবিত্রতা নিয়ে যে কেউ প্রশ্ন করবে সেটাও করতে পারল না, তার কারণ মুনি ঋষিরা বলে দিলেন পুরানে যা আছে বেদেও তাই আছে, রামায়ণ মহাভারতে যা আছে বেদেও তাই আছে। এখন সাধারণ মানুষের মনে বেদের ব্যাপার আর কোন কৌতুহল রইল না।

মানুষ প্রথমের দিকে ভাবে যে জীবনে আমি একটু বড় হব। কিন্তু কিছু দিন সংগ্রাম করার পর ভাবে – না বাবা, যেমন আছি বেশ আছি। মানুষ সব সময় মনে করে সে নিজে খুব সুখে স্বাছন্দে আছে আর অপরের যে সমস্যা সেটা তার কাছে ভীতিকর। বেদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হল। বত্রিশ বছর খেটেখুটে বেদ মুখস্ত করতে হবে, আর তার থেকে সহজেই যদি সেটা পুরান, মহাভারতে পেয়ে যাই তাহলে অত কষ্ট করে বেদ মুখস্ত করতে যাব কেন। এর ফলে ব্রাহ্মণদের কেউ জোর করে বলতেই গেল না যে বেদে কি আছে তোমাকে বলতেই হবে। বেদেকে এই ধরণের আক্রমণের সামনে পড়তেই হলো না। এটা অবশ্য ঠিকই যে বেদে কি আছে সেটা পরে উপনিষদে, মহাভারতে আমরা পেয়ে গেছি।

বেদের দৃশ্যপটে ব্যাসদেবে কবে এসেছেন এই নিয়েও অনেক বিতর্ক আছে, কেউ বলে এক হাজার খ্রীষ্টপূর্ব আবার কেউ বলে দেড় হাজার খ্রীষ্টপূর্বে এসেছিলেন। কিন্তু এর বেশী আগে তাঁর আসার কথা নয়। ব্যাসদেবের কাছে যখন বেদ এসেছে তখন বেদ বিশালাকার হয়ে গেছে। তিনি দেখলেন মানুষের এইতো ক্ষুদ্র জীবনে, এই ক্ষুদ্র জীবনে এই বিশাল বেদ কখন মুখস্ত করবে। আর মুখস্ত করে বেদকে জীবনে প্রয়োগ করবে কীভাবে? বলা হয় চারটে বেদই আগে একটার মধ্যে ধরে রাখা হয়েছিল। এখন যদি বলা

হয় যারাই সারাটা জীবন স্বামীজীর কাজে উৎসর্গ করবে তাদের সবাইকে স্বামীজীর দশ খণ্ড রচনাবলী মুখস্ত করতে হবে। একজনের পক্ষে এটা কখনই সম্ভব হবে না। তাই প্রত্যেকের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে বলে দেওয়া হল তুমি প্রথম খণ্ড, আমি দ্বিতীয় খণ্ড, আরেকজন তৃতীয় খণ্ড মুখস্ত করবে, এইভাবে দশটি খণ্ডই সবার মধ্যে ভাগ করে যার যার খণ্ড মুখস্ত করতে বললে আর কোন সমস্যা হবে না। ব্যাসদেবও এইটাই করলেন তিন এই একটা বেদকে বিভাজন করে দিলেন। এইভাবে বিভাজন করে তিনি তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে মুখস্ত করাতে লাগলেন। ঋকবেদ দিয়ে দিলেন তাঁরই এক শিষ্য পৈলাকে, যজুর্বেদ দিলেন বৈশম্পায়নকে। পুরান, মহাভারতেও আমরা বৈশাম্পয়নের নাম অনেকবার উল্লেখ দেখতে পাই। সামবেদকে দিলেন জৈমিনীকে, জৈমিনীও বিরাট বড় ঋষি ছিলেন, তিনি পূর্বমীমাংসার সূত্রগুলি রচনা করেছিলেন। আর অথর্ববেদ সুমন্তকে দিলেন।

পরের দিকে বৈশাম্পয়নের শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যের সাথে যে গুরুর যে বিবাদ হয়েছিল তার কাহিনী এর আগে আমরা আলোচনা করেছি। এখানে যজুর্বেদ কৃষ্ণযজুর্বেদ ও শুক্লযজুর্বেদ নামে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। বমি থেকে এই বিদ্যে এসেছিল বলে কৃষ্ণযজুর্বেদ নাম হয় আর যাজ্ঞবল্ক্য পরে সাক্ষাৎ সূর্য থেকে এই বিদ্যা পেয়েছিলেন বলে এর নাম হয়ে গেল শুক্লযজুর্বেদ। যাজ্ঞবল্ক্যের এই কাহিনীটা ভারতের আধ্যাত্মিক জগতে খুব গুরুত্বপূর্ণ। লোকেরা এটাকে খুব বেশি গুরুত্ব দেননা কারণ শুক্লযজুর্বেদে আর কৃষ্ণযজুর্বেদের বিষয়বস্তুর মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। কিন্তু এর সুক্ত আর মন্ত্রগুলি দুটোতে যেভাবে সাজানো হয়েছে তার মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্য দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় যে এই দুটো পুরো আলাদা পরম্পরা থেকে এসেছে। যাজ্ঞবল্ক্য এত বড় ঋষি ছিলেন, বৃহদারণ্যক উপনিষদ পুরোটাই যাঁর উপর দাঁড়িয়ে আছে, এটা কখনই বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না যে তিনি যজুর্বেদের কয়েকটা অধ্যায়কে একটু এদিক ওদিক করে দিয়ে সবটাই নিজের নামে চালিয়ে দেবেন। তিনি এই বিদ্যাকে ত্যাগ করেছিলেন কিন্তু পরে সূর্যের তপস্যা করে সূর্যের কাছ থেকে সরাসরি এই বিদ্যাটা আবার অর্জন করেছিলেন। ঠাকুর যেমন মা ভবতারিণীর কাছ থেকে আদেশ পেয়েছিলেন ‘তুই ভাবমুখে থাক’। ‘ভাবমুখে’ বলে কোন শব্দ কোন দর্শনেই পাওয়া যাবে না। এখানে মাকালী এসে সাক্ষাৎ শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলেন, মাকালী ঠাকুরকে অনেক কথাই বলেছিলেন, কিন্তু সব কথা লিপিবদ্ধ হয়নি, ঠাকুরও সবাইকে বলে যাননি, কিন্তু ভাবমুখে থাকার যে আদেশ মাকালীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন তা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। সূর্যের কাছ থেকে সরাসরি যেমন যাজ্ঞবল্ক্য পেয়েছিলেন, ঠিক একই ভাবে ঠাকুর মার কাছ থেকে এই ভাবমুখে থাকার ব্যাপারটা পেয়েছিলেন। এই রকমই আরেকটা ঘটনা আমরা স্বামীজীর জীবনেও দেখতে পাচ্ছি। স্বামীজী যখন আমেরিকাতে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। সেই সময়কার একটা ঘটনা স্বামীজী অনেক জায়গাতেই উল্লেখ করে গেছেন। তিনি রাত্রিবেলা শুয়ে শুয়ে ভাবতেন আগামীকাল আমি বক্তৃতায় কি বলব। ভাবতে ভাবতে যখন তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন তখন তিনি ঘুমের মধ্যে দেখতেন কে যেন এসে তাঁকে ঘুমের মধ্যেই আগামীকাল কি বলবেন সেটা অনর্গল ভাবে বলে চলে গেলেন। স্বামীজী যাদের বাড়ীতে থাকতেন তারা সকালবেলা এসে স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করত ‘স্বামীজী আপনি রাত্রিবেলা কার সাথে কথা বলছিলেন, কিন্তু আপনার ঘরের দরজা বন্ধ, লাইট নেভানো’? একজন দৈবী সত্তা এসে যে স্বামীজীর ভাষণ আগে থাকতে বলে দিচ্ছে এটা সত্যিই হয়। আমরা এখন বেদ অধ্যয়ন করছি, বেদের মধ্যে এই রকম অনেক কিছু পাই যেটা ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর জীবনেও পুনারবৃত্তি হয়েছিল, এগুলো জানা থাকলে আমাদের বেদ বুঝতে অনেক সহজ হয়ে যায়। যাজ্ঞবল্ক্যও যদি সূর্য থেকে এই বিদ্যাটা পেয়ে থাকেন এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

উপনিষদেও আমরা এই জিনিষের সাক্ষ্য পাই। সত্যকাম ঋষিরও এই ভাবে জ্ঞান হয়েছিল। সত্যকামের গুরু তাঁকে কিছু রুগ্ন গরু দিয়ে জঙ্গলে পাঠিয়ে দিয়ে বলে দিলেন যে ‘এই গরুগুলিকে তুমি লালন পালন করবে, হাজারটা গরু যখন হয়ে যাবে তখন তুমি আমার কাছে এসো’, এইভাবেই গুরুরা শিষ্যদের কাজ করিয়ে মনকে শুদ্ধ করতেন। সত্যকামও গুরুর আদেশে জঙ্গলে দশ বারো বছর পরে থেকে

গরুর দেখাশোনা করছে। হঠাৎ একদিন গরুর যে প্রধাণ ষাঁড় বৃষভ সে সত্যকামকে উদ্দেশ্য করে বলছে ‘সত্যকাম আমরা সংখ্যায় হাজারটা গরু হয়ে গেছি, এবার গুরুগৃহে চলো’ এই কথা বলে সত্যকামকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপরে একটা উপদেশ দিচ্ছে। একটা উপদেশ দিয়ে বলছে ‘এর পর বাকীটা রাত্রে অগ্নি তোমাকে বলবে’। রাত্রে অগ্নি একটা উপদেশ দিয়ে বলছে ‘এর পর বাকীটা তোমাকে সকালে অমুক পাখি উপদেশ দেবে’। সকালে একটা পাখি তাকে বাকি উপদেশটা দিল। পরে হাজারটা গরু নিয়ে সত্যকাম গুরু গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছে। গুর সত্যকামকে দেখেই বুঝে গেছেন যে সত্যকাম ব্রহ্মজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত, তিনি জিজ্ঞেস করছেন ‘সত্যকাম, তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ কে দিল, তোমার চেহারা ব্রহ্মজ্ঞানের জ্যোতিতে আলোকিত’? সত্যকাম বলছে ‘আমাকে তো কেউ উপদেশ দেননি, আর আপনাকে ছাড়া আমি আর কাউকে জানিও না’। তার ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেছে, তার চেহারা জ্বলজ্বল করছে, কিন্তু সে জানে না যে এটাই ব্রহ্মজ্ঞান, সেটাও সে বুঝতে পারছে না। বৃষভ, অগ্নি আর পাখি যে উপদেশ দিয়েছিল সত্যকামকে তার সবটাই উপনিষদে লেখা আছে, আমরা সেই উপদেশ কতবার পড়েছি কিন্তু আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান হচ্ছেন না কেন? কিন্তু সত্যকামের কেন হল? কারণ বারো বছর ধরে সত্যকাম যে গুরুসেবা করল, এই গুরুসেবা করে করে তার মন পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, আর যেই ঐ বীজটা পড়ল দপ্ করে ব্রহ্মজ্ঞানের আলোটা জ্বলে গেল। যারা কাজ করেনা, খাটতে চায়না তাদের দ্বারা কোন দিনই হবে না। আর যারা কাজ করে কিন্তু নিষ্কাম ও অনাসক্ত হয়ে করে না, তাদের দ্বারাও কোনদিন হবে না। কর্ম করতে হবে, নিষ্কাম ভাবে সেই কর্ম করতে হবে, অনেক বছর ধরে করতে হবে, তারপর গুরুর একটা ছোট্ট কথা যেই কানে যবে ‘তত্ত্বমসি’ তখনই তার উপলব্ধি হয়ে যাবে। সত্যকামকে তত্ত্বমসি বলা হয়নি, সেখানে দিক সমুদয় ব্রহ্ম এই তত্ত্ব শুনিয়েছিল। সেইজন্য বেদে যে আমরা পাচ্ছি উপদেশ যে কোন ভাবে আসতে পারে, এটা নতুন কিছু নয় আমাদের কাছে। বিদেশীদের কাছে এইগুলো বুঝতে অসুবিধা হয়, কিন্তু আমাদের কাছে এগুলো কোন সমস্যা হয় না। মহম্মদের ক্ষেত্রেও একই জিনিষ ঘটেছিল, হীরা পর্বতে দেবদূত এসে তাঁকে উপদেশ দিয়েছিল।

ব্যাসদেব বেদকে প্রথম তিনটে ভাগে বিভক্ত করলেন – ঋক্, ঋক্ হচ্ছে এক ধরণের মন্ত্রের উচ্চারণ আছে সেগুলো সব ঋকবেদের মধ্যে রাখা হয়েছে, সাম হচ্ছে – বেদের কিছু মন্ত্র আছে যেগুলোকে সুরারোপিত করে গান করা যায়, সেই মন্ত্রগুলিকে সামবেদে রাখা হল, যজুর্বেদ হচ্ছে বেদের যত গদ্যরূপ আছে সেগুলোকে নিয়ে। এর মধ্যে কিছু কিছু তথ্যমূলক কথা বলা হয়েছে। অথর্ববেদ হচ্ছে – বেদের সব কিছু নিয়ে একটা সম্পূর্ণ অন্য শ্রেণীর তথ্য ও তত্ত্বে সমণ্বিত। এগুলোকে বলা হয় ছন্দ, আমরা সচারচর পদ্যে বা গানে যে ছন্দকে জানি, এখানে সেই ছন্দের কথা বলা হচ্ছে না।

ত্রয়ী কথার অর্থ হচ্ছে তিন। এখানে, বিশেষ করে বেদে এই ত্রয়ীর অর্থ হচ্ছে, যজ্ঞের সময় যখন আসল আহুতি দেওয়া হবে তখন তিন জন প্রধান পুরোহিতের দরকার হবে, এই তিন জন পুরোহিতরা হলেন ঋকবেদীয়, সামবেদীয় ও যজুর্বেদীয় পুরোহিত। এখানে অথর্ববেদের ভূমিকা খুব কম। এইটাকে ভিত্তি করে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বলে দিলেন অথর্ববেদ পরে লেখা হয়েছে। কিন্তু পরম্পরা সূত্রে যে তথ্য পাই তাতে চারটে বেদকে আমরা এখন যেভাবে পাচ্ছি সেটা ব্যাসদেব এইভাবে বিভাজন করে গেছেন, আরও পরে তিনি অথর্ববেদ সুমন্তকে শিক্ষা দিলেন, এই তথ্যগুলি পাশ্চাত্যের এই ধারণার উল্টো কথাই বলছে।

অথর্ববেদের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা আরেকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকে ভুলে যান। যে কোন যজ্ঞে মোট চারজন পুরোহিত থাকবে, প্রথম তিন জনের কাজের কথা আগে বলা হয়েছে। অথর্ববেদের পুরোহিতকে বলা হয় ব্রহ্মা। ব্রহ্মা হচ্ছেন সমগ্র যজ্ঞের সমস্ত কর্মের সাক্ষী রূপে সব দেখাশোনা করেন। ব্রহ্মা দেখবে যজ্ঞে সব ঠিকঠাক চলছে কিনা। ব্রহ্মার এই ভূমিকাকে এখন তন্ত্রধারক রূপে তন্ত্র গ্রহণ করেছে। বৈদিক যজ্ঞে ব্রহ্মার গুরুত্ব এত বড় ছিল যে যা কিছু প্রণামী, দক্ষিণা পড়বে তার অর্দ্ধেক ব্রহ্মার প্রাপ্য ছিল, আর বাকী অর্দ্ধেক তিন জনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত। এখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে

যদি অথর্ববেদ পরে লেখা হয়েছিল আর অথর্ববেদ অনেক পরে বেদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে এবং যদি এই বেদের গুরুত্ব অন্যান্য বেদ থেকে অনেক কম হয় তাহলে অথর্ববেদের পুরোহিতকে যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত কেন করে দেওয়া হবে? শুধু তাই নয়, যজ্ঞে যত দক্ষিণা পড়বে তার অর্দ্ধেক অথর্বেদের পুরোহিতের প্রাপ্য, অথর্ববেদের গুরুত্ব যদি কম হত তাহলে বাকি তিনটি বেদের পুরোহিতরা কি অত সহজে এটা মেনে নিত?

ঋকবেদে মোট দশটি মণ্ডল আছে। বাইবেলে মণ্ডল গুলি Book-1, Book-2, এই ভাবে আছে। প্রত্যেকটি মণ্ডলে অনেক গুলি করে সুক্ত রয়েছে, আর প্রত্যেকটি সুক্তে কয়েকটি করে মন্ত্র রয়েছে। সুক্ত হচ্ছে একটি সম্পূর্ণ প্রার্থনা। ঋকবেদের সুক্তগুলিকে একটা বিশেষ পদ্ধতিতে সাজান হয়েছে, যেটা দেখলে বোঝা যাবে যে এটা কৃত্রিম ভাবেই সাজান হয়েছে। ঋকবেদ দেখলেই বোঝা যায় যে এটা খুব সাজান গোছান, কোথাও এলোমেলো কিছু নেই। এই সাজানো গোছান ব্যপারটাই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে ব্যাসদেব যে বেদের বিভাজন করেছিলেন এটা ঘটনা। যদি মণ্ডলগুলিকেই বিচার করা হয় তাহলে দেখতে পাবো যে একেকটি মণ্ডল একেক জন দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। যেখানে অগ্নি দেবতার মন্ত্র আছে সেখানে পর পর অগ্নিদেবতার মন্ত্রই থাকবে। তারমধ্যে প্রথমে যেগুলো সব থেকে লম্বা সুক্তো সেইগুলি থাকবে, তারপরে তার থেকে যেটা ছোট, এইভাবে বড় থেকে ছোট সাজান হয়েছে। এমনকি দুটি সুক্তে যদি সমান মাপের হয় যেমন প্রথম সুক্তে *'অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম। হোতারং রত্নধাতমম্'* এখানে ন'টি মন্ত্র আছে, এখন যদি দ্বিতীয় সুক্তে যদি ন'টি মন্ত্র থাকে তাহলে কোনটা আগে কোনটাকে পরে থাকবে, সেই অবস্থাতে ছন্দের মাত্রা অনুযায়ী সাজান হবে, যে মন্ত্রের ছন্দের মাত্রা বড় সেটা আগে যাবে। এত বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সাজান হয়েছে যে বোঝাই যে এগুলিকে পরের দিকে এইভাবে সুসম্বদ্ধ ভাবে সাজান হয়েছে। কবি, সাহিত্যিকরা যখন কিছু রচনা করেন তখন প্রথমেই তাদের রচনাগুলিক সুসম্বদ্ধ ভাবে এই রকম গুছিয়ে করেন না। আমাদের পরম্পরাতে যে বলা হয় ব্যাসদেব বেদকে এই রকম সুসম্বদ্ধ ভাবে সাজিয়ে গেছেন, এটার অনেক প্রমাণও পাওয়া যায়। এতো সহজ জিনিষটা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের নজরে পড়ল না, সত্যিই তাজ্জব লাগে। দশম মণ্ডল ছাড়া বাকী নয়টি মণ্ডলই খুবই সুসংগঠিতে ভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন। অনেক মন্ত্রকে যখন সংগঠিত করা গেল না তখন সেই মন্ত্রগুলিকে নিয়ে দশম মণ্ডল তৈরী করে দিলেন। যখন আমরা বাড়ি-ঘর সাজাই তখন যে জিনিষগুলিকে সাজান গেল না তখন সেগুলিকে আলাদা করে একটা জায়গায় জড়ো করে রাখা হয়, দশম মণ্ডলের ক্ষেত্রে তাই করা হয়েছে।

ঋকবেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম সুক্তের প্রথম মন্ত্র ***'অগ্নিমীডে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম। হোতারং রত্নধাতমম্'***, বেদের এইটিই হচ্ছে প্রথম মন্ত্র। এই সুক্তটি হচ্ছে অগ্নি দেবতার উদ্দেশ্যে। বেদ দুই রকমের হয় – ঋকভি স্তুবন্তি আর যজুর্ভি যজন্তি – এই দুই শ্রেণীর মন্ত্র আছে, ঋক আর যজুঃ। ঋকভি স্তুবন্তি মানে এই মন্ত্র পূজো করার জন্য, স্তবন করার জন্য বা প্রশংসা করার জন্য। আর যজুর্ভি যজন্তি – যখন আহুতি দিতে হয় তখন যজুর্বেদ থেকে সাহায্য নেওয়া হয়। যখন যজ্ঞ হবে তখন যজুর্বেদের যিনি ব্রাহ্মণ তিনি যজ্ঞে আহুতি দেবেন, স্বাহা বলে যিনি যজ্ঞের অগ্নিতে ঘি বা অন্য কিছু ঢালবেন। ঋকবেদের আবার দুটো ভাগ আছে, একটা আছে ঋক ছন্দে, এটাও একটা মন্ত্রের ধরণ যেটা ব্রাহ্মণরা ব্যবহার করতেন, দ্বিতীয় হচ্ছে স্তুবন্তি, যে মন্ত্রগুলি প্রার্থনার জন্য ঠিক করা আছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে যজুর্বেদের বেশির ভাগ মন্ত্র, কয়কটি মুষ্টিমেয় মন্ত্রকে বাদ দিলে বেশির ভাগ মন্ত্রই ঋকবেদ থেকে এসেছে, মানে এই মন্ত্রগুলি ঋকবেদেও পাওয়া যাবে। আবার সামবেদের কয়েকটি মন্ত্র বাদে সবটাই এসেছে ঋকবেদ থেকে। ঋকবেদের বিরাট কলেবর। তাহলে ঋকবেদকে আমরা কিভাবে নেব – যদি বলা হয় যে ঋক্ কখনই যজ্ঞে আহুতির সময় ব্যবহার করা হয় না, কিন্তু সেই মন্ত্রই যখন যজুর্বেদে যাবে তখন কিভাবে আহুতির সময় ব্যবহার হচ্ছে? এই জন্য ঋকবেদকে বোঝাবার জন্য বলা হয় ঋকবেদ হচ্ছে স্তুবন্তি। একই মন্ত্র কখন স্তুবন্তি হিসাবে ব্যবহার করা হয় আবার কখন একই মন্ত্রকে যজন্তি রূপে ব্যবহার হচ্ছে। যখন চণ্ডী

যজ্ঞ হয় তখন চণ্ডীর যে মন্ত্রগুলি চণ্ডীপাঠে ব্যবহৃত হয় সেই মন্ত্রই চণ্ডী যজ্ঞে বেলপাতাকে ঘৃতের মধ্যে ডুবিয়ে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয় – যেমন 'যা দেবী সর্বভূতেষূ মাতৃরূপেণ সংস্থিতা' বলার পর 'স্বাহা' বলে আহুতি দেবে আবার 'নমস্তস্যৈ' বলে আবার আহুতি, 'নমস্তস্যৈ' আবার আহুতি 'নমস্তস্যৈ নমো নমঃ' বলে আবার আহুত দেবে। একদিকে চণ্ডীকে মন্ত্ররূপে পূজো করা হয় আবার যজ্ঞ রূপেও ব্যবহার করা যায়। ইদানিং কালে অনেকে গীতা যজ্ঞও করেন, গীতার শ্লোক গুলি পাঠ করে করে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়। ঋকবেদের মন্ত্রগুলি যখন যজুর্বেদে আসবে তখন তার একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, এই যজ্ঞে এই মন্ত্রই আহুতি দিতে হবে। বিভিন্ন যজ্ঞের জন্য আলাদা আলাদা মন্ত্র নির্দিষ্ট করা আছে।

বৈদিক যুগেও বিভিন্ন রকমের যজ্ঞ হত আর সব সময়েই যে অগ্নি প্রজ্জ্বলন করে সব যজ্ঞ করতে হবে তার কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। যেমন যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ হত তখন অগ্নি প্রজ্জ্বলন করা হত না, সেখান ঘোড়াকে বলি দেওয়া হত। তবে বেশির ভাগ যজ্ঞেই অগ্নির ব্যবহার বাধ্যতামূলক ছিল। বেদে সবচেয়ে বেশি স্তুতি রয়েছে ইন্দ্রের নামে, তারপরেই হচ্ছে অগ্নি। এর মানে এই নয় যে ইন্দ্র বড় দেবতা আর অন্যান্য দেবতারা ছোট দেবতা।

বেদে আমরা নিরুক্ত নামে একটা শব্দ পাই। বেদের শব্দগুলির অর্থ যেখানে করা হয়েছে তাকে নিরুক্ত বলা হয়, বাংলায় আমরা যাকে অভিধাণ বলি, নিরুক্ত হচ্ছে বৈদিক অভিধাণ। যাস্ক, যিনি সাতাশ'শ বছর আগে বৈদিক ঋষি ছিলেন, তিনি এই নিরুক্ত রচনা করেছিলেন। যাস্ক বৈদিক দেবতাদের একটা শ্রেণীবিন্যাস করে তিন রকমের দেবতার কথা বলছেন। প্রথম শ্রেণীর দেবতারা এই পৃথিবীতে থাকেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবতারা অন্তরীক্ষে আর তৃতীয় শ্রেণীর দেবতারা স্বর্গে থাকেন। এখানে আমরা যে অগ্নি দেবতার স্তুতি পেলাম সেই অগ্নি হচ্ছেন পৃথিবীর দেবতা, ইন্দ্র হচ্ছেন স্বর্গের দেবতা।

আমরা আগে আলোচনা করেছি যে সমস্ত সংস্কৃত শব্দগুলি এসেছে ধাতু থেকে। এখন অগ্নির অর্থকে উদ্ধার করতে হলে আমাদের ধাতুটাকে জানতে হবে, কোন ধাতু থেকে অগ্নি শব্দ এসেছে। এই ধাতুর একটা সমস্যা হচ্ছে, একই ধাতুর আবার অনেক রকম অর্থ হয়। যেমন বেদ বিদ্ ধাতু থেকে এসেছে, এই বিদ্ ধাতুর পাঁচ রকমের অর্থ হয়। আরো যেটা বড় সমস্যা হয় একই শব্দ কখন কখন দুটো কিংবা তিনটে ধাতু থেকে আসতে পারে, যদি দুটো কিংবা তিনটে ধাতু থেকে আসে তাহলে তখন শব্দের অর্থ নিরূপণের ক্ষেত্রে আরো বেশি সংশয় তৈরী হয়, কেননা বেদের ভাষা অনেক প্রাচীন, কিছু কিছু শব্দের এখন আর ব্যবহারই হয় না। যাস্ক অগ্নি শব্দের অর্থ করছেন 'অগ্নম্ নিয়তে'। যে কোন যজ্ঞ যখন করা হয় তখন, সেই যজ্ঞে অগ্নি হচ্ছেন সেই দেবতা যাঁকে প্রথম আবাহন করা হয়, যিনি প্রথম পূজা পান। ঋকবেদের প্রথম সুক্ত তাই অগ্নি দেবতাকে দিয়েই শুরু করা হয়েছে। 'অয়ম নিয়তে' আছে বলে অগ্নি শব্দ নিয়ে যাওয়ার অর্থে ব্যবহার করা হয়। অগ্নির আরেকটি অর্থ হচ্ছে 'অগ্রণি ভবতি', এর অর্থ হচ্ছে অগ্নি হচ্ছেন নেতা, দলপতি, মানে অগ্নি না এলে বাকি দেবতারা আসবেন না। অগ্নির তৃতীয় অর্থ হচ্ছে – যত দেবতা আছেন সমস্ত দেবতাদের মধ্যে অগ্নির প্রথম জন্ম হয়। অগ্নির জন্ম হয় জল থেকে, আমরা যে জলকে জানি সেই জলের কথা এখানে বলছে না, বিশ্বের জন্মের আগে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জলের যে তন্মাত্রায় আপ্লুত ছিল, সেই জল থেকে অগ্নির জন্ম হয়। প্রথম যে জীব-জগতের বিকাশ হচ্ছে সেটা অগ্নি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এই জগতে যত রকমের খারাপ জিনিষ, অশুভ যা কিছু আছে অগ্নি তার সব নাশ করে দেন। এই ধারণা থেকেই এখন দোলের আগে যা কিছু আবর্জনা থাকে সেটাকে জড়ো করে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। এখানে সাধারণ অগ্নির কথাই সবাই মনে করে। কিন্তু আমরা সাধারণ অগ্নির কথা আলোচনা করছি না, আমরা অগ্নি দেবতার কথাই বলছি। অগ্নি হচ্ছেন সর্বদর্শী, তিনি সব কিছু দেখতে পান, সব কিছু জানতে পারেন, সেইজন্য অগ্নির আরেকটি নাম হচ্ছে জাতবেদস। যা কিছু জন্ম নিয়েছে, জাত হয়েছে অগ্নি তাদের সবাইকে জানেন। জাতবেদসের মত অগ্নির আরেকটা নাম হচ্ছে বিশ্ববেদস। বিশ্ববেদসের অর্থ হচ্ছে, যারা জাত বা

জন্ম নিয়েছে অগ্নি শুধু তাদেরকেই জানেন না, যা এখন জাত হয়নি এই ধরণের অন্যান্য সব কিছুকেই জানেন।

এখানে অগ্নি দেবতার ক্ষেত্রে সর্বজ্ঞ কথাটা প্রযোজ্য হবে না, কেননা সর্বজ্ঞ বিশেষিত এই শব্দটি একমাত্র ঈশ্বরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সেই অর্থ অগ্নি কিন্তু ঈশ্বর নন। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, মিত্র, বায়ু, যম এঁরা হচ্ছেন সব দেবতা, ইংরাজীতে গড্ লেখার সময় এঁদের ক্ষেত্রে ছোট অক্ষরের 'জি' লেখা হয় আর ভগবানের ইংরাজী গড্ লেখার সময় বড় অক্ষরের 'জি'কে ব্যবহার করা হয়।

বেদের ঋষিরা প্রথমে প্রকৃতির দিকে মন দিয়েছিলেন। ভারত প্রথম থেকেই ছিল কৃষি প্রধান দেশ, কৃষি প্রধান দেশ হওয়ার জন্য এখানে বৃষ্টির একটা বিশাল প্রভাব রয়েছে। এই বৃষ্টির পেছনে এক দৈবী শক্তিকে তাঁরা বিশ্বাস করতেন, সেই শক্তিই ঠিক সময়ে বৃষ্টি দিয়ে বৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। এই প্রকৃতির দেবতা হচ্ছেন ইন্দ্র, তখন তারা ইন্দ্রের পূজা করতে শুরু করলেন। তারপরে ঋষিরা দেখলেন যে অগ্নি আমাদের জীবনে একটি অপরিহার্য শক্তি, এই শক্তির দেবতা নিজেই হচ্ছেন অগ্নি, তাই অগ্নি দেবতা খুব প্রাধান্য পেলেন। তাঁরও পূজা ও স্তুতি হতে লাগল। এখন পরবর্তি কালে ইন্দ্র বা অগ্নির একটা রূপ দিয়ে মুর্তি তৈরী করে পূজার প্রবর্তন হয়। আবার বিভিন্ন আদিবাসীরাও নানান মুর্তি তৈয়ারী করে পূজা করে। এই বৈদিক দেবতা আর আদবাসীদের দেবতাদের মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যটাকে না ধরতে পারলে বেদের দর্শনকে বোঝা যাবে না। তখনকার বৈদিক যুগে যেসব অনুন্নত উপজাতিরা ছিল তারাও অগ্নিদেবতার মুর্তি করে পূজা করছে, এখানে যে অগ্নির পূজা হচ্ছে সেই অগ্নি দেবতার সাথে বেদে যে অগ্নি দেবতার কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে সব থেকে যে বড় পার্থক্য তা হচ্ছে বেদের অগ্নি দেবতার মধ্যে অনেক মহৎ গুণ আছে, কিন্তু উপজাতিরা যে অগ্নিকে পূজা করছে সেই অগ্নির একটাই গুণ, সে শুধু জানে সবাইকে পুড়িয়ে দিতে, তাঁকে যদি শান্ত না রাখা হয়, তাঁকে যদি প্রার্থনা না করা হয় তাহলে তাঁর রোষ দিয়ে তিনি সবাইকে ভষ্ম করে দিতে পারেন, আর তাঁকে যদি খুশি রাখা হয় তাহলে তিনি খুশি হয়ে তারা যা যা পেতে চায় সব দিয়ে দেবেন। কিন্তু বৈদিক দেবতাদের মধ্যে রয়েছে অনেক মহৎ গুণ, এই গুণগুলো হচ্ছে নৈর্ব্যাক্তিক। আমাকে যদি কেউ বলে – আপনি কি বুদ্ধিমান। এখানে বুদ্ধিমান এই গুণটা হচ্ছে আমার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার জন্য এটা আমার নিজস্ব গুণ। কিন্তু বুদ্ধি গুণটা হচ্ছে সার্বিক ভাবে নৈর্ব্যাক্তিক, এটা যে কোন লোকেরই হতে পারে। ঠিক সেইভাবে কারুকে যদি বলা হয় – তুমি কি সুন্দর। সুন্দর এই গুণটা তার এইখানে ব্যাক্তিগত, কিন্তু সৌন্দর্যটা হচ্ছে নিরপেক্ষ। এই যে বলা হল অগ্নিদেবতা হচ্ছেন জাতবেদস, বিশ্ববেদস সব কিছু জানবার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে আছে। সব কিছু জানার যে ক্ষমতা এই গুণটাই হয়ে গেল নৈর্ব্যাক্তিক, impersonal quality, কিন্তু সর্বজ্ঞত্বতা একমাত্র ভগবানের, অগ্নি কিন্তু ভগবান নন। এক দিকে বেদের অগ্নিদেবতার সাথে উপজাতি আদিবাসীদের দেবতাদের মধ্যে কিছুটা মিল রয়েছে এই কারণে যে তার নিজস্ব কিছু গুণ রয়েছে আবার সাথে সাথে বেদের অগ্নিরও কিছু কিছু নিজস্ব গুণ আছে। অন্য দিকে তাকে আবার একজন শ্রেষ্ঠ দেবতারূপে গণ্য করা হচ্ছে, কারণ তাঁর মধ্যে কিছু গুণ আছে যেগুলি নৈর্ব্যাক্তিক। এইগুলোই হচ্ছে বেদের বৈশিষ্ট্য, এই ধরণের বৈশিষ্ট্যতা বেদ ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যাবে না।

খ্রীশ্চানদের গড্ বা মুসলমানদের আল্লাকে যে যে গুণের দ্বারা ভূষিত করা হয় সেই একই গুণ বেদে ইন্দ্রকেও দেওয়া হচ্ছে, একই গুণ অগ্নিকেও দেওয়া হচ্ছে। এর জন্য বেদের অনেক সমস্যাও হয়, সমস্যার কথা এই কারণে বলা হচ্ছে যে এই সমস্ত দেবতাদের একটা মুর্ত রূপ দেওয়া হয়, তাঁদের একটা শরীর আছে, এই শরীর এই রকমের, ইন্দ্র অনেক সময় সোমরস খেয়ে বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকে, তাকে সামলান যায় না, দেবতাদের মধ্যে হিংসা আছে, দ্বেষ আছে, মানবজাতির হেন রোগ নেই যা ইন্দ্রাদি দেবতাদের নেই। কেউ কোন যজ্ঞ করছে সেই যজ্ঞ করলে যদি ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব চলে যায় সেই ভয়ে ইন্দ্র ঐ যজ্ঞকে পণ্ড করতে সব রকমের অসদুপায় অবলম্বন করবে। একদিকে দেবতাদের অনেক দোষ আছে আবার অন্য দিকে

তাঁদের মধ্যে অনেক মহৎ গুণও আছে – যেমন অগ্নিকে বলা হচ্ছে জাতবেদস, যারা জন্ম নিয়েছে তাদের সবাইকে সে জানে, বিশ্ববেদস, যারা জন্ম নেয়নি তাদেরকেও জানেন। তথাপি তাঁকে সর্বজ্ঞ বলা হচ্ছে না। কারণ যদি তিনি সর্বজ্ঞ হতেন তাহলে তাঁর মধ্যে যে মানবিক যে দোষগুলি আছে সেগুলো থাকত না। সেই কারণে বৈদিক দেবতাদের সম্বন্ধে যে অদ্ভুত ধারণা আমরা বেদে দেখতে পাচ্ছি এটাকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বুঝতেই পারেনা। বিদেশীদের কাছে আদিবাসী উপজাতিদের দেবতাদের আর বাইবেল বা কোরানের সর্বোচ্চ দেবতাদের ধারণাই আছে। আমাদের কাছে এখন না হয় বেদান্ত এসে গেছে। কিন্তু বেদের দেবতারা এই দুটোর মধ্যে কোনটাই নয়। এই দুটোকে সমণ্বয় করা সাধারণ মানুষের সাধারণ বুদ্ধিতে কখনই সম্ভব নয়।

আমরা যখন প্রথম প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা শুরু করি তখন মনের মধ্যে ঘুরপাক খাবে শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে জন্ম নিয়েছিলেন, তিনি দক্ষিণেশ্বরে সাধনা করেছিলেন, তাঁর মুর্তি এখন বেলুড় মঠে পূজা করা হয়। তারপরে ঠাকুরের প্রতি যখন আরো একটু শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পেল, তখন মনে হবে যদি বেলুড় মঠে ঠাকুরের খিচুরী ভোগ খেতে পারি তাহলে আমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে। তারপরে ধীরে ধীরে এগুলোও বন্ধ হয়ে মনে হবে আমি প্রসাদ খাই আর নাইই খাই তাতে আমার কোন প্রয়োজন নেই, আমি যেন নিরিবিলি ঠাকুরের কাছে চুপচাপ বসে তাঁর চিন্তা করতে পারি। এইভাবে এক সময় মনে হবে এই জগতে আর কিছুই নেই আমি আছি আর ঠাকুর আছেন। তারপর এক সময় আসবে মনে হবে যে বেলুড় মঠে ঠাকুরের অস্তি রাখা আছে, এখানে কত সাধু জপ-ধ্যান করেছেন। কিন্তু এইখানে কি আমি ঠাকুরকে পাব? ঠাকুরকে যদি ঠিক ঠিক খুঁজতে হয় তাহলে আমাকে আমার অন্তর্জগতে ধ্যানের গভীরে গিয়ে খুঁজতে হবে। মন্দিরে মাথা ঠুকলে, খিচুরী আর চরণামৃত খেলেই হবে না। আমরা মন এখন কিন্তু একটা অন্য দিকে মোড় নিয়েছে। এই পরিবর্তনটা আসার পর আমি ঠাকুরের ধ্যান করতে শুরু করলাম। ধ্যান শুরু করতে গিয়ে প্রথমের দিকে ঠাকুরর যে ছবি আছে তখন সেই ছবিটাই ধ্যানে আসতে থাকবে। এতদিন খোলা চোখে ঠাকুরের যে ছবি দেখতাম এখন সেই ছবিটাকে ধ্যানের মধ্যে দেখছি খুব বেশি হলে three dimension এ মন্দিরের ঠাকুরের যে মুর্তি আছে সেই মুর্তিটা ধ্যানের মধ্যে দেখা শুরু হবে। কিন্তু মুর্তিতো মানুষ নয়, মানুষ আর মুর্তির মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। এইভাবে চলতে চলতে এক সময় মনে হবে – আরে, ঠাকুর তো মুর্তি নন, তিনিতো জীবন্ত মানুষ দেখছি। জীবন্ত মানুষটি কোথায় রয়েছেন? আমার হৃদয়ে মনের ভেতরে। এখন যদি একদিন মন্দিরে ঠাকুরের মুর্তির সামনে এসে দাঁড়াই তখন মনে হবে না যে এটা একটা মুর্তি, দেখছি সাক্ষাৎ ঠাকুর বসে আছেন। এখান থেকে যখন আরো এগোব তখন আরও অনেক কিছু বোধ হতে থাকবে। তারপর দেখছি ঠাকুরই সব কিছু হয়েছেন। এই যে প্রথম বাতাসা খাওয়া থেকে শুরু করছি, বাতাসা না খেলে জীবনটা যেন সর্বনাশ হয়ে যাবে, একদিন যদি গুরুপ্রণাম না হয় তা হলে মনে হত জীবনটা বৃথা চলে গেল, এখান থেকে বেরিয়ে এসে এগোতে এগোতে দেখছি, বাতাসা খাওয়া না খাওয়াতে আমার কিছুই হচ্ছে না, এখন আমি দেখছি সিয়ারাম ম্যায় সব জগ জানু, এই গোটা বিশ্বজগৎ দেখছি রামকৃষ্ণময়। এগুলি হচ্ছে আমার মধ্যে ঠাকুরের ব্যাপারে আমার চেতনার বিস্তার হচ্ছে। এখানে কার পরিবর্তনটা হল? সেই প্রথম যেদিন আমি ঠাকুরের ছবি দেখলাম, যেদিন আমার প্রথম দীক্ষা হল সেইখান থেকে এই যে আমি ঠাকুরকে পুরো জগৎ জুড়ে দেখছি এতটা রাস্থা চলার পথে কি ঠাকুর পাল্টে গেলেন? তিনি ছবি থেকে বেরিয়ে গিয়ে সর্বভূতে বিরাজমান হয়ে গেলেন? কখনই ঠাকুর ছবি থেকে বেরিয়ে আসেননি। এটা আমার চেতনার বিস্তার হতে হতে আমার ভাবটা পাল্টে গেছে। যখন আমার মনে ঠাকুরের প্রতি ভক্তি ভাবে এসেছিল তখন এক রকম অনুভূতি হয়েছে, আবার যখন আমার মধ্যে ভক্তির পরাকাষ্টা এসে গিয়েছিল তখন সেই ঠাকুরকে আমি অন্য ভাবে দেখছি। গভীর ভাবে অনেক বছর পর সাধনার পর যখন আমার উপলব্ধি হল যে ঠাকুর তো সমস্ত জগৎ জুড়ে রয়েছেন, সেই অবস্থায় যদি আমার এই পরিবর্তনগুলি প্রথম থেকে কোথাও লিপিবদ্ধ করে রাখছি – তার প্রথম লাইনটা দিলাম – আহা, ঠাকুর তোমার কি অপরূপ সৌন্দর্য দেখলাম। দ্বিতীয় লাইনে লিখলাম ঠাকুরকে তো জীবন্ত দেখছি তিনিতো সজীব, এতদিন তাঁকে শুধু

পাথরের মুর্তির মধ্যেই দেখেছি। তারপরে লিখলাম – তিনিতো সাড়া বেলুড় মঠ জুড়েই রয়েছে। চতুর্থ লাইনে গিয়ে লিখলাম আমি যেদিকেই দৃষ্টিপাত করি ঠাকুরকেই দেখতে পাই। ঠাকুরের প্রতি আমার অনুভূতিগুলি ক্রমান্বয়ে যে পরিবর্তন হয়েছিল সেটাকে এই চারটে লাইনে খুব সুন্দর পদ্যাকারে লিপিবদ্ধ করলাম। তারপর হাজার বছর এই লাইনগুলি কেউ হয়তো মিশিয়ে আগে পড়ে করে দিয়েছে। এখন ঠাকুর তুমি সর্বত্র বিরাজমান এই লাইনটাও থাকবে আবার শ্রীরামকৃষ্ণ মুর্তিরূপে বিরাজমান এই লাইনটাও থাকবে। এর মধ্যে আমার পরবর্তিকালে যারা সাধক এসেছিলেন তাঁদের অনুভূতির কথাও ঢুকে গেছে। এখন কেউ হয়তো প্রথমেই এর মধ্যে খুব উচ্চ অবস্থার অনুভূতির কথা পেলেন, তারপরেই হঠাৎ দেখতে পেলেন অনেক সাধারণ নিম্ন অবস্থার কথা লেখা রয়েছে। বেদেও ঠিক এইটাই হয়েছে। এতে বেদের কোন দোষ নেই। পঞ্চাশ জন ঋষির বিভিন্ন অবস্থার উপলব্ধির কথা তাঁদের শিষ্য, সন্তানদের মাধ্যমে চলতে চলতে লাইন গুলির এদিক সেদিক হতেই পারে। পরবর্তি সময়ে তাই বলা মুশকিল হয়ে দাঁড়াল যে কোন্ কথাটা প্রথমে লেখা হয়েছিল আর কোন্ কথাটা পরের দিকে লেখা হয়েছে। কোন উপায়ই নেই জানার যে কোনটা আগে কোনটা পরে এসেছে। এমনও হতে পারে, যেমন তোতাপুরীর ক্ষেত্রে হয়েছিল, অদ্বৈতজ্ঞান আগে হয়েছে দ্বৈতজ্ঞান পরে হয়েছে। ঠাকুর দেখলেন মা'ই সব হয়েছেন, পরে দেখলেন সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। এখন কে বলবে কোনটা আগে কোনটা পরে, আমাদের বুদ্ধিতে মনে হবে দ্বৈত আগে অদ্বৈত পরে, কিন্তু তোতাপুরি ছাড়াও অনেক সাধক আছেন যাদের পরে দ্বৈতজ্ঞান অদ্বৈতজ্ঞানের আগে হয়েছে। স্বামীজীরই অদ্বৈতজ্ঞান আগে হয়েছে, পরে যখন তিনি ক্ষীরভবানীতে গেছেন তখন তিনি দৈববাণী পেলেন – মা বলছেন আমি তোর রক্ষা করি না তুই আমার রক্ষা করিস। ঠাকুরের দিব্যস্পর্শে যাঁর নির্বিকল্প সমাধি হয়ে গেছে, যিনি দেখছেন সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, ঘটি, বাটি, ঘরবাড়ি সবই দেখছেন চৈতন্য, তাঁকেই মা বলছেন – তুই আমাকে রক্ষা করিস না আমি তোকে রক্ষা করি। বেদের ঋষিদের হাজার হাজার বছর আগে যে উপলব্ধি হয়েছিল এখন আমরা আমাদের এই জাগতিক বুদ্ধি দিয়ে কি করে বিচার করব যে তাঁদের কোন্ উপলব্ধিটা আগে হয়েছিল আর কোনটা পরে হয়েছিল। এটাকে জানার কোন উপায়ই নেই।

আমরা জানি মানুষ ছোট থেকে আরও আরও বড় হতে থাকে। লীলাপ্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের মানবরূপ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ঠাকুরের যে বর্ণনা দিয়েছেন এগুলো সবই তার মানবিক গুণ, তিনি সাধারণ ভাবে কি রকম থাকতেন, তাঁর কি ধরণের বিভিন্ন শখ ছিল, তাঁর শরীর বড়সর ছিল, বসতে গেলে বড় পিড়ের দরকার হত, ঠাকুর কি কি খেতে ভালোবাসতেন আরও অনেক ধরণের বর্ণনা রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ঠাকুরের মানবরূপ, আমরা যখন ঠাকুরের প্রথম ধ্যান করতে যাই তখন এই মানব গুণাগুণ আর তাঁর মানবরূপেরই ধ্যান করি। মানবিক গুণই মানবিক দুর্বলতা। নরেন ঠাকুরকে দেখিয়ে বলছে – এঁকে আবার সবাই বলে পরমহংস আবার মোটা গদিতে বসে। ঠাকুরও শুনে বলছেন – শালা, তোর গদি আমার থেকে দ্বিগুণ মোটা হবে। নরেন্দ্রনাথ যখন স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে দেশে ফিরে এলেন তখন আমেরিকার এক ভক্ত স্বামীজী একটা মোটা গদি করে দিয়েছিল, যেটা এখন স্বামীজীর ঘরে তাঁর খাটের উপরে পাতা আছে। মেপে দেখা গেলে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের খাটে যে গদি আছে তার থেকে স্বামীজীর খাটের গদি ঠিক দুই গুণ বেশি মোটা। সে যাই হোক, তাঁকে পরমহংস বলছে আবার তিনি গদিতে শোয়া বসা করেন। যখন বেলুড় মঠ স্থাপন হল তখন বেলুড় মঠের নামে কোর্টে নালিশ গেল যে বেলুড় মঠ হচ্ছে নরেন দত্তের বাগান বাড়ি। জজ সাহবে জিজ্ঞেস করছেন – এটা কি সত্যি যে আপনারা খাটে শোন, এটা কি সত্যি আপনারা চা খান, এই ধরণের সব প্রশ্ন তখন কোর্টে উঠেছিল। যাই হোক পরে প্রমাণিত হলে যে এটা বাগান বাড়ি নয়। একশ বছর আগে যারা সন্ন্যাসী তাদের খাটে শোওয়া, চা খাওয়া ছিল এক ধরণের সামাজিক দুর্বলতা।

শ্রীরামকৃষ্ণের মানবিক রূপের উপরে যখন আমরা ধ্যান করতে যাব তখন তাঁর এই মানবিক গুণগুলিও আমাদের সামনে এসে যাবে, ঠাকুরের এইটা ভালো লাগত, ঠাকুরের এই করতেন, ঠাকুরের এটা

পছন্দ ছিল, এই জিনিষটা তাঁর ভালো লাগত না। যখন আমাদের চেতনার উচ্চ অবস্থার উন্মেষ হতে থাকবে তখন ঠাকুরের এই মানবিক গুণগুলিও আস্তে আস্তে আমাদের চিন্তা ভাবনা থেকে খসে পড়তে থাকে। কিন্তু ঠাকুর যে যে গুণগুলির স্বরূপ – সত্য বিগ্রহায়, তিনি সত্যের বিগ্রহ, কৃত্যং করোতি কলুষম্, তিনি এমনই পবিত্র যে যেটা আমাদের কলুষ বা পাপ সেটাকেই তিনি পূণ্যে পরিণত করে দেন। এই গুণগুলি, সত্য, পবিত্রতা, সর্বজ্ঞতা, চৈতন্য হচ্ছে তাঁর স্বরূপ। এই গুণগুলি তাঁকে সাধনা করে অর্জন করতে হয়নি, এটাই তাঁর স্বরূপ, এইটাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। এইভাবেই আমরা ব্যাক্তি থেকে নৈর্ব্যাক্তিক, মুর্ত থেকে অমুর্তের দিকে অগ্রসর হই। বৈদিক মন্ত্রগুলিও এইভাবেই এগিয়েছে। কিন্তু বেদে কোথাও আমরা এটাকে একটা প্রণালীতে নিয়মের মধ্যে সাজান অবস্থায় পাবো না। কোথাও প্রথমেই দেখতে পাই আধ্যাত্মিকতার শেষ উচ্চাবস্থার কথা, কোথাও প্রথমেই পুরোপুরি ব্যাক্তি রূপে একজন দেবতাকে স্তুতি করা হচ্ছে। আবার কোথাও দেখাচ্ছে ইন্দ্র প্রচণ্ড সোমরসে আসক্ত, অপর নারীর প্রতি সে প্রলুব্ধ হয়ে অনেক কাণ্ড করছে। এখনকার দিনে আমরা কি ভাবতে যাব স্বামীজী চরুট খেতেন কি খেতেন না, মুরগী খেতেন কি খেতেন না। স্বামীজীর সময়ে খবরের কাগজে স্বামীজীকে নিয়ে কার্টুন আঁকা হত স্বামীজী চুরুট টানছেন, আর স্বামীজীকে চারটে মেম ঘিরে রেখেছে আর তাঁর কমণ্ডুলু থেকে মুরগীগুলো মুখ বার করে আছে। আজকে কি কেউ স্বামীজীকে এই ভাবে চিন্তা করতে পারবে বা করবে? এই একই জিনিষ বেদের দেবতা ইন্দ্র, বরুণের ক্ষেত্রে হয়েছিল। প্রথমেই ঋষিদের মনে দেবতাদের জাগতিক দোষত্রুটি গুলিকেই ধরা পরেছিল পরে তাঁরাও যত ধ্যানের গভীরে যেতে থাকলেন ততই এই গুণগুলিও সরে গিয়ে উচ্চতর দৈবী গুণগুলির প্রতি আকৃষ্ট হলেন।

বেদ – ৬ই ফেব্রুয়ারী ২০১০

এর আগে বেদের যে চারটে অঙ্গ, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ নিয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে, পরে এইগুলোকে নিয়েই আরেকটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করতে থাকব। ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে একটা বিশেষ কাল অনেক দিন চলতে চলতে সেই কালটা ক্ষীণ হয়ে গিয়ে আরেকটা কাল শুরু হয়ে যায়। বেদেও ঠিক এই রকম কালের গতিতে আরও দুটো ধারা এসে সংযুক্ত হয়েছিল। মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ যেমন এক সময় অনেক দিন ধরে চলছিল, অনেক পরে সমাজের প্রয়োজনের তাগিদেই হোক বা অন্য কোন কিছুর প্রয়োজনেই হোক আরও তিনটি জিনিষ এসে যোগ হল। এই তিনটি হল শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র আর কল্পসূত্র।

বেদের আমরা যত কিছুই বলি না কেন, বেদের ধর্ম আসলে হচ্ছে যজ্ঞ-যাগের ধর্ম। উপনিষদের তত্ত্বগুলিকে বেদের আলাদা একটা ভাগে ভাগ করা হলেও আমরা যখন মন্ত্রের অংশ দেখব তখন সেখানে দেখতে পাবো যে উপনিষদের তত্ত্বগুলি সেখানে আগে থেকেই আছে। কিন্তু একটা জিনিষের বৈশিষ্ট্যগুলিকে যখন বিচার করা হয় তার মধ্যে বেশি যেটা আছে সেটাকেই তার প্রধাণ বৈশিষ্ট্য বলে মানা হয়। বেদে বিভিন্ন যজ্ঞ-যাগের কথাই বেশি বলা হয়েছে। এখন এই সব যজ্ঞ-যাগের কি বিধি হবে, কিভাবে করা হবে, কখন করা হবে, কি কি আনুষাঙ্গিক দ্রব্য লাগবে এইগুলোর জন্য ওনারা আলাদা নিয়মাবলী বানাতে শুরু করলেন। এখন যেমন দেখা যায় পুরোহিত দর্পণ, ইদানিং কালে রামকৃষ্ণ পূজাপদ্ধতির বই। যজ্ঞ-যাগের সব নিয়মাবলীকে একটা নির্দিষ্ট ভাবে সাজান হল, আর এর সব নিয়মগুলি খুব সংক্ষেপে সূত্রাকারে লেখা থাকত। ব্রাহ্মণ সন্তানরা এই সূত্রগুলি মুখস্ত করে রাখতেন আর এর সমস্ত ব্যাখ্যা গুরুর কাছে শুনে রাখতেন। ভারতের ঋষিরা খুব সংক্ষেপে তাঁদের কথাগুলিকে সূত্রাকারে তৈরী করে রাখতেন, যত শাস্ত্র আছে বেশির ভাগই এই রকম সূত্রাকারে রচিত হয়েছে – যেমন ভক্তিসূত্র, যোগসূত্র, জৈমিনির ধর্মসূত্র, ন্যায়সূত্র, এই রকম প্রত্যেকটি বিষয়ই সূত্রাকারে বলা হয়েছে। কারণ এঁনাদের জ্ঞানের পরিধি এত বিশাল ছিল কত মনে ধরে রাখবে। সেইজন্য মূল তত্ত্বটাকে সূত্রাকারে লিখে নিয়ে ওটাকেই মুখস্ত করতেন। যজ্ঞ-যাগের বিধি-নিয়মাবলীগুলিকে নিয়ে সূত্রাকারে রচিত হলে শ্রৌতসূত্র, গৃহসূত্র আর কল্পসূত্র। এই তিনটি হচ্ছে বৈদিকপূর্ব আর বৈদিকপরবর্তি কালের মেলবন্ধন।

এই তিনটি সূত্রের পরেই বেদের পরবর্তি কালে আবার এলো বেদাঙ্গ। বেদাঙ্গ হচ্ছে ছয়টি – কল্প, ব্যাকারণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, শিক্ষা ও ছন্দ। নিয়ম ছিল বেদ যে পড়তে যাবে তাকে বেদের সাথে বেদাঙ্গও পড়তে হত। বেদের প্রত্যেকটি শব্দকে কিভাবে ঠিক ঠিক উচ্চারণ করতে হবে তার কথা বলা হয়েছে শিক্ষাতে। কল্প হচ্ছে সমস্ত সূত্রগুলি যেটাতে লিপিবদ্ধ করা আছে। ব্যাকারণে বেদের সংস্কৃত ভাষার নিয়মাবলীকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিরুক্ত হচ্ছে বিশেষ অভিধাণ যাতে শুধু বেদের শব্দগুলির অর্থ বলা আছে, নিরুক্ত ব্যাকারণ সহ অভিধাণ। বেদের মন্ত্রগুলি বিভিন ছন্দে লেখা হয়েছে, এখন কত রকমের ছন্দ আছে, কোন ছন্দের কি নিয়ম, কোন ছন্দে কটি কটি করে শব্দ থাকবে তার বিশদ বিবরণ যাতে বলা হয়েছে তার নাম হচ্ছে ছন্দ। শেষে হচ্ছে জ্যোতিষ, এখন যাকে জ্যোতিষ শাস্ত্র বলা হয়। সরস্বতি পূজাতে পূষ্পাঞ্জলী দেওয়ার মন্ত্রটিতে যে বলা হয় .....বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত বিদ্যাস্থানেভ্য..., এখানে বেদ বলতে এখানে বোঝান হচ্ছে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণকে, বেদান্ত বলতে বোঝাচ্ছে উপনিষদ আর বেদান্ত বলতে এই ছয়টিকে বোঝাচ্ছে। কিন্তু বেদেকে যখন সামগ্রিক রূপে ব্যাখ্যা করা হয় তখন এই তিনটে মিলিয়েই সমগ্র জিনিষটা বলা হয় বেদ। এই তিনটে মিলিয়েই বেদ, আবার যখন তিনটেকে আলাদা করে দেবে তখন আরেকটু বড় পণ্ডিত তাঁরা বলবেন – বেদ মানে তুমি কোনটা বলছ? মন্ত্র বলছ না ব্রাহ্মণ বলছ? তখন আবার বেদ আলাদা হয়ে যাবে। বেদকে যে কত ভাবে আলাদা আলাদা করে ভাগ করা আছে বিদেশীদের ধারণাই

নেই। এই ছয়টি জিনিষকে যদি ঠিক মত না জানা থাকে বেদ কেউ বুঝতেই পারবে না। বেদের পণ্ডিত হতে গেলে এই ছয়টি জিনিষকে তার অবশ্যই জানতে হবে।

আমরা আগেও বলেছি যে ঈশোপনিষদ শুক্লযজুর্বেদের সংহিতার শেষে আসছে, বেদ যেভাবে সাজান আছে সেই ক্ষেত্রে এখানে একটা ব্যতিক্রম এসে যাচ্ছে। আবার এটাও একটা ব্যতিক্রম যে শুক্লযজুর্বেদের মধ্যে আরণ্যক নেই। আরণ্যক বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা শুক্লযজুর্বেদের বৃহদারণ্যক উপনিষদে মিশিয়ে দেওয়া আছে। শুক্লযজুর্বেদের দুটো উপনিষদ, একটা হচ্ছে ঈশোপনিষদ আরেকটা হচ্ছে বৃহদারণ্যক। একটা মজার জিনিষ হচ্ছে শুক্লযজুর্বেদে সংহিতা অংশের ৩৯তম অধ্যায়ের পরেই ৪০তম অধ্যায়ে পাই ঈশোপনিষদ, আরণ্যক নেই, শুক্লযজুর্বেদের এটা হচ্ছে সং হিতা কিন্তু তার ৪০তম অধ্যায় হচ্ছে উপনিষদ, তারপরে ব্রাহ্মণ, তারপরেই বৃহদারণ্যক উপনিষদ। সেইজন্য বেদকে যেভাবে বিভাজন করা হয়েছে তার যে কোন একটা পদ্ধতিতেই আগাগোড়া অনুসরণ করা হয়নি। যে কোন ভাবেই বিভাজন করতে যাওয়া হোক না কেন তাতে অনেক সমস্যা হয়। তবে আমরা যে বিভাজনটা অনুসরণ করছি এটাই হচ্ছে ঠিক ঠিক বেদের বিভাজনের পরম্পরা পদ্ধতি, আমাদের পূর্ব পুরুষরা এই ভাবেই বেদকে বিভাজন করেছিলেন – প্রথমে মন্ত্র বা সংহিতা, তারপরে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও শেষে উপনিষদ। এটাতেও সমস্যা আছে কিন্তু অন্য কোন পদ্ধতিতে বিভাজন করতে গেলে সমস্যাটা আরও বেড়ে যায়। এখন ঈশাবাস্য উপনিষদ যজ্ঞের কাজে লাগবে না, সেইজন্য আদিম কাল থেকে আমাদের ঋষিরা বলে এসেছেন এতা হচ্ছে উপনিষদ।

একই বেদের আবার কয়েকটি শাখা আছে। প্রত্যেকটি শাখাতে যে বইগুলো সাজান আছে সব কয়টা বই আলাদা। বৃহদারণ্যক উপনিষদের কোথায় যে আরণ্যক আর কোথা থেকে যে উপনিষদ শুরু হচ্ছে এটাকে ধরা খুব মুশকিল। অবশ্য বৃহদারণ্যক যখন পড়ান হয় তখন বলে দেওয়া হয় যে এর প্রথম চারটে অধ্যায় হচ্ছে আরণ্যক, তখন আর এই চারটে অধ্যায়কে পড়ান হয় না, কেননা আরণ্যক এখন আমাদের খুব একটা কাজে লাগে না। যদিও শঙ্করাচার্য আরণ্যকের উপরে ভাষ্য রচনা করেছেন কিন্তু আরণ্যক বুঝতে খুব কষ্ট হয়, কিন্তু উপনিষদ বুঝতে অতটা কষ্ট হয় না।

শ্রৌতসূত্র আর গৃহসূত্র যেহেতু বৈদিক যুগের শেষের দিকে এসেছিল তাই অনেক সময় এনারা স্মৃতি শাস্ত্রের মধ্যে অন্তর্গত করে দেন। এগুলো ঠিক শ্রুতির মধ্যে গণ্য করা হয় না, যদিও এই নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। একটা মত মাঝখানে এসেছিল যাতে বলা হয়েছিল যে এই চারটে মন্ত্র বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক আর উপনিষদ তখন যে চারটে আশ্রম ছিল ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বাণপ্রস্ত ও সন্ন্যাস, এই চারটে আশ্রমের জন্য বেদের একেকটা অংশকে ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল। সংহিতা হচ্ছে ব্রহ্মচর্যশ্রাম, ব্রাহ্মণ হচ্ছে গৃহস্থাশ্রম, আরণ্যক বাণপ্রস্তাশ্রম আর উপনিষদ সন্ন্যসাশ্রমের জন্য ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল। এটা একটা মত, কিন্তু স্মৃতি এই ধরণের কোন নিয়মের উল্লেখ আমরা পাইনা। অন্য দিকে আমরা দেখতে পাই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ব্রহ্মচারীদের বেদের শুধু সংহিতাই নয়, পুরো বেদটাই মুখস্ত করতে হত।

বেদের যে এত বিশাল পরিধি, এর মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ, এর সাথে আসছে শ্রৌতসূত্র ও গৃহসূত্র আর এগুলোর আনুষাঙ্গিক হিসেবে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকারণ, জ্যোতিষ, নিরুক্ত ও ছন্দ এই এতগুলো একই লোকের পক্ষে অধ্যয়ন করা আর অধ্যয়ন করান খুবই কঠিণ ও সময় সাপেক্ষ ছিল। একেই বেদের চারটে ভাগ, এই চারটে ভাগের পরেও বেদকে এইভাবে ধরে রাখা কঠিণ ছিল। তাই এনারা করলেন কি একেকটা বিষয়কে বেছে নিয়ে একেক জন ব্রাহ্মণ গুরুকে দিয়ে দিলেন, কেউ হয়তো ঋকবেদের মন্ত্র অংশকে মুখস্ত করছে, সেই গুরু আবার তাঁর শিষ্যদের, সেই শিষ্যরা আবার তার শিষ্যদের দিতে থাকলেন, এইভাবে বেদের একেকটি বিষয় বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। আবার যারা সংহিতা মুখস্ত করছে তারা আবার এই সংহিতার অধ্যায়গুলি যার যার মত করে আগে পরে করে মুখস্ত করেছে। কেউ

হয়ত প্রথম অধ্যায়টা করে তৃতীয় অধ্যায়টা মুখস্ত করছে আবার কেউ হয়ত তৃতীয় অধ্যায়ের পর ষষ্ঠ অধ্যায় করছে, কিন্তু যেটাই করত সেটা পুরোটাই মুখস্ত করে রাখত, মানে কোন অধ্যায়ের কিছুটা মুখস্ত করে ছেড়ে দিয়ে অন্য আরেকটা অধ্যায়কে ধরছে না। এই আগে পরে হওয়ার কারণ হচ্ছে, কোথাও হয়তো কোন যজ্ঞ করতে হবে, সেই যজ্ঞে যে অধ্যায়ের মন্ত্রগুলো দরকার হবে তখন গুরু বলে দিলেন যে আগে এই অধ্যায়টা মুখস্ত করে নাও, পরে যজ্ঞ শেষ হয়ে যাওয়ার পর অন্য অধ্যায় শুরু করা যাবে। এখন শিষ্যরা যে ক্রমানুসারে মুখস্ত করেছে পরে সেই ক্রমটাকেই ধরে রেখেছে। তারপর শিষ্যরা বিবাহ করে আলাদা হয়ে হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। এইভাবে ছড়িয়ে যাওয়ার পরে এদের মধ্যে আবার inter-mixing হয়ে আরও ছড়িয়ে যাওয়াতে একেক জন বেদের একেকটা বিষয়কে ধরে রাখতে শুরু করল। শুধু যে বেদকেই ধরে রাখছিল তা নয়, বেদের পরেও পরিবারগুলিতে যে তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যে নতুন সংস্কৃতি নতুন চিন্তা ভাবনার ধারা সংযোজিত হয়েছিল সেটাকেও ধরে রাখতে শুরু করল। এটাকেই এনারা বলতে শুরু করলেন শাখা। এইভাবে একেকটা বেদের অনেক শাখার জন্ম হল। যে পরিবারগুলির মধ্যে মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, কল্পসূত্র আর অন্য কোন অতিরিক্ত পাঠ্য যখন একই হবে তখন সেটাকে বলবে শাখা বা চরণ।

এখন মনে করা যাক পাঁচটা পরিবার আছে, এই পাঁচটা পরিবারই সামবেদ মুখস্ত করছে। এখন গুরু দেখলেন যে আমার যে পাঁচজন শিষ্য আছে এদের ক্ষমতা সবার সমান নয়। তিনি এক শিষ্যকে মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ শিখিয়ে দিলেন, আরকজনকে বললেন – তোমার বাহ্মণ জানার দরকার নেই তুমি শুধু মন্ত্র আর উপনিষদটা জেনে রাখ। এইখানে শাখাটা পুরো আলাদা হয়ে গেল। ঋকবেদে প্রথমে একুশটি শাখা ছিল, আর এখন মাত্র দুটো শাখা – সকল ও বাস্কল শাখাকে খুঁজে পাওয়া গেছে। সকল ও বাস্কল এনার হচ্ছেন পরের দিককার ঋষি। এনাদের শিষ্যরা আবার কিছু কিছু জিনিষ মুখস্ত রেখেছে, কিছু করেনি। এখন যদি কেউ বলে আমি সামবেদ জানি, এইটুকু বললেই হবে না, তাকে শাখা উল্লেখ করতে হবে, মানে সামবেদের কোন শাখার সে অন্তর্ভুক্ত সেটা বলতে হবে। ঋকবেদের যেমন প্রথম দিকে একুশটি শাখা ছিল, তেমনি কৃষ্ণযজুর্বেদের পঁচাশিটি, শুক্লযজুর্বেদ সতেরো, সামবেদের এক হাজার আর অথর্ববেদের পঞ্চাশটি শাখা ছিল। এখন সামবেদের যেমন এক হাজারটা শাখা ছিল এটা আমরা জানতে পারছি যে পতঞ্জলি এর হাজারটা শাখাকে দেখেছিলেন, সেই সূত্রে আমরা এই তথ্য পাচ্ছি। কিন্তু এই হাজারটি শাখা সামবেদের কয়েকটা ভাগকে মুখস্ত রেখেছিলেন না সবাই কতকগুলি একই জিনিষ মুখস্ত রেখেছিল এটা সঠিক ভাবে এখন বলা মুশকিল। কিছু দিন আগে আবিষ্কার করেছে যে দুটি শাখাতে একটা একই সূক্ত পাওয়া গেছে – একটি শাখা এই সূক্তটিকে উদাত্ত আর অনুদাত্ত দিয়ে মুখস্ত রেখেছে, আরেকটি শাখা এই সূক্তকেই পুরোটাই স্বরিত দিয়ে মুখস্ত করেছে। উদাত্ত আর অনুদাত্ত সহ মুখস্ত করা খুব কঠিণ হয়। এখন একটা অনুমান করা হয় যে – এই শাখার আদিতে যে ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁর হয়তো একটাই শিষ্য আছে, গুরু হয়ত দেখলেন এই শিষ্যের স্মরণ শক্তি অতটা প্রখর নয় বা বুদ্ধিটাও একটু কম থাকতে পারে, কিন্তু একে বিদ্যা দিতে হবে তা নাহলে পুরো বিদ্যাটাই হারিয়ে যাবে। তখন হয়ত গুরু সেই শিষ্যকে বলে দিলেন – তোমাকে এর সুরটা মনে রাখতে হবে না, শুধু স্বরিত দিয়ে কবিতার মত মুখস্ত করলেই হবে। পরে এর যখন শিষ্য হল তাদেরকেও সে কবিতার মত মুখস্ত করিয়েছে।

এখন যদি মনে করা যায় একটি শাখা কাশ্মীরে ছিল, আরেকটি শাখা কোন ভাবে ঘুরতে ঘুরতে আসামে চলে গেছে। ম্যাক্সমূলারের লোকেরা যখন ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বেদের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করতে শুরু করলেন তখন একই বিষয় বস্তু দুটো আলাদা শাখায় পাওয়া যেতেই তারা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু একটাই পার্থক্য দেখা গেল, একটা শাখাতে এটা সুর দিয়ে আছে আরেকটা শাখাতে সুর দিয়ে নেই। একটা শাখায় সুর আছে আর আরকটা শাখায় সুর নেই তাই এটাকে দুটো শাখাই ধরতে হবে। আবার আরেকটা শাখাতে দেখা যায় কিছু কিছু মন্ত্রের সুর হারিয়েই গেছে।

অনেকে বলে আজ পর্যন্ত বেদের যত গুলি শাখা পাওয়া গেছে তাছাড়াও আরও কিছু শাখা আছে, ম্যক্সমূলার যখন বেদের সংগ্রহ কাজ করছিলেন তখন অনেক পণ্ডিত তাঁদের পাণ্ডুলিপি ম্যাক্সমূলারের লোকেদের না দিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল। এখনও এই রকম অনেক শাখা পাণ্ডুলিপি রূপে রয়ে গেছে, এখনও ছাপা হয়নি। এখন যদিও এই পাণ্ডুলিপিগুলিকে উদ্ধার করে ছাপা হয় তাহলে এইগুলো সত্যিই বেদ কিনা এটা বিদ্বৎ পণ্ডিতদের দিয়ে বিচার করেও বোঝা সম্ভব হবে না। আকবর যখন দিল্লীর বাদশা ছিলেন তখন একটা উপনিষদ লেখা হয়েছিল, তার নাম দেওয়া হয়েছিল আল্লাহোপনিষদ, যাতে বলা হচ্ছে আল্লাই হচ্ছেন সব কিছু। এখন আমরা কতটা মানব যে এটা একটা উপনিষদ। এখন কোন পণ্ডিত কোন পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসে বলে দিতে পারেন এটা বেদের অঙ্গ। এমন কি কোন বেদের অঙ্গ সেটাও বলে দেবে। যদি বলেন – কিন্তু আরতো কেউ এটাকে বেদ বলে জানেনা। তখন পণ্ডিত বলবে – যে বেদগুলো লুপ্ত হয়ে গেছে এটা তারই একটা শাখা। এই ভাবে দিনে দিনে উপনিষদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। যদি বলা হয় এই উপনিষদের আগের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ এগুলো কোথায়, তখন বলবে ওগুলো হারিয়ে গেছে। এখন এর প্রতিবাদ কে করতে যাবে আর কিভাবেই বা প্রমাণ করবে যে এটা সেই হারিয়ে যাওয়া বেদেরই একটা অংশ। আমরা প্রথমে শুনেছিলাম আটাত্তর খানা উপনিষদ আছে, এখন বলছে দুশোটা উপনিষদ তৈরী হয়ে গেছে।

আমরা যে ঋষিদের নাম পেয়েছি পৈলা, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি আর সুমন এনারা ব্যাসদেবের শিষ্য ছিলেন। আমরা এর আগে দেখেছিলাম কিভাবে কৃষ্ণযজুর্বেদ আর শুক্লযজুর্বেদ সৃষ্টি হয়েছিল। বৈশাম্পয়নের শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যের সাথে তাঁর গুরুকে ত্যাগ করে আলাদা ভাবে উপাসনা করে সূর্যের কাছে সেই পুরো বিদ্যাটাই পেলেন যেটা তিনি ত্যাগ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ আর শুক্ল যজুর্বেদে সেই একই জিনিষ রয়েছে কিন্তু অধ্যায় গুলো আগে পরে করে আলাদা ভাবে সাজান আছে। যেমন তৈত্তরীয় শাখা, আর এর আছে বাৎসরীয় শাখা, এর দুটো শাখার সংহিতার অংশের অধ্যায়গুলোর সাজানটা আলাদা। যদি অধ্যায়গুলিকে আলাদা ভাবে সাজান হয়ে থাকে তাহলে তখন সেটা একটা আলাদা শাখা হয়ে যাবে। যেমন কঠোপনিষদকে বলা হয় পিপ্পলাদ শাখা। যদি পিপ্পলাদা শাখার বেদের শৌনক শাখা কোথাও পাওয়া যায় সেখানে কঠোপনিষদ থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে।

শুক্লযজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ খুব বিখ্যাত। অনেক কিছুকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শতপথ ব্রাহ্মণের কথা উল্লেখ করা হয়। শঙ্করাচার্য যখন গীতার ভাষ্য লিখছিলেন তখন তিনি অনেক জায়গাতে একটা কথা বলে বলছেন – শতপথ ব্রাহ্মণে এইভাবে বলা আছে, বা শতপথ ব্রাহ্মণে আমরা এই কথাটা পাই। ব্রাহ্মণে যদিও প্রধাণত যজ্ঞের কথাই বলা হয়েছে কিন্তু তার মধ্যে কিছু কথা ও কাহিনীও পাওয়া যাবে। সামবেদের প্রচুর ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়। অথর্ব বেদের গোপদ ব্রাহ্মণও খুব নামকরা। অথর্ব বেদের ব্রাহ্মণ এই একটাই আছে কিন্তু এই বেদের আরণ্যক কিছু নেই। অথর্ব বেদে মন্ত্র, ব্রাহ্মণ থেকে সোজা উপনিষদে চলে গেছে, মাঝখানে আরণ্যক নেই। অথর্ব বেদের উপনিষদ হচ্ছে – প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য।

আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, অর্থশাস্ত্র এগুলিকে উপবেদ বলা হয়। এগুলোর মধ্যে আবার শুক্ল ও কৃষ্ণ যজুর্বেদের দুটোতেই একই জিনিষ পাওয়া যাবে। যেমন দুটোরই উপবেদ হচ্ছে ধনুর্বেদ। এই তথ্য যদিও কোন বিশেষ কাজে লাগবে না, কিন্তু বেদ পড়তে গেলে এই তথ্যগুলি জানা থাকলে বেদ পাঠ করতে অনেক সহজ হয়ে যায়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পুরোহিত। যজ্ঞের সময় ঋকবেদের তরফ থেকে যে পণ্ডিত আসন গ্রহণ করতেন তাঁকে বলা হত হোতা বা হোত্রি। যজুর্বেদ থেকে যিনি পুরোহিত হবেন তাঁকে বলা হয় অদ্বর্জু। যিনি অর্ঘ অর্পণ করেন তাঁকে অদ্বর্জু বলা হয়, যজ্ঞে তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ঋকবেদের ব্রাহ্মণ পর পর শুধু মন্ত্রগুলি বলে যাচ্ছেন, আর যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ আহুতিটা যজ্ঞে ঢালতে থাকেন। সামবেদের ব্রাহ্মণকে বলা হয় উদ্‌গাতা বা উদ্‌গাত্রি, যিনি উদ্‌গীত গান করেন। উদ্‌গীতকেই বলা হয়

সামগান। অথর্ব বেদের ব্রাহ্মণকে বলা হয় ব্রহ্মা, উনি হচ্ছে পর্যবেক্ষক। ব্রহ্মা কিছুই করবেন না, কিন্তু যজ্ঞের সব কিছু ঠিক ঠিক ভাবে চলছে কিনা সব লক্ষ্য রাখেন। সেইজন্য অথর্ব বেদের যিনি পুরোহিত হতেন তাঁকে পুরোটাই জানতে হত। সামগান ঠিক সুরে ছন্দে হচ্ছে কিনা, যজ্ঞে আহুতি ঠিকমত হচ্ছে কিনা, আর ঋকবেদের ঋচাগুলি ঠিক ঠিক সুর লয়ে হচ্ছে কিনা, সবটাকে নজর রাখা ছিল ব্রহ্মার কাজ, এই কারণে তাঁকে সবটাই জানতে হত। বর্তমান যুগে চারজনের পরিবর্তে দুজন থেকে গেছেন আর তাঁদের নামও পাল্টে গেছে – পুরোহিত আর তন্ত্রধারক। কিন্তু উপনয়নের মত কিছু সামাজিক অনুষ্ঠানে বিশেষ করে পরম্পরা মতে যেসব অনুষ্ঠান হয় সেখানে তন্ত্রধারকের পরিবর্তে ব্রহ্মার ভূমিকাকে এখনও কোথাও কোথাও ব্যবহার করা হয়। তন্ত্রমতে যত রকমের পূজা হবে সেখানে তন্ত্রধারক বলা হয়। কিন্তু বৈদিক মতের অনুষ্ঠানে ব্রহ্মা থাকেন পর্যবেক্ষক হিসাবে। এখন পুরোহিত সব ধরণের অনুষ্ঠানেই থাকে। তবে এখনও ভারতের কোন কোন জায়গায়, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে কেরল অঞ্চলে যখন কোন যজ্ঞ-যাগ হয় সেখানে এই চারজনকেই হোতা, অদ্বর্জু, উদ্‌গাতা ও ব্রহ্মাকে রাখা হয়।

সামবেদে একটা মজার ব্যাপার হল, সামবেদে বলছে এর হাজারটা শাখা কিন্তু এর ঋচার সংখ্যা মাত্র ১৮৭৫ টি। কিন্তু সামবেদের যে এতগুলো ব্রাহ্মণ আছে – বংশ, জৈমিনীয়, তাণ্ডীয়, ছান্দোগ্য, সংবিধানীয়, ষট্‌বংশীয় ইত্যাদি, এর সব কটাই সে মুখস্ত করবে না। হয়তো এর চারটেকে মুখস্ত করল আর বাকি চারটেকে বাদ দিয়ে দিল, তখনই এর শাখা আলাদা হয়ে যাবে। তেমনি কৃষ্ণযজুর্বেদে পাঁচ খানা উপনিষদ আছে, এর মধ্যে হয়তো সে তিনটে মুখস্ত করেছে বাকি দুটো করেনি তখন এর শাখা আলাদা হয়ে যাবে। এই ভাবে বিভিন্ন শাখা আলাদা হয়েছে।

বেদের ভাষা নিয়ে আমরা এর আগেই কিছু আলোচনা করেছি। বেদের ভাষা যে শুধু সংস্কৃত নয় খুবই পুরনো সংস্কৃত। ভাষার সুরটাকে তিন রকমের করা হয়েছে – উদাত্ত, অনুদাত্ত আর স্বরিত। কখন সুরটা উপরে যায় আবার নীচে যায় আবার সমান থাকে, উদাত্তে সুরটা উপরে যাচ্ছে, অনুদাত্তে সুরটা নীচে আসে আর স্বরিততে সুর সমান থাকে। যাস্ক, যিনি ৭০০ খ্রীষ্টপূর্বে ছিলেন, তিনি বেদের শব্দগুলির অর্থকে ব্যাখ্যা করার জন্য নিরুক্ত রচনা করলেন। যাস্ক যে প্রথম নিরুক্ত লিখেছেন তা নয়, তাঁরও আগে পরম্পরা ছিল। যাস্ক নিজেই উল্লেখ করছেন যে তিনি এই নিরুক্ত কৌস্তভ বলে একজন ঋষি ছিলেন তাঁর লেখা নিরুক্তকে আধার করে এটা লিখেছেন, কৌস্তভ আবার আরেকজনকে আধার করে লিখেছেন। এগুলোর পর পর উল্লেখ পাওয়া যায়। যাস্ক যখন এই নিরুক্ত লিখেছেন তখনই বেদের ভাষা খুব কঠিণ হয়ে গেছে। এই কারণেই বলে যে বেদ বোঝা অত্যন্ত কঠিণ।

বেদের কবিতা খুবই উচ্চমানের। এর মধ্যে একটা ছন্দ সব সময় থাকবে। আর ছন্দগুলি একেবারে সুন্দর করে একেবারে বেঁধে দেওয়া আছে, এর বাইরে থাকবেই না। বেদের সবটাই ছন্দে বাঁধা। একটা কবিতাতে যদি চারটে লাইন থাকে তাহলে একটা লাইনে এক ধরণের কথা বলবে, পরের লাইনে অন্য কথা বলবে না। প্রত্যেকটা লাইনই একে অপরের পরিপূরক। যেমন ধরা যাক – জনগণমনধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা, এখানে একই জিনিষ বলা হচ্ছে। কিন্তু কিছু কবিতা আছে যেখানে ভাবটা একই থাকবে কিন্তু চারটে লাইনে চার রকমের কথা বলা হবে। বেদে কিন্তু এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। আবার যেখানে চারটে চারটে করে যদি পদ থাকে সেখানে সব পদের মধ্যে একটা যোগসুত্র পাওয়া যাবে। একটা পদ আরেকটা পদে পাঠক-পাঠিকাকে পৌঁছে দিচ্ছে। জনগণমনধিনায়কের মধ্যে যে পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা এই পদটা যেখানে আছে সেটাকে যদি আগে পরে করে দিই তাহলে কবিতার কোন পরিবর্তন হবে না। তার অর্থ হচ্ছে পদগুলি পরিপূরক নয়। আরও ভালো বোঝা যাবে যদি বলি রামকথার অধ্যায়গুলি আগে পরে করে দেব, তাহলে রাবণ আগে মরে যাবে আর সীতার বিয়ে পরে হবে। এটা আমরা কখনই করতে পারব না, অর্থাৎ এখানে অধ্যায়গুলো একে অপরের সাথে সংযুক্ত আছে। আবার একেকটা অধ্যায়ে যে ছোট ছোট ভাগ আছে সেগুলও একে অপরের পরিপূরক। একটা পরিচ্ছেদ আরেকটা পরিচ্ছেদের দিকে

এগিয়ে যায়। যেমন – দশরথ বশিষ্ট মুনিকে নিয়ে বসে আছেন, বিশ্বামিত্রের আগমন। আমরা কখনই এখানে বলতে পারব না যে বিশ্বামিত্র দশরথের আগে এসে বসে আছেন। এইভাবে লেখা হলে কাহিনীটা ভেঙ্গে যাবে। বেদও ঠিক এই নিমটাকেই অনুসরণ করেছে। এটা এইজন্য বলা হচ্ছে না যে এগুলো ভালো আর ঐগুলো খারাপ, এটা শুধু আমরা বেদের সাহিত্য রচনা কি পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে সেটা আলোচনার জন্য বলা হল। আবার বেদের সব পদই যে একটার সঙ্গে আরেকটার সম্পর্ক থাকবে তা নয়, কিন্তু বেশির ভাগ পদেই সম্পর্কটা বজায় রেখে রচিত হয়েছে।

পরবর্তি কালে ভারতে যত ধরণের কাব্য রচনা করা হয়েছে তার পুরোপুরি বেদের কাব্য যে পদ্ধতিকে আধার করেই রচিত হয়েছে। প্রথম নিলেন বাল্মীকি, তিনি যখন রামায়ণ রচনা করলেন তিনি বেদের যে স্টাইল সেটাকে অনুসরণ করেই রচনা করেছেন। হনুমান এক ঘুঁষি মারল সে একশ যোজন দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ল – এটাকে বলা হবে বাল্মীকি অতিরঞ্জিত করে বাড়িয়ে বলছেন। এই ধরণের অতিরঞ্জিত ব্যাপার আমরা বেদেই পাই। যদিও অতিরঞ্জিত কিন্তু কাব্যের সৌন্দর্যের উৎকর্ষতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। কোন ধরণের কাজকে কোন ভাবকে বোঝাবার জন্য কবিতার মধ্যে নতুন নতুন শব্দ আর ছন্দ দিয়ে এত সুন্দর করে সাজাবে যে কবিতাকে যে পাঠ করবে তারই মনের মধ্যে গেঁথে যাবে। বেদের কবিতাও ঠিক এই ধরণের তাই বিশ্বের কাব্য রসিকরাও বেদের কবিতাকে অত উচ্চমানের বলে স্বীকার করেন। স্বামীজীও বেদের কবিতার মাধুর্যকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলছেন যে বেদের কবিতার সামনে অন্য কোন কবিতা দাঁড়াতে পারেনা। নাসদীয় সূক্তের আলোচনাতে স্বামীজীর যে মন্তব্য করেছেন তাতেই এই প্রশংসার কথা আমরা জানতে পারি। নাসদীয় সূক্তে ঘন অন্ধকারের যে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে স্বামীজী কালিদাসের তুলনা করে বলছেন যে কালিদাস এটা কে বর্ণনা করছেন সুচীভেদ্য অন্ধকার, এমন ঘন অন্ধকার যে সেই অন্ধকারকে ছুঁচ দিয়ে ভেদ করা যায় না। আর এই ঘন অন্ধকারকেই বেদের নাসদীয় সূক্তে বলছে অন্ধকার অন্ধকারে ঢাকা। অন্ধকারকে কবি আর বোঝাতে পারছেন না, তাই বলছেন অন্ধকার অন্ধকারে ঢাকা। এইখানে একটা সমস্যাও হয়, এখন অন্ধকার অন্ধকারে আচ্ছাদিত এইটা কি কবিতা না দর্শন? ভারতের পণ্ডিতরা বলবেন এটা কবিতা এতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে এক উচ্চ দর্শন, এই তত্ত্বকে তোমাকে বাস্তব সত্য বলে সাত্ত্বিক অর্থে গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা বলবেন এটা কবিতা, এদের ভারতীয় ঋষিদের ক্ষমতার কোন ধারণাই নেই, কারণ এদের একমাত্র ঋষি হচ্ছেন যিশু খ্রীষ্ট। কবিতা হচ্ছে পুরো আলাদা একটা ক্ষমতা, কবিত রচনা হচ্ছে একটা মেধা, সবার মধ্যে এই ক্ষমতা থাকেনা, যিশু খ্রীষ্ট, ঠাকুর এনাদের মধ্যে এই কবিত্ব ছিলনা, তাঁরা কোন কবিতা রচনা করেননি, কিন্তু স্বামীজীর মধ্যে কবিত্ব ছিল, তাঁর বাংলা কবিতাগুলি অত্যন্ত উচ্চমানের। ঠাকুর দু-চারটে গ্রাম্য ছড়া জানতেন, আর কিছু গান জানতেন, এর বাইরে তাঁর কবিতার ব্যাপারে বিশেষ কিছু জানা ছিল না। খ্রীষ্টানরা জানেই না যে দর্শনকেও কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। স্বামীজী নিজেও দর্শনকে কবিতার মাধ্যমে উপস্থাপনা করেছেন, বিশেষ করে তাঁর সন্ন্যাসীগীতি একদিকে উচ্চ দর্শন আবার অন্য দিকে খুবই উচ্চমানের কবিতাও বটে। মানবজাতির যত মৌলিক দর্শন আছে তার সবটাকেই বেদ কবিতার মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করে ভারতের সাহিত্য রত্নভাণ্ডারকে সমৃদ্ধশালী করে গেছে।

বেদে অনেক ধরণের ছন্দ পাওয়া যায়। বেদে সাধারণত চারটে পদে (স্তবক) একটা মন্ত্র পূর্ণ হয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিন বা পাঁচটি পদেও মন্ত্র রচনা করা হয়েছে, তবে ছয় পদের উপরে কোন কবিতা হয় না, ছয় পদের উপরে কবিতা গুলিকে সুর ও ছন্দে বাঁধা খুব কঠিণ হয়। আর প্রত্যেকটি পদে আট, এগারো বা বারোটা করে অক্ষর থাকবে, তবে কখন কোথাও অন্য সংখ্যাও থাকতে পারে। সংস্কৃতে দুই রকমের ছন্দ হয় একটা আক্ষরিক আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে মাত্রিক। সংস্কৃতে মূলতঃ আক্ষরিক মাত্রাকেই ব্যবহার করা হয়। এখানে অক্ষরের সংখ্যাকে গোণা হয় শব্দের উচ্চারণের মাত্রা অনুযায়ী, সেখানে দীর্ঘস্বর থাকুক, অক্ষর একা থাকুক কি যুক্ত থাকুক তাতে কিছু আসবে যাবে না, অক্ষর গোণার ক্ষেত্রে উচ্চারণই হচ্ছে একমাত্র

ভিত্তি। আমরা গীতার প্রথম শ্লোকটাকে যদি দেখি তাহলে এটা পরিষ্কার করে বুঝতে পারব – ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ – এখানে 'ধর্ম' হচ্ছে যুক্তাক্ষর, এখানে এক 'ধ' ও 'ম' কে একটা অক্ষর, রেফ্‌কে অক্ষর হিসাবে ধরা হবে না, কিন্তু এটাকেই যদি 'ধরম' লেখা হত তখন তিনটে অক্ষর গোণা হবে। ঠিক সেই রকম 'ক্ষে' এর মধ্যে 'ক' আছে আর 'ষ' আছে আবার 'এ'কার আছে, এটাকেও একটা অক্ষর গোণা হবে। আক্ষরিক ছন্দে 'ক্ষে'কে একটাই অক্ষর ধরা হবে কিন্তু, যখন মাত্রিক মাত্রায় গোণা হবে তখন এটাকে দুটো অক্ষর ধরবে।

চারটে করে পদ আছে, প্রত্যেকটা পদে যদি এইভাবে আটটা করে অক্ষর থাকে (৮X৪) তখন এই ছন্দের নাম হবে অনুষ্টুপ ছন্দ, গীতার বেশির ভাগ শ্লোকই অনুষ্টুপ ছন্দের আর সমগ্র মহাভারত মোটামুটি অনুষ্টুপ ছন্দেই রচিত হয়েছে। আট চার যেমন দেখলাম, ঠিক সেই রকম আট পাঁচ, আট ছয়ও হতে পারে, কিন্তু সাধারণত ছয়ের উপরে থাকে না। আর যেমন যেমন অক্ষরের সংখ্যা কম বেশি হবে আর পদের সংখ্যাও যেমন যেমন কম বেশি হবে তখন সেটাই একেকটা ছন্দ হবে। গায়ত্রী ছন্দে তিনটে লাইন আর আটটা করে মাত্রা বা অক্ষর থাকবে। পঙতি ছন্দ হচ্ছে পাঁচটা পদ আর আটটা অক্ষর, বেদে এই ছন্দ অনেকবার ব্যাবহার হয়েছে। জগতি ছন্দ এখনও খুব জনপ্রিয়। বেদে মোটামুটি এই চার ধরণের ছন্দ – অনুষ্টুপ, গায়ত্রী, পঙতি ও জগতি ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

এখন 'অগ্নিমীডে পুরোহিতং(১) যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্‌(২)। হোতারং রত্নধাতমম্‌(৩)' ঋকবেদের প্রথম মন্ত্র, এর মধ্যে আটটি করে মাত্রা আর চারটে করে লাইন আছে। এখন এক, দুই ও তিনটি পদের মাত্রাগুলি আটটা অক্ষরে সাজান হয়েছে। সংস্কৃতের ব্যাকরণকে একবার বুঝে গেলে অক্ষর গোণার আর সমস্যা হবে না। সংস্কৃত ভাষা একেবারে ব্যাকরণের ছকে বাঁধা। এইটাই সংস্কৃতের শক্তি। তবে যার যেটা শক্তি সেটাই আবার তার দুর্বলতার জায়গা। যেমন বৌদ্ধ ধর্মের অহিংসা হচ্ছে পুরো শক্তি আবার এই অহিংসাই বৌদ্ধ ধর্মের কাল হয়ে গেল। বিধর্মীরা যখন বৌদ্ধ ধর্মের উপর আক্রমণ করল তখন তাদের বাঁচার আর কোন পথ থাকল না। আগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে বৌদ্ধ ধর্মের কি প্রচণ্ড বিস্তার হয়েছিল, কিন্তু পরে মুসলমানদের যখন অনুপ্রবেশ হতে থাকল তখন তারা বৌদ্ধ ধর্মের উপরে এমন আক্রমণ করল যে আজ ইন্দোনেশিয়া থেকে আরম্ভ করে অনেক দেশ সব মুসলিম প্রধাণ রাষ্ট্র হয়ে গেল। মুসলমানদের শক্তি হচ্ছে জেহাদ, এই জেহাদই মুসলমানদের এখন শেষ করে দিচ্ছে। ডাইনোসরাসের মত প্রাণীরা লুপ্ত হয়ে গেল কেন? এত বিশাল শরীর, কিন্তু যখন খাদ্য সংকট দেখা দিল প্রথমে ডাইনোসরাসরাই হারিয়ে গেল। এইটাই প্রকৃতির নিয়ম, সেইজন্য বলে কোন কিছুই বেশি করতে নেই, একটা জায়গায় গিয়ে ইতি টানতে হয়। সংস্কৃত ভাষাকে এত বেশি নিয়ম-কানুনে আবদ্ধ করে দেওয়ার ফলে সংস্কৃতের জনপ্রিয়তা হারিয়ে যাচ্ছে।

যারাই বেদ নিয়ে অধ্যয়ন করতে গেছে তাদের প্রত্যেককেই একটা প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে, বলছে যে বেদে নাকি অনেক জাগতিক ব্যাপার রয়েছে। কিন্তু বেদের পণ্ডিতরা বলে বেদে জাগতিক ব্যাপার বলে কিছু নেই। যেমন অনেক বিবাহের কথা বেদে আছে। একটা খুব স্পর্শকাতর সূক্ত আছে যেখানে দেখান হয়েছে যে একটি অল্প বয়সী সদ্য বিধবা মেয়ে তার মৃত স্বামীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে কাঁদছে, আর একজন কেউ তাকে এসে সান্ত্বনা দিচ্ছে, সে যে কেউই হতে পারে, মেয়েটিকে বিয়ে করতে চায় এমন কোন পুরুষ, বা তার ভাই হতে পারে, মৃত স্বামীর ভাই হতে পারে। সে খুব হৃদয়ের আবেগ দিয়ে মেয়েটিকে বোঝাচ্ছে – দ্যাখো, যে যাবার সে অন্য জগতে চলে গেছে, এখন তুমি তোমার বাকী জীবনের কথা ভাব। এই ধরণের কিছু কবিতা আছে যেগুলিকে অনেকে বলেছে যে এগুলো সব হচ্ছে বেদের পার্থিব জগতের কবিতা। আরেকটা সূক্ত আছে সেখানে বলছে – ব্রাহ্মণরা সামগান করছে আর এদের গানগুলো শোনাচ্ছে যেন বর্ষাকালে ব্যাঙগুলি গ্যাঁও গ্যোঁ করে আওয়াজ করছে। পণ্ডিতরা কিন্তু বলছেন এগুলি কিন্তু জাগতিক কবিতা নয়, কারণ এখন যদি কোথাও অনাবৃষ্টি চলতে থাকে তখন এই সূক্তটাই যদি কোথাও ঠিক ঠিক গান করা হয় তাহলে বৃষ্টি হবে। আর আগের যে সূক্তটার কথা বলা হল, তার ব্যাপারে বলছে,

মানুষ যদি কখন মৃত্যুজনিত কোন প্রচণ্ড আঘাত পায় তখন তাকে যদি এই মন্ত্রগুলি শোনান হয় তাহলে সে তার শোককে জয় করতে পারবে। ঠিক এই রকমই আরেকটা সূক্ত আছে এক জুয়াড়িকে নিয়ে। একজন খুব জুয়া খেলে সব কিছু খুইয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে। এখন সে ক্রন্দন করছে – আমার এত দিনের যা কিছু সঞ্চয় ছিল সব শেষ হয়ে গেছে, আমি কি করে বাড়ি ফিরব, আমার স্ত্রী আর আমার মুখের দিকে তাকাবে না, আমার মা-বাবা, যাঁরা আমাকে এত স্নেহ করেন, তাঁরাও আমাকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে এড়িয়ে যাবে। খুব মজার কবিতা, শেষে বলছে – ভাইরে ভাই, তোদের সবাইকে বলি, আর যাই করিস জুয়া যেন খেলতে না যাস। আপাত ভাবে শুনলে মনে হবে এটা একেবারেই সাদামাটা জাগতিক কবিতা। কিন্তু পণ্ডিতরা বলছেন যাদের জুয়া খেলাতে প্রচণ্ড নেশা হয়ে গেছে তাদের এই সর্বস্বান্তক নেশাকে যদি ছাড়াতে হয় তাহলে এই মন্ত্রের দ্বারা যদি তাকে উপচার করা হয় তাহলে তার এই জুয়া খেলার নেশা চলে যাবে।

বেদে আবার উর্বশী পুরুরবা সংবাদ নামে কিছু কিছু পৌরাণিক সংলাপও আছে। কিন্তু এগুলোরও পৌরাণিক মূল্য আছে শুধুই সাহিত্য নয়। ফ্রান্সের একজন খুব নামকরা সাহিত্যের গবেষক খুব কড়া ভাষায়, যদিও তিনি ফ্রান্সের লোক, বলছেন – বেদে সাহিত্য বলে কিছু নেই, যা কিছু বেদে আছে তা হয় ধার্মিক নয়তো আধ্যাত্মিক। শুধু যে কাহিনীই আছে তা নয়, খুব মজার ধাঁধাও আছে, একটা ধাঁধা আছে যেখানে দশটি দেবতার ব্যাপার নিয়ে। এখনকার দিনে যেমন স্কুলে ছাত্রদের ভর্তির জন্য পরীক্ষা দিতে হয়, তখনকার দিনে গুরুর কাছে যখন শিষ্যরা বিদ্যার্জনের জন্য যেতেন তখন গুরুও ছাত্রকে অনেক পরীক্ষা করে শিষ্য করতেন। এখানে দশটি দেবতার নাম বলে তাদের চরিত্রের বর্ণনা করা হয়েছে, একটা নাম বলে তার চরিত্র বর্ণনা শুনে বলতে হবে কোন দেবতার কথা বলা হচ্ছে। তুমি বেদ পড়তে আসছ দেবতার সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি রকম সেটাকে জানার জন্য এই ধরণের ধাঁধা বেদে দেখা যায়, এটাও অবশ্য একটা ব্যাখ্যা। এসব ছাড়া ঐতিহাসিক, ভৌগলিক সংক্রান্ত অনেক তথ্যও বেদে আছে। ভৌগলিক তথ্য দ্বারা অনুমান করা যায় যে বৈদিক সভ্যতা পাঞ্জাবের কাছাকাছি কোথাও শুরু হয়েছিল। ঐতিহাসিক তথ্যের মধ্যে একটা জায়গায় দেখা যায় যে বলা হচ্ছে – তারা দাসদের পরাজিত করেছে। এখান দাসদের হারিয়েছে বলতে পণ্ডিতরা বলছেন আর্যরা এসে অনার্যদের হারিয়েছে। কিন্তু যখন মহেঞ্জদারো হরপ্পা আবিষ্কৃত হল তখন বলা হল যে মহেঞ্জদারো হরপ্পার বাসিন্দারা ছিল অনার্য, এদেরকেই আর্যরা হারিয়েছে। এই বলে মতটাকে সত্য বলে ধরে নিয়েছিল। এখন আরও গবেষণার পর বলছে যে আসলে মহেঞ্জদারো হরপ্পা আর্যদেরই নাকি সভ্যতা ছিল। তার কারণ হিসেবে বলছে যে যদি মারামারি কাটাকাটি হত তাহলে কিছু মৃতদেহের কঙ্কাল পাওয়া যাবে। সমগ্র মহেঞ্জদারোর খনন কার্য চালিয়ে সব কিছু, ঘর, বাড়ি, বাসন, অস্ত্রশস্ত্র সবই পাওয়া গেছে কিন্তু একটা কোন প্রাণীর কঙ্কাল পাওয়া গেল না। তখন ঐতিহাসিকরা সিদ্ধান্তে করলেন যে কোন কারণে বন্যা বা অন্য কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে লোকজন অঞ্চল ছেড়ে অন্য নিরাপদ জায়গায় চলে গিয়েছিল। ঐতিহাসিক পণ্ডিতরা একেক সময় একেকটা মত নিয়ে আসে। কিন্তু যাঁরা পরম্পরা পণ্ডিত তাঁরা বলেন – দাস হচ্ছে যে কোন মানুষ যার মধ্যে, এখন যদি কোন বাক্যে থাকে ইন্দ্র এসে আক্রমণ করে দাসগুলিকে হারিয়ে দিল। এটাকে যদি ঐতিহাসিক কবিতা বলে মনে করা হয় তাহলে এর অর্থ এক রকম হবে, যদি বলা হয় এটা একটা প্রার্থনা তখন এর অর্থ অন্য রকম করে বলবে ইন্দ্র হচ্ছে দৈবী শক্তি আর আমাদের মধ্যে যে আসুরিক শক্তি আছে সেটাকে দমন করার জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে – হে ইন্দ্র তুমি আমাদের সাহায্য কর যাতে আমরা দাসগুলিকে হারাতে পারি। দাস অর্থ হচ্ছে আমাদের মধ্যে যে আসুরিক বৃত্তি গুলি আছে সেগুলো। মানুষে জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বেদের সময় চারটে বর্ণ এসে গিয়েছিল। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণ বা মহাভারতের সময়ের মত বর্ণাশ্রম অতটা দৃঢ় ছিল না। যেমন একজন বলছে আমার বাবা ব্রাহ্মণ আমার মা ক্ষত্রিয় আর আমি নিজে শূদ্রের কাজ করি। তার মানে বেদে একই পরিবারের সদস্য কেউ ব্রাহ্মণের কাজ করছে কেউ ক্ষত্রিয়ের কাজ করত।

এখন আমরা বেদের প্রথম সূক্তের অর্থকে নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। বেদের প্রথম সূক্ত বলে আমাদের সবারই এটাকে জানা দরকার। একট সূক্তকে জানলে বুঝতে পারব বেদের ঋচাগুলি কি রকম আর তা কিভাবে লেখা হয়েছে। ঋষিদের পরম্পরা আমরা শুনে এসেছি যে যখন কোন যজ্ঞে দেবতাদের আবাহন করা হত তখন দেবতারা সশরীরে সেই যজ্ঞস্থলে হাজির হতেন। সমস্ত দেবতাদের তাঁদের পদমর্যাদা অনুযায়ী সেই যজ্ঞের ভাগ দেওয়া হত। যজ্ঞের ভাগ নিয়ে আবার দেবতাদের মধ্যে প্রায়ই বিবাদ বিতণ্ডা হওয়ার ঘটনাও অনেক আছে। আগেকার দিনে ভারতে ডাক্তারদের সম্মান খুব একটা ছিল না। ঠাকুরও ডাক্তারদের দেওয়া সামগ্রি স্পর্শ করতে পারতেন না। কেন জানা যায় না, ডাক্তারি পেশাকে খুব হেয় নজরে দেখা হত। দেবতাদের মধ্যেও ডাক্তারদের প্রতি এই হেয় মনোভাবটা বরাবরই ছিল। অশ্বিনীকুমারদ্বয় ছিলেন দেবতাদের ডাক্তার। এই দুই দেবতাদের যজ্ঞের কোন ভাগ দেওয়া হত না। পরে অবশ্য এনারা যজ্ঞের ভাগ পাবার অধিকারী হয়েছিল। মহাভারতে আমরা এর কাহিনী পাই। শিবও প্রথমের দিকে যজ্ঞ ভাগের অধিকারী ছিলেন না।

যারা বেলুড় মঠে বা মঠের অন্যান্য কেন্দ্রে কোন যজ্ঞ দেখার সুযোগ পান তারা দেখবেন যজ্ঞের সময় বলা হয় – শ্রীরামকৃষ্ণ সপার্ষদ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ট ইহ সন্নিধি কুরু। এটি একটি মন্ত্রে এই মন্ত্রে ঠাকুরকে আবাহন করে বলা হচ্ছে হে প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণ আপনি আপনার সমস্ত পার্ষদেরকে নিয়ে এই স্থানে আসুন এবং অবস্থান করুন। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে এই ধরণের মন্ত্রের কি কোন প্রাসঙ্গিকতা বা মূল্য আছে? ঋষিরা কবে কি বলে গেছেন আর তার সত্যতাকে এখনও আমাদের অনেকের মনে সন্দেহের বাতাবরণ তৈরী করে। কিন্তু এই যুগে আমাদের কাছে আছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন। ঋষিদের কথার সত্যতাকে যাচাই করার সব থেকে বড় মানদণ্ড হচ্ছে ঠাকুরের জীবনের বহু ঘটনা। ঠাকুর যখন পূজো করতে বসতেন তখন তিনি হাতের তালুতে জল নিয়ে 'রং' এই বীজ মন্ত্রোচ্চারণ করে তাঁর চতুর্পার্শ্বে ছিটিয়ে দিতেন। এই বীজ মন্ত্রের দ্বারা পূজার সময় বাইরে থেকে যে সব বিঘ্ন হওয়ার সম্ভবনা থাকে সেই বিঘ্ন আর আসেনা। যে কোন ভালো জিনিষ করতে গেলে নানা ধরণের বিঘ্ন আসবেই। ঠাকুর নিজের মুখে বলছেন তিনি যখন 'রং' বলে তাঁর চারপাশে জল ছিটিয়ে দিতেন তখন তিনি পরিষ্কার দেখতে পেতেন যে আগুনের একটা বলয় তাঁকে ঘিরে রেখেছে। অগ্নির ঐ বলয়কে অতিক্রম করে আর কেউ পূজাস্থলে প্রবেশ করতে পারবে না। আমাদের ভেতরে সেই চিত্তশুদ্ধি হয় না, সেই পবিত্রতার পরাকাষ্টা আসেনি বলে আমরা এই জিনিষ দেখতে পাইনা। ঠাকুরের জীবনের এইটাই মাহাত্ম্য যে তিনি এগুলো পরিষ্কার দেখতে পেতেন। ঠাকুর তো নাম-যশের কাঙ্গাল ছিলেন না, তাঁর তো কোন প্রয়োজন নেই মিথ্যা কথা বলার। বেদের ঋষিরাও ত্যাগ তপস্যার দ্বারা এই পবিত্রাতে পৌঁছেছিলেন, ওনারা যখনই কোন দেবতাকে যজ্ঞের সময় আবাহন করতেন দেবতারা সশরীরে এসে হাজির হতেন।

যজ্ঞে যত দেবতারা আসতেন তাঁদের সবাইকে অগ্নিদেবতা নিয়ে আসতেন। অগ্নি হলেন প্রধাণ মাধ্যম। দেবতাদের যে আবাহন করে যে আহুতি দেওয়া হত সেটা অগ্নির মাধ্যমেই হত। ঋষিদের বিশ্বাস ছিল যে অগ্নি এই আহুতি সমূহ দেবতাদের কাছে পৌঁছে দেন। ঋকবেদের যত সূক্ত আছে তারমধ্যে সব থেকে বেশি আছে ইন্দ্রের উপরে, প্রায় আড়াই'শ সূক্ত ইন্দ্রের নামে। ইন্দ্রের পরেই অগ্নি, অগ্নির উপরে প্রায় দু'শটি সূক্ত আছে। বেদের প্রথম সূক্ত অগ্নিকে দিয়েই শুরু হচ্ছে – নয়টি মন্ত্রে প্রথম সূক্ত। এখানে প্রথম মন্ত্রে বলা হচ্ছে – অগ্নিমীড্যে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম। হোতারং রত্নধাতমম্। অগ্নিকে এখানে দুটো শব্দ দিয়ে সম্বোধন করা হচ্ছে পুরোহিত আর হোতা। পরিবারের কোন যজ্ঞ বা পূজা যখন বাড়িতে করা হয় সেখানে যে পূজা করছেন তাঁকে বলা হয় পুরোহিত। আর ঘরের বাইরে সর্ব সমক্ষে যে যজ্ঞ হয় তার প্রধানকে বলা হয় হোতা, হোতা থেকেই হোত্রি। বৈদিক যজ্ঞে ঋকবেদের ব্রাহ্মণ হোতার খুব গুরুত্ব, কারণ হোতা যদি না আবাহন করেন তাহলে কোন দেবতাই এগিয়ে আসবেন না। ঋকবেদের ব্রাহ্মণ যখন আবাহন করবেন তারপরেই দেবতারা আসবেন। ভারতে আগেকার দিনের এই প্রথাগুলির খুব সুন্দর তাৎপর্য ছিল।

কোথাও যখন কেউ কোন অনুষ্টান করবে তখন সে অনুষ্টান কর্তা নাপিতকে সব জায়গায় নিমন্ত্রণ করতে পাঠান হত। নাপিত যদি নিমন্ত্রণ না করে তাহলে কেউই সেই অনুষ্টানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে না। যতই রান্নাবান্না করা হোক না কেন, কেউই সেই অন্নজল গ্রহণ করতে যাবে না। নাপিতরা এইসব নিমন্ত্রণের ব্যাপারে নিজের গুরুত্বটা ভালো করেই বুঝত, আর তাদের অবস্থাও ভালো থাকত না, দারিদ্রতাই তাদের জীবনের বৈশিষ্ট্য। সেই কারণে দেখা যেত খুব কোন বড়লোককে বা সম্মানীয় কাউকে নিমন্ত্রণ করার সময় নাপিত বেঁকে বসত। নানান রকমের দাবী-দাওয়া শুরু করে দিত, আমাকে যদি ভালো ধুতি না দেন কিংবা আমাকে যদি একটা ভালো বাছুর না দেন তাহলে আমি কিন্তু নিমন্ত্রণ নিয়ে যাব না। কিন্তু আমি যত বড়লোকই হই না কেন আমি কখনই গ্রামের কাউকে নিজে গিয়ে নিমন্ত্রণ করতে পারব না, নাপিতকে দিয়েই করাতে হবে। নাপিত যদি নিমন্ত্রণ না করে গ্রামের কেউই খেতে আসবে না। এই নিয়ে তখনকার দিনে নানা নাপিতের সঙ্গে দর কষাকষি থেকে লাঠালাঠি পর্যন্ত হত। আমার বাড়িতে যদি শ্রাদ্ধ বা বিয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছে এখন যদি কেউ না আসে তাহলে আমার মান-মর্যাদা কোথায় যাবে কেউ ভাবতে পারবে? এই সব প্রথাগুলি রাখা হয়েছিল সামাজিক ভারসাম্যকে ধরে রাখার জন্য। বেশ কয়েক বছর আগে ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজে এক মহারাজের শরীর চলে গিয়েছিল। এখন সন্ন্যাসীরা গেছেন মহারাজের মৃত শরীরকে নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু ওখানে ডোমরা বেঁকে বসেছে যে ওদের দুশো টাকা দিতে হবে তবেই ওরা মৃত শরীর বার করে দেবে। হিন্দুদের নিয়ম আছে যখন কেউ হাসপাতালে মারা যাবে তখন মৃতের শরীর বিছানা থেকে নামাবার সময় কেউ স্পর্শ করতে পারবে না, এই কাজটা করার জন্য একটা বিশেষ সম্প্রদায় আছে, তারাই শুধু নামাবে, আর এই কাজটা ডোমেরাই করে। সন্ন্যাসীর তখন ডোমদের বলল – আমরা ভাই সন্ন্যাসী আমাদের এই সব ছোঁয়াছুয়িতে কিছু যায় আসে না, তোমরা যদি না নামাও আমরা এই ডেডবডি নিয়ে চললাম। ডোমেদের কখন সন্ন্যাসির মৃতদেহ নিয়ে অভিজ্ঞতা নেই। তখন ডোমেরা বলছে – ঠিক আছে আপনারাই সব করবেন কিন্তু আমাদের পঞ্চাশটি টাকা দিতে হবে, এটা আমাদের প্রাপ্য। তখন মহারাজরাই সরালেন কিন্তু ওদের পঞ্চাশটা টাকা দিলেন। এগুলোও দরকার, না হলে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হিন্দুদের জীবন নানা অনুষ্ঠান দিয়ে মোড়া থাকে, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, হাতেখড়ি, দীক্ষা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মধ্যে সমাজের যারা দরিদ্র সাধারণ মানুষ রয়েছে এইভাবে ব্যবহার করে একদিকে আর্থিক ভাবে আর অন্য দিকে তাদেরকেও সমাজে একটা পদমর্যাদা দিয়ে তাদেরকে সচল রাখা হয়।

আবাহন হচ্ছে না অথচ যজ্ঞ-যাগ হচ্ছে বৈদিক যুগে এটা কেউ কল্পনাই করতে পারত না। তাই হোতাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই মন্ত্রে অগ্নিকে বলা হচ্ছে হোতা। মহাভারতেও একটা জায়গায় দেখা যায় যেখানে অর্জুন অগ্নির উপাসনা করছে। এই মন্ত্রে অগ্নির কতকগুলি উচ্চ গুণের বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু অর্জুনের বিরাট লম্বা প্রার্থনায় শুধু অগ্নির অনেক নাম বলে গেছে। বৈদিক কাল থেকে অগ্নির স্তুতির প্রচণ্ড মাহাত্ম্য। যে কোন ইন্দো-আর্য সভ্যতাতে অগ্নিদেবতাকে খুব উঁচুতে রাখা হয়। যেহেতু এরাও এই ইন্দো-আর্য সভ্যতা থেকেই উদ্ভব হয়েছে তাই পার্সি সভ্যতাতেও অগ্নিকে খুব সম্মান করা হয়। এদের মন্দিরের নামই হচ্ছে Fire Temple । আর এই মন্দিরের যিনি পুরোহিত (Custodian of Fire) তাকে আমাদের ব্রাহ্মণদের যেমন সম্মান দেওয়া হয় ঠিক সেই রকম খুব সম্মান করা হয়। আর যে কোন লোকই Custodian of Fire হতে পারেনা, যে Custodian of Fire হতেন উত্তরাধিকারে সূত্রে তার সন্তানই পরে Custodian of Fire হবে। যদিও আলাদা সম্প্রদায় কিন্তু এরা অগ্নি দেবতার পূজাতে হিন্দু ব্রাহ্মণদের মতই একই নিয়ম প্রথাকে অনুশীলন করে। পৃথিবীর যে কোন প্রাচীন ধর্মে অগ্নিদেবতার মোটামুটি এই একই ধরণের ধারণা পাওয়া যাবে। আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন অগ্নির উপাসক। পৃথিবীর আদিম অবস্থায় অগ্নি ছিল না, অগ্নিকে স্বর্গলোক থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করান হয়েছে। অগ্নিকে এই অবতরণের কৃতত্ব অঙ্গিরসকে (বা অঙ্গিরা) দেওয়া হয়। একটা মতে বলা হয় অঙ্গিরস কাঠ দিয়ে কিভাবে অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করা যায় এই বিদ্যাটা প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন। এই কারণে অঙ্গিরসে প্রতি সবারই

খুব সম্মানের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। আবার অগ্নির অনেক নামের মধ্যে একটা নাম হচ্ছে অঙ্গিরস। অঙ্গিরস থেকে হিন্দীতে ও বাংলা ভাষায় অঙ্গার শব্দটা ব্যবহৃত হয়।

এখানে কিন্তু কোন যজ্ঞের আহুতি দিচ্ছে না, কারণ এটি ঋকবেদের মন্ত্র। এই মন্ত্রই যখন যজুর্বেদে আসবে তখন এই মন্ত্র উচ্চারণ করে যজ্ঞে আহুতি দেবে। এখানে অগ্নিকে প্রার্থনা করা হচ্ছে, রোজ যদি এইভাবে অগ্নির প্রার্থনা করা হয় তাহলে কি হবে, তার ফল মন্ত্রের শেষে বলা হয়েছে, সেই ফলটা সে পেয়ে যাবে। বলছেন – 'অগ্নিমীডে', এই অগ্নিকে আমি প্রার্থনার দ্বারা সাদর অভ্যর্থনা করছি। 'পুরোহিতং যজ্ঞস্য' তিনি (অগ্নি) হচ্ছেন যজ্ঞের পুরোহিত। ঘরের যে কোন পূজো সব কিছু নির্ভর করে পুরোহিতের উপরে, অগ্নি হচ্ছেন এই পুরোহিতের মত। বলছেন 'যজ্ঞস্য দেবম', এই যে যজ্ঞ তার দেবতা হচ্ছেন অগ্নি। সবারই একজন করে অধিষ্ঠাত্রি দেবতা আছেন, যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রি দেবতার নাম অগ্নি। 'ঋত্বজম হোতারং', অগ্নি হচ্ছেন হোতাদের মধ্যে ঋত্বিক, আগেই বলা হয়েছে যে হোতার কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, হোত্রিয় মানে যিনি ঋকবেদ পাঠ করেন। এগুলি আসলে হচ্ছে স্তুতিবাচক, প্রশংসা করার জন্য বলা হয়। এই যে ভাবটা আমরা এখানে পাচ্ছি, যেখানে বলছে যজ্ঞে যা কিছু আছে তার শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন অগ্নি। বেদে অনেকবার আমরা এই ধরণের ভাবকে দেখতে পাব। গীতাতেও এই ধরণের ভাব দেখতে পাই, দশম অধ্যায়ে বিভূতিযোগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যাবতীয় যা কিছু আছে তার মধ্যে যেটা শ্রেষ্ঠ বস্তু আমি সেটা নিজেই, যেমন বলছে বেদানাং সামবেদোহস্মি, অর্থাৎ সমস্ত বেদের মধ্যে আমি সামবেদ। এরপরে বলছেন 'রত্নধাতমম্', আমাদের কাছে রত্ন মানে মূল্যবান বস্তু, সোনা, হীরে, মুক্তো ইত্যাদি। কিন্তু সায়নাচার্য ঋকবেদের সংহিতায় তাঁর ভাষ্যে রত্নকে ব্যাখ্যা করছেন – রত্নধাতমের সহজ অর্থ হতে ফল দেওয়া, যিনি ফল দাতা অথবা যিনি রক্ষা করেন বা যিনি আমাদের বরিষ্ঠ, কর্মিষ্ঠ, বলিষ্ঠ সন্তান দেন বা যিনি আমাদের প্রচুর খাদ্য-সামগ্রী দেন বা প্রচুর ধন-রত্ন দেন। একটা রত্ন শব্দের কত অর্থ করা হয়েছে। সায়নাচার্য রত্নের এতগুলি অর্থ কেন করলেন? বেদে যখন কোন শব্দকে ব্যবহার করা হয় তখন সেই শব্দকে কি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে কেউ জানে না। রত্ন শব্দকেও বেদ কি অর্থে বলেছে আমরা এখন কেউ জানিনা, সায়নাচার্যও জানতে না। সেইজন্য তিনি বললেন বেদে রত্নের অর্থ এটাও হতে পারে, ওটাও হতে পারে আবার অন্যটাও হতে পারে। রত্ন শব্দটাকে যদি আজকে বাংলায় লেখা হয় এবং যদি বলা হয় – তিনি কবিরত্ন, তখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তিনি কবিদের মধ্যে রত্ন। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পরে কবিরত্নের অর্থ কত ভাবে পাল্টে যাবে আমরা এখন কি করে জানব, আর পাঁচ হাজার বছর পরে লোকেরাও বলতে পারবে না যে তখনকার দিনে এর আসল অর্থ কি ছিল। বেদের সময়ে রত্নের অর্থ কি হতে পারে যাস্কের আগে যে কৌশভ ছিলেন তিনিই বলছেন এখন এই শব্দের অর্থ কঠিণ হয়ে গেছে, যাস্ক এসে এর নতুন ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলছেন যে এই এই রকমের অর্থ ছিল শুনেছি। আর যাস্কেরও হাজার বছর পরে এসে সায়ানাচার্য ঐগুলো দেখে দেখে একটা অর্থ বার করার চেষ্টা করেছেন। যার ফলে তিনি কোন শব্দের নির্দিষ্ট কোন অর্থ দিচ্ছেন না। সায়নাচার্য বলছেন – যিনি যজ্ঞ করছিলেন তিনি কি যজ্ঞ করছিলেন এই বলে যে – ওগো, তুমি আমাকে হীরা জহরৎ দিয়ে যাও। যিনি অন্ন চাইছেন তিনি অন্নের জন্য, যিনি সন্তান চাইছেন তিনি সন্তানের জন্য যজ্ঞ করছেন, এইটা বলছেন না যে তুমি এটা পাবেই। তাই তিনি বলছেন বেদের সময়ে রত্নের অনেক অর্থ হতে পারে তাই এই সব রকম অর্থই হতে পারে। বেদের সময় থেকে আমরা অনেক সরে এসেছি, সময়ের সাথে সাথে ভাষাও পাল্টাতে থাকে, সেইজন্য তিনি অনেকগুলি অর্থ দিচ্ছেন। তাই এখন আমরা এই রকম যে কোন জিনিষই চাইনা কেন আমরা এইভাবে স্তুতি করতে পারি। বেদের সময়ে দুহিতার অর্থ ছিল যে মেয়ে গরুর দুধ দোহন করত। সেইখান থেকে পাল্টাতে পাল্টাতে দুহিতার অর্থ গিয়ে দাঁড়াল নিজের কন্যাতে। আবার সেখান থেকে এখন যে কোন মেয়েকে আমরা দুহিতা বলি। সায়নাচার্য বর্তমান কালে বেদের দুহিতার অর্থ করতেন – দুহিতার অর্থ হচ্ছে যে মেয়ে গরুর দুধ দোহন করে, বা দুহিতা মানে নিজের মেয়ে বা দুহিতা মানে যে কোন মেয়েকে বোঝাবে। কিন্তু আজকের ভাষায় দুহিতার অর্থের কোন সংশয় নেই। শঙ্করাচার্যও যখন উপনিষদ ও গীতার ভাষ্য রচনা করেছেন তখন তিনি কোন কোন শব্দের অর্থ বলতে গিয়ে

বলছেন – এইটা এই অর্থ হয় বা এটাও হতে পারে। কারণ শব্দের অর্থ পাল্টে গেছে। বৈদিক অভিধান নিরুক্ততে রত্নের যে অর্থ করা হয়েছে, সেই অর্থ সায়ানাচার্যের কাছে যখন এসেছে তখন আরও পাল্টে গেছে। আধুনিক যুগের কোন বৈদিক অভিধান যদি থাকে তাতে রত্নের এই সব কয়টা অর্থই দেওয়া থাকবে। কিন্তু বাংলা থেকে বাংলা অভিধানে রত্ন মানে হীরা, জহরৎ।

এখানে অগ্নির অনেক রকম জিনিষের সাথে তুলনা করে কল্পনা করা হয়েছে এবং অনেক উপমা দেওয়া হয়েছে। যেমন অগ্নিকে অনেক সময় বাজপাখির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ভালো জাতের ঘোড়ার কাঁধে যে কেশর হয়, ইংরাজীতে mane আর হিন্দীতে আয়াল বলে, তার সাথে অগ্নির শিখার তুলনা করা হয়েছে। অগ্নি দেবতার অনেকগুলি রূপ আছে, যেমন পৃথিবীতে তিনি অগ্নি রূপে, সূর্যের মধ্যে অগ্নি তাপ রূপে। অগ্নির একটা বিখ্যাত নাম হচ্ছে বিপ্র। বিপ্রের আসল অর্থ হচ্ছে ব্রাহ্মণ। দেবতাদের মধ্যে অগ্নিকে ব্রাহ্মণ বলা হয় বলেই অগ্নির আরেক নাম বিপ্র। অগ্নির আরেকটি নাম কবি। যিনি ঠিক ঠিক ত্রিকালদর্শি তাঁকেই কবি বলা হয়। আমরা যা কিছু জ্ঞান আহরণ করি সবই এই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে করি, কিন্তু যিনি কবি তাঁর কিছু জানার জন্য এই ইন্দ্রিয়গুলির কোন ধরণের প্রয়োজন হয় না। বেদে কবি হচ্ছে ভগবান, আর প্রথমে অগ্নিকে কবি বলে যে স্তুতি করা হচ্ছে এটা হচ্ছে তাঁর আরেকটি নাম।

দ্বিতীয় মন্ত্র হচ্ছে – **অগ্নিঃ পূর্বেভিঋষির্ভিড্যো নুতনৈরুত। সা দেবাঁ এহ বক্ষতি।।** আমরা আগে বলেছি যে দু রকমের পাঠ হয় একটা সংহিতা পাঠ আরেকটা পদ পাঠ। পদ পাঠে সন্ধিগুলিকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়, এখানে আমরা ভেঙ্গে ভেঙ্গে বললে বুঝতে সুবিধা হবে – অগ্নিঃ পূর্বেভিঃ ঋষিভিঃ ঈড্যঃ নতুনৈঃ উত সা দেবাঁ আ ইহ বক্ষতি। সন্ধিগুলি ভেঙ্গে দিলে অক্ষর বেড়ে যাওয়াতে ছন্দটা নষ্ট হয়ে যায় তাই সন্ধি সহ উচ্চারণ করে ছন্দকে ধরে রাখা হয়, এইটাই সংস্কৃতে সন্ধির উপযোগিতা। আমি এই যে অগ্নির স্তুতি করছি, পূজা করছি এখন যত ঋষিরা আছেন এনারও অগ্নির পূজা করেন, মানে অগ্নি সবারই পূজা পাওয়ার যোগ্য। আগেকার দিনের যে ঋষিরা ছিলেন অগ্নি তাঁদেরও পূজা পাওয়ার যোগ্য। তার মানে অগ্নি হচ্ছেন চির নতুন দেবতা। যারা ধর্মীয় ইতিহাস সম্বন্ধে জানার আগ্রহ আছে তারা দেখতে পাবেন যে আদিবাসীদের অনেক রকম দেবতা আছে, এইসব দেবতারা এক সময় পূজা পেত কিন্তু পরে গিয়ে দেখা যায় এরা আর পূজা পায়না। যেমন ইন্দ্র, বরুণ বৈদিক যুগে পূজা পেত কিন্তু এখন আর পূজা পায়না। এখানে ঋষি বলছেন – অগ্নি আগেকার ঋষিদের পূজার যেমন যোগ্য ছিলেন ইদানিং কালের যারা ঋষি তাঁদেরও পূজা পাওয়ার যোগ্য।

এই মন্ত্রটা বেদের ঋষি বলছেন, তিনিই বলছেন আগেকার ঋষিরা পূজা করতেন, এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে তারও আগে থেকে ঋষিদের পরম্পরা চলছে। ইনি হচ্ছেন শুধু এটার রচনাকারী। মানুষের যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয় এটা তার মনের কল্পনা না সত্যিই তার এটা উপলব্ধি হয়েছে কি করে জানা যাবে? সেইজন্যই আমাদের ঋষিরা বলে গেছেন তোমার এই উপলব্ধিটা সত্যি কিনা জানতে হলে তোমার উপলব্ধিকে শ্রুতি, যুক্তি আর অনুভূতির উপরে যে কোন একটাতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। শ্রুতি হচ্ছে – পরম্পরা, আমার মাথায় একটা চিন্তা এসে গেল যে এই বৃক্ষকে পূজা করলেই আমাদের সব জ্ঞান হয় যাবে। এখন যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয় কোথা থেকে আপনার এই চিন্তাটা এলো, এর আগেও কি এইভাবে কেউ জ্ঞান লাভ করেছে? আগেকার কোন ঋষিদের কেউ কি পূজো করেছিলে? এর কি কোন পরম্পরা, কোন ঐতিহ্য আছে? না, সে রকমতো কিছু জানিনা। তাহলে তুমি বাপু ঠিক বলছ না, কেননা তোমার এই কথার কোন পরম্পরা নেই। বেদের আগে তো কোন শাস্ত্র ছিল না, তা সত্ত্বেও এখানে বলছে আগেকার ঋষিরাও অগ্নির পূজা করতেন। ঠাকুরও বলছেন – সনাতন ধর্মই থাকবে, বাকী সব আসবে আর যাবে। এটাকেই অনেকে মনে করে যে ঠাকুর এটাতে ইসলাম ও খ্রীশ্চান ধর্মকেই বলছেন, কিন্তু আদপেই তা নয়, ইসলাম ও খ্রীশ্চানও সনাতন ধর্ম। ঠাকুর ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য সমাজ এদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন। সনাতন ধর্ম মানে এর ঐতিহ্য ও পরম্পরা আগে থেকেই চলে আসছে। শ্রীরামকৃষ্ণ কি চিরদিন ধরে আছেন? না, এখানে তা বলছে না,

শ্রীরামকৃষ্ণ যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব যে সত্যগুলিকে বলেছেন সেগুলি নতুন কিছু নয়, এগুলো আগে থেকেই বলা আছে। অনেক খুব উৎসাহসের সাথে উচ্ছ্বাস নিয়ে বলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এক নতুন দর্শন দিয়ে গেলেন। কি নতুন দর্শন ঠাকুর দিয়েছেন? নতুন কিছুই তিনি দেননি। স্বামীজীও একবারও কোথাও বলেননি যে ঠাকুরের কথা নতুন কিছু আছে। ঠাকুর যেটা বলেছেন তা হল – আগেকার যারা ছিলেন তাঁরা পুরানো হয়ে গেছে, কিন্তু এখন যাঁরা আছে তাদের শক্তিটা নতুন। শ্রীশ্রীমাকে প্রশ্ন করছেন ঠাকুরের ধর্মসমণ্বয়টাকে কি নতুন বলা যাবে? মা বলছেন – ওগুলো আগেই ছিল, তবে তিনি ছিলেন ত্যাগের বাদশা, তাঁর ত্যাগটাই সব থেকে বড়। ত্যাগ দিয়ে বিচার করলেও ত্যাগটাও নতুন কিছু নয়, ভগবান বুদ্ধও ত্যাগ করেছিলেন, যিশুও ত্যাগ করেছিলেন। ঠাকুরের যদি কিছু নতুনত্ব থাকত তাহলে তো গোলমাল হয়ে যেত, তাহলেই তো বোঝা যেতে যে সেই পরম্পরা ঠাকুরের ছিল না। হিন্দু ধর্মের যে প্রধান নিয়ম তা হচ্ছে শ্রুতি, যুক্তি আর অনুভূতি। শ্রুতি, যুক্তি আর অনুভূতিতে যদি না মেলে তবে সেই তত্ত্ব বা দর্শনের কোন মূল্যই নেই হিন্দু ধর্মে। ঠাকুর বলছেন ওরকম ধ্যানে দেখে কি হবে, সামনা সামনি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ঠাকুর নিজের আধ্যাত্মি অনুভূতির কথা বলতে গিয়ে বলছেন – তাঁর সাথে দেখা হল, কত মজা হল, কত আঙ্গুল মটকানো হয়েছে। আধ্যাত্মিক চেতনার যখন উন্মেষ হয় তখন ভগবান সত্যি সত্যি এসে সামনে এসে দাঁড়ান, তিনি কথা বলেন। অন্য লোকে যখন ঠাকুরকে দেখছে তখন দেখছে ঠাকুর নিজের মনে হাসছেন, হাত নাড়ছেন। লোকে তাই বলত ঠাকুর পাগল হয়ে গেছে, নিজের মনে কথা বলছে। ঠাকুর দেখছেন তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলছেন, ঈশ্বর তাঁর আঙ্গুল মটকে দিচ্ছেন। এই ধরণের দর্শন যে দেখছে একমাত্র সেই দেখতে পাছে তাঁর আশেপাশে যারা থাকবে তাদের কাছে কিছুই হবে না। এটা কোন অনুভূতি নয় এটা হচ্ছে সাক্ষাৎ দর্শন, আর এই ধরণের দর্শন দুজন একই রকম দেখেন না। কেউ চাইলেই যে শ্রীরামকৃষ্ণের যে দিব্যদর্শন হয়েছিল সেইগুলিকে সেও দর্শন করে নিতে কখনই পারবে না। কারণ এটা কোন একটা ভাব রূপে সত্য (objective reality) নয়, ঠাকুরের দিব্যদর্শন হচ্ছে subjective reality। তাহলে যদি বলা হয় রামপ্রসাদের মাকালীর দর্শন হয়েছিল, ঠাকুরেরও মাকালীর দর্শন হয়েছিল। মাকালীকে দুজনে ঠিকই দেখেছিলেন, কিন্তু একই রূপে দেখেছিলেন কিনা সেটা কে জানে। আগামীকাল যদি আমার শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন হয়ে যায় আর অন্য কারুরও যদি দর্শন হয় তাহলে দুজনই শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন হয়েছে কিন্তু একই রূপে দর্শন হবে না। সেইজন্য ঋষিদের যে বর্ণনাগুলি আমরা পাই তার কোন দুটোর বর্ণনা এক হয় না। এতে তাঁদের নিজেদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব তৈরী হয়না বরঞ্চ একে অপরের পরিপূরক হয়। কবীর দাস ও সুরদাসের লেখা সম্পূর্ণ আলাদা কিন্তু এ নিয়ে কোন বিরোধ হয় না উল্টে একে অপরকে পরিপূরণ করে। বাইবেলের কথা কোরানের কথা এক নয়, কোরানের কথা আর কথামৃতের কথা এক নয় আবার কথামৃতের কথা আর বেদের কথা এক নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও কারুর মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। এরমধ্যে সবাই যে যেমন ভাবে ঈশ্বরকে দেখেছেন তার কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু কারুরই এক রকম দর্শন হয়নি। এখানে এই চশমাটা আমিও যাই দেখব অন্য লোকেও তাই দেখবে কিন্তু ঈশ্বর দর্শনে আমি আর সে এক দেখব না, কারণ spiritual reality always subjective not objective.

অগ্নিকে যে আগের ঋষিরাও দেখেছিলেন আর ইদানিং কালের ঋষিরা অগ্নিকে দেখছেন তাঁরা অগ্নিকে একই রূপে দেখছেন না। কিন্তু যাই দর্শন হোক না কেন, আমাদের কাছে প্রধান হচ্ছে শ্রুতি, যুক্তি অনুভূতি। আমার যাইই আধ্যাত্মিক অনুভূতি হোক না কেন, দেখতে হবে এটা কি বিচারে টিকতে পারবে। তারপরে বলবে আমিই কি এটা প্রথম দেখলাম না এর আগেও কেউ উপলব্ধি করেছে। যদি বলি ঠাকুরের কৃপায় আমিই প্রথম উপলব্ধি করেছে, তাহলে কিন্তু এটাকে আধ্যাত্মিক অনুভূতি বলে মানা হবে না, এটা আমার মনের নিছক একটা কল্পনা মাত্র বলে সবাই উড়িয়ে দেবে। গীতার ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর এইটাই বলছেন – অসম্প্রদায়বীৎ সর্বশাস্ত্রবেদোপি মুর্খবদেব উপেক্ষণীয়। যিনি অসম্প্রদায়বীৎ, যিনি কোন গুরুর কাছে এই বিদ্যা পায়নি, বা তার গুরু গুরুর কাছে এই বিদ্যা শোনেনি, মানে যাদের সম্প্রদায় নেই, এই রকম কেউ যদি সমস্ত বেদ সমস্ত শাস্ত্রকে ঝাড়া মুখস্ত করে নেয় তাহলেও তাকে মুর্খের মত উপেক্ষা করবে।

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শঙ্করাচার্য এই কথা বলছেন। আমাদের রামকৃষ্ণ মঠের যারা সন্ন্যাসী ও দীক্ষা নিচ্ছেন তারা তাদের যে গুরু থেকে দীক্ষা নিচ্ছেন সেই গুরু হয়তো ঠাকুরের কোন পার্ষদের কাছ থেকে দীক্ষা পেয়েছিলেন, তিনি পেয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে, শ্রীরামকৃষ্ণ তোতাপুরি থেকে, তোতাপুরি থেকে হয়ে হয়ে শঙ্করাচার্যে পৌঁছে যাচ্ছে, শঙ্কারাচার্যের আগে গোবিন্দাপাদ হয়ে হয়ে বেদে চলে যাচ্ছে। আমাদের প্রত্যেকের বিদ্যা এইভাবে একটা সম্প্রদায়ের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। এখন যদি কেউ এসে আমাদের বলে যে এগুলো আপনাদের নিজেদের পড়া পাণ্ডিত্য দেখাচ্ছেন, তখন বলতে হয় যে আপনাদের বিদ্যা একশ বছরের আর আমাদের বিদ্যার পেছনে হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্য রয়েছে। এখানে আমরা যে বিদ্যাই পাই না কেন এটা সম্প্রদায় বিদ্যা পাচ্ছি।

বেদের দ্বিতীয় মন্ত্রেই সেই সম্প্রদায়ের কথা বলা হচ্ছে – আগেকার ঋষিরা আর ইদানিং কালের ঋষিরাও অগ্নির উপাসনা করেছেন। বেদের প্রথমেই বলে দিচ্ছে যে আমি কিন্তু আমার মনের কোন কথা বলছি না, এর আগের আগের ঋষিরা এই ভাবেই অগ্নির স্তুতি করেছেন। তারপরে বলছেন ‘নতুনৈঃ উত’, অগ্নি কোন অচল দেবতা নন। স্বামীজী বলছেন – ভারতের আর সব দেবতারা পুরনো হয়ে গেছে এখন শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছে নতুন ভগবান। বেদে বলা হচ্ছে আমি যখন এটা রচনা করছি এখনও এই অগ্নি দেবতার পূজা হচ্ছে। আর বলছেন – ‘স দেবাঁ এহ বক্ষতি’। অগ্নি দেবতা যেন সব দেবতাদের আমার কাছে নিয়ে আসেন।

বেদ – ৭ই ফেব্রুয়ারী ২০১০

বেদের মূল বিষয়গুলির উপরে মোটামুটি আলোকপাত করা হয়ে গেছে। যে শব্দগুলি আমাদের কাছে একেবারেই নতুন ছিল সেগুলোকে আমাদের একটু সরগর হয়ে গেছে, যদিও সব কিছু ঠিক ভাবে সরগর হতে সময় লাগবে কিন্তু কিছুটা ধারণা হয়ে গেলে পরে যখন এই শব্দগুলি আসবে তখন আমাদের কাছে অবোধ্য মনে হবে না।

স্তব আর মন্ত্রের মধ্যে প্রধান যে পার্থক্য তা হচ্ছে – স্তব হচ্ছে কারুর গুণাবলীর প্রশংসা করে স্তুতি করা, যেমন আগেকার দিনে প্রজারা যখন রাজদরবারে রাজার সঙ্গে দেখা করতে যেতেন তখন সেই প্রজা প্রথমে রাজার প্রশংসা করে স্তুতি করত। মন্ত্র গুরু-শিষ্যের মধ্যেই থাকবে, বাইরের কাউকে বলা যাবে না। এর অর্থ হচ্ছে মন্ত্র হচ্ছে গোপনীয়, এবং গুরু মুখেই শুনতে হবে, বেদেও তাই হত। বেদের ক্ষেত্রে পুরো সংহিতাকে মন্ত্র বলা হয়। মন্ত্র অত্যন্ত পবিত্র জিনিষ। সেইজন্য আগেকার দিনে বেদের সংহিতা বা মন্ত্র অংশ শিষ্যকে গুরুর কাছে শুনে নিয়ে মুখস্ত করতে হত। মন্ত্রের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে মন্ত্রের একটা শক্তি আছে, কেউ যদি এই এই মন্ত্র রোজ পাঠ করে তার এই এই ফল হবে। বেদের সংহিতার এই দুটো বৈশিষ্ট্যই আছে – এগুলো কাউকে বলা যাবে না আর এর একটা শক্তি আছে। বেদে যেহেতু এই মন্ত্র অংশকে পবিত্র বলা হয়েছে তাই পরবর্তি কালে যেসব স্তোত্র বা স্তব পবিত্র বলে মনে হতে লাগল সেগুলোকেও মন্ত্র রূপে গণ্য করা হতে শুরু হল। কিন্তু মন্ত্র কখনই স্তব বা স্তুতিতে রূপান্তরিত হবে না। গীতার একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা করে আপনি গুরুর গুরু, আপনি সকলের গুরু ইত্যাদি বলছে তখন এগুলো হয়ে যাচ্ছে স্তুতি কিন্তু আমরা যখন এইগুলো পাঠ করব তখন এইগুলো স্তব হয়ে যাবে। এই ধরণের স্তুতি যারা রোজ পাঠ করে তাদের মধ্যে একটা পবিত্রতা ও মনের অনেক শক্তি আসে। স্তবের মূল জিনিষ হচ্ছে কারু স্তবন বা প্রশংস করা।

Impersonal God হচ্ছে ঈশ্বরের অমূর্তরূপ। আমরা প্রায়ই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, সর্বব্যাপী চৈতন্য এই ধরণের শব্দগুলি ব্যাবহার হতে দেখ। ঈশ্বরের চৈতন্য শক্তিকে যখন নির্গুণ-নিরাকার অমূর্ত রূপে চিন্তা করা হয় তখন সেটাই হচ্ছে Impersonal God। সেই চৈতন্য শক্তির যখন রূপ এসে যায় তখনই তাকে বলছে Personal God তখন ঈশ্বরের একটা রূপ এসে গিয়ে তিনি সগুণ-সাকার হয়ে যাচ্ছেন। বিভিন্ন ধর্মে ঈশ্বরকে বিভিন ভাবে কল্পনা করা হয়, কেউ কেউ তাঁকে পুরোপুরি সগুণ-সাকার রূপেই দেখেনে আবার কেউ কেউ পুরোপুরি নির্গুণ-নিরাকার রূপেই দেখেন। কিছু অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ আছেন যারা সগুণ-সাকারের উপাসকদের উপাসনাকে পৌত্তলিক উপাসক বলে। ইসলাম ধর্মে পুরোপুরি নির্গুণ-নিরাকার ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু স্বামীজী আপত্তি করে ইসলাম ধর্মের প্রচারকদের বলছেন – তোমরা যদি এতই মুর্তি পূজার বিরোধী হয় তাহলে তোমরা কাবাতে হজ করতে কেন যাচ্ছ। এগুলো আর কিছুই নয়, বড়রা কিছু বলে দিয়েছে ছোটরা সেটাকে না বুঝে মেনে নিয়েছে। খ্রীশ্চান ধর্ম কখন ঈশ্বরকে নির্গুণ-নিরাকার আবার কখন সগুণ-সাকার বলে।

বেদের মন্ত্রগুলির প্রথমে একজন ঋষির নাম দেওয়া থাকে, যেমন ঋকবেদের প্রথম মন্ত্র 'অগ্নিমীডে পুরোহিতং' এই মন্ত্রের প্রথমে ঋষির নাম দেওয়া হয়েছে মধুছন্দা। এত হাজার বছর পর এটা বলা খুবই মুশকিল যে মধুছন্দা ঋষ এই মন্ত্রের দ্রষ্টা না এই মন্ত্র অন্য কোন ঋষি পেয়েছিলেন আর মধুছন্দা মন্ত্রটাকে সংকলন করেছেন। এখন এটাকে একেক পণ্ডিত একেক ভাবে বলবে। তবে ঋকবেদের দ্বিতীয় মণ্ডল থেকে অস্টম মণ্ডল পর্যন্ত ঋষির নাম প্রথম থেকেই নির্দিষ্ট করা হয়ে আছে। প্রথম মন্ত্রে যেখানে মধুছন্দা ঋষির নাম পাচ্ছি সেখানে বলা হয়েছে তিনি বিশ্বামিত্রের পুত্র, এখন এটাও হতে পারে যে এই মন্ত্র বিশ্বামিত্র পরিবারে সংরক্ষিত হয়ে আসছিল। পরিবারে সংরক্ষিত হয়ে আসছিল বলে তার মানে এই নয় যে তাঁরা এই মন্ত্রের দ্রষ্টা হবেন, অনুমান করা হচ্ছে। কেননা বিভিন্ন দিক থেকে শিক্ষা পেতে পেতে একটা জায়গায় গিয়ে

মন্ত্রগুল জমা হচ্ছিল। এখন যিনি এই মন্ত্রকে প্রথম লিপিবদ্ধ করেছেন তার দুটো সম্ভবনা থাকতে পারে – হয়তো কোন পরিবারে ঠাকুরের মত কোন বিরাট মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল, তিনি একটা আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে আবিষ্কার করলেন, পরে তিনি নিজের শিষ্যদের এই মৌলিক সত্যটা দিয়ে বললেন যে – অগ্নিই হচ্ছে সব। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই ধরণের ঘটনা দেখা যায় যেখান একেকটা জিনিষকে নিয়ে বলছে এইটাই ব্রহ্ম, যেমন ঋষি রৌক্ষ বলছেন প্রাণই হচ্ছে ব্রহ্ম। প্রাণ হচ্ছে জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক শক্তি, এই শক্তিই পরবর্তিকালে রূপ পেল দুর্গা, কালী রূপে। রৌক্ষ ঋষি খুব উচ্চকোটির ঋষি ছিলেন, তাঁর নামে প্রশংসা করে বলা হয় যে – দুটো পাখি পরস্পর কথা বলতে বলতে উড়ে যাচ্ছে, একটা পাখি জিজ্ঞেস করছে মানুষ যে এত তপস্যা করছে এর সব ফল কোথায় যাচ্ছে, তখন অন্য পাখিটি বলছে তপস্যার ফল সব রৈক্ষ ঋষির কাচ্ছে যাচ্ছে। রাজা পাখিদের কথা শুনতেই খুব আগ্রহ হয়ে জানতে চাইলেন কে এই রৌক্ষ ঋষি যাঁর কাছে সবার তপস্যার ফল চলে যাচ্ছে। রাজা খোঁজ করতে করতে একটা জায়গায় গিয়ে দেখে একটা গরুগাড়ির কাছে একজন ঋষি বসে গরু গাড়ির চাকাতে ঘষে ঘষে তাঁর পিঠ চুলকাচ্ছেন। কাছে গিয়ে দেখেন ঋষির পিঠে খোস-পাঁচড়ায় ভরে গেছে। রাজা ঋষির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কিন্তু রাজার দিকে তিনি কোন ভ্রুক্ষেপই করলেন না। রাজা আশ্চর্য হয়ে ভাবছেন যে কে এই ঋষি যে আমাকে কোন পাত্তাই দিচ্ছে না, নিশ্চয়ই কোন বিরাট ঋষি হবেন। তিনি তখন সেই ঋষিকে বলছেন – মুনিবর, আপনি আমাকে শিক্ষা দিন, আমি আপনার সেবার জন্য আমার এই মেয়েকে আপনকে দিয়ে গেলাম। কোন পিতা যখন তাঁর মেয়েকে কাউকে দিয়ে দেয় তার মানে তাঁকে কত সম্মান দেওয়া হচ্ছে। তখন রৈক্ষ রাজাকে উপদেষ দিচ্ছেন – প্রাণই ব্রহ্ম। এই কথাটাকে যদি ঠাকুরের ভাষায় অনুবাদ করা হয় তখন তার অনুবাদ হবে কালীই ব্রহ্ম। প্রাণ হচ্ছে ক্রিয়াশক্তি, কালীও হচ্ছেন ক্রিয়াশক্তি।

তৈত্তরীয় উপনিষদে সত্যাকামের যখন হাজারটা গরু হয়ে গেছে তখন প্রধান ষাঁড় বৃষভ এসে বলছে – সত্যকাম এবার গুরুর কাছে চল, আমরা হাজারটা গরু হয়ে গেছি। এই কথা বলে বৃষভ সত্যকামকে একটা ব্রহ্মোপদেশ দিয়ে বলছে যে বাকীটা তুমি সন্ধ্যে বেলা অগ্নির কাছ থেকে শুনে নিও। সত্যকাম যে এতদিন ধরে গরুগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ করছিল, সে কিন্তু প্রতিদিননই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করে যাচ্ছিল। সেই রকম সন্ধ্যেবেলা সত্যকাম সংহিতা পাঠ করে যখন অগ্নিহোত্র কর্ম করছে তখন অগ্নি তাকে দ্বিতীয় একটা উপদেশ দিল। বেদতো অনেক আগের উপনিষদ অনেক পরে এসেছে। এই যে এখানে একটা ঘটনা আসছে অগ্নি এসে সত্যকামকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিচ্ছে। এই রকম ভাবে বেদের সময়ে কোনও ঋষি হয়ত দেখেছিলেন যিনি অগ্নি তিনি যে শুধুই ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দেন তা নয়, তিনি অন্য সব কিছুই দিতে পারেন, কি কি দিতে পারেন সেটা আমরা আগেই আলোচনা করেছি – তিনি সন্তান দিতে পারেন, তিনি রক্ষা করতে পারেন, সব সম্পদ দিতে পারেন ইত্যাদি। যিনি এটা প্রথম পেয়েছিলেন তিনিই হয়তো এটাকে সংকলন করে পরবর্তি বংশধরদের দিয়ে গেছেন, বা তিনি এটা তাঁর পূর্ব পুরুষ বা গুরুর কাছ থেকে সংকলন করেছেন। এগুলো আমরা শুধু অনুমান করতেই পারি, আর কিছু নয়। এখন এটাই লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। এখন যিনি ঋষি, যিনি এই তত্ত্বটা পেয়েছিলেন তিনিই এটাকে এত সুন্দর ছন্দে অলংকারে কবিতায় লিপিবদ্ধ করবেন, এটা ভাবলেই একটু অবাক লাগবে। স্বামী প্রেমেশানন্দজী অনেক সুন্দর সুন্দর গান লিখেছেন, যার মধ্যে একটা বিখ্যাত গান হচ্ছে – অরূপ সায়রে লীলা লহরী। এই গানের কথাগুলি রাজা মহারাজ শুনে বলছেন – যে এই গানটি লিখেছে তার ব্রহ্ম অনুভূতি হয়েছে। আসলে স্বামী প্রেমেশানন্দের তখন কি ব্রহ্মানুভূতি হয়েছিল? তখনও তাঁর ব্রহ্মানুভূতি আদৌ হয়নি। কিন্তু তিনি নিজে একজন বড় সাধক ছিলেন, কথামৃতের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কথাগুলি তিনি অনেকেবার পড়েছেন, সেইগুলিকে অনুধ্যান করেছেন। তার ফলে এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি তাঁর নিজস্ব কবিত্ব প্রতিভা আর আধ্যাত্মিক সাধনার সংমিশ্রণে কবিতা হয়ে তাঁর কলম থেকে বেরিয়ে এল। রাজা মহারাজের কথা অনুযায়ী যদি আমরা বিচার করি তাহলে অরূপ সায়রে এই গানটি একটি সিদ্ধ গান। এই কারণেই সিদ্ধ গান বলা হচ্ছে যে আধ্যাত্মিক সত্য একজন কবির কবিতার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসছে যিনি নিজেই একজন উচ্চ সাধক।

অগ্নিমীডে পুরাহিতং এইটাও একটা সিদ্ধ মন্ত্র, কারণ এটিও হয় ঋষি এটাকে প্রত্যক্ষ করেছেন যে অগ্নি হচ্ছেন সেই দেবতা যিনি সব কিছুই দিতে পারেন। নয়তো যিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেছেন, পরে সেই শিষ্যরা আবার তাদের শিষ্যদের দিয়েছেন। কথামৃতে যত আধ্যাত্মিক সত্য আছে তার সব কয়টাকে যদি আমরা কবিতার আকারে রূপ দিই তাহলে অনেক বই হয়ে যাবে। বেদের সব মন্ত্রগুলিও তাই, আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে কবিতার আকারে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখন এমনও হতে পারে কোন ঋষি তাঁর গুরুর কাছে সত্যটাকে জেনে এই ভাবে কবিতার আকারে সাজিয়ে দিয়েছেন। এখন তিনি আবার তাঁর শিষ্যদের দিয়ে বলে দিলেন – এইটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক সত্য, এইটাকে নিয়মিত তোমরা পাঠ করবে। নিয়মিত বেদ পাঠ আবার দুই রকমের হয়। এটা মনে রাখতে হবে ঋকবেদকে আধার করে কোন যজ্ঞ হয় না, যজ্ঞ হবে যজুর্বেদকে অবলম্বন করে। আবার যজুর্বেদের যত মন্ত্র আছে তার বেশির ভাগই ঋকবেদ থেকে এসেছে। অগ্নিমীডে এই মন্ত্রটা যদি যজুর্বেদে থাকে তাহলে এই মন্ত্র দিয়ে যজ্ঞ হতে পারবে, তবে আমরা যত দূর জানি এই মন্ত্রটি যজুর্বেদের নেই, এটি পুরোপুরি স্তুতি মন্ত্র। পুরোপুরি স্তুতি মন্ত্র হচ্ছে, এখন যজ্ঞ যখন হচ্ছে, যদি অগ্নিকে উপলক্ষ করেই যজ্ঞ হয় তাহলে ঋকবেদের যিনি ব্রাহ্মণ তিনি তখন এই মন্ত্রটা পাঠ করতে থাকবেন। ঋকবেদের ব্রাহ্মণ যিনি, তিনি নিজে ঠিক করে নেবেন কোন কোন অগ্নির মন্ত্র পাঠ করবেন, কেননা অগ্নির উপরে প্রচুর মন্ত্র আছে। মন্ত্র বেছে নিয়ে তিনি এখন একে একে সেই মন্ত্রগুলি পাঠ করতে থাকবেন।

ব্যাসদেবের আগে পর্যন্ত বেদের মধ্যে অনেক তত্ত্বই সংগ্রহিত হচ্ছিল। কারণ একই গুরু-শিষ্য চলতে চলতে মাঝখানে যদি কোন শিষ্য ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে যায় তখন তাঁর বিদ্যাটাও বেদে অন্তর্ভুক্ত হত। এখন এই ভাবে হতে হতে বেদের অনেক কলেবর বৃদ্ধি হয়ে যাচ্ছিল, তাছাড়া কিছু কিছু জিনিষ অনেক জায়গায় ঘুরে ঘুরে পাওয়া যায়। ব্যাসদেব এসে এইটাকে ঠিক করলেন। ব্যাস হচ্ছেন বেদের আগে ও বেদের পরের বিভাজন রেখা। ব্যাসের আগে যে নতুন বিদ্যা পেতেন সেটা বেদে যোগ হয়ে যেত। মনে করুন আমার যে গুরু তিনি আমাকে চারটে মন্ত্র শিখিয়েছেন, এরপর ধ্যানের গভীরে আমিও একটা নতুন মন্ত্র পেলাম। এখন গুরুর চারটে মন্ত্রের সাথে আমার পাওয়া মন্ত্রটাও যোগ হয়ে পাঁচটা মন্ত্র হয়ে গেল। আমি যখন আমার শিষ্যকে শেখাব তখন আমি এই পাঁচটা মন্ত্রই শেখাব। তারপর আমার প্রশিষ্য সেও ধ্যানের গভীরে একটা আধ্যাত্মিক সত্যকে পেল। সেও তখন ঐ মন্ত্রটা আগের পাঁচটার সাথে যোগ করে ছটা মন্ত্র তার শিষ্যদের শেখাবে। এই করেই বেদ এত বিশাল আকার হয়েছে। তখন ব্যাসদেব এসে বললেন – এত দিন ধরে যা যোগ হবার হয়ে গেছে, এর পর আর কিছু বেদে যোগ করা হবে না। বেদেতো আর কিছু যোগ হবে না। কিন্তু এর পরেও যাঁরা আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি আবিষ্কার করবেন সেগুলি কোথায় যাবে? তখন সেটা আলাদা গ্রন্থ হিসাবে গণ্য করা হবে। যেমন এখন কথামৃতেও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ছড়াছড়ি রয়েছে সেগুলো ককনই বেদে যাবে না। এই জিনিষটাই ব্যাসদেব এসে করলেন। ব্যাসদেবের আগে যদি কথামৃত হত তখন সেটা বেদের কোন সংহিতা বা ব্রাহ্মণ অংশে বা উপনিষদে থাকত। ব্যাসদেবের পরে যা কিছু তত্ত্ব আবিষ্কার হয়েছে সেগুলি একটা নতুন ধরনের আধ্যাত্মিক সাহিত্য হিসাবে প্রকাশিত হল।

বাল্মীকি আর ব্যাসদেব মধ্যে কালের খুব মারাত্মক একটা ব্যবধাণ নেই। এই কারণেই বাল্মীকি যখন রামায়ণ রচনা করলেন তখন সেটা আর বেদের পরম্পরাতে সংযুক্ত করা হল না। যার জন্য বাল্মীকি বেদের ঋষিদের মত অত সম্মান তখনকার দিনে পাননি। বশিষ্ট, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকি এই তিনজন ছিলেন একই সময়ের। বশিষ্ট ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের রাজগুরু আর বিশ্বামিত্র ছিলেন অস্ত্রগুরু। আর তার একটু পরেই হচ্ছেন বাল্মীকি যিনি শ্রীরামচন্দ্রের জীবনের উপরে কবিতা রচনা করছিলেন। বশিষ্ট আর বিশ্বামিত্রের প্রচুর উল্লেখ আমরা বেদেই পাই। কিন্তু সমস্যা হয় যে বশিষ্ট আর বিশ্বামিত্র একজন কোন নির্দিষ্ট ঋষির নাম নাকি একটা পরিবারের নাম, যেমন এখনকার দিনে মুখার্জী, ব্যাণার্জী ইত্যাদি। এখন অনেক ভট্টাচার্য পরিবার আছে কিন্ত তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল কে এই মন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। আসল কথা

হচ্ছে বেদের ব্যাপারে আমরা যা কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পাচ্ছি এর সবটাই কয়েকজন মুষ্টিমেয় পণ্ডিত বেদের ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়ে তাঁদের যে বিচার ধারা দিয়েছেন সেইটাকেই আমরা সত্য বলে মেনে নিচ্ছি। কিন্তু এই জিনিষগুলিকে নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করে আরও অনুসন্ধান যদি কেউ করতে যায় তাহলে দেখা যায় একটা জায়গায় গিয়ে এদেঁর তথ্যগুলিও আটকে যায়, তখন এমন কিছু প্রশ্ন এসে যায় যে তার উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে যে বেদে যে পরে অনেক সংযোজিত হয়েছে, সেটা কতবার আর কত দিন অন্তর অন্তর। এটা তাদের জেনে রাখা উচিত যে বেদে প্রথমে যা ছিল সেটাই বিশাল ছিল, এখন পরবর্তি কালে ব্রাহ্মণরা পরম্পরা প্রথা বেদ মুখস্ত করতেন। এই বিশাল বেদ মুখস্ত করতেই তাদের সারাটা জীবন কেটে যেত, এরপরে তাদের পক্ষে সম্ভব হত না যে নতুন কিছু আবিষ্কার করে রচনা বেদে সংযোজিত করবে। মানুষের বুদ্ধিতো এতটুকু, সেটাও বেদ মুখস্ত করতে চলে যায়, কাঠামো বাঁধা বিদ্যাকে আয়ত্ত করতেই জীবনের বেশির ভাগ সময়টা খরচ হয়ে গেলে সে কখন আর বেদ রচনা করবে। ব্রাহ্মণরা যে বেদের মন্ত্রগুলি মুখস্ত করে প্রত্যেক দিন নিষ্ঠাপূর্বক যে আবৃত্তি করতেন তাতে তাঁদের মধ্যে একটা শক্তি আসত। স্বামীজী বলছেন হাজার হাজার বছর গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে করে ভারতের অন্তর্জগত দিব্যালোকে উজ্জ্বল হয়ে আছে। যে কেউ যদি দিনে একবার হাজার বার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে তাহলে এক বছর পরে তার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। ঠাকুর বলছেন – যখন ঝগড়া ঝামেলা হয় তখন বড় গোঁফওয়ালা পালোয়ান থাকতে বিশ ক্রোশ দূরের অন্য গ্রাম থেকে পাল্কী করে রোগাপ্যাটকা ব্রাহ্মণকে নিয়ে আসে বিচারের জন্য। কেননা তাঁর সেই শক্তিটা আছে। এইটাই হচ্ছে বুদ্ধিজীবি ও সৃজনশীলতার প্রভেদ। আধ্যাত্মিকতা এদের থেকেও অনেক উপরে।

তৃতীয় মন্ত্রে বলছে – ***অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎপোষমেব দিবেদিবে। যশসং বীরবত্তমম্***।। যজ্ঞে অগ্নির স্তুতি করে অগ্নির উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে, এই যজ্ঞ যিনি করছেন তিনি যেন রত্ন লাভ করেন, যজমানের ধনরত্ন যেন দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়। আগে যেমন বলা হয়েছিল 'রত্নধাতমম্' যার অর্থ হচ্ছে অগ্নি রত্ন দেন। 'দিবেদিবে' এই শব্দটা বেদের খুব প্রচলিত একটা ভাব – এখনও আমরা কারুর মঙ্গল কামনা করে বলি তোমার দিনে দিনে শ্রীবৃদ্ধি হোক। 'রয়িম' শব্দের অর্থ হচ্ছে সম্পদ, এই সম্পদ একবার দিয়ে দিল তাতে হচ্ছে না, এটা যেন দিনে দিনে বাড়তে থাকে, কখনই যেন এর হ্রাস না হয়। আর বলছেন 'যশসং বীরবত্তমম্' যিনি যজমান তাঁর যে সন্তান হবে তারা যেন বীর হয়, 'বীরবত্তমম্' বীর্যবান হোক, এটাও একটা খুব জনপ্রিয় বৈদিক যুগের ভাব। ওনারা সব সময় চাইতেন আমার যে সন্তান হবে তারা যেন বীর্যবান হয়। বীরবত্তমম্ শব্দের কোন ব্যাখ্যা বলা হচ্ছে না যে কিসে সে বীর হবে, কেননা যাদের মেধা আছে তাদেরকেও তাঁরা বীর বলতেন আবার যার খুব সাহস ও বল থাকত তাকেও বীর বলতেন। বীর বলতে মেধা ও শক্তি এই দুটোকেই বোঝায়। আর 'যশসং' তার যেন খুব সুনাম হয়, যজমানের ছেলের নয়, যজমানের নিজের সুনামের কথা এখানে বলা হচ্ছে। আমি সেই অগ্নির পূজা করছি যে অগ্নি এই সব সম্পদের দাতা। সম্পদ বলতে বোঝাচ্ছে – বীর্যবান সন্তান, সম্পদ, যশ এইগুলো। একবার দিয়ে দিলেই হবে না, এগুলো যেন দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়। আমরা এখন বৈদিক যজ্ঞের ধারণা থেকে অনেক সরে এসেছি। কিন্তু প্রত্যেক বাড়িতেই ভোরবেলা অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করতে হয়, তা রান্নার জন্যই হোক আর ঠাকুর ঘরে পূজার সময় ধূপদীপ জ্বালানর জন্যই হোক, এখন অবশ্য উনুনের পরিবর্তে গ্যাসের ব্যবহার হচ্ছে। কেউ যদি গভীর ভাবে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে এই মন্ত্রগুলির অর্থ চিন্তা করে রোজ অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করেন এবং অনেক দিন ধরে যদি করতে থাকেন তাহলে এর একটা শুভ ফল সে পাবেই পাবে। এগুলো কিন্তু শ্লোক নয়, এগুলো হচ্ছে মন্ত্র, আর এর প্রত্যেকটি মন্ত্রেরই প্রচণ্ড শক্তি আছে। মন্ত্রশক্তি হচ্ছে, এটাকে যখন আমরা উচ্চারণ করব, যখন এই মন্ত্রের উপরে ধ্যান করব, তখন এই মন্ত্রের যে বক্তব্য সেটা হাতেনাতে ফলবে। যে কোন একটা কথা বলে দিল কেউ আর সেটার উপরে ধ্যান করলেই কিছু হবে না। কিন্তু এগুলো ঋষিরা ধ্যানের গভীরে দেখেছেন তাই এই সব মন্ত্র সিদ্ধমন্ত্র।

আমি যদি কাউকে বলি ঠাকুর আপনার মঙ্গল করুন, এর একটা নিশ্চয়ই দাম আছে, কেননা আমি একজনের শুভ কামনা করে যেমন আমি নিজেকে পবিত্র হচ্ছি অপর দিকে যার মঙ্গল কামনা করছি তারও ভাল হবে। আবার স্বামীজী যখন বলছেন 'কৃত্যং করোতি কলুষং কুহকান্তকারী' – শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবান, আমাদের যে কলুষতা, পাপকর্ম তিনি যদি চান তাহলে সেটাকেই কৃত্য করে দেন, মানে যেটা আমার পাপ, আমরা যেটা মন্দতা এইটাই আমাকে মহৎ করে দেবে। স্বামীজী যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে আর্ষবাক্য, ঋষির কথা। এখন এইটাকেই যদি আমরা রোজ উচ্চারণ করি বা ধ্যানের মধ্যে চিন্তা করি তখন আমাদের মধ্যে যে পাপবোধ, অপরাধবোধ আছে সেটা কমে যাবে, হঠাৎ অনুভব হবে যে আমার মধ্যে কোথা থেকে একটা শক্তি আসছে। স্বামীজী ছিলেন ঋষি, তিনি কোন কল্পনা করে এই কথা বলছেন না, ঠাকুরের গুণাবলীর যে বৈশিষ্ট্য সেটাকে স্বামীজী ছন্দোবদ্ধ করেছেন। ভগবানের এইটাই গুণ বা স্বভাব, শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন অবতার পুরুষ, তিনি মানুষের দুঃখকষ্টকে হরণ করে নেন। আমাদের অপরধবোধ, কলঙ্কবোধ সেটাকে তিনি শুধু সরিয়েই দেননা, এইটাই আমাকে বিরাট করে দেবে। স্বামীজী ঠাকুরের সমস্ত গুণাবলীকে একত্রিত করে 'ওঁ হ্রীং ঋতম্ ত্বমোচলো গুণজিৎ গুণেড্য' এই প্রার্থনা মন্ত্রের মধ্যে সন্নিবেশিত করে লিপিবদ্ধ করে দিলেন। ঠাকুরের ভক্তদের কাছে যেমন এই প্রার্থনাটা বেদবাক্য, ঠিক তেমনি *অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎপোষমেব দিবেদিবে। যশসং বীরবত্তমম্।।* এটাও ঠিক একই বেদবাক্য। ঠিক ঠিক সেই শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা নিয়ে যদি রোজ পাঠ করা হয় তাহলে সত্যি সত্যিই বাড়িতে ধনসম্পদ বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

চতুর্থ মন্ত্র হচ্ছে – *অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি। স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি।।* হে অগ্নি দেবতা, এই যে যজ্ঞ করা হচ্ছে এটাতে কোন রকম ভাবেই বিঘ্নিত হচ্ছে না। অর্থাৎ আমি এই যজ্ঞ করতে করতে বন্ধ করে দিয়ে আবার অন্য কিছু করে আবার যজ্ঞ শুরু করছি, এই ধরণের কোন বিরতি দেওয়া হচ্ছে না। হে অগ্নি তুমিই এই যজ্ঞকে চারিদিক থেকে ঘিরে রেখে একে বিঘ্ন শূন্য করছ। 'পরিভূঃ' শব্দের অর্থ ঘিরে রাখা। উপনিষদেও পরিভূ শব্দ পাই, যেখানে বলছেন – পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ, যিনি ব্রহ্ম তিনি ঘিরে রেখেছেন। আমি যে ঘৃত দিয়ে যজ্ঞে আহুতি দিচ্ছি তা অগ্নির তেজকে বাড়ানোর জন্য ঢালছি না, আহুতিটা দেওয়া হচ্ছে দেবতার উদ্দেশ্যে, এই আহুতিটাকে অগ্নি ঘিরে রেখেছে। বেল পাতাতে ঘি লাগিয়ে 'ওঁ সর্বদেবদেবী স্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় স্বাহা' বলে আগুনের মধ্যে অর্পণ করছি। যে অগ্নিতে অর্পণ করা হচ্ছে সেই অগ্নির নাম হচ্ছে 'শ্রীরামকৃষ্ণ নাম্নো অগ্নে'। আমি একজন বিশেষ দেবতাদের উদ্দেশ্যে দিলাম, কিন্তু এটা যে কোন অন্য কেউ গ্রহণ করে নিতে পারে, যেমন রাক্ষস, প্রেত, অসুর এরা এসে সেই আহুতিটা নিতে পারে। কিন্তু তারা নিতে পারেনা। কেন পারছে না? অগ্নি এটাকে ঘিরে রেখেছে যাতে অন্য আর কেউ এসে নিতে পারে। আর এই যজ্ঞটা বিরামহীন ভাবে করা হচ্ছে, মাঝখানে কোথাও বন্ধ করা হচ্ছে না। তাই 'স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি' আমি নিশ্চিত যে আমার সমস্ত আহুতি দেবতাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। তাহলে সম্পূর্ণ অর্থ হচ্ছে – হে অগ্নি আমি শ্রীরামকৃষ্ণের নামে যে আহুতি দিলাম, সেই আহুতিকে তুমি আবৃত করে রেখেছ তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই আহুতি ঠিক ঠিক ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেই পৌঁছাচ্ছে। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের জায়গায় হবে ইন্দ্রাদি দেবতা, ইংরাজীতে যে গডের 'জি' ছোট অক্ষরে লেখা হয়। দেবতাদের আহ্বাণ করে নিয়ে আসা যায় কিন্তু ভগবানকে ডেকে আনা যায় না, কারণ তিনি হচ্ছেন সর্বব্যাপী। সেইজন্য বিষ্ণু, শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণের পূজাতে এইটা হবে না। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ এনারা দেবতা নন, তাই এই তত্ত্ব অনুযায়ী এখানে কোন অবতার বা ঈশ্বরের নামে হবে না। দেবতা আর ভগবানের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে, দেবতারা হলেন মানুষেরই মত কিন্তু মানুষের থেকে দেবতাদের শক্তি অনেক বেশি। ভগবান হচ্ছে সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান। ভগবানেরই একটা ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে দেবতারা হয়েছেন, দেবতাদের থেকে আরেকটু কম শক্তি নিয়ে মানুষ হয়। মানুষের আবার অন্য একটা বড় সুবিধা আছে তা হল, মানুষ ভগবানকে লাভ করতে পারে, যেটা দেবাতারা পারে না। আবার দেবতারা অনেক কিছু করতে পারেন যেটা মানুষ করতে পারেনা।

পঞ্চম মন্ত্রে বলা হচ্ছে – ***অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ। দেবো দেবেভিরা গমত্।।*** এখানে যে শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে পরে এই শব্দগুলিই আবার উপনিষদে ব্রহ্মের গুণের বর্ণনার সময় পাওয়া যাবে। ঋষিরা যেন একেক জন করে দেবতাকে চিন্তা করেছেন আর যত প্রকারের গুণ হতে পারে সব গুণগুলি সেই দেবতার উপরে বর্ষণ করেছেন। এইভাবে অনেক গুণ দেবতাদের উপরে ঢালার পর দেখলেন ব্যাপারটা ঠিক যেন জমল না, তারপরে সেটাকেই আবার বাদ দিয়ে দিলেন। তারপর আরেকজন দেবতাকে ধরলেন, এইভাবে করতে করতে তারা ব্রহ্মের উপরে এই গুণগুলি আরোপ করলেন। প্রথম থেকে অগ্নিদেবতার গুণগুলি বাড়াতে থাকছে। প্রথমে বলেছেন – তুমি হচ্ছ পুরোহিত, হোত্রি, এখানে এসে বলছেন অগ্নির্হোতা, মানে তুমি হচ্ছে ঋকবেদের স্তুতিকার। 'কবিক্রতুঃ'র অর্থ মানে তুমি হচ্ছ ক্রান্তদর্শি কবি। ক্রান্তদর্শি কবি মানে হচ্ছে যিনি জ্ঞাতা, ত্রিকালদর্শী, বই পড়া পণ্ডিত নয়। পৌত্তলিক দেবতা বা দেবী বলতে আমরা যা বুঝি, বিশেষ করে আদিবাসীরা যে দেব-দেবীর মুর্তি বা পাথরকে পূজা করে, অগ্নি কিন্তু একেবারেই তা নয়। অগ্নিকে এখানে বলছে 'কবি' 'সত্যঃ', এই সত্যই পরে হয়ে যাচ্ছে সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্, এই সত্যই পরে এসে সচ্চিদানন্দম্ হয়ে যাচ্ছে। অগ্নিকে যখন পূজা করা হয় তখন এই অগ্নিকে, যে অগ্নিকে আমরা প্রতিনিয়ত দেখছির, পূজা করা হয়না। অগ্নির পূজায় অগ্নিকে পূজা করা হয় না, অগ্নির রূপের মধ্যে দিয়ে ভগবানের পূজা হচ্ছে। একজন সন্ন্যাসীর বেড়াল খুব প্রিয়, তিনি সব সময় বেড়ালকে খাওয়ানো, ঘুম পাড়ান, তাদের পরিষ্কার করা, কোন বেড়াল কখন কোথায় যাচ্ছে আসছে এই নিয়েই তিনি ব্যস্ত। তাঁকে বেড়ালের ব্যাপারে কিছু বললেই তিনি জবাব দেন যে 'কেন ঠাকুর বেড়ালের মধ্যেও মাকে দেখতেন'। কিন্তু ঠাকুর বেড়ালের মধ্যে মাকে দেখেছিলেন আর ইনি বেড়ালকেই মা দেখেন, এই হচ্ছে তফাৎ। যাজ্ঞবল্ক তাঁর স্ত্রীকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলছেন – মানুষ নিজের সন্তানকে যে ভালোবাসে সে তার নিজের সন্তান বলেই ভালোবাসে না, নিজের আত্মার ছবি সন্তানের মধ্যে দেখতে পায় বলে সন্তানকে ভালোবাসে। নিজের স্ত্রীকে স্ত্রীর জন্য ভালোবাসছে না, স্ত্রীর মধ্যে নিজের আত্মার ছবি দেখে বলেই ভালোবাসে। আমাদের সমস্যা হচ্ছে যে মানুষ যে নিজের আত্মার ছবি দেখছে সেটা অতি ক্ষুদ্র একটা গণ্ডীর মধ্যেই দেখে, ওর বাইরে সে নিজের আত্মার ছবি দেখতে পায়না। কিন্তু যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী তিনি সব কিছুতেই নিজের আত্মার ছবি দেখতে পান, সেইজন্য সর্বভূতেই তাঁর ভালোবাসা বিলিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু মানুষ যত নিজেকে সংকীর্ণ করে নেয় ততই তার আত্মার ছবিও ছোট্ট হয়ে যায়, কেননা সে অতটুকুর মধ্যেই সে দেখছে, এমন কি অনেকে শুধু নিজেকে নিয়েই থাকে নিজের স্ত্রী সন্তানের ভালোমন্দেও দৃষ্টি দেয়না। একজন আমেরিকান মহিলা স্বামীজীকে বলছিলেন 'স্বামীজী আপনি সব সময় যে বলে সব কিছুর মধ্যে আত্মাকে দেখতে, কিন্তু আমিতো আমার গয়না, সাজপোষাক, টাকা পয়সার মধ্যেই আমার স্বরূপকে দেখি'। স্বামীজী শুনে বললেন 'আপনি তাইই দেখতে থাকুন কোন আপত্তি নেই'। এগুলোওতো ভগবানের বাইরে নয়। স্বামীজী আরও বললেন – 'তুমি ওগুলোর মধ্যেই হাজার হাজার বছর ঘুরপাক খেতে থাক, কোন জন্মে গিয়ে যখন অনেক দুঃখ-কষ্ট পাবে তখন তোমার মনে জাগবে যে এগুলোই শেষ কথা নয়, এর বাইরেও অনেক কিছু আছে'।

আরও বলছেন 'চিত্রশ্রবস্তমঃ' অগ্নিকে ছবির মত বলা হচ্ছে, কারণ চিত্র হচ্ছে সৌন্দর্যের প্রতীক। 'দেবো দেবেভিরা গমৎ' দেব শব্দ দ্যু ধাতু থেকে এসেছে, দ্যু শব্দের অর্থ হচ্ছে আলোকিত, যে আলো বিস্ফুরিত হচ্ছে। খ্রীশ্চানরাও এইটাকে খুব বিশ্বাস করে, ওরা যখন যিশু বা কোন মহাপুরুষের ছবি আঁকে তখন ছবির পেছনে জ্যোতির বলয় দিয়ে দেয়। এখানে অগ্নিকে প্রার্থনা করে বলা হচ্ছে আপনি দেবতাদের নিয়ে আসুন।

তারপরের মন্ত্রে বলছেন – ***যদঙ্গ দাশুষে ত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি। তবেত্তৎসত্যমঙ্গিরঃ***।। অঙ্গিরঃ অগ্নিরই আরেকটি নাম। যজমানের যা কিছু ভালো হচ্ছে, সে যা কিছু পাচ্ছে সবই আপনি তাকে দিচ্ছেন, যজমান যে নিজের শক্তিতে পাচ্ছে তা নয়। যজমান যজ্ঞ করে তার যে সমৃদ্ধি হল, এই সমৃদ্ধিটা তার

নিজের নয়, হে অঙ্গিরস, তুমি তার ওপরে কৃপা করেছ বলেই তার এই সমৃদ্ধি হয়েছে। আমরা প্রায়শই বলি সবই ঠাকুরের ইচ্ছা, তাঁর ইচ্ছাতেই আমার যা কিছু হয়েছে, এই ভাবটা আজকের নয়, বেদের প্রথমেই এই ভাবটা দেখতে পাচ্ছি। বেশি দুঃখ-কষ্ট আসতে থাকলে, বিপদ লেগে থাকলে বলে – ঠাকুরের নাম কর সব বিপদ, দুঃখ-কষ্ট কেটে যাবে। অগ্নিকে বলা হচ্ছে দাতা, যা কিছু আছে সব অগ্নিই দেন।

সপ্তম মন্ত্রে বলা হচ্ছে – ***উপ ত্বাগ্নে দিবেদিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্। নমো ভরন্ত এমসি***।। হে অগ্নি, আমি সকাল বিকাল রোজ আপনার কাছে আহুতি দিতে আসি। আপনি আমার উপর কৃপাবর্ষণ করুন। তার মানে সে বোঝাতে চাইছে আমি অগ্নির একজন উত্তম সেবক, আমি অগ্নিহোত্র করছি, অগ্নিহোত্র ব্রাহ্মণ হচ্ছে যিনি সকাল বিকেল অগ্নিতে আহুতি দেন। তাই অগ্নিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে হঠাৎ আমার খেয়াল হল আর অগ্নিতে একদিন আহুতি দিয়ে দিলাম আর কোন দিন দিলাম না তা নয়, হে অগ্নি আমি আপনার একনিষ্ঠ সেবক। আজকালকার দিনে ব্রাহ্মণরা সারা বছর কত রকমের অন্য ধরণের কাজ করে বেড়ায় আর বছরে হয়তো একদিন কোন পূজাপার্বণে পুরোহিতের কাজ করতে গেল। সারা বছর হয়তো ডাক্তারি করছে আর বছরে দেশের জমিদার বাড়িতে তিন দিন ধরে দুর্গাপূজার পুরোহিতের কাজ করছে। এখানে কিন্তু তা হচ্ছে না, রোজ সকাল বিকেল অগ্নির সেবা করে। ভগবানের উপরে অধিকার দেখাতে হলে, তাঁর উপরে জোর খাটাতে হলে আগে তাকে ভগবানের একনিষ্ঠ সেবক হতে হবে। ঠাকুর বলছেন – দেখা দিবি না মানে, দেখা দিতেই হবে। তুই কি আমার পাতান মা, তুমি আমার আপন মা। অগ্নির উপরেও এই আপনত্ব আরোপ করে বলা হচ্ছে – আপনার সাথে আমার একটা একত্ব ভাব আছে কেননা আমি রোজ সকাল বিকেল আপনার সেবা করি, তাই আমার অধিকার আছে আপনার কাছে কিছু দাবী করার। কিসের দাবী? আপনি আমার পূজা গ্রহণ করুন, আমাকে রক্ষা করুন, আপনি সেই দেবতাদের নিয়ে আসুন, যেই দেবতাদের উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞ করা হচ্ছে। যদিও দেবতাদের উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞ করা হচ্ছে, কিন্তু আমি জানি আমার যা কিছু ভালো হবে সবই আপনার মাধ্যমেই হবে। আমি চাকরি করছি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অফিসে, আমাকে মাইনে দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কিন্তু আমি জানি হে ঠাকুর এই যা কিছু আমার হচ্ছে, এরা যা মাইনে দিচ্ছে, তা তোমার জন্যই আমার সব কিছু হচ্ছে, সুখ সমৃদ্ধি যা কিছু আমি পাচ্ছি তুমিই এর দাতা, 'দাতা এক রাম'। এই ধরণের যত ভাব আছে সবই বেদের প্রথম সূক্তেই পেয়ে যাচ্ছি।

অস্টম মন্ত্রে বলছেন – ***রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিম্। বর্ধমানং স্বে দমে।।*** আমরা আপনার কাছে আসি, যিনি হচ্ছেন 'রাজন্তম্' রাজার মত দীপ্যমান। আসলে রাজা কে? যার তেজ আছে। গীতাতে তেজের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শঙ্করাচার্য বলছেন তেজ হচ্ছে ওজঃ শক্তি, রাজার উপস্থিতিই বুঝিয়ে দেবে যে তিনি রাজা। ওর্হান পামুরের নোবেলজয়ী বই 'My Name is Red' বইতে তিনি এক রাজার বর্ণনা দিচ্ছেন, রাজা নিজের লাইব্রেরীতে ঢুকছেন, যত লোক সেখানে ছিল সবাই নিষ্প্রভ হয়ে গেল, রাজার যে তেজ, সেই তেজ বাকীদের সমস্ত তেজ হরণ কর নেয়। যার মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি কাজ করে তার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে তার তেজে সবার তেজ ঝিমিয়ে যায়। আকাশে চাঁদ উঠলে তারাগুলি নিষ্প্রভ হয়ে যায়, সূর্য উঠলে আবার চাঁদ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। লোডশেডিং এর সময় মোমবাতি জ্বলছে, যেই কারেন্ট এসে টিউব লাইট জ্বলে গেল মোমবাতির আলো ক্ষীণ হয়ে গেলে। টিউব লাইট কি মোমবাতির আলোটাকে হরণ করে নিল? না, মোমবাতির আলোটা টিউব লাইটের আলোতে চাপা পড়ে গেল। রাজা যখন ঢুকবে তখন মন্ত্রী, সেনাপতি সবার তেজ রাজার তেজে চাপা পড়ে। সায়ণাচার্য তাই রাজার ব্যাখ্যাতে বলছেন 'দীপ্যমানম্'। অগ্নিকেও তাই বলা হচ্ছে রাজা, সব সময় তুমি দোদীপ্যমান, তোমার তেজে তোমাকে সব সময় জ্বলজ্বল দেখাচ্ছে। 'অধ্বরাণাং' যাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা হচ্ছে তাদের মধ্যে অগ্নি সব থেকে বেশি জ্বলজ্বল করছে। 'গোপামৃতস্য' ঋতং শব্দটা বেদে আমরাই প্রায়ই পাব। ঋতের অনেকগুলি অর্থ হয়। সায়নাচার্য এখানে ঋতম্‌কে সত্যম্ অর্থে ব্যবহার করেছেন। ঋতমের আরেকটা অর্থ হচ্ছে মহাজাগতিক নিয়ম, যে নিয়মের মাধ্যমে এই জগত ঠিক ঠিক চলছে। আবার ঋতমের আরেকটি অর্থ হয় ধর্ম। 'গোপামৃতস্য' মানে, হে অগ্নি

তুমি সত্যকে অনাবৃত করে তাকে আলোকিত কর। আর বলছেন দীদিবিম্ বর্ধমানং স্বে দমে – হে অগ্নি, তোমার যে এত গুণ সেতো আছেই কিন্তু তারপরেও তুমি তোমার নিবাসে দিনে দিনে বর্ধিত হচ্ছ। এটাই খুব মজার ব্যাপার, অগ্নির যে গুণগুলি আছে তার মধ্যে একটা আছে, অগ্নি যদিও পুরাতন কিন্তু একেবারেই নতুনের মত। কারণ, রোজই অগ্নির নতুন নতুন শুদ্ধ জন্ম হচ্ছে যেহেতু অরণি কাষ্ঠের দ্বারাই প্রতিদিন নতুন নতুন ভাবে অগ্নির জন্ম হচ্ছে। আবার অন্য দিকে পুরনো কারণ আদিম কাল থেকে অগ্নি চলে আসছে। তাছাড়া দিনে দিনে বৃদ্ধি হচ্ছে। রোজই তো যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হচ্ছে, তাই অগ্নির ক্ষয় হবার কোন প্রশ্নই নেই, সেইজন্য দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। পুরানেও এই ভাবটা আবার আসবে, সেখান পুরানকে বলা হচ্ছে, পুরানের সব আখ্যায়িকা গুলি পুরনো কিন্তু নতুনের মত। এখানে সায়নাচার্য ঋতমের অর্থ বলছে – সত্যস্য অবশ্যম্ভাবিনাঃ কর্মফলস্য। যে কর্মফল হবেই হবে।

নবম মন্ত্রে বলছেন – ***স নঃ পিতেব সুনবেহগ্নে সূপায়নো ভব। সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে।।*** হে অগ্নি! পিতা যেমন সন্তানের সঙ্গে এক, পিতা যেমন সন্তানের কিসে ভালোর হয় তার জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকেন, ঠিক তেমনি তুমিও আমাদের সাথে পিতা-পুত্রের মত এক হও আর আমাদের যাতে মঙ্গল তার জন্য তুমি তোমার কৃপাদৃষ্টি সব সময় আমাদের উপরে দাও। এই হচ্ছে অগ্নির প্রতি প্রার্থনা। এগুলো আসলে হচ্ছে সিদ্ধ মন্ত্র। গায়ত্রী বা ইষ্টমন্ত্রের মত জপ করলে এর ফল পাওয়া যাবে। এই যে শেষে বলা হচ্ছে পিতা যেমন সন্তানকে রক্ষ করেন হে অগ্নি তুমিও আমাদের সেইভাবে রক্ষা কর, এখন যেদিন থেকে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়ে এটা পাঠ করলে দেবতারা আমাদের নিশ্চয়ই রক্ষা করবেন।

বেদ – ১৩ই ফেব্রুয়ারী ২০১০

এখন আমরা বেদের ধর্ম অর্থাৎ বেদ কি বলতে চাইছে সেটাকে আরো বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। চারটে বেদে মূলতঃ চার রকমের কথা বলা হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি বেদ হচ্ছে হিন্দু ধর্মের মূল, বেদের বাইরে হিন্দু ধর্মের কিছু নেই। বেদেরই বিভিন্ন ভাবগুলি আরো নানা ভাবে সম্প্রসারিত হয়ে পরবর্তি কালে হিন্দু ধর্মের অন্যান্য শাস্ত্রে জায়গা করে নিয়েছে।

এর আগে আমরা বলেছিলাম ধর্ম হচ্ছে দুই প্রকার – প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম আর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। লক্ষণ হচ্ছে গুণাবলী, প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তির গুণাবলী। বাংলাতে যখন কেউ বলে – তোমার কি রকমের প্রবৃত্তি? অর্থাৎ তোমার মনটা কোন দিকে যাচ্ছে। প্রবৃত্তি হচ্ছে একটা দিকে মন দেওয়া আর নিবৃত্তি হচ্ছে সেইখান থেকে মনকে সরিয়ে আনা। যখন কোন কিছুতে আমি মন দিচ্ছি তখন সেটা হয়ে গেল প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। যে কোন ধর্মই এই দুই প্রকারের। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মে কর্মই প্রধান আর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মে ত্যাগই মূল। যে কোন সমাজে বিভিন্ন ধরণের মানসিকতার মানুষ বাস করে, কিছু লোকের মধ্যে কর্মের তোড় বেশি, যারা কর্ম ছাড়া থাকতে পারেনা। যাদের মধ্যে দৈহিক মানসিক শক্তি খুব বেশি থাকে তারা সেই শক্তিটাকে ব্যয় করবার জন্য সব সময় ছটফট করছে। সেইজন্য যে কোন ধর্মকে যদি সাফল্য পেতে হয় তাহলে সবার আগে সাধারণ মানুষের মনটাকে আগে জয় করতে হবে। ইসলাম ধর্ম যেমন পুরো প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। সকাল সন্ধ্যা পাঁচবার নমাজ পড়বে, এতটা দান করবে, জীবনে একবার মক্কা ঘুরে আসবে। এইগুলো সবই হচ্ছে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের কথা। নিবৃত্তিতে আবার সব কিছুকে ছাড়ার কথা বলা হয়, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুর কথা চিন্তা করা যাবে না। বৌদ্ধ ধর্ম হচ্ছে পুরো নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। এখানে করার কিছুই নেই সবটাই হচ্ছে ছাড়ার কথা। যদি কোন ধর্ম একটাকে বেশি জোর দিয়ে অন্যটাকে অবহেলা করে তখন সে ধর্মের অনেক দোষ এসে পড়ে। কারণ বিশেষ ধরণের লোকদের সেই ধর্মে মন তৃপ্ত হয় না। বেদে দুটো ধর্মই আছে, প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ এই দুটোকেই বেদ সমান ভাবে জোর দিয়েছে।

যদি কেউ জিজ্ঞেস করে বেদের ধর্ম কি? তখন বলতে হবে বেদের এইটাই হচ্ছে সৌন্দর্য যে বেদ দূটো ধর্মকেই সমান গুরুত্ব দিয়েছে। নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মে বেদের বিশেষত্ব হচ্ছে, বেদের ঋষিরা নিজেরাই বলছেন যে চরম নিবৃত্তিতে বেদকেও ছাড়িয়ে যায়। *তত্র বেদা অবেদা ভবতি*, সেখানে বেদ অবেদ হয়ে যাবে। অন্যান্য ধর্মে বিশেষ করে ইসলাম ও খ্রীশ্চান ধর্মের সাধনা করে একজন সাধক যত বড়ই হয়ে যাক না কেন সে কখনই বাইবেল আর কোরানের বাইরে যেতে পারবে না, কোরানের বাইরে চলে যাওয়ার কথা বললেই সে শেষ। হিন্দুদের ক্ষেত্রে এই জিনিষ কখনই হবে না, চরম ত্যাগে তোমাকে বেদকেও অতিক্রম করে যেতে হবে, বেদকে শুধু ত্যাগই না, অবশ্যই ত্যাগ। তুমি যদি এখনও বেদকে ধরে থাক তাহলে বুঝতে হবে তোমার সাধনা এখনও শেষ হয়নি। ঠাকুর বলছেন – সন্ন্যাসীর কাছে কিছুই থাকবে না, একটা গীতা অবশ্যই থাকবে। গীতা থাকবে মানে একটা প্রতীক রূপেই থাকবে। বেদ হচ্ছে বিধি-নিষেধ, সন্ন্যাসি, যিনি নিবৃত্তি মার্গে আছেন তাঁর ক্ষেত্রে এই বিধি-নিষেধ প্রযোজ্য নয়, সেইজন্যই বলা হয় সন্ন্যাসী বেদকেও অতিক্রম করে যায়।

বেদের একটা প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে বেদে অনেক দেবতার কথা পাওয়া যাবে। বেদে যত দেবতার উল্লেখ পাই তার অনেক দেবতাই এখন হারিয়ে গেছে। বেদের দেবতাদের সম্বন্ধে যেটা সাধারণত সবাই মনে করেন তা হচ্ছে প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিরই একেকটি মুর্ত রূপ। প্রকৃতিতে নানান ধরণের শক্তির প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়, বাতাসের শক্তি, জলের শক্তি, অগ্নির শক্তি, প্রকৃতির যে কোন শক্তিকে বেদ যেন একটা রূপ দিয়ে সামনে নিয়ে আসছে। ইদানিং কালে আণবিক শক্তি বা বিদ্যুৎ শক্তিকে যদি একটা মুর্ত রূপ দিয়ে তার একটা দেবতা ঠিক করে দেওয়া হয় তাহলে বেদের যে দেবতারা আছেন যাদের প্রকৃতির

বিভিন্ন শক্তির মুর্ত রূপে ভাবা হয়েছে, এই দুটোর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। মুর্ত রূপ দিয়ে দেওয়া মানে এটা একটা কবিতার মত কোন কল্পনা নয়। একটা জাগতিক বিষয়কে চিন্তা করতে করতে যখন তাঁরা ধ্যানের গভীরে এমন একটা স্তরে চলে যেতেন যেখান থেকে আর সেই বিষয়ের পেছনে যেতে পারতেন না, তখন সেই জাগতিক শক্তি, যেমন বাতাস, তার যে একটা দিব্য স্বরূপ আছে, সেই দিব্য স্বরূপের সন্ধান তাঁরা পেয়ে যেতেন। এখন যদি মনে করা হয়, অগ্নির যে দেবতা আর রান্নাঘরে যে গ্যাস ব্যবহার করা হয় তার সাথে কি সম্পর্ক আছে? এটা বলা খুবই মুশকিল যে এটা তাদের কল্পনা কিনা। কিন্তু সাধক যখন অগ্নির উপরে ধ্যান করতে শুরু করেন, তারপর যত ধ্যানের গভীরে যেতে থাকেন তত অগ্নির সে বাহ্যিক মুখোশগুলি রয়েছে সেগুলো অপসারণ হতে শুরু করে। অগ্নির উপরে যে আবরণ রয়েছে সেটা অপসারিত হয় না, সাধকের মনের উপরে যে আবরণ গুলি রয়েছে প্রকৃত পক্ষে সেগুলো একটা একটা করে সরে যেতে থাকে। তারপরে একটা স্তরে গিয়ে তাঁর উপলব্ধি হয় যে এই উনুনের আগুন আর ঐ উনুনের আগুন দুটো এক। এখান থেকে আরো একটু এগিয়ে দেখছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় যত অগ্নি আছে সবটাই এক। আমরা মনে করতে পারি ঋষি কি আর এমন বিরাট কথা বললেন। কিন্তু আমরা কি কখন মনে করতে পারি আমি, আপনি আর ওপাড়ার রাম, শ্যাম, যদু, মধু সব এক? কম্যুনিস্টরা বলে দুনিয়ার মজুর এক হও। ঠিক কথাই বলছে তারা, আমরা সবাই এক, বিপ্লব হয়ে গেল। যখনই মজুররা এক হয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে নিল যারা নেতা ছিল তারা উঠে এল ওপরে, যারা মজুর ছিল তারা মজুরই থেকে গেল। তার মানে তোমার যে স্লোগান দুনিয়ার মজুর এক হও, এটা তোমার শুধু মুখের কথাই ছিল, এতটুকু সত্য ছিল না। আমরা সর্বক্ষণ বলে চলেছি সবই ঠাকুরের ইচ্ছা, ঠাকুরের ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হবে না। কিন্তু এই কথা বলার পরক্ষণেই সব কিছুতেই কি আমরা ঠাকুরের ইচ্ছাকে দেখি বা দেখার কখন চেষ্টা অন্তত করি? কখনই করি না, কেন না এগুলো আমাদের মুখের কথা। কিন্তু ঋষিরা যখন দেখেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যত দাহিকা শক্তি আছে সবই সেই অগ্নি দেবতারাই শক্তি, তখন অগ্নিকে তাঁরা সামনে দেবতা রূপেই দেখেন। তাঁরা কখনই দেখেন না যে স্বর্গে একজন অগ্নি রূপে দেবতা আছেন আর তাঁর নিঃশ্বাসে এই আগুন জ্বলছে। তাঁরা দেখেন সেই অগ্নি, সেই দিব্যশক্তি, সেই দাহিকা শক্তি তাঁর ভেতরেও বিরাজমান আবার সবার মধ্যেও সেই একই শক্তি বিরাজ করছে।

এখন যিনি এই সাধনাটা করছিলেন তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ ভাবে দিব্যশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সাধনা করে করে তাঁর আন্তর্জগতে এই যে রূপান্তর হচ্ছে তার ফলে তাঁর মধ্যে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করবার শক্তি এসে যায়। অগ্নির গুণাবলী গুলি তাঁর মধ্যেই সঞ্চারিত হয়ে তাকে এক দিব্যশক্তিতে পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক পুরুষে পরিণত করে দেয়। রাজযোগে বিভূতি-পাদে পতঞ্জলি উল্লেখ করেছে যখন সাধক ধ্যানের পরাকাষ্ঠা লাভ করে তখন সে এই এই জিনিষের উপরে ধ্যান করলে তাঁর এই এই শক্তি লাভ হবে। পতঞ্জলি এই তত্ত্বটাকে খুব বিজ্ঞান সম্মত ভাবে আলোচনা করেছেন। অগ্নি সম্পর্কিত যা যা শক্তি আছে সব অগ্নি উপাসকের মধ্যে এসে যাবে। তাই ঋষিরা বলছেন – তোমার বাড়িতে যে অগ্নিকে নিত্য ব্যবহার করছ সেই অগ্নিকে নিয়ে যদি তুমি ধ্যানের গভীরে যাও তাহলে তোমার মধ্যেও অগ্নির সমস্ত শক্তি ও গুণ চলে আসবে।

বেদে যত দেবতার নাম দেখতে পাই সমস্ত দেবতাই হচ্ছেন প্রকৃতির একেকটি শক্তির মুর্ত রূপ। কিন্তু তাই বলে এটা ভাবা ভুল হবে যে বেদ প্রকৃতির উপাসনার কথাই বলছে। আমরা যে আগুন দেখছি বেদ সেই আগুনের পূজার কথা বলছে না। আদিবাসী অধ্যুষ্যিত অঞ্চলে দেখা যায় আদিবাসীরা কোন পাথরের বা কোন বৃক্ষের সামনে আগুন জ্বেলে পূজা করছে। এখন বেদের যে ঋষি আগুন জ্বেলে পূজা করছে আর আদিবাসীরা যে আগুনের পূজা করছে এই দুটো পূজা কখনই এক নয়, দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। আদিবাসীরা যখন পূজা করে তখন তাদের মনের মধ্যে অগ্নির স্থূল রূপকেই সে দেখছে আর সেই মনোভাব নিয়েই পূজা করে। কিন্তু বেদের ঋষি যখন অগ্নির পূজা করছেন তখন তিনি অগ্নির স্থূল রূপকে দেখছেন না,

তিনি অগ্নির মধ্যে যে আধ্যাত্মিক সত্তা রয়েছে তাঁকে তিনি দেখছেন। ঋষি পূজার সময় দেখছেন – জগৎ কোন মতেই ঈশ্বর ছাড়া নয়, ঈশ্বরেরই একটা রূপ মানুষ, একটা রূপ অগ্নি, ঈশ্বরেরই একটা রূপ বাতাস, তিনিই জগতের সব কিছু হয়েছেন। এইটাই চরম সত্য। তিনি অগ্নিতে যে রূপে প্রকাশ হয়েছেন সেই রূপের স্তুতিই বেদের ঋষি করছেন। যখন এই রূপটাকে ঈশ্বরের রূপ বলে ধরে নেবে তখন তিনি অগ্নির শক্তির সাথে এক হয়ে যাবেন।

একটা উপমা দিলে এই জিনিষটাকে বোঝা যাবে। একটা চক আছে, এই চক দিয়ে অনেক কাজ হয়, কখন এটা দিয়ে লেখা যাচ্ছে, কখন এটাকে দিয়ে সাদা রঙ করা যাবে। একজন সাধারণ মানুষ এই চকের ক্ষমতা এইটুকুর মধ্যে দেখে। আবার একজন লেখাপড়া জানা মানুষ দেখবে এই চকের গঠণ হয়েছে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দিয়ে। যখন কেউ চকের রাসায়নিক গঠণটা জেনে যাবে তখন চকের ব্যাপারে তার অনেক ক্ষমতা এসে যাবে। এই রাসায়নিক গঠণটাকে দিয়ে সে এখন অনেক কিছুই করতে পারবে। আবার যে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের পরমাণুর গঠণটাকে ধরে ফেলবে তখন তার ক্ষমতার মাত্রাটা অনেক বেড়ে যাবে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকায় এটা বিশ্বের সবাই জানে। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনরা যখন বললেন আকাশের এই বিদ্যুৎ আমাদের অনেক প্রাণহানির কারণ হয়, কিন্তু একে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তারপরে ওনারা Lightning Conductor লাগিয়ে বজ্রপাত থেকে রক্ষা পেল। এতে আবার খ্রীশ্চান পাদরীরা পড়ে গেল মহা ফাঁপরে, কেননা সেই সময় যখন চার্চগুলির উপর বজ্রপাত হত তখন পাদরীরা সবাইকে বলত তোমরা সব পাপ কর তাই শয়তান চার্চের উপরে বজ্র ফেলে চার্চকে নষ্ট করার সুযোগ পেয়ে যায়। লোকগুলি সহজ সরল মনে এইটাকেই বিশ্বাস করে আতঙ্কিত হয়ে নিজেরাই টাকা পয়সা দিয়ে চার্চগুলিকে সারিয়ে দিত। বেঞ্জামিন যখন আবিষ্কার করলেন এগুলো মূলত তড়িৎ শক্তি আর তার আগেই static electricity আবিষ্কার হয়ে গেছে ঘুড়ি উড়িয়ে। তারপরে মাইকেল ফেরারে এসে current electricity আবিষ্কার করলেন, আর আজ বিশ্বের মানুষ বিদ্যুৎ শক্তিকে এমন ভাবে করায়ত্ত করেছে যে একই বিদ্যুৎ শক্তি দিয়ে ঠাণ্ডাও করে দিচ্ছে আবার সেই একই বিদ্যুৎ শক্তি দিয়ে গরমও করে দিচ্ছে। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এমন কোন জিনিষ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি যে একই জিনিষ দিয়ে ঠাণ্ডাও করা যায় আবার গরমও করা যায়, একমাত্র ইলেক্ট্রিকসিটির শক্তিই শুধু এটা করতে পারে। অথচ এই জিনিষটা আমাদের পূর্ব পুরুষরা জানতেন না। তারপরে এলেন আইনস্টাইন, তিনি বস্তুকে ভেঙ্গে তার অনু ও পরমাণুকে বার করলেন, সেই থেকে এলো আণবিক শক্তি, এখন এই শক্তিকে দিয়ে অনেক কিছুই করা যাচ্ছে, একদিকে মানবজাতির কল্যাণেও একে ব্যবহার করা যায় আবার মানবজাতিকে ধ্বংসের মুখেও ঠেলে দেওয়া যায়।

এইটাই হচ্ছে মজা, আমরা বস্তুর যত ভেতরে যাব, যতই এর রহস্যকে উদ্‌ঘাটন করে এর মৌলিকত্বকে বার করতে পারব ততই আমাদের ক্ষমতা বেড়ে যাবে। বস্তুর যত ওপরের দিকে অর্থাৎ স্থূল অবস্থাকে ধরে থাকব, আমি যতই পড়াশুনা করে বিশাল পণ্ডিত হই না কেন, দশটা বিষয়ে জ্ঞান হতে পারে কিন্তু তাতে কোন কাজ হবে না। বিজ্ঞানের একেকটি দিকে, কেউ রসায়নে, কেউ পদার্থে, এই ভাবে বস্তুর মৌলিকত্বকে জানবার জন্য প্রাণপাত করে দিচ্ছে, কেউ আবার জেনেটিক বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম অবস্থাকে বার করে নতুন প্রজাতির জন্ম দিয়ে দিচ্ছে। ঠিক একই জিনিষ আধ্যাত্মিক জগতেও হচ্ছে, বাড়িতে আমরা যে আগুন জ্বালাচ্ছি, সেই আগুনের আধ্যাত্মিক সত্ত্বাকে যেই আমরা জেনে নেব তখন অগ্নির গুণাবলীকেও আমরা আয়ত্ত করে নিতে পারব। কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে, বিদ্যুৎ শক্তির রহস্য অন্য লোককে শিখিয়ে দেওয়া যায় বা অন্যের কাজে লাগান যায়, যেমন একটা ব্যাটারি দিলে আমরা সেটাকে কাজে লাগিয়ে দিতে পারি। কিন্তু অন্তর্জগতের ক্ষেত্রে সেটা হবে না, যার হয় তারই হয়। যিনি সাধনা করে অগ্নির গুণাবলীকে আয়ত্ত করে নিয়েছেন সেটা তাঁরই থাকবে, তিনিই শুধু বিশাল ক্ষমতাশালী হয়ে যাবে। একেবারেই যে কিছু অন্যের জন্য করতে পারবেন না তা নয়, তিনি পথ দেখিয়ে দিয়ে অন্যকে এগিয়ে দিতে প্রেরণা দিতে পারেন, যেমন

স্বামীজী আজকে এত কিছু করেছিলেন বলেই আজ আমরা আমাদের মননশীলতার ও বিচার বুদ্ধির ক্ষেত্রে এতটা উন্নত হতে পেরেছি।

বেদের প্রথমের দিকে তেত্রিশ দেবতার কথা বলা হয়েছে, সমস্ত দেবতাকে আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম হচ্ছে পৃথিবীর দেবতা, দ্বিতীয় হচ্ছে অন্তরীক্ষের দেবতা আর তৃতীয় হচ্ছে স্বর্গের দেবতা। দেবতারা এই তিনটে জায়গায় বাস করেন। দেবতারা কেউ অনাদি নন, তাঁদের সবারই জন্ম হয়েছে। হিন্দু ধর্মের পরম্পরাকে জানতে হলে দেবতা আর ঈশ্বরের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য জানা দরকার। দেবতাদের একটা সময়ে সৃষ্টি হয়েছেন, একটা এমন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছাচ্ছেন যখন দেবতারা ছিলেন না, এনারা সবাই একটা সময়ের মধ্যে আবদ্ধ, কিন্তু ঈশ্বর হচ্ছেন অনাদি, তাঁর সৃষ্টিও নেই লয়ও নেই।

আমরা মরুৎ দেবতাদের জন্ম বৃত্তান্ত পুরানে পাই। দৈত্যদের মা হচ্ছেন দিতি। ইন্দ্র সব সময় ছলে কৌশলে দৈত্যদের হারিয়ে দিয়ে বধ করে দিচ্ছে। দৈত্য জননী দিতি গেলেন খুব রেগে। ইন্দ্রকে জব্দ করার জন্য তিনি তাঁর স্বামী কাশ্যপ মুনির কাছে বর চাইতে গেলেন – আমাকে এমন এক পুত্র দিতে হবে যে একাই ইন্দ্রকে শেষ করে দেবে। কাশ্যপ মুনি পড়ে গেলেন খুব চিন্তায়, কেননা ইন্দ্র যত খারাপ কাজই করুক না কেন, কিন্তু সে হচ্ছে লোককল্যাণকারী। কাশ্যপ তখন দিতিকে বললেন যে – আমি তোমাকে বর দেব যাতে তোমার এমন এক সন্তান জন্ম নেবে যাকে কেউ বধ করতে পারবে না, কিন্তু তার জন্য তোমাকে কতকগুলি ব্রত পালন করতে হবে। দিতির এর পরে অনেক ব্রত করতে শুরু করে দিল, এদিকে তার গর্ভও হয়েছে। অন্য দিকে ইন্দ্র পড়ে গেলেন মহা দুশ্চিন্তায়, একদিকে দিতি হচ্ছে ইন্দ্রের সৎ মা, আর তার যে সন্তান হবে তার কোন দিন নাশ হবে না। ইন্দ্র সুযোগ খুঁজতে লাগল কি ভাবে এই সন্তানের জন্মের আগেই গর্ভের মধ্যেই তাকে বিনষ্ট করে দেওয়া যায়। একদিন দিতি রাত্রি বেলা পা না ধুয়ে বিছানায় শুতে গেছে, ব্যস ইন্দ্র সুযোগ পেয়ে গেছে, ব্রত ভঙ্গ হয়ে গেছে, সেই সুযোগে ইন্দ্র তার সৎ মার গর্ভে ঢুকে গিয়ে গর্ভে যে সন্তান ছিল তাকে সাতটা টুকরো করে দিল। কিন্তু কাশ্যপের বরে এই সন্তান অমর, তাই তার মৃত্যু হল না। যেই সাতটা টুকরো করে দিল তখন সেই গর্ভের সন্তান কাঁদতে শুরু করল। ইন্দ্র তখন প্রত্যেক টুকরোকে আরো সাতটা সাতটা করে টুকরো করে দিল, কিন্তু তারা কেউ মারা গেল না কিন্তু তাদের শক্তিটা কমে গেল। যখন কাঁদছিল তখন ইন্দ্র তাদেরকে বলছে ‘মা রুদ’ ‘মা রুদ’, তোমরা কেঁদো না। তারা জিজ্ঞেস করল তুমি কে? ইন্দ্র বলল ‘আমি তোমাদের দাদা’। তারা বলল ‘ঠিক আছে, তুমি যখন আমাদের দাদা হও তাই আমরা সব সময় তোমার সাথে থাকব’। ইন্দ্র তখন একদিকে এদের শক্তি ক্ষয় করে দিল আর দ্বিতীয়তঃ ওদের ঊনপঞ্চাশ জনকে নিজের বন্ধু বানিয়ে নিল। এরাই পরে হল ঊনপঞ্চাশ মরুৎ, মরুৎ মানে বাতাস। প্রথমে ‘মা রুদ’ বলে ইন্দ্র সম্বোধন করেছিলেন বলে এদের নাম হয়ে গেল মরুৎ। এই কাহিনীটা বলা হল এই কারণে যে দেবতাদের এখানে জন্ম হল, একটা বিশেষ সময়ে তাদের জন্ম হয়েছিল। বেদে মরুৎএর কথা আসবে। পুরানে আবার এই কাহিনীকেই আরো অনেক বিস্তৃত করে বলা হয়েছে।

আরেকটা যেটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তা হল, সমস্ত দেবতাদের এক সঙ্গে জন্ম হয়নি, তাদের কারুর আগে আবার কারুর পরে জন্ম হয়েছে। এখনও দেবতাদের জন্ম হতে পারে, কেউ বিদ্যুতের উপরে ধ্যান করে করে হয়তো বিদ্যুতের দেবতার সৃষ্টি করে দিতে পারেন। বেদে দেবতাদের সংখ্যা কোন নির্দিষ্ট করা নেই, কোরান বাইবেলের আছে, যদি নতুন কোন দেবতার জন্ম হয়ে যায় তাহলেও আমাদের কোন সমস্যা হবে না। শুধু তাই নয়, বেদের প্রথম দিকে যেসব দেবতারা খুব ক্ষমতাবান ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে পরের দিকে বেদেই উল্লেখ আছে সেই দেবতারাই আবার সব ক্ষমতা হারিয়ে সাধারণ হয়ে গেছে। দেবতারা কখন কখন খুব শক্তিশালী হয় আবার কখন কখন তারা অনেক দমে যায়। যে ইন্দ্রকে বেদ এত শক্তিশালী বলছে সেই ইন্দ্রই আবার মহাভারতে এসে শ্রীকৃষ্ণের কাছে নাস্তানাবুদ হয়েছেন। এখন ভারতে কোথাও কেউ আর ইন্দ্রকে পূজা করে না। বেদেই আছে যে এই দেবতা এক সময় খুব শক্তিশালী ছিলেন এখন তাঁর আর

সেই শক্তি নেই। পরবর্তি কালে নতুন একটা ধারণা তৈরী হল যে, যেসব মানুষ খুব ভালো কাজ করে, অনেক পূণ্য করে তারাই মৃত্যুর পর দেবতা হয়ে জন্মায়। ইন্দ্র, বরুণ এগুলো সবই হচ্ছে একটা পদ। যেসব দেবতার কথা বেদে বলা হচ্ছে এদেরকে মানবিক রূপেই দেখা হত। মানুষের এটাই স্বাভাবিক, তারা যখন ঈশ্বর দেবতার কিছু চিন্তা করে তখন তাদের মানবদেহধারী রূপেই মনে করে। এতে কোন দোষ নেই। দেবতারা যে কোন আকৃতি নিতে পারে, তাহলে মানুষের আকৃতি নিতে পারার মধ্যে কোন আপত্তি হওয়ার কিছু নেই। এইভাবে চিন্তা করলে ধ্যান উপাসনা করতে মানুষের সুবিধা হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদেও উপাসনার বিষয়ে যেখানে বলা হয়েছে সেখানে এই জিনিষটাকেই উল্লেখ করা হয়েছে। যখন কোন কিছুর উপাসনা করবে তখন তার উপর অনেক গুণ আরোপিত করে দিয়ে উপাসনা করবে।

এইভাবেই সূর্যের যে দেবতা আছেন তার হাতকে সূর্যের রশ্মি রূপে কল্পনা করা হয়। আবার অগ্নিকে যখন মানুষ রূপে কল্পনা করা হয় তখন অগ্নির শিখাকে তার জিহ্বা রূপে দেখা হয়। দেবতাদের যে গুণের কথা বলা হয় তা সব আলাদা আলাদা। যদিও দেবতাদের কোন বর্ণ নেই কিন্তু তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যতাকে কেন্দ্র করে একেক জন দেবতাকে একেকটি বর্ণের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়। যেমন ইন্দ্রকে একজন ক্ষত্রিয় যোদ্ধা রূপে দেখা হয়। অগ্নি আর বৃহস্পতির স্বভাব অনুযায়ী তাদেরকে পুরোহিত রূপে দেখা হয়। দেবতাদের সবারই কিছু না কিছু একটা বাহন থাকবে। বেশির ভাগ সময় এঁদের ঘোড়া আছে, হাতিও আছে, আর বিভিন্ন পশু পাখিও বাহন রূপে দেখা যায়। সাধারণত দেখা যায় মানুষ সে সব খাদ্যদ্রব্য ভালোবাসে দেবাতারাও সেই সব খাদ্য খেতে ভালোবাসেন। শ্রীমা যেমন বলছেন – ঠাকুর যখন বেঁচে ছিলেন তখন কেউ দেখল না, এখন ঠাকুর নেই কিন্তু নিজেরা যা খেতে ভালোবাসে সেই জিনিষ দিয়েই ঠাকুরকে ভোগ দেয়। দেবতাদের যজ্ঞের মাধ্যমে খাদ্য সামগ্রী নিবেদন করা হয়, যখন যজ্ঞ হয় যে দেবতা যা যা খেতে ভালোবাসেন সেই সেই খাদ্য দ্রব্য সেই সেই দেবতার উদ্দেশ্যে আগুনে আহুতি দিয়ে দেওয়া হয়। অগ্নি দেবতা সেই খাদ্যদ্রব্যের সার ভাগটা সেই সেই দেবতাদের উদ্দেশ্যে বহন করে নিয়ে যান। শ্রীমাকে একজন জিজ্ঞেস করছে – ঠাকুরকে যে ভোগ দেওয়া হয় ঠাকুর সেটা কিভাবে গ্রহণ করেন। শ্রীমা বলছেন – ঠাকুরের পটের সম্মুখে যে ভোগে দেওয়া হয় ঠাকুরের ছবি থেকে একটা জ্যোতি বেরিয়ে সেই ভোগের রসটুকু আস্বাদ করে নেন। দেবতারাও ঠিক তাই করেন। শ্রীমার কথা যদি আমরা বিশ্বাস করি তাহলে দেবতাদের এইভাবে খাদ্য রস আস্বাদনের ব্যাপারটাও মানতে হবে। বিদেশে একজন যুক্তিবাদী আছেন যার কাজ হচ্ছে যত ধর্মীয় নেতারা আছেন তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করা। একজন খ্রীশ্চান ফাদার যিনি প্রচণ্ড পড়াশুনা করা, তাকে জিজ্ঞেস করছে – আপনি ভগবান মানেন? হ্যাঁ মানি। যুক্তিবাদী জিজ্ঞেস ফাদারকে আবার জিজ্ঞেস করছে – কেন মানেন? ফাদার বলছেন – Miracle is the proof of God. যুক্তিবাদী এবারে জিজ্ঞেস করছে – তাহলে মহম্মদ সাদা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে স্বর্গে গিয়ে আল্লার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এটা আপনি মানেন? ফাদার জবাব দিচ্ছেন – কোন মতেই মানিনা। যুক্তিবাদী – তাহলে আপনি মনে করেন এটা মিথ্যা? ফাদার – হ্যাঁ, পুরো মিথ্যা। এইভাবে যুক্তিবাদী একটা একটা করে আরো অনেক ধর্ম থেকে এই রকম কিছু অলৌকিক কাহিনী তুলে ফাদারকে জিজ্ঞেস করছে – এটাও কি আপনি মানছেন? ফাদার সব কটাকে মিথ্যা শুধু নয় একেবারে আজগুবি বলে উড়িয়ে দিলেন। মুসলমানরা যা বলছে সেটা মিথ্যা, হিন্দুরা যা বলছে সেটা মিথ্যা আর আপনার মিরাক্যালটা সত্য এটা কি করে হচ্ছে? ফাদার বলছে – কেন, তুমি একটা নোট দেখলে জাল, আরেকটা নোট দেখলে জাল, কিন্তু তার মধ্যে একটা নোটতো ঠিক থাকবে, আমরাই হলাম সেই সত্য নোট। এই ধরণের যাদের মনোভাব তাদের উপরে কার শ্রদ্ধা হবে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে ঢাকাতে ঠাকুর দেখা দিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঠাকুরের গা টিপে টিপে দেখেছেন। এটাকে যদি একজন ঠাকুরের ভক্ত বিশ্বাস করতে পারে তাহলে সে অন্যান্য ধর্মে এই ধরণের যত অলৌকিক কাহিনী আছে সেগুলিকেও তাকে বিশ্বাস করতে হবে। অবতার মানেই হচ্ছে তাঁর এমন কিছু বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে আসেন যা অন্য কারুর পক্ষে করা কখনই সম্ভব নয়। ঠাকুর যা যা করে গেছেন তার কিছু কিছু জিনিষ কেউ পুনারাবৃত্তি করতে পারবে আবার এমন অনেক কিছু আছে যা কেউই

পুনরাবৃত্তি করতে পারবে না। তেমনি ভগবান অনেক কিছু করতে পারেন কিন্তু দেবতারা করতে পারবেন না, যেমন ঈশ্বর সৃষ্টি করতে পারেন, যেটা আর কেউ করতে পারবে না। আমরা যে অনেকবার বলেছি যে যাই নতুন কোন তত্ত্ব বলে দিচ্ছে সেটাকে তখনই সত্যি বলে ধরা হবে যখন শ্রুতি, যুক্তি আর অনুভূতিতে মিলছে। কিন্তু যখন আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অনুভূতি হচ্ছে তখন একজন এক রকম ভাবে উপলব্ধি করছে অন্য কেউ আরেক রকম ভাবে অনুভূতি লাভ করছে, কেননা শক্তির তারতম্য আছে। ঠাকুরের কোন এমন উপলব্ধি নেই যেটা আমরা কখনই উপলব্ধি করতে পারবো না, কিন্তু একই লোক ঠাকুরের সমস্ত উপলব্ধি গুলিকে লাভ করে নেবে এটা কখনই সম্ভব হবে না। যেমন কেউ চেষ্টা করলে বিল গেট্স হয়ে যেতে পারে কিন্তু কুবের কোন দিন হতে পারবে না।

শ্রীমার কথাকে, ঠাকুরের ছবি থেকে একটা জ্যোতি বেরিয়ে এসে নিবেদিত খাদ্যের সব রস আস্বাদ করেন, এটাকে বিশ্বাস করলে বেদে দেবতারা যে এসে যজ্ঞের আহুতির সব সার গ্রহণ করেন এটাও বিশ্বাস করতে হয় বা অগ্নি যে দেবতাদের নিয়ে আসেন এটাও মানতে হবে। যদি বলি আমি এগুলো মানিনা তাহলে শ্রীমায়ের কথাকেও ফেলে দিতে হবে, শ্রীমায়ের কথাকে ফেলে দিলে ঠাকুরকেও ফেলে দিতে হবে, তাতে কি হবে – আধ্যাত্মিকতার যে পুরো পরম্পরা সেটা উড়ে যাবে। আমরা যে এখানে এটা আলোচনা করছি এটাকে বিশ্বাস করার কথাও বলা হচ্ছে না, আবার অবিশ্বাস করার কথাও বলা হচ্ছে না, ঋষিরা কিভাবে জিনিষ গুলিকে দেখেছেন সেটাই তুলে ধরা হচ্ছে। ঋষিদের কথাগুলো কতটা গালগপ্পো সেটাকে বোঝার জন্য আমরা ঠাকুরের কথা উল্লেখ করলাম, তাঁরা যা যা দেখেছেন সেটা ঠাকুরের জীবনেও পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

দেবতাদের খুব প্রিয় জিনিষ হচ্ছে সোমরস। সোমরস প্রকৃত পক্ষে ঠিক কি বস্তু এখনও আমাদের জানা নেই, তবে এইটুকু বলা হয় যে পাহাড়ের উপরে এক ধরণের জড়িবুটি পাওয়া যেত, সেই জড়িবুটিকে ঘষে ঘষে রস বার করে কাপড় দিয়ে ছেঁকে নেওয়া হত, পরে তাতে আর অন্য কিছু মিশিয়ে সোমরস প্রস্তুত করা হত, ইন্দ্রাদি দেবতাদের যা খুব প্রিয় পানীয় বস্তু ছিল। সোমরসের বিভিন্ন বিবরণ পড়ে অনেকে মনে করেন যে ভাঙ্ বা সিদ্ধিকেই সোমরস বলা হত। ভাঙ পাহাড়ী এলাকাতেই বেশি হয়। তবে এর বেশি সোমরসের বেশি বিবরণ পাওয়া যায় না, ওনারা বলেন এর পরিচিতি এখন হারিয়ে গেছে। তবে একটা জিনিষ প্রায়ই অনেকে মনে করেন যে, সারা দেশ জুড়ে যে জিনিষটার এত কদর ছিল সেটা রাতারাতি হারিয়ে যেতে পারেনা, যেমন এখন সারা দেশ গম খাচ্ছে, পরে হাজার বছর গম চাষ হবে না এটা কখন হতে পারে না, তবে নাম যদি পাল্টে দেওয়া হয় তখন সে ঐ নামেই তাকে জানবে। কয়েক জেনারেশন পরে বাবা শব্দটাই হারিয়ে যাবে, কেননা আজকালকার বাচ্চারা বাবাকে সব ড্যাডি বলে। এমন দিন আসবে যে কোন বাচ্চাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তোমার বাবার নাম বল, তখন সেই বাচ্চা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করবে বাবা কাকে বলে। সেইজন্য সোমরসকে অনেকেই মনে করেন এটাই পরে ভাঙ বা সিদ্ধি জাতীয় পানীয় হয়ে এখনও টিকে আছে।

এরপর আসছে দেবতাদের গুণ ও ক্ষমতা। দেবতাদের সবচেয়ে যেটা বড় তা হচ্ছে তাঁদের ক্ষমতা বা শক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ, বুদ্ধ এনারা হচ্ছেন অবতার, এনাদের কে আমরা কখন ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশেষিত করিনা, আমরা তাঁদের উপরে করুণা, দয়া, ভালোবাসা, প্রেম ইত্যাদি এই গুণগুলি দিয়ে ভূষিত করি। বেদের দেবতাদের আমরা ক্ষমতাবান বলে উল্লেখ করি, এনারা প্রকৃতির বিভিন্ন কার্যকে নিয়ন্ত্রণ করার বিশেষ ক্ষমতা আছে। দেবতাদের কাজ হচ্ছে প্রকৃতিকে ঠিক রেখে তাকে ঠিকভাবে কাজ করতে দেওয়া আর যেখানে নিয়মবিরুদ্ধ কিছু হচ্ছে সেখানে সব কিছুকে নিয়মের মধ্যে নিয়ে আসা। ক্ষমতা অসুরদেরও ছিল কিন্তু তাদের সেই ক্ষমতাকে তারা অশুভ শক্তির প্রভাবকে বৃদ্ধি করে শুভ শক্তির বিনাশে কাজে লাগাত। বেদে যে এই ধারণাটা যেখানে বলা হচ্ছে দেবতারা যেখানে যেখানে অশুভ শক্তির বিকাশ হচ্ছে সেখানে সেখানে তাদের ক্ষমতার দ্বারা সেই অশুভ শক্তিকে দমন করতেন, এই ধারণাটাই পরে অবতারের

ক্ষেত্রে বলা হয়েছে – যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহম্। বেদে দেখা যায় যেখানেই অধর্ম হচ্ছে ইন্দ্রাদি দেবতারা সেখানেই সংগ্রামের দ্বারা অধর্মকে পরাভূত করে ধর্মকে রক্ষা করছেন। কিন্তু অবতাররা যখন অধর্মের প্রভাব বেড়ে যায় তখন ধর্ম সংস্থাপনের জন্য সেখানে গিয়ে তাঁরা মানব শরীরধারণ করে জন্ম গ্রহণ করেন।

দেবতাদের আরেকটা ক্ষমতা হচ্ছে এই প্রকৃতিতে যত প্রাণী আছে সবার উপরে তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেওয়া আছে, আর মানুষ যখন দেবতাদের পূজা করে তখন তাঁরা তাদের সব ইচ্ছাই পূরণ করে দিতে পারেন। গ্রীসদের দেবতা আর বৈদিক দেবতার মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য আছে। গ্রীস দেবতারা একেকটা অঞ্চলের একেকটা আদিবাসীদের দেবতা হতেন, আর তাদের ক্ষমতা একটা বিশেষ ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ, তাঁর বাইরে আর কোন ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু বেদের দেবতা ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে যে কেউ যে কোন বাসনা নিয়ে প্রার্থনা করে ঠিক ঠিক আহুতি দেয়, ইন্দ্র তার সেই বাসনা পূরণ করে দেবেন। ঠিক তেমনি বেদের অন্যান্য দেবতাদেরও এই একই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, যদি অগ্নির কাছে প্রার্থনা করে আহুতি দেওয়া হয় তাহলে অগ্নিও সে প্রার্থনা পূরণ করে দেন। কিন্তু পরের দিকে মহাভারতে এসে আমরা দেখতে পাই দেবতাদের যত ক্ষমতা ছিল সব ক্ষমতা ভগবান নিজে নিয়ে নিলেন। যেমন ভারতে আকবর রাজা হবার আগে অনেক ছোট ছোট রাজা ছিল, আকবর দিল্লীর মসনদে বসেই সব কটা রাজার ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নিলেন। ইংরেজরা যখন ভারত ছেড়ে চলে গেল তখন সারা ভারতে ৫৪২ জন সামন্ত রাজারা তাদের নিজেদের রাজ্যে আলাদা আলাদা শাসন ব্যবস্থা কায়েম রেখেছিল। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সব কটা রাজাদের শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে করে দিলেন Union of India. দেবতাদের ক্ষমতা ভগবান যে নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছিলেন গীতার নবম অধ্যায়ে এই ব্যাপারটা আরও খুব পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। সেখানে ভগবান অর্জুনকে বলছেন – যখন কেউ অন্যান্য দেবতাদের পূজা করছে সেই পূজা আমার কাছেই আসছে। শঙ্করাচার্য এই শ্লোকের ভাষ্যে বলছেন – কি দুঃখের কথা, একই পরিশ্রম করে, ইন্দ্রের পূজা করলে যে পরিশ্রম ও সময় ব্যয় হবে, শ্রীকৃষ্ণের পূজাতেও সেই একই পরিশ্রম আর সময় যাবে কিন্তু ফল অনেক বেশি পাওয়া যাবে যদি শ্রীকৃষ্ণের পূজা করা হয়, তাও লোকেরা ইন্দ্র, বরুণাদির মত ছোটখাটো দেবতাদের পূজা করছে। যদি আমার সুযোগ থাকে বিডিও বা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার তখন একজন বিডিওর কাছে প্রার্থনা করে আমি যা ফল পাব মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রার্থনা করলে জিনিষটা তখন অন্য রকমের দাঁড়িয়ে যাবে। দুজনের সাথে দেখা করতে আমার সময়ও একই লাগছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রার্থনা করলে জেলাশাসক থেকে শুরু করে আরও যত বড় বড় মাতব্বররা রয়েছে সবাইকেই আমি হাতে রাখতে পারব, কিন্তু বিডিও তার এক্তিয়ারে যতটুকু ক্ষমতা আছে সেটুকুর বাইরে সে যেতে পারবে না। গীতাতে ভগবান এই কথাই বলছেন – মানুষ কেন যে এই ভুলটা করে দেবতাদের পূজা করে, তারা সরাসরি আমাকেই পূজা করতে পারে। সর্ব অবস্থাতে অবতারেরই পূজা করতে হয়, এই ধারণাটা কিন্তু বেদের ধারণা থেকেই স্থানান্তরিত হয়ে এই অবস্থায় এসেছে।

দেবতাদের মানুষের প্রতি সব সময়ই একটা কৃপার দৃষ্টি থাকত। বিপরীত ভাবে অসুরদের সব সময় ছিল মানুষের ক্ষতি করার স্বভাব। দেবতাদের মধ্যে আরেকটা যে বড় গুণ ছিল ওনারা সত্যে খুব দৃঢ় ছিলেন, আর সব সময় মন-মুখ এক করেই চলতেন, মুখে একটা কথা বললাম আর কাজে অন্য রকম করলাম এই জিনিষটা দেবতাদের মধ্যে কখনই ছিল না। আরেকটা খুব অদ্ভুৎ বৈশিষ্ট্য দেবতাদের মধ্যে লক্ষ্য করার বিষয়, তা হচ্ছে দেবতারা যখন জোড়ায় জোড়ায় চলেন তখন তাঁদের ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। যেমন মিত্র-বরুণ, এনারা দুজন সব সময় এক সঙ্গে থাকেন। ইন্দ্রের সঙ্গী হচ্ছেন অগ্নি, এনারা দুজন বেশির ভাগ সময় এক সাথে থাকেন। ইন্দ্র আর অগ্নি যখন এক সাথে চলবে তখনও তাঁদের ক্ষমতা অনেক গুণ বেড়ে যাবে। এই জিনিষগুলির থেকেও যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বেদের ধর্ম কখনই Monotheism বা একেশ্বরবাদ ছিল না, ভারতীয়রা কখনই এক দেবতার পূজা করত না। একজন মাত্র দেবতা, আর তাঁরই

কেবল পূজা হচ্ছে, এই জিনিষ ভারতে কখনই ছিল না, যদিও অন্য অন্য ধর্মে এই একেশ্বরবাদকেই বেশি দেখা যায়। একেশ্বরবাদীরা বেদের ধর্মকে বলত Polytheism মানে পৌত্তলিক, যারা অনেক দেবতাদের পূজা করে। কিন্তু পৌত্তলিক শব্দটার যে অর্থে ব্যবহার করা হয় সেই অর্থে বৈদিক যুগের মানুষরা দেবতাদের পূজা করতেন না, তাই এনারা একটা নতুন শব্দ নিয়ে এলেন, বিশেষ করে ম্যাক্সমূলাররা নাম দিলেন Pantheism যার ভারতীয় নাম হচ্ছে সর্বেশ্বরবাদ, মানে একের মধ্যে বহুকে দেখা। সেই ঈশ্বরেরই নানান রূপ হচ্ছেন ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অগ্নি ইত্যাদি দেবতারা। সেইজন্য ভারতের এই আধ্যাত্মিকতার ধারণাকে অনুপম বলা হয়, একদিকে সেই এক ঈশ্বর আছেন আমরা তাঁর পূজা করছি আবার অন্য দিকে এই ভাবে আমরা ঈশ্বরেরই অনেক রূপের পূজা করছি। এই দুটোর মধ্যে ভারতীয়রা কখনই কোন তফাৎ দেখতে পায় না। যেমন এই ঘর আছে, ঘরের অনেক জানালা রয়েছে, আমি এই জানালা দিয়ে আকাশ দেখতে পারি, আবার অন্য জানালা দিয়েও আকাশ দেখতে পারি, জানালাগুলো একই ঘরের জানালা, তেমনি ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ভগবানরই একেকটি রূপ – এইটাই হচ্ছে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার একটি অনুপম বৈশিষ্ট্য।

মানুষ কত ভাবে ভগবানের পূজা করে বলতে গিয়ে গীতাতে ভগবান এই জিনিষটা খুব পরিষ্কার করে দিয়ে বলছেন – একত্বেন পৃথকত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ - মানুষ যখন আমাকে পূজা করে তখন সে এক রূপে মানে আমিই শ্রীকৃষ্ণ ভগবান এই রূপে, অনেক রূপে, যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা মহেশ্বর রূপে আমাকেই পূজা করছে আবার এই পুরো বিশ্বে যত রূপ হতে পারে সব রূপেই আমাকে পূজা করতে পারে, বিশ্বের অনন্ত রূপে হতে পারে।

আমরা আগেই বলেছি তিন রকমের দেবতার কথা বেদে বলা হয়েছে, পৃথিবীর দেবতা, অন্তরীক্ষের দেবতা এবং স্বর্গের দেবতা। স্বর্গের দেবতারা হলেন দ্যু, বরুন, মিত্র, সূর্য, সবিতু, পূষণ, অশ্বিনী আর দেবীদের মধ্যে ঊষা আর রাত্রি। অন্তরীক্ষের দেবতারা হলেন ইন্দ্র, রুদ্র, বায়ু, মরুৎ, পর্জন্য আর বরুণ। আর পৃথিবীর দেবতারা হলেন পৃথ্বী, অগ্নি ও সোম। দেবতাদের যেমন একটা মুর্ত রূপ আছে ঠিক সেই রকম তাদের একটা বিমুর্ত রূপও আছে। যেমন আমরা যখন কোন জিনিষকে বোঝাবার জন্য বলি খুব বর্ণময়, তখন এই বর্ণময় শব্দটা জিনিষটার একটা বিমুর্ত রূপ দিয়ে দেওয়া হল। দেবতাদের অনেক গুণের কথা বলা হয়, পরে তার কোন একটা গুণকে আলাদা করে বার করে সেই গুণের একটা বিমূর্ত রূপ দিয়ে আরেকটা দেবতা বানিয়ে দিচ্ছে। যেমন ইন্দ্রের আছে শক্তি, এখন আমি এই শক্তিটাকে আলাদা করে টেনে নিলাম, সেই শক্তিকে একটা দেবতা বানিয়ে দিলাম। আমরা যেমন বলি এরা হচ্ছে শাক্ত, অর্থাৎ এরা শক্তির পূজারী। শক্তিটা হচ্ছে এখানে একটা বিমূর্ত রূপ, একটা ভাব, এর মা হচ্ছেন ইন্দ্র। হনুমান হচ্ছে শক্তির প্রতীক। যেমন বিদ্যা, বিভিন্ন যে দেবতা বা দেবী আছেন তাদের বুদ্ধি বা মেধাকে আলাদা করে নিয়ে পরে এইটাই আলাদা একজন দেবী হয়ে গেলেন। পরে এই দেবী হলেন বাক্ বা সরস্বতি। ইন্দ্রের একটা গুণ ছিল ধাতা রূপে, পরে ধাত্রীই একজন দেবী হয়ে গেলেন, সেই দেবী যিনি সূর্য আর চন্দ্রমাকে সৃষ্টি করছেন। এইভাবে দেবতাদের যে অনেক গুণ ছিল সেই গুণগুলিকে টেনে নিয়ে একেকটা দেবতা বা দেবী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। একজন বাস্তব দেবতাকেই পরে একটা বিমুর্ত রূপ দিয়ে দিল। এটাও বেদের একটা অনুপম শৈলী। এখানে বিশ্বকর্মার উদাহরণও দেওয়া যেতে পারে, বিশ্বকর্মা, যিনি এই জগতকে নির্মাণ করেছেন, মানে ভগবান নিজে যে শক্তিতে এই জগতের নির্মাণ করেছেন সেই শক্তিকে আলাদা করে নিয়ে তার নাম দিয়ে দিলেন বিশ্বকর্মা। এখন সেই বিশ্বকর্মা হয়ে গেছেন যত যন্ত্রপাতি, নির্মাণশিল্প রয়েছে তার দেবতা। ঠিক তেমনি মন্যু (ক্রোধের দেবী), শ্রদ্ধা, অনুমতি (দেবতাদের আনুকল্য পাওয়ার দেবী), নীর্তি (রোগব্যাধির দেবতা) ইত্যাদি অনেক আলাদা আলাদা দেবতা ও দেবীর সৃষ্টি হল। শ্রদ্ধা সব মানুষের মধ্যেই থাকে আবার দেবতাদের মধ্যেও আছে, সেই শ্রদ্ধাকেই একজন দেবী বানিয়ে দেওয়া হল।

বেদ – ২০শে মার্চ ২০১০

বেদে দেবতা, অসুর, দানব, দৈত্য এদের নিয়ে অনেক ধরণের কথাবার্তা আছে, যেগুলো পরের দিকে হিন্দু পুরানে বিভিন্ন আখ্যায়িকার মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। আমরা এর আগে বলেছিলাম যে দেবতাদের মধ্যে কিছু কিছু দেবতা এক সঙ্গে থাকেন। তার মধ্যে একটা গোষ্টি হচ্ছে দ্বাদশ আদিত্য বা ঊনপঞ্চাশ মরুৎ। দেবতারা ছাড়া আরেকটা শ্রেণী হচ্ছে দৈত্য, দৈত্য বলতে এক ধরণের বিশেষ একটি বংশধারাকে বোঝায়। কিন্তু এই একই শ্রেণীর বংশধারাকে বলতে গিয়ে বেদে দানব, অসুর, দৈত্য ইত্যাদি কয়েকটা শব্দ দিয়ে বলা হয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে দেবতা, দানব ও দৈত্যরা হচ্ছে একই পিতার সন্তান, শুধু যে একই বাবার সন্তান তাই নয়, এদের মায়েরা হচ্ছে আপন বোন। দক্ষ প্রজাপতির চৌষট্টিটি মেয়ে ছিল। এদেরই মধ্যে দনু, দিতি, অদিতি এরা সব বোন ছিল, আর এদের সকলের বিয়ে হল বিরাট বড় ঋষি কাশ্যপ মুনির সাথে। কাশ্যপেরই সব সন্তান যারা দনুর থেকে জন্ম নিল তাদের বলা হল দানব, অদিতির সন্তানদের বলা হল আদিত্য, দিতির সন্তানদের বলা হল দৈত্য। বেদে প্রথমের দিকে এদের মধ্যে বিশেষ তেমন কোন পার্থক্য ছিলা, এখন আমরা যেমন দানব, দৈত্য বলতে যেমন খুব খারাপ কিছু মনে করি, বেদে প্রথম দিকে এদের মধ্যে কিন্তু সেই রকম খারাপ কিছু ছিল না। শুধু শক্তির পার্থক্য ছিল। পরের দিকে দেখা গেল, যেটা আমরা উপনিষদে বেশি করে পাই, সেটা হচ্ছে দেবতারা আত্মজ্ঞানের দিকে বেশি নজর দিলেন। আত্মজ্ঞানের দিকে দেবতারা যেমন যেমন অগ্রসর হতে থাকলেন তেমন তেমন তাঁরা বিশেষ শক্তিশালী হয়ে গেল। কিন্তু দানব, দৈত্য ইত্যাদি যারা ছিল তার আত্মজ্ঞানের পথে গেল না।

এই দৈত্যদের বংশেও কেউ কেউ ভক্ত হয়েছিলেন, এর মধ্যে নামকরা ভক্ত হলে প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদ ছিলেন দৈত্য বংশের। পরের দিকে পুরান রচনার সময় দেখা গেল, বিশেষ করে পৌরানিক ধারাকে অবলম্বন করে যারা পরবর্তি কালে শাস্ত্র রচনা করেছিলেন, তারা করলেন কি যত রকমের খারাপ মানবিক গুণ থাকতে পারে সেগুলিকে একত্র করে দানব, দৈত্যদের উপর চাপিয়ে দিলেন। সেইজন্য এখনও আমরা সবাই দানব, দৈত্য বলতে অধার্মিক, দুশ্চরিত্র মনে করি। আসলে এরা কিন্তু কেউই এই ধরণের ছিল না, বাস্তবে এরা কিন্তু অনেকেই দেবতাদের থেকেও অনেক বেশি শক্তিশালী ও ধার্মিক ছিল। এদের সাথে দেবতাদের সব সময়ই যুদ্ধ লড়াই লেগেই থাকত। দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র ছিলেন একটু ঈর্ষাপরায়ণ, সব সময় সে অসুর, দানব ও দৈত্যদের থেকে ভয়ে ভয়ে থাকত।

দৈত্য, দানব, অসুররা ছিলেন স্বর্গের অধিবাসী। কিন্তু পরের দিকে দেবতারা অমৃতের সন্ধান পেয়ে গিয়েছিলেন, অমৃতের সন্ধান পেয়ে যাওয়াতে দেবতারা বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যেহেতু দেবতারা ধর্মসাধন করতেন তাই তাঁরা বরাবরই ভগবানের বেশি কৃপাধন্য ছিল। ভগবানের কৃপার পাত্রের সুবাদে দেবতারা যে করেই হোক এই অসুর, দানব ও দৈত্যদের স্বর্গ থেকে পাতাল লোকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। বেদে পাতাল লোকের যে ধরণের বর্ণনা আমরা পাই সেইগুলো খুবই ঐশ্বর্যপূর্ণ। তবে পাতাল লোকের সব সময় উল্লেখ করা হয় পৃথিবীর নীচে। সেইজন্য পাতাল লোকে কেউ যেতে চায় না। বলি এক রাজা ছিলেন, তিনি ছিলেন দৈত্য বংশের। সেই বলি রাজা এমন কঠোর তপস্যা শুরু করেছিলেন যে ইন্দ্র পর্যন্ত ঘাবড়ে গিয়েছিলেন এই ভেবে যে তাঁর হয়তো ইন্দ্রত্ব চলে যাবে। তখন ইন্দ্র ভগবানের সাহায্য চাইলেন। ভগবান তখন বামন অবতার ধারণ করে বলিকে কায়দা করে পাতাল লোকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পাতালে যখন বলি রাজাকে পাঠিয়েই দেওয়া হল, তখন বলি ভগবানকে প্রার্থনা করলেন যে – হে প্রভু, আমি তো এমনিতে কোন দোষ করিনি, কিন্তু আমাকে আপনি অনুমতি দিন যাতে বছরে একটা দিন আমি পৃথিবীতে এসে মানুষদের দেখতে পারি। কেরলে যে ওনম উৎসব হয়, লোকে বলে সেইদিন রাজা বলি নাকি পাতাল লোক থেকে পৃথিবীতে আসেন।

দৈত্য দানব ও অসুর ছাড়াও আরও এক ধরণের অধার্মিক ও দুশ্চরিত্র প্রাণীর কথা বেদে উল্লেখ করা হয়েছে। এরা হল রাক্ষস ও পিশাচ। এই রাক্ষস ও পিশাচরা পৃথিবীতেই ঘোরাফেরা করে আর এদের মধ্যে রাক্ষসদের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষ, বলা হয় এরা মানুষদের বেশি ক্ষতি করে। দৈত্য দানবদের সাথে মানুষের কোন লড়াই ছিল না, এদের লড়াই ছিল দেবতাদের সঙ্গেই। পিশাচরাও এক ধরণের নরখাদক, ভূত প্রেতের মত এরাও কিছুটা অশরীরি। আমাদের এই কোর্সের নাম হচ্ছে ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য, ভারতীয় চিন্তাধারাতে এই ভূত পিশাচের ভাবনা গুলো কিভাবে এসেছে এগুলোকে জানার প্রয়োজন আছে বলে এই ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করা হল। আমরা এই ভূত পিশাচ এদের কথা বেদেই উল্লেখ পাই।

এছাড়া আরেক শ্রেণীর উল্লেখ বেদে পাই, এরা হলেন পিতৃ। আমাদের প্রাচীন কাল থেকে একটা বিশ্বাস চলে আসছে যে মানুষ যখন মারা যায় তখন তার কর্ম অনুসারে বিভিন্ন লোকে তাদের গতি হয়। তার মধ্যে একটি লোক হচ্ছে পিতৃলোক। পিতৃলোক দেবতাদের বাসস্থান দেবলোক থেকে অনেক নীচে। কিন্তু সাধারণত বিভিন্ন সময় এই পিতৃলোকের বাসিন্দারা দেবতাদের সাহায্য করে, আর যখন কেউ মারা যান তখন এই পিতৃলোকের বাসিন্দারা তাদেরকে স্বাগত করেন। কিন্তু যাই হোক না কেন পিতৃলোক দেবলোক থেকে পুরো আলাদা, মেইন লাইন আর কর্ড লাইনের মত আলাদা। যারা একবার পিতৃলোকে প্রবেশ করে যায় তাদের পক্ষে দেবলোকে যাওয়া খুব কঠিণ হয়ে যায়।

গীতাতে শুক্লমার্গ আর কৃষ্ণমার্গ এই দুটো আলাদা পথের কথা বলা হয়েছে, এছাড়া দেবযান ও পিতৃযানের কথাও বলা আছে। যারা দেবলোকে যান তারা একটা অন্য পথে যান আবার যারা পিতৃলোকে যান তাদের যাওয়ার পথটা আবার আলাদা। পিতৃলোকের বাসিন্দারা চান তাদের বংশের লোকেরা এসে এই পিতৃলোকে বাস করুক। কিন্তু দেবলোকে যারা আছেন তাদের এই ব্যাপারে কোন মাথা ব্যাথা নেই যে কেউ এসে তাদের এখানে থাকুক, কেননা দেবলোকে বাস করার ইচ্ছুক লোকের সংখ্যা অনেক বেশি। আমাদের যে শ্রাদ্ধাদির কার্যে যা কিছু অর্পণ করা হয় তা সব সময় পিতৃদের উদ্দেশ্যেই অর্পণ করা হউ। আবার যখন যজ্ঞ-যাগ করা হয় তখন যা অর্পণ করা হয় তা দেবতাদের উদ্দেশ্যে করা হয়। হিন্দুদের মধ্যে পূজা, যজ্ঞ-যাগটাই এই কারণে বেশি করা হয়ে থাকে। পিতৃদের উদ্দেশ্যে সাধারণত আমাদের তিনটি কর্ম করা হয় – প্রথম যে কর্ম তা হচ্ছে শ্রাদ্ধ, মৃত্যুর বারো কি তেরো দিন বাদে এই শ্রাদ্ধাদি কর্ম সম্পন্ন করতে হয়, তবে বিভিন্ন বর্ণে বিভিন্ন নিয়ম আছে, দ্বিতীয় কর্ম হচ্ছে বার্ষিকী, প্রত্যেক বছরে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করা হয়। এই বাৎসরিক শ্রাদ্ধ আবার দুই রকমে করা হয়। সাধারণত যেই তারিখে মৃত্যু হয়েছিল সেই দিনটিতে বাৎসরিক কর্ম করা হয়, আবার অনেক সময় যেদিন পিতৃপক্ষ শেষ হবে সেই দিন তর্পণ করা হয়। তৃতীয় যে কর্ম পিতৃলোকদের উদ্দেশ্যে করা হয় সেটা হচ্ছে গয়াতে বিষ্ণু পাদপদ্মে পিণ্ড দান করা হয়। গয়াতে যখন পিণ্ডদান হয়ে যাবে তখন সে তার পিতৃপুরুষদের প্রতি সমস্ত দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে গেল। যারা সন্ন্যাসী তারা সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণের আগে পিণ্ড দান করে দেন। সন্ন্যাসীদের যাদের বাবা-মা জীবিত থাকেন তাদেরও পিণ্ড দান করা হয়, সেই পিণ্ড ভগবান বিষ্ণুর কাছে জমা থাকবে, যখন বাবা-মা কেউ মারা যাবেন তখন ভগবান বিষ্ণুর কাছ থেকে সেই পিণ্ড গ্রহণ করেন।

পিতৃদের উদ্দেশ্যে যখন কিছু অর্পণ করা হয় তখন মন্ত্রের স্বধা বলে অর্পণ করা হয়। আর দেবতাদের যখন যজ্ঞে কিছু অর্পণ করা হয় তখন স্বাহা বলা হয়। ঠাকুর আমাদের শ্রাদ্ধবাড়ির কিছু খেতে নিষেধ করেছিলেন। শ্রাদ্ধবাড়ির অন্ন খেলে নাকি পিতৃলোকের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়। স্বামী ভূতেশানন্দজীর কাছে দীক্ষা নেওয়ার পর এক মহিলা তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন – মহারাজ, আমি কি শ্রাদ্ধবাড়ির অন্ন খেতে পারব? মহারাজ খুব অসন্তুষ্ট হলেন, তিনি সাধারণত কখন রাগতেন না, কিন্তু তিনি বেশ অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন – এত প্রশ্ন থাকতে তোমার এই একটা প্রশ্নই মনে পড়ল। দীক্ষা নিয়ে তখনও খাবার চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরছে। ঠাকুর যেটা নিষেধ করেছিলেন সেটা তিনি খুব উচ্চকোটির সাধকদের জন্য বলেছিলেন। শ্রাদ্ধবাড়ির অন্ন খেলে ভক্তির হানি হয়। একটা দ্রব্য যখন কারুর নামে অর্পণ বা সংরক্ষিত করে দেওয়া হয়

তখন সেই ব্যাক্তির মানসিকতা বা তার যে তন্মাত্রা সেই দ্রব্যের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে যায়। সেইজন্য বলা হয় কোন জিনিষ ছোটদের দিয়ে বড়দের দেওয়া উচিৎ নয়, ঠাকুরের জন্য কোন জিনিষ ঠিক করে রাখা আছে এখন কেউ যদি সেটার প্রতি লোভ দেয় তাহলে সেটা আর ঠাকুরকে দিতে নেই, কেননা সেই দ্রব্যটা তখন নষ্ট হয়ে যায়। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর একটা খুব উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে। এক ভক্ত মহিলা তাদের বাগানের ভালো জাতের আম গাছে খুব ভালো আম হয়েছিল। মহিলা সেখান থেকে কিছু ভালো ভালো আম তার ছেলেকে দিয়ে মহারাজের জন্য পাঠিয়েছেন। রাস্থা দিয়ে আসতে আসতে ছেলেটি দুটো আম হাতে নিয়ে ভাবছে – এই সুন্দর আম দুটো যদি আমি খেতে পেতাম। মহারাজের কাছে এসে যখন আমের থলেটা ওনার হাতে দিয়েছে তখন মহারাজ ঠিক ঐ আম দুটো তুলে ছেলেটিকে বলছে – খোকা, তুমি এই আম দুটো খেয়ো। ছেলেটি অবাক হয়ে দেখছে যে দুটি আমের প্রতি সে দৃষ্টিপাত করেছিল ঠিক সেই দুটো আমকেই মহারাজ সরিয়ে দিলেন। ঠাকুর শ্রীশ্রী মায়ের নামে বলছেন – জয়রামবাটীতে রামচন্দ্রের মেয়ে কুটো বাঁধা আছে। কুটো বাঁধা মানে, ঠাকুরের জন্য শ্রীমা নির্দিষ্ট হয়ে আছেন। যে কোন জিনিষ যখন কারুর জন্য নির্দিষ্ট করা থাকে তখন সেই জিনিষটা যদি অন্য কারুর কাছে চলে যায় তখন গোলমাল লেগে যাবে। হিন্দু ধর্মে এই ধারণাটা সুদৃঢ় ভাবে বসে আছে।

যখন শ্রাদ্ধ করা হয় তখন যা কিছু নিবেদন করা হয় তখন সেখানকার সমস্ত কিছু পিতৃদের জন্য নির্দিষ্ট। এখন সেই দ্রব্য যখন কেউ গ্রহণ করবে তখন তার ভেতরের সত্তাটা পিতৃলোকের জন্য তৈরী হয়ে যাচ্ছে। তাই বলে কি পিতৃলোক কি খুব খারাপ? আদপেই খারাপ নয়। কিন্তু পিতৃলোক হচ্ছে দেবলোকের থেকে পুরোপুরি আলাদা। দেবলোক আবার ব্রহ্মলোক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আবার ব্রহ্মলোক হচ্ছে মুক্তিমার্গ থেকে আলাদা। তবে দেবলোক, ব্রহ্মলোকের লাইনটা ক্রমমুক্তির লাইনে মুক্তিমার্গের দিকে এগোতে থাকে কিন্তু পিতৃলোক সেই লাইন থেকে সরে যায়। বেদে কিন্তু এত বিশদ ভাবে এই পার্থক্যগুলিকে উল্লেখ করা নেই। বেদে প্রথম যে পার্থক্যটার উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে পিতৃলোক আর দেবলোকের ক্ষেত্রে। পিতৃলোককে পরিহার করার কথা প্রথম পরিষ্কার করে উল্লেখ করা হয়েছে মুণ্ডোক উপনিষদে। সেখানে স্পষ্ট করে বলা আছে, যারা আধ্যাত্মিক সাধক তাদের জন্য পিতৃলোক নয়।

এরপর আসছে বেদের আচার পদ্ধতি। আমাদের মাথায় সব সময় ধরে রাখতে হবে যে আজ পর্যন্ত হিন্দু ধর্মে যত পূজা পদ্ধতি, আচার আচরণ, রীতি-নীতি যা কিছু আছে বা হচ্ছে তার সবটাই বেদ থেকেই এসেছে। কোন হিন্দুই বেদের বাইরে কক্ষণ যেতে পারবে না। বেদে আমরা দুই ধরণের আচার পাই – একটা হচ্ছে গৃহ্য আরেকটি হচ্ছে শ্রৌত। এইগুলো থেকেই পরের দিকে এক শ্রেণীর সাহিত্যের জন্ম নিয়েছিল যার নাম হল কল্পসূত্র আর গৃহ্যসূত্র। গৃহ্যসূত্রে যে সব পূজার আচার বিধির কথা বলা আছে তাতে পুরোহিতের প্রয়োজন হত না। আর শ্রৌত আচার ছিল সামাজিক অনুষ্ঠান, এখানে পুরোহিতের দরকার পড়ত। যেমন যাদের বাড়িতে নিত্যপূজাদি হয়, যার বাড়িতে কোন বিগ্রহ আছে, সেখানে বাড়ির লোকেরাই পূজা করে নিতে পারে। কিন্তু যখন দুর্গাপূজা, কালীপূজা করা হয় তখন পুরোহিতের দরকার পড়বে। বাড়ির লোকেরাও যদি দুর্গাপূজা বা কালীপূজা করে তখন তাকে বাইরের পুরোহিতকে দিয়েই পূজা করাতে হয়।

এরপরে আসছে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় – বিধি-নিষেধ। যে কোন ধর্মকে তার অনুগামীদের বলে দিতে হয় সে কি করবে আর কি করবে না। প্রত্যেক ধর্মেই এই বিধি-নিষেদ একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। বেদেও অনেক বিধি-নিষধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিধি হচ্ছে যেটা সবাইকে করতে হবে আর নিষেধ হচ্ছে যে জিনিষগুলি করা যাবে না। যেমন কারুর ক্ষতি করবে না, কাউকে হত্যা করবে না – এগুলো হচ্ছে নিষেধাত্মক। আবার যখন বলবে সকালে উঠে স্নান করবে, এটা হচ্ছে বিধি। বেদে নিষেধাত্মক কর্ম আবার দুই রকমের – কতকগুলি হচ্ছে সাধারণ বুদ্ধিতেই করা যায় না, যেমন যে পশু বা পাখিকে বিষযুক্ত তীর দ্বারা বধ করা হয়েছে সেই পশু বা পাখির মাংস খাবে না। আবার কিছু বড় বড় নিষেধ আছে।

কিন্তু বিধিই হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। বিধি আবার চার রকমের – ১) নিত্যকর্ম, ২) নৈমিত্তককর্ম, ৩) কাম্যকর্ম এবং ৪) প্রায়শ্চিত্ত কর্ম।

নিত্যকর্ম হচ্ছে, যে কর্ম আমাদের সবাইকে প্রত্যেক দিন করতে হবে – যেমন পূজা করা, জপ করা ইত্যাদি। নিত্যকর্ম হচ্ছে বাধ্যতামূলক। গীতা আর উপনিষদে এই নিত্যকর্মের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। গীতা উপনিষদে বলছে যারা সাধক, এখনও যারা সিদ্ধি পাননি, তার নিত্যকর্ম যেন অবশ্যি করে। গীতার অস্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন – নিয়তং কর্ম, এখানে নিয়তং কর্ম মানে হচ্ছে নিত্য কর্ম। যারা এই নিত্য কর্ম করবে না, তারা কখনই ধার্মিক হতে পারবে না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ে নিত্যকর্ম একেক রকমের হবে, যারা বৈষ্ণব তাদের নিত্যকর্ম এক রকম হবে, আবার যারা শাক্ত পরিবারের লোক তাদের নিত্যকর্ম আরেক রকমের হবে। নিত্যকর্ম একমাত্র করেন না যিনি পরমহংস ও পরিব্রাজক। যেমন ঠাকুর, তিনি কোন ধরণের নিত্যকর্ম করবেন না। দক্ষিণেশ্বরে মাস্টারমশাই প্রথম এসেছেন। সন্ধ্যেবেলা ঠাকুরের ভেজানো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছেন ভেতরে যাবেন কিনা, বৃন্দে ঝি বলছে ভেতরে গিয়ে বসতে। কিন্তু মাস্টার ইতঃস্তত করছেন। আস্তে করে ভেতরে ঢুকে দেখেন ঠাকুর খাটের উপরে একাকি বসে আছেন। কিছুক্ষণ পরে মাস্টারমশাই বলছেন – আপনি এখন সন্ধ্যা করবেন তবে আমরা এখন আসি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন – না – সন্ধ্যা – না এমন কিছু নয়। কিন্তু তার আগেই ঠাকুর এক ঘরের লোকের সামনে বলছিলেন – যখন একবার হরি বা রামনাম করলে শরীর রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয় – তখন নিশ্চয়ই জেনো সন্ধ্যাদি কর্ম আর করতে হবে না। তখন কর্মত্যাগের অধিকার হয়েছে – কর্ম আপন-আপনি ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে, তখন কেবল একবার রামনাম কি হরিনাম কিংবা শুদ্ধ ওঁকার জপলেই হল। সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয় আর গায়ত্রী ওঁকারে লয় হয়।

যাঁরা পরমহংস হন তাঁরা নিত্যকর্মের উর্দ্ধে চলে যান। নৈমিত্তিক কর্ম হচ্ছে বিশেষ কোন এক দিনে কিছু কর্ম করতে হয়, বিশেষ দিন বলতে যেমন সন্তান হয়েছে, এখন সন্তানের অন্নপ্রাশন দিতে হবে, তার উপনয়ন দিতে হবে। অন্নপ্রাশন বা উপনয়ন যদি না করা হয় তাহলে সেটা তখন পাপ হবে। যদি এই কর্মগুলি করা হয় তাহলে সেই কর্মগুলিকে বলা হয় নৈমিত্তিক কর্ম। বাবা কিংবা মা মারা গেছেন, এখন শ্রাদ্ধ কর্ম করতে হবে, এটা হচ্ছে নৈমিত্তিক কর্ম। অথবা বাড়িতে দুর্গা পূজা করছেন কিংবা কালী পূজা করা হচ্ছে তখন সেটাও নৈমিত্তিক কর্ম। নৈত্তিমিক কর্ম আরেক ভাবেও হয়, আমি মনে মনে ঠিক করে নিলাম যে আমার ছেলের যদি চাকরি হয়ে যায় বা আমার ছেলে যদি ভালো ভাবে পাশ করে তাহলে আমি বাড়িতে সত্যনারায়ণ পূজা বা অন্য কোন পূজা দেব, তখনও সেটা নৈমিত্তিক কর্ম হয়ে যাবে। নৈমিত্তিক শব্দের মধ্যেই এর অর্থ আছে, একটা নিমিত্ত আছে, একটা কারণের জন্য পূজা হচ্ছে আর রোজ না করে একটা বিশেষ দিনে এই নৈমিত্তিক কর্মাদি সম্পন্ন করা যেতে পারে। ঠাকুরের যে গলিত হস্ত, মানে তিনি তর্পণ করতে গিয়ে তাঁর হাতের ফাঁক দিয়ে জল গলে যাচ্ছে, এটা হচ্ছে নৈমিত্তিক কর্ম। পরমহংস হচ্ছেন বিধি নিষেধের পারে, তর্পণ করাটা হচ্ছে নৈমিত্তিক কর্ম, তর্পণ করাটা নিত্য বা প্রত্যেক দিন করতে হয় না। যিনি পরমহংস তিনি নিত্য আর নৈমিত্তিক দুটো কর্মের পারে চলে যান। তিনি যদি নিত্য বা নৈমিত্তিক কর্ম করতেও চান তাহলেও পারবেন না, যেমন ঠাকুর তর্পণ করতে যাচ্ছেন কিন্তু পারছেন না, আপনা আপনি তাঁর আঙ্গুল ফাঁক হয়ে জল গলে যাচ্ছে। আবার যারা আধ্যাত্মিক পথের সাধক, তাদের জন্য এই নৈমিত্তিক কর্ম শাস্ত্রে কঠোর ভাবে নিষেধ করা আছে।

নিত্যকর্ম সবাই করবে একমাত্র পরমহংস বাদে। নৈমিত্তিক কর্ম পরমহংস তো করবেনই না কিন্তু যারা সাধক তারাও করবে না। এখানে সাধক মানে যারা উচ্চ সাধক, কর্মমার্গী নন, যেমন সন্ন্যাসী তারাও এই নৈমিত্তিক কর্ম করবে না।

কাম্যকর্ম হচ্ছে, একটা কিছু কামনা করে যখন কোন কর্ম করা হয়। যেমন কোন শত্রুকে নাশ করতে হবে, তখন কোন ব্রাহ্মণকে ধরে কোন যজ্ঞ করছে তখন সেটা কাম্য কর্মের মধ্যে পড়ে যাবে। যে কোন আধ্যাত্মিক সাধক, সে উচ্চকোটিই হোক বা আধ্যাত্মিক সাধনার প্রথম অবস্থায় আছে, কোন ভাবেই এই কাম্য কর্ম করতে পারবে না। সাধারণ লোকেদের মন যাতে ধর্ম পথে আসে তাদের কে বলা হয় যে তুমি যদি এই এই চাও তাহলে এই এই ভাবে নিষ্ঠা পূর্বক এই এই কর্ম কর। কেউ চাকরি খুঁজছে কিন্তু পাচ্ছে না, কারুর মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, কারুর বাড়িতে অশান্তি লেগেই আছে তারা যদ বাড়িতে এই এই যজ্ঞ করে তাহলে তার সেই ব্যাপারে ফল পেয়ে যাবে। কিন্তু যারা আধ্যাত্মিক সাধক তারা এগুলো করবে না, তাদের সংসারেও তো দুঃখ-কষ্ট আসবে, কিন্তু তারা জীবন ধারণের ক্ষেত্রে যেগুলি আসছে, ভালো মন্দ যাই আসুক, তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

এবারে আসছে প্রায়শ্চিত্ত কর্ম। পরমহংস ছাড়া প্রায়শ্চিত্ত কর্ম সবাইকেই করতে হবে। আমরা সবাই সব সময় জেনে বা না জেনে অনেক ভুল কাজ করে ফেলি, অজ্ঞানত অনেক দোষ করে ফেলি, জানিই না যে এটা দোষের। এই সব কর্মের কর্মফল থেকে বাঁচার জন্য তার সাথে কিছু পূণ্য অর্জন করার জন্য এই প্রায়শ্চিত্ত কর্মের কথা বলা হয়েছে। এই যে এত লোক তীর্থে যাচ্ছে, কুম্ভস্নানে যাচ্ছে এগুলোর পশ্চাতে এই ধারণাটাই কাজ করে। এখন যে হরিদ্বারে কুম্ভস্নান চলছে, হরিদ্বার খুবই ছোট জায়গা যেখানে মহারাজদেরই স্নান করে বেরিয়ে আসতে সাত-আট ঘন্টা লেগে যাচ্ছে তখন সাধারণ মানুষের আরও কত সময় লাগবে। এই যে দীর্ঘকাল ধরে লাইনে কষ্ট করে দাঁড়িয়ে থেকে স্নান করছে এটাই একটা বিরাট তপস্যা হয়ে যাচ্ছে। এই তপস্যাটা কেন করা হচ্ছে? একটা বলে যে এই জন্মে এবং আগের আগের জন্মে অজ্ঞানত বশতঃ যে পাপ কাজ করা হয়েছে, এই তপস্যার ফলে ঐ পাপগুলো ধুয়ে গেল। আর পাপ যদি না থাকে তাহলে এই তপস্যাটাই পূণ্য হয়ে গেল। বেদের এই ধারণাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এই যে বিধি-নিষেধ এখানে করা হয়েছে, পরবর্তিকালে ষড়দর্শনের পূর্বমীমাংসকরা, যারা কর্মকাণ্ডী, তারা মনে করেন যে বেদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে এই বিধি-নিষেধকে জীবনে প্রতি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। দ্বিতীয়তঃ পূর্বমীমাংসকরা বলে যে বেদে যত মন্ত্র আছে সবই কোন না কোন ভাবে এই বিধি-নিষেধের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে। যেমন যদি বলা হয় এই বোতলের জলটা এখানে কেন রাখা হয়েছে, নিশ্চয়ই স্নান করার জন্য রাখা হয়নি, জলটাকে পান করার জন্যই এখানে রাখা হয়েছে। তাহলে এই জল দিয়ে আমি কি স্নান করতে পারি, কেন স্নান করা যাবে না, নিশ্চয়ই যাবে। এখন বেদ কেন, বেদের উদ্দেশ্য কি, বেদের উপযোগিতাটা কি? এই জিনিষগুলিকে যখন ব্যাখ্যা করা হয় তখন বেদের যারা সব থেকে বড় পণ্ডিত, যারা পূর্বমীমাংসক, তারা বলেন বেদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে চারটে বিধি-নিষেধের কথা বলা হল, এই বিধি-নিষেধকে ঠিক করা, আর বেদের মন্ত্রগুলি কোন্ কোন্ বিধি-নিষেধে প্রয়োগ করা হবে, সেইটাকে ঠিক করে দেওয়া। কিন্তু যারা বেদান্তী তাঁরা পূর্বমীমাংসকদের বেদ সম্বন্ধে এই ধারণাকে উপেক্ষা করেন। বেদান্তীরা বলেন বেদে যে নিত্যকর্মের কথা বলা আছে সেগুলো আমরা অনুশীলন করব, নৈমিত্তিক কর্ম যারা সাধারণ গৃহস্থ তারাই করতে পারেন, কাম্য কর্ম আমরা কোন অবস্থাতেই করব না। আর নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম যেটা করবে সেটাও অনাসক্ত ভাবে করবে কোন উদ্দেশ্য থাকবে না। একদিকে বলা হচ্ছে অনাসক্ত মনোভাব নিয়ে কর্ম করতে, তোমার কোন চাহিদা থাকবে না, আবার অন্য দিকে কাম্য কর্ম করছি সেখানে কোন চাহিদা থাকবে না, সেটাতো হতে পারেনা। কাম্য কর্ম করা আর অনাসক্ত হয়ে কর্ম করা এই দুটোই হচ্ছে পরস্পর বিরোধী। সেইজন্য প্রত্যেক আধ্যাত্মিক সাধকের জন্য কাম্য কর্ম নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পূর্বমীমাংসকদের কাছে কাম্য কর্ম হচ্ছে বাধ্যতামূলক, তাদের কাছে বেদের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে কাম্য কর্ম। কাম্য কর্মের মধ্যে পড়ছে যেমন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, সন্তান চাই। এখানেই বেদান্তী বলবে যে সন্তান যদি হবার থাকে হবে, যদি না হওয়ার থাকে তাহলে হবে না, কিন্তু কামনা করবে না। যদি সন্তান হয়ে যায় তাহলে সেই সন্তানের প্রতি তোমার কর্তব্য পালন করে তাকে মানুষ কর। তোমার সামনে যে কর্তব্যটা এসে

গেছে সেটাকে আগে সম্পন্ন কর, নতুন করে কর্তব্য তৈরী করো না। রাজসূয় যজ্ঞ, আমি রাজা হয়ে থাকব, অশ্বমেধ যজ্ঞ, মৃত্যুর পর আমি স্বর্গের দেবতা হব – এই ধরণের কামনা বেদান্তীদের মতে কখনই করা উচিৎ নয়।

শেষ পর্যন্ত ভারতে এই দুই জনই থেকে গেল। পূর্বমীমাংসকদের কিছু কিছু কর্ম থেকে গেল, বিশেষ করে প্রায়শ্চিত্ত কর্মাদি আর বেদান্ত যেটাতে জোর দিয়েছিল যে কাম্য কর্মকে উৎখাত করতে, সেই কর্মগুলি আবার বন্ধ হয়ে গেল। সেইজন্য এখন আর রাজসূয় যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, স্বর্গারোহণাদি যজ্ঞ ইত্যাদি হাজার রকমের যজ্ঞ কাউকে আর করতে দেখা যায় না। কিন্তু কেউ যদি করতে চান তাহলে তারা করতে পারেন, কেননা এখনও এইগুলোর নিয়ম-কানুন লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। যার জন্য কেরালাতে এখনও দেখা যায় সেখানে কিছু কিছু জায়গায় কেউ কেউ এগুলো করছেন।

এরপরে আসছে বেদের নৈতিকতা। বেদ নৈতিকতাকে হচ্ছে, যেমন একটা বড় জিনিষ আছে তার মধ্য থেকে একটা ছোট জিনিষকে নিয়ে আনা হয়েছে। বেদে সব থেকে উচ্চতম নৈতিকতাকে ঋতম্ এই শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। ঋতমের একটা ছোট অংশ হচ্ছে নৈতিক আচরণের বিধি বা moral code। গোটা ব্রহ্মাণ্ড একটা সুসংবদ্ধ নিয়মের মধ্য দিয়ে চলছে, যেমন পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করছে, চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে, আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে, সময়ে গাছপালা ফল ফুল দিচ্ছে, ঘাস হচ্ছে, গরু সেই ঘাস খাচ্ছে, দুধ দিচ্ছে, এই সব কিছুর প্রেরণা হচ্ছে ঋতম্। যে নিয়মে এই জগত চলছে আর যে নিয়ম মানবিক আচরণ বিধিকে ঠিক মত চালাচ্ছে সবই ঋতমের জন্য। পারস্পরিক সম্পর্ককে সুসংহত করতে যে আচরণ বিধিকে আমাদের সবাইকে অনুসরণ করতে হচ্ছে, আর যে আচরণ বিধিগুলি ঋতম্ থেকে সরাসরি এসেছে সেইটাই হচ্ছে সত্যিকারের নৈতিকতা। যার জন্য দেখা যায় সত্যিকারের যে নৈতিকতার কোন দিনই পরিবর্তন হয় না। কিন্তু যে আচরণ বিধি গুলো, সমাজের যে নিয়ম গুলি ঋতমের বাইরে সেগুলো একটা সময়ের পর পাল্টে যায়। যেমন আমাদের সংবিধান, ভারতীয় পেনাল কোড প্রতি মুহূর্তে সংশোধন করা হচ্ছে। এগুলোকে কখনই নৈতিকতার মাপকাঠি দিয়ে বিচার করা হয় না, এগুলো হচ্ছে Legal Code। লিগাল কোড আর নৈতিকতার মধ্যে অনেক পার্থক্য। নৈতিকতা সব সময় সার্বজনীন, যেমন সত্য আর সততা হচ্ছে ঋতমেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেইজন্য সততাই হচ্ছে নৈতিকতা, না বলে কারুর জিনিষ নিয়ে নেওয়া এটা হচ্ছে নৈতিকতা।

এরপর আসছে বেদ আত্মা সম্বন্ধে কি বলছে। একটা জিনিষ আমাদের মাথাতে সব সময় রাখতে হবে যে, মানুষের মৃত্যুর পর যদি সব কিছু শেষ হয়ে যায় তাহলে ধর্মের আর কোন আবশ্যকতা থাকে না। এইটাই হচ্ছে সব থেকে আশ্চর্য যে, আমরা অপরের মৃত্যুর কথা সব সময় ভাবি কিন্তু নিজেও যে একদিন মারা যাব এইটা কিছুতেই আমাদের মাথায় আসে না। যদি মৃত্যুতেই সব কিছুর পরিসমাপ্তি হয় তাহলে যে কোন ধর্ম, সে হিন্দুই হোক, কি খ্রীশ্চান হোক, কি ইসলাম হোক, কি বৌদ্ধ, কি জৈন, কি শিখ, কি জুরাথ্রীস্ট সব অর্থহীন হয়ে যাবে। যে কোন ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে এই একটি বিশ্বাসের উপরে – জীবন কোন না কোন আকারে বা রূপে চলতেই থাকে।

এইখানে এসে আমরা দুটো চিন্তাধারা পাই। একটা হচ্ছে সেমেটিক বা Oriental Thinking আরেকটা হচ্ছে প্রাচ্য বা Occidental Thinking, মানে ভারতীয় চিন্তাধারা আর অভারতীয় চিন্তাধারা। ভারতীয় চিন্তাধারাতে মৃত্যুর পরেও জীবন চলতে থাকে। মৃত্যুর পর জীবনকে যে নীতি বহন করে চলেছে, সেটা সব সময় সমান ভাবে থাকে, সেই নীতিটা হচ্ছে আত্মা, আত্মাই আবার জন্ম নিচ্ছে। সেমেটিক, মানে খ্রীশ্চান, ইসলাম, জুদাইজম্ চিন্তাধারাতে যখনই মৃত্যু হয়ে গেল সেখানেই সব কিছু শেষ হয়ে গেল। মজার ব্যাপার হচ্ছে জুরাথ্রীস্টরা, যারা সেমেটিকদের থেকেও অনেকাংশে হিন্দুদের সঙ্গে মেলে, তারাও একটা জন্মকেই বিশ্বাস করে, বার বার জন্ম গ্রহণ করাটাকে বিশ্বাস করে না।

আমাদের বিষয় হচ্ছে বেদ, বেদ বিশ্বাস করে যে যখন কোন প্রাণী মারা যায় তখন তার জীবাত্মা সূক্ষ্ম শরীরটাকে নিয়ে স্থূল শরীর থেকে বেরিয়ে আসে, আর সে যেমন যেমন কর্ম করেছিল সেই অনুসারে বিভিন্ন লোকে গিয়ে ভোগ করে, কর্মফলের ভোগ শেষ হয়ে যাওয়ার পর সে আবার এই পৃথিবীতে এসে জন্ম নেয়। এই আসা আর যাওয়া চলতেই থাকে। তবে মাঝে মাঝে তাদের পতনও হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে নরক সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা মনের মধ্যে বসে আছে, বেদে কিন্তু এই রকম নরকের কোন ধারণার উল্লেখ নেই। বর্তমানে আমাদের নরকের ধারণাটা পরবর্তি কালে পৌরাণিক কাহিনী গুলোর মাধ্যমে আর আরও পরে ভারতে ইসলাম ও খ্রীশ্চানদের অনুপ্রবেশের পর তাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের ফলে এসেছে। বেদে যেটা বলা হয়েছে তা হল – আত্মা জীবাত্মা হয়ে পৃথিবীতে আছে, মৃত্যুর পর স্বর্গে গেল, আবার নেমে এল, আবার গেল। এর মধ্যে শুধু তার শরীরটাই পাল্টাচ্ছে, পৃথিবীতে একটা শরীর নিচ্ছে, স্বর্গে গিয়েও শরীর পাল্টে যাচ্ছে। এর মধ্যে সব থেকে যেটা খারাপ হবার তা হচ্ছে – সে যদি কোন খারাপ কাজ করে তখন সে স্বর্গে না গিয়ে নিম্নযোনিতে জন্ম নেয়। বেদের মতে নিম্নযোনিতে জন্ম নেওয়াটা খুবই জঘন্য শাস্তি। এই চিন্তাধারাটাই আমরা গীতাতে পাই যেখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে একটা মত হিসাবে বলছেন – জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ – যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু হবেই, যার মৃত্যু হয়েছে তার জন্ম হবেই। এই চিন্তাধারাটা এসেছে বেদ থেকে। অনেক এই চিন্তাধারাটাকে গীতার নিজস্ব মত বলে মনে করেন। কিন্তু গীতা বলছে না যে যে মরেছে তার জন্ম হবেই, গীতার এটা দর্শনই নয়। মহাভারতের সময়ে জন্ম-মৃত্যুর ব্যাপারে তিনটে মত ছিল, শ্রীকৃষ্ণ তারই একটা মত উল্লেখ করে অর্জুনকে বলছেন – যদি তোমার এই মত হয় যে, যে মারা গেছে তার জন্ম হবেই। এই মতটা আসলে বেদের মত। বেদের কর্মকাণ্ডীদের মত এইটাই – যে জন্ম নিয়েছে তাকে মরতেই হবে আর যে মরেছে তাকে জন্ম নিতেই হবে, চক্রাকারে এইটা চলতেই থাকবে।

বেদান্ত যখন পূর্বমীমাংসকে আক্রমণ করে তখন এই মতবাদে এসেই পূর্বমীমাংস চুপসে যায়। তাদের কে যখন বলা হয়ে বেদেই যে অনেক জায়গায় মুক্তির কথা বলা হয়েছে সেটাকে তুমি কি বলবে। এই প্রশ্নের কোন উত্তর তাদের কাছে নেই। বেদের ঋষিরা দেখলেন পৃথিবী আর স্বর্গ, স্বর্গ আর পৃথিবী এইটাই সব কিছু নয়, এর বাইরেও একটা অস্তিত্ব আছে। সেই অস্তিত্বের কথা বলতে গিয়ে বলা হচ্ছে যে আত্মাই ব্রহ্ম। অহং ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি, এই তত্ত্বগুলির মধ্য দিয়েই বেদ কিন্তু ইঙ্গিত করছে এই স্বর্গ ও পৃথিবী, জন্ম-মৃত্যুর পারেও একটা কিছু আছে যার কোন জন্ম-মৃত্যু নেই। এই চিন্তাধারা আর কোন ধর্মেই পাওয়া যাবে না। ধর্মের চিন্তাধারার মধ্যে যে বিবর্তন আসে সেটা হিন্দু ধর্মে খুব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। খ্রীশ্চান বা ইসলাম ধর্মের কোন বিবর্তন হয়নি, প্রথমে যা ছিল এখনও তাই আছে। জুদাইজিমে অল্প একটু বিবর্তন হয়েছিল কিন্তু তারাও মোটামুটি সেই পুরনো ধ্যান-ধারণাকেই ধরে রেখেছে। বিবর্তনের দিক দিয়ে শিখধর্ম পুরো অন্ধকারেই রয়ে গেছে। বৌদ্ধ ধর্ম এক সময়ে evolve করেছিল কিন্তু পরে সেটা বন্ধ হয়ে যায়। একমাত্র হিন্দু ধর্মই তার আদর্শ ও চিন্তাধারাতে evolve করেই চলেছে। হিন্দী, হিন্দু আর হিন্দুস্থানকে কোন দিনই ব্যাখ্যা করা যাবে না। তার কারণ এই তিনটেই হচ্ছে খুবই আল্গা, স্বাধীনতার পর হিন্দু ধর্ম এখন সবার জন্য খুলে গেছে, ভারতও সবার জন্য খুলে গেছে, আর হিন্দী ভাষাও এখন সবাই ব্যবহার করছে। এখন সবার জন্য খুলে যাওয়াতে কি হয়েছে, স্পঞ্জ যেমন জলকে শুষে নেয়, এই তিনটেই এখন স্পঞ্জের মত বিশ্বের সমস্ত রকমের ভাব, আচার, অনুষ্ঠান, ভাষাকে নিজের মধ্যে শুষে নিচ্ছে। এর ফলে সব থেকে মজার ব্যাপার হল, যারা খ্রীশ্চান তারা খ্রীশমাস কতটা পালন করছে জানা নেই কিন্তু প্রত্যেক হিন্দু এখন পালন করছে। হিন্দু ধর্মের সাথে খ্রাইস্টের কি সম্পর্ক আছে? খ্রীস্টানরা যিশুকে ভগবান মানুক আর নাই মানুক আমরা তাঁকে ভগবান বানিয়ে দিয়েছি। মুসলমানরা গলা কেটে দেবে বলে, যদি সুযোগ পেত হিন্দুরা এত দিনে আল্লাকে ভগবান বানিয়ে দিয়ে রীতিমত পূজা করতে শুরু করে দিত। হিন্দুদের মত সমস্ত ভাবধারকে হজম করার মত শক্তি আর কোন ধর্মের লোকেদের নেই। হিন্দী, হিন্দু আর

হিন্দুস্থান এই তিনটেই পৃথিবীর যে কোন কিছুকে, সে সংস্কৃতিই হোক, ধর্মীয় প্রথা বা অনুষ্ঠানই হোক, বা পৃথিবীর যে কোন ভাষাই হোক সব হজম করে নিজের মত করে নেবে।

শঙ্করাচার্যের পর থেকে হিন্দু ধর্মে আর কোন সেই ধরণের খুব একটা বিবর্তন হয়নি, হিন্দু ধর্মে যদি বিবর্তন না হয়ে থাকে তাহলে হিন্দু ধর্ম আর ইসলাম ও খ্রীশ্চান ধর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। বিবর্তনের শক্তি ও ক্ষমতার উপরেই হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ঠাকুর আসার পরে হঠাৎ করে হিন্দু ধর্মের অনেক কিছু নতুন করে খুলে গেছে। এখন আবার প্রচণ্ড ভাবে হিন্দু ধর্ম সব ধরণের ভাবকে হজম করতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

বেদে আছে জন্ম হলে মৃত্যু হবে মৃত্যু হলে স্বর্গে যাবে সেখান থেকে আবার পৃথিবীতে এসে জন্মাতে হবে। বেদেরই একটি অংশ উপনিষদ আবার এই মতের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াল, তত্র বেদা অবেদা ভবতি, উপনিষদই এই কথা বলছে। একটা অবস্থা আসবে যেখানে বেদ অবেদ হয়ে যাবে, বেদের তখন আর কোন মূল্যই থাকবে না। তখন কি হবে? আত্মাই হচ্ছে ব্রহ্ম, ব্রহ্মই সব কিছু। এইটাই হচ্ছে অদ্বৈত তত্ত্ব। যেখানেই দ্বৈত সেইখানেই নিয়ম-কানুন থাকবে। যদি সংহিতা আর মন্ত্রকেই একমাত্র বেদ বলে মনে করা হয় তাহলে বেদের মত হচ্ছে জন্মালে মরতে হবে মরলে জন্মাতে হবে আর পৃথিবী আর স্বর্গের মধ্যে আসা আর যাওয়া চলতেই থাকবে। আর যদি উপনিষদকেই বেদ বলে ধরা হয় তাহলে নতুন এক ভাবকে আমরা পাব, যে ভাবটা হচ্ছে আত্মাই হচ্ছেন ব্রহ্ম। আজকের বর্তমান হিন্দুধর্মে এই দুটো মত ও ভাবই চলছে। এখনও সাধারণ মানুষ যখন কোন ভালো কাজ করে তখন সে বলে যে স্বর্গে যাবার ব্যবস্থাটা পাকা করা হয়ে গেল। রামকৃষ্ণ মঠের ভক্তরা যেমন বলে মরার পর রামকৃষ্ণলোকে জায়গা পাকা করা আছে। এখন রামকৃষ্ণলোক স্বর্গেরই একটা অন্য রূপে কল্পনা। কুম্ভে যদি একটা ডুব মারতে পারি তাহলে আমার স্বর্গ গ্যারান্টি। আবার অন্য ধরণের মানুষও দেখা যায় যাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে মুক্তি।

এই যে বেদ বলছে শরীর থেকে শরীরে স্বর্গ থেকে পৃথিবী আবার পৃথিবী থেকে স্বর্গে আত্মা পরিভ্রমণ করে চলেছে, স্বাভাবিক ভাবেই তাহলে এমন কিছু আছে যা তাকে শরীর থেকে শরীর, পৃথিবী থেকে স্বর্গে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। সেই বস্তুটি কি? বেদ বলছে এইটাই হচ্ছে কর্ম। পরের দিকে এই কর্ম-বিধানই হিন্দু ধর্মের প্রধান কাণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ যদি প্রশ্ন করে হিন্দু ধর্মের সাথে অন্যান্য ধর্মের মৌলিক পার্থক্যটা কোথায়? তখন বলা যেতে পারে যে কর্ম হচ্ছে হিন্দু ধর্মের সব কিছু। যদি কর্ম-বিধানকে মেনে নিতে পারে তাহলে হিন্দু ধর্মের বাকি যা কিছু আছে সব এক লাইনে এসে দাঁড়িয়ে যাবে। এই কর্ম ফলের অনুসারেই একজন বিভিন্ন যোনিতে কখন মানুষ আবার কখন নিম্ন যোনিতে জন্ম নিচ্ছে আবার এই কর্মের অনুসারেই কখন স্বর্গে আবার কখন পৃথিবী বা অন্য লোকে জন্ম নিচ্ছে। একবার যখন কর্মকে কেউ অতিক্রম করে যাবে তখনই তার এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। এই কর্মবাদই হচ্ছে হিন্দু ধর্মের বিশিষ্টতা আর এই কর্মবাদই অন্যান্য ধর্ম থেকে হিন্দু ধর্মকে পার্থক্য করে দেয়। কর্মবাদকে যদি একবার বুঝে নিতে পারে তাহলে সে হিন্দু ধর্মের বাকি সব কিছুকেই বুঝে নিতে পারবে। অন্য ধর্ম কর্মবাদকে মানে না।

কর্মবাদ এবং কার্য ও কারণের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। কার্য-কারণ হচ্ছে কর্মবাদেরই একটা ছোট্ট অংশ। কর্মবাদে এই বিরাট অদৃশ্য বস্তুর ভূমিকা আছে। কিন্তু কার্য-কারণে হচ্ছে – একটা কাজ করলাম তার একটা ফল পেলাম, এখানে কর্মবাদ বলবে কার্য-কারণ হচ্ছে সমুদ্রের গর্ভে ডুবে থাকা পাহাড়ের চূড়ার একটু অংশ যেন দেখা যাচ্ছে, পাহাড়ের বেশির ভাগটাই থাকে জলের গভীরে অদৃশ্য রূপে। সেই অদৃশ্য বস্তুটা হচ্ছে যে কর্মের পুটলি তুমি জন্ম থেকে জন্মান্তরে বয়ে নিয়ে চলেছ। কর্মবাদ বলবে – মনমোহন সিং কংগ্রেসে যোগদান করেছে বলেই দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়নি, কিন্তু তিনি এর আগের আগের জন্মে এমন এমন কর্ম করেছিলেন যেটা তাঁকে বাধ্য করেছে কংগ্রেসে দলে যোগ দিতে আর সেই কর্মই

তাঁকে পরবর্তি কালে দেশের কর্ণধার রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই কর্মবাদ ধীরে ধীরে বিবর্তিত হতে থাকে এবং কর্মবাদ হচ্ছে ঋতমেরই অঙ্গ।

বেদে জিনিষগুলি এইভাবে সাজান হয়েছে – বিধি-নিষেধ, ঋতমের ধারণা, আত্মার ধারণা, কর্মবাদের ধারণা, স্বর্গ-পাতালের ধারণা। এইগুলো পরে শেষে আসছে মুক্তির ধারণা। মুক্তি হচ্ছে আগে যত গুলোর ধারণার কথা বলা হল সেইগুলিকে অতিক্রম করে যাওয়া, যেখান পৃথিবী, স্বর্গ, পাতাল, কর্ম, অকর্ম, বিকর্ম, জন্ম-মৃত্যু সব কিছুকে পার করে যাচ্ছে। মুক্তি হচ্ছে নিজেকে সেই পরম সত্তা, সচ্চিদানন্দের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। তখন হয়ে যায় তত্ত্বমসি, তুমিই সেই ব্রহ্ম, আত্মা যখন ব্রহ্মনের সাথে এক হয়ে যায় তখনই মুক্তি হয়।

অনেকের মনে প্রশ্ন আসে, আত্মা আগুনে পুড়ছে না, জলে আর্দ্র হচ্ছে না, আত্মা কোন খাবার খায় না, তাহলে শ্রাদ্ধের সময় আত্মার উদ্দেশ্যে কেন পিণ্ড দান করা হয়। আমাদের যে স্থূল দেহ এটা হচ্ছে রক্ত, মাংস, মজ্জা, হাড় দিয়ে তৈরী। এই স্থূল দেহের পেছনে রয়েছে আরেকটি সূক্ষ্ম শরীর। আবার এই সূক্ষ্ম শরীরের পেছনে রয়েছে আত্মা। আমরা যখন বলি আত্মা স্বর্গে যাচ্ছে না নরকে যাচ্ছে তখন বলা হয় এই সূক্ষ্ম শরীরটা যায়। সূক্ষ্ম শরীরের আরেকটি নাম হচ্ছে জীবাত্মা, আত্মা যখন জীবের ধর্মকে নিয়ে নেয় তখন তাকে জীবাত্মা বলছে। এই জীবাত্মাই আসা যাওয়া করে। খ্রীশ্চান বা ইসলামে যে স্বর্গ নরকের কথা বলা হয়, সেখানে মৃত্যুর পর যে চিরস্থায়ী ভাবে অবস্থান করছে তার সাথে এই জীবাত্মার মিল আছে, আবার পূর্বমীমাংসারা যে বলছে আত্মার মুক্তি নেই, আত্মার জন্ম ও মৃত্যু চিরন্তন, এখানেও সেই জীবাত্মারই কথা বলছে। আমাদের যত প্রকার ধর্মের কথা বলা হয় তখন এই সূক্ষ্ম শরীরকে কেন্দ্র করেই সব কিছু বলা হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা সব সময় সূক্ষ্ম শরীরে যে আত্মা রয়েছেন তার দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মানুষ যখন এই আত্মার দিকে এগিয়ে যায় তখন সে দেখতে পায় আমার মধ্যে যে আত্মা রয়েছে ঠিক তেমনটি আত্মা সবার মধ্যেই রয়েছে। তাই বলে আমার দেহ আর অপরের দেহ এক নয়। একজন পুরুষ একজন নারী। শুধু এই স্থূল শরীরটাই আলাদা নয়, সূক্ষ্ম শরীরটাও এক নয়। কিন্তু যখন আত্মার স্তরে চলে যাবে তখন দেখে আমার মধ্যে যেমনটি আছে অপরের মধ্যেও ঠিক ঐ রকমটিই আছে। এই স্তর থেকে যখন অদ্বৈত স্তরে পৌঁছে যাবে তখন দেখে স্থূল, সূক্ষ্ম, জড় বলে কিছুই নেই সবটাই সেই আত্মা, আত্মা ছাড়া আর কিছুই নেই। যখন বলছে আত্মাকে জ্বালাতে পারেনা, ভেজাতে পারেনা, অস্ত্র দিয়ে ছেদন করা যায় না, তখন তারা এই আত্মার কথাই বলছে। দ্বৈতবাদীরা যখন আত্মজ্ঞানের কথা বলে তখন তারা আসলে নিজের ভেতরে যে আত্মা আছেন অন্তত তাকে জানার চেষ্টা কর। যখন পূণ্য, পাপের কথা বলা হয় তখন সূক্ষ্ম শরীরের কথাই বলছে, পাপ-পূণ্য সূক্ষ্ম শরীরকেই প্রভাবিত করে। সূক্ষ্ম শরীরকে প্রভাবিত করলে স্থূল শরীরেরও তার প্রতিক্রিয়া হবে। যারা খুব পাপকর্ম করে তাদের শরীর এক রকমের হয়ে যায় আবার যারা খুব পূণ্য কর্ম করে তাদের শরীর অন্য রকমের হয়ে যায়। সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হয় দশটি ইন্দ্রিয় আর মনকে নিয়ে। আমাদের এই শরীরটা একটা গাড়ীর মত, একে চালাচ্ছে পুরোপুরি সূক্ষ্ম শরীর, আবার এই সূক্ষ্ম শরীরকে চেতনা দিচ্ছে আত্মা। মানুষ স্থূল দেহের থেকে মনটাকে সরিয়ে ইন্দ্রিয়ের উপরে নিয়ে আসে, ধ্যানের মাধ্যমে সত্যিই মানুষ তার সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলিকে স্পষ্ট দেখতে পায়। তারপর সেইখান থেকে ধীরে ধীরে সেই চৈতন্যে চলে যায়, এইখানে এসে বেশির ভাগেরই সাধনা শেষ হয়ে যায়। কচিৎ কয়েকজন একশ বছরে বা হাজার বছরে দু চার জন অদ্বৈত ভূমিতে পৌঁছে যান, তখন দেখেন এই আত্মা ছাড়া কিছু নেই। এত দিন এগুলো যা ছিল সবই কল্পনা।

বেদ – ২১শে মার্চ ২০১০

সৃষ্টির ব্যাপারে যা কিছু বলার বে নাসদীয়সূক্তম্ ও পুরুষসূক্তমের মধ্য দিয়ে বলে দিয়েছে। বেদের মতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় চক্রাকারে চলতে থাকে। আরেকটা জিনিষ হল, এখন আমরা ভগবান বলতে ঠিক যা বুঝি, বেদে ঠিক এইভাবে না দেখে ভগবানের এই ভাবটাকে অন্য অন্য ভাবে দেখা হত। বেদে ভগবানকে বেশির ভাগ সময়তেই পুরুষ রূপে বিচার করতেন। যখন সৃষ্টির হল সেই সময় সবচেয়ে প্রথম জন্ম হল ঋষিদের, তারপরে জন্ম নিয়েছিলেন প্রজাপতিরা। দেবতারা তাদের নিজস্ব সত্তারূপে আরও পরে জন্ম নিলেন। সেইজন্য আমরা এর আগেও বলেছি যে, যেহেতু দেবতাদের অনেক পরে সৃষ্টি হয়েছে তাই তারা ভগবানের কথা কি করে জানতে পারবে!

বেদে সাংসারিক ধর্মের প্রতি জোরটা বেশি দেওয়া হয়েছে, কি করে জাগতিক সুখ সুবিধা অর্জন করে সংসারে কিভাবে উন্নতি লাভ করতে হয় সেই ব্যাপারে বেদে অনেক রকমের যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে। আমরা প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম বলতে যা বুঝি, তুমি কর্ম কর আর কর্মের ফলে যা কিছু উদ্ভব হবে, ভালো মন্দ, সব ভোগ কর। সেইজন্য বেদে প্রথম দিকে ত্যাগের ভাবের দৃষ্টান্ত খুব একটা বেশি পাওয়া যাবে না। আমার ধন-সম্পদ হোক, আমার জমি-জায়গা হোক, আমার অনেক গৃহপালিত পশু হোক, এই জীবনে, যেখানে আমি জীবন-যাপন করছি এখানে যেন আমার কোন দুঃখ-কষ্ট, দারিদ্রতা না হয়, মৃত্যুর পর আমি যেন ভালো স্বর্গে যেতে পারি, এগুলোই ছিল বেদের মূল লক্ষ্য, এই দিকটাতেই বেদে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই যে স্বর্গে যাচ্ছি, সেখান থেকে আবার ফিরে এসে জন্ম নিয়ে আবার সেই একই প্রার্থনা, এইভাবে বারবার আসা-যাওয়ার মধ্য থেকেই আত্মার ধারণার জন্ম নিল। এই আত্মার ধারণা যখন এসে গেল, সেখান থেকে আবার এসে গেল কর্মবাদ।

কর্মবাদ যখন এসে গেলে তখন কর্মবাদ থেকে স্বাভাবিক ভাবে এই কর্ম থেকে মুক্তির ধারণারও জন্ম নিল। পরের দিকে দেখা যায় বেদে যে যে জিনিষগুলিকে মূলতঃ ভালো বলেছে উপনিষদ তার সব জিনিষকে সরিয়ে দিল। যেমন বেদে দেবতার স্থান খুব উঁচুতে কিন্তু উপনিষদে দেবতাদের কোন স্থান নেই, তারপরে বেদে জাগতিক অভ্যুদয় মানে সাংসারিক উন্নতি, যাতে বেশি সুখ সুবিধা হতে পারে তার দিকে নজর দিয় হাল্কা করে নিঃশ্রেয়ের কথা বলেছে, কিন্তু উপনিষদ সাংসারিক সুখ সুবিধাকে পুরো উড়িয়ে দিয়ে এই নিঃশ্রেয়সকেই জোর দিয়ে পরে মুক্তির ধারণাকে বেশি করে সামনে নিয়ে এসেছে। বেদে যেটাতে বেশি জোর দিয়েছে উপনিষদ সেটাকে পুরো বাতিল করে দিয়ে বেদ যেটাকে হাল্কা করে বলেছে সেটাতেই অনেক জোর দিয়েছে। এই ব্যাপারটাতে দোষের কিছু নেই। পরে শঙ্করাচার্য বেদ ও উপনিষদের সব কিছুকে সমণ্বয় করে লৌকিক ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে দিলেন।

শঙ্করাচার্য বেদে ও উপনিষদের দর্শনকে সমন্বয় করে দেখাচ্ছেন জগতে তিন ধরণের লোক আছে – এক ধরণের মানুষ আছে যারা কোন ধর্মকর্মে বিশ্বাস করেনা, এরা মনে করে আমি বেঁচে থাকব, ভালো করে সব সুখভোগ করব, দরকার পড়লে লুটেপুটে খাব, বাকী কার কি হচ্ছে তাতে আমার কিছু যায় আসে না। ধর্ম এদের জন্য নয়। আমাদের যত শাস্ত্র আছে বেদ, উপনিষদ, পুরান, তন্ত্র, এই সব শাস্ত্র এদের জন্য নয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ আছে যারা বলে – আমি ধর্ম করতে রাজী আছি কিন্তু আমার মনে এখনও প্রচুর ভোগ বাসনা রয়েছে। বেদ তখন এদের জন্য অভ্যুদয়ের কথা শোনালেন – তোমার যা যা ভোগের ইচ্ছা রয়েছে সবটাই আমরা পূরণ করে দেব, তোমার ভালো বউ চাই, পেয়ে যাবে, অর্থ চাই, অর্থ পেয়ে যাবে, সন্তান চাই, সন্তান হয়ে যাবে। সব পেয়ে যাবে কিন্তু তুমি শুধু যজ্ঞ করে যাও। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে অনেকেই নানা রকমের জাগতিক সমস্যা নিয়ে আসতেন, কেউ বলছেন আমার চাকরিতে এই উন্নতিটা হোক, আমার একজনের প্রতি আকর্ষণ আছে। এই সব লোকদের কি ঠাকুর ধুর্ শালা বলে

তাড়িয়ে দিতেন? ঠাকুর কক্ষনই তা করতেন না। একজন এসে ঠাকুরকে বলছে – আমার মনটা সব সময় আমার বউ টেনে নিচ্ছে। আবার কেউ একজন এসে বলছে – আমি না কিছুতেই মদ খাওয়া থেকে সরে আসতে পারছি না। অন্য একজন এসে বলছে – আমার পুরো মনটা আমার ভাইপোর উপরেই পরে থাকে। এরা সবাই কিন্তু ঠাকুরের কথা শুনতে রাজী আছে কিন্তু তার মনের মধ্যে এই ব্যাপার গুলো ঘুরপাক খাচ্ছে। এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ঠাকুরে প্রত্যেককে এমন একটি বীজ মন্ত্র দিয়ে দিচ্ছেন তাতেই তার জীবনের মানচিত্র পুরো পাল্টে গিয়েছিল। যে বুড়ি তার ভাইপোকে ছাড়া আর কিছু দেখছে না তাকে ঠাকুর বীজ মন্ত্র দিয়ে দিলেন – তোমার ভাইপোর মধ্যে তুমি গোপালকে দেখ। এখন কেউ ঠাকুরের এই কথা প্রথমে শুনলে তার কাছে হাসির খোরাক হয়ে যাবে। কিন্তু ঠাকুরের কথা কিনা সেই কথার ফল হতে বাধ্য। এই ভাবে দেখতে দেখতে প্রথমের দিকে গোপাল আসেনা ভাইপোওই থাকে কিন্তু ধীরে ধীরে মনটা সেই ভাইপো থেকে সরে আসতে থাকে, তারপর একটা সময় আসবে ভাইপো চলে যাবে কিন্তু গোপালই থেকে যাবে। বেদেরও ঠিক এইটাই উদ্দেশ্য। এখন যার খুব ভোগের ইচ্ছা আছে তখন তাকে বলা হল এই এই যজ্ঞ কর। তারপরে সে লাগিয়ে দিল বারো বছরের এক যজ্ঞ। যখন যজ্ঞ শুরু হবে তখন তাতে এত বেশি যজ্ঞ কর্মের মধ্যে ডুবে যাবে ভোগ করার সময়ই পাবে না। তাছাড়া যজ্ঞ চলাকালীন কতকগুলি বিধি-নিষেধ থাকার জন্য জীবনটা খুব নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে তার দৈনন্দিন জীবনচর্চাতে সংযমের অভ্যাসটা দৃঢ় হতে থাকে। তখন তার মন অন্য দিকে যাবে না। কিছু দিন পরে দেখা যায় তার মনটা পুরোপুরি ধর্মের দিকে চলে গেছে। এইটাই ছিল বেদের উদ্দেশ্য, যে করেই হোক লোকের মনটাকে একটা উচ্চ চিন্তার দিকে নিয়ে আসা, বাকি জিনিষটা সে নিজেই বুঝে নেবে। উচ্চ চিন্তা করার ফলে মনটা খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। একটা অবস্থার পরে মনটাই হয়ে যায় গুরু। মনই বলে দেবে আমাদের কি করতে হবে কি করতে হবে না।

তৃতীয় ধরণের লোক হচ্ছে তাদের কাছে এইসব যজ্ঞ, ধর্ম-কর্ম সব পার করে একমাত্র ব্রহ্মের চিন্তা করে মুক্তির দিকে এগিয়ে যায়। বেদে মুক্তির কথা এক সময় থেকে আসতে শুরু হয়েছিল কিন্তু সেটাই পরে ধীরে ধীরে উপনিষদের প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়াল। এইটাই হচ্ছে বেদের মূল দর্শন, যেটাকে শঙ্করাচার্য খুব সুন্দর সমন্বয় করে বলছেন অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়।

বেদ সৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে নাসদীয়সূক্তম্ ও পুরুষসূক্তম্ এই দুটো দর্শনকে নিয়ে এসেছে, এই দুটোর মধ্যে নাসদীয়সূক্তম্ হচ্ছে নৈর্ব্যক্তিক সৃষ্টির বর্ণনা আর পুরুষসূক্তম্ হল একজন কেউ এই সৃষ্টিটা করছেন, ভগবানের থেকে সব সৃষ্টি হচ্ছে। নাসদীয়সূক্তম্এ প্রকৃতিই সব সৃষ্টি করছে পুরুষসূক্তম্ বলছে ভগবানই সৃষ্টি করছেন। যার ফলে এই দুটো মত থেকে ভারতে আলাদা আলাদা দর্শনের জন্ম নিল। নাসদীয়সূক্তম্ থেকে জন্ম নিল কপিলের সাংখ্যদর্শন, সাংখ্য দর্শনকে নিল যোগ ও বেদান্ত। বেদান্তে আবার ভক্তিমার্গের সাধকরা পুরুষসূক্তম্কে গ্রহণ করল। কিন্তু পরের দিকে বেদান্তের যত ছোট ছোট বই রচিত হয়েছে সেখানে এই দুটো সূক্তম্কে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানে বলছে ভগবান যিনি তাঁরই দুটো প্রকৃতি – একটা পরা আরেকটি অপরা প্রকৃতি। তারা বলে যে অপরা প্রকৃতিতেই সৃষ্টিটা হয়। হিন্দু ধর্মে কোন কিছুকেই বাতিল করে দেবে না, আমরা আগেও এক জায়গায় বলেছি যে হিন্দু ধর্ম সব সময় নিজেকে বিস্তার করে চলেছে। পুরুষসূক্তমে সেই ভগবান অর্থাৎ আদি পুরুষকে নিয়ে এসে দেবতারা বলি দিল। বলি দেওয়ার পর সেই পুরুষের শরীরের একেকটি অঙ্গ একেকটি জিনিষের সৃষ্টি করল। পুরুষসূক্তমের মূল অন্তর্নিহিত তত্ত্ব হচ্ছে – এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বর বাদে কিছু নেই। নাসদীয়সূক্তম্ বলছে – *কো অদ্ধা বেদ*, আমরা বাপু জানিনা এই সৃষ্টিটা কিভাবে হয়, আর কে জানে এটা কিভাবে হয়েছে? কিন্তু বলছেন জড় বস্তু আছে আর শক্তিও আছে, শক্তি এই জড়ের উপরে আঘাত করে তারপরে একটা থেকে আরেকটা হতে থাকে।

শঙ্করাচার্য যে বেদান্তকে আমাদের সামনে দিয়ে গেছেন সেখানে তিনি এই দুটো সূক্তম্কে গীতার শ্লোককে ভিত্তি করে সমন্বয় করে দিলেন। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন – *অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে*

পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ।।(৭/৫) মানে, ভগবান যিনি, তাঁরই দুটি রূপ, একটা হচ্ছে অপরা আরেকটি হচ্ছে পরা। ভগবানের অপরা প্রকৃতি, যেটাকে নিকৃষ্ট প্রকৃতি বলছে সেইখানেই সৃষ্টির খেলা হয়। কিভাবে হচ্ছে? নাসদীয়সূক্তমের মতে যেমন বলা হয়েছে সেইভাবে সৃষ্টি এগোতে থাকে। একটাই কথা বারে বারে বিভিন্ন ভাবে বলতে চাইছেন যে ভগবান যিনি তিনিই সব কিছু নিজে হয়েছেন। কিন্তু এই যে সৃষ্টিটা হচ্ছে ভগবান এই সৃষ্টির প্রক্রিয়াতে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত নন। গীতার নবম অধ্যায়ে এই তত্ত্বটির বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে প্রথমে ভগবান বলছেন আমিই সব করি, তারপরে বলছেন আমিই করি কিন্তু আমি এর ভালো মন্দের কোন কিছুতেই লিপ্ত নই, আর শেষে বলছেন আমি আদপেই এইগুলো কিছুই করি না। পরপর তিনটে শ্লোকে তিনটি পরস্পর বিরোধী কথা বললেন। আসলে এখানে পরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতির যে ধারণা বেদে দেওয়া আছে সেটাকেই এখানে সমন্বয় সাধন করে বলা হয়েছে।

কল্পের ব্যাপারে বেদ বলছে যে মানুষের গড় একশ বছর আয়ু ধরে তার একটা জীবন নিয়ে দেবতাদের একটা দিন, দেবতাদের একশ বছরে ব্রহ্মার একটা দিন হয়। ব্রহ্মার একটা দিন আর একটা রাত মিলিয়ে হচ্ছে একটা কল্প। ব্রহ্মা যখন রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েন তখন সৃষ্টির সব কিছু লয় হয়ে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ব্রহ্মা যখন আবার সকাল বেলা জেগে ওঠেন তখন সব আবার যে রকম ছিল সেইভাবে জেগে ওঠে। এই ভাবে চলতে চলতে ব্রহ্মার যখন একশ বছর হয়ে গেল তখন এই ব্রহ্মা লীন হয়ে যান। ব্রহ্মার লীন হয়ে যাওয়ার পর আবার কবে থেকে, কিভাবে সৃষ্টি হয়ে এই ব্যাপারে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু আবার সৃষ্টি হবে। তার মানে এই নয় যে ব্রহ্মা একশ বছর বেঁচে থাকার পর যখন লীন হয়ে গেলেন তারপরে সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হতে একশ বছর অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

সৃষ্টি নিয়ে ফিজিক্সে তিনটে থিয়োরি আজ পর্যন্ত এসেছে। একটা যে থিয়োরি ছিল যা আছে এইটুকুই আছে, এর মধ্যেই যা হবার হবে আর এই রকমই হবে, এই থিয়োরির নাম হচ্ছে Steady Stayed Theory, যেমন এই বাড়িটা আছে এইটাই চিরস্থায়ী হয়ে আছে, এর মধ্যেই আমি কোথাও পাখা লাগালাম, আর তাও এখান থেকে খুলে ওখানে লাগালাম, মানে বাইরে থেকে কিছু হচ্ছে না। পরে এই থিয়োরিটা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হল। ফিজিক্সের দ্বিতীয় থিয়োরিটা অনেকটা জিউস্‌দের যে ধারণাটা ছিল পরে যেই ধারণাটাকে খ্রীশ্চানরা নিল, ঈশ্বর একদিন এই জগতটাকে সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তবে থেকে এই জগৎটা চলেই যাচ্ছে। প্রথমের দিকে লোকেরা এই থিয়োরিটাকে খুব একটা বুঝতেন না। পরের দিকে বিজ্ঞানীরা, এরমধ্যে আইনস্টাইনের মত বিজ্ঞানীরও আছেন, এই থিয়োরিটার নাম দিলেন বিগ্‌বাঙ। এই থিয়োরির মতে বলছে একটা সময় কিছুই নেই, কিন্তু সেই কিছু নেই থেকেই সৃষ্টিটা বেরিয়ে এলো। কিন্তু পরের দিকে ফিজিক্সের বিজ্ঞানীরা দেখলেন গাণিতিক নিয়মে ও ফিজিক্সের বিভিন্ন তত্ত্বগুলিকে বিশ্লেষণ করতে করতে গিয়ে এই কিছুই নেই সেইখান থেকে সৃষ্টি বেরিয়ে এলো, এই থিয়োরিতে এসে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য বিজ্ঞানীরাও এই থিয়োরিটাকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারলেন না। কিছু বছর আগে আরেকটি থিয়োরি বাজারে আসতে শুরু করেছে, এই থিয়োরিকে বলছে Cyclic Theory of Universe, যদিও এই থিয়োরিটা এখন দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কারণ যে কোন থিয়োরিকে প্রতিষ্ঠিত করতে অনেক রকমের তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া থাকে, নতুন কি কি থিয়োরি আসতে পারে এই সব নিয়ে আগাম ভাবনা চিন্তা করতে হয়। তাই একটা নতুন থিয়োরিকে প্রতিষ্ঠিত হতে পনের-কুড়ি বছরের মত সময় অপেক্ষা করতে হয়। তবে অনুমান করা যাচ্ছে যে এখন পর্যন্ত সৃষ্টির ব্যাপারে বিজ্ঞান যত থিয়োরি দিয়েছে তার মধ্যে এই থিয়োরিটাই শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যাবে। এই থিয়োরির যারা প্রবক্তা, এনারাও খুব বড় পদার্থ বিজ্ঞানী এবং নামকরা গণিতজ্ঞ। এনার একটা বই লিখেছেন On Cyclic Universe, সেখানে এনারা বলছেন যে বিগব্যাঙকে নে যা বলা হচ্ছে সেটা ঠিকই বলা হয়েছে, কিন্তু এমনকি স্টিফেন হকিংও যেখানে বলছেন the universe come out of nothing, এনারা এই থিয়োরিটাকে মানলেন না। বলছেন এটা কি করে হবে, কোন কিছুই নেই সেইখান থেকে কি করে সৃষ্টি হবে! এনারা তার বদলে যে থিয়োরিটা

দিলেন, আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, হিন্দুরা কয়েক হাজার বছর আগে ঠিক এই থিয়োরিটাই দিয়ে রেখেছেন। এই যে কিছুক্ষণ আগে আমরা বললাম মানুষের একশ বছর দেবতাদের একটা দিন, দেবতাদের একশ বছর ব্রহ্মার এক দিন, ঠিক এই জিনিষটাই অন্য ভাবে বিজ্ঞানের সূত্র দিয়ে বলা হয়েছে।

আমরা যদি বিগব্যাঙ থিয়োরিকে নিই তাহলে কিন্তু হিন্দুদের সৃষ্টির তত্ত্বের সঙ্গে কয়েকটি ছোট খাটো জিনিষ ছাড়া বেশির ভাগ জিনিষই মিলবে না। কোন হিন্দুই, যে একটু শাস্ত্র জানে, সে কখনই স্টিফেন হকিং এর থিয়োরি আর বিগব্যাঙ এর থিয়োরির সাথে একমত হবে না। অভাব থেকে সৃষ্টি হচ্ছে এই থিয়োরি হিন্দুরা কখনই মানবে না। হিন্দুরা বলবে যা আছে সেটাকেই তুমি নানান আকার ও রূপ দিতে পার, কিন্তু অভাব থেকে কিছু সৃষ্টি তুমি করতে পারবে না। কিন্তু খ্রীশ্চানরা, মুসলমানরা এইটাকেই ধরে আছে। কারণ এদের ওল্ড টেস্টামেন্টেই এই কথা বলা হচ্ছে যে creation come out of nothing, আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা হয় না।

বর্তমান যে সময়ে আমরা এই ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছি এর বয়স হচ্ছে পনের বিলিয়ন। হিন্দুরা ব্রহ্মা যে একটা কল্পের কথা বলছে সেটার বয়স হয় মোটামুটি দশ বিলিয়ন বছরের কিছু বেশি। বর্তমান বিজ্ঞানীরা আজকের দিনের নানান অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, গণিতের সাহায্যে যে হিসেব দিচ্ছে সেই হিসেবের সাথে ভারতের ঋষিরা যারা ধ্যানের গভীরে গিয়ে বসে বসে যে হিসেব দিলেন তাদের হিসেবের সাথে এই মিলটা খুবই আশ্চর্য লাগে। দশ আর পনেরতে ঐ বিরাট মাত্রায় গিয়ে খুব একটা বড় পার্থক্য থাকে না। ব্রহ্মার একশ বছর শেষ হয়ে যাওয়ার পর আবার কবে সৃষ্টি হবে এই ব্যাপারে বেদ বা পুরান নীরব, ফিজিক্সের যে নতুন থিয়োরি এসেছে তাঁরাও এই ব্যাপারে কিছু বলেননি। বিজ্ঞানীরা বলছেন যে একবার লয় হয়ে যাওয়ার পর আবার কবে সৃষ্টির কাজ শুরু হবে এটাকে অনুমান করা যাবে না। পরের দিকে এনারা যখন অনুসন্ধান করতে গেলেন যে সৃষ্টির ব্যাপারে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রগুলো কি বলছে, হিন্দুদের শাস্ত্রে যখন এই থিয়োরিটা পেলেন তখন আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে এই থিয়োরিটা এদের সাথে মিলে যাচ্ছে। যেটা সব থেকে বড় মিল পাওয়া গেছে তা হচ্ছে cyclic creation, যে জিনিষটা আজকে হয়েছে পরের সৃষ্টিতে ঠিক সেটাই হবে। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন - আমি কতবার এই কথাগুলো তোমাদের সামনে বলেছি, তোমরা কতবার এই কথাগুলো আমার কাছে শুনেছ। এইখানে স্বামীজী সেই concept of cyclic universe এর কথাই বলছেন। অবাক কাণ্ড যে স্বামীজী জোর গলায় আমেরিকাতে এই কথাগুলো বলেছিলেন, কারণ আমেরিকানরা তখনকার দিনে এই সব কথা কল্পনাই করতে পারত না।

সহজ ব্যাপার হচ্ছে খ্রীশ্চান বা জুদাইজম্ যখন দেখল একটা মানুষ জন্ম নেয়, কিছু কাজ করে, তারপর মরে যায়, খেলা শেষ। বাবা-মার মিলন থেকে এক সন্তানের জন্ম হল, ভগবানের ইচ্ছাতে হয়েছে ঠিক আছে, একবার হল, তারপর মরে গেল, ঐখানেই সব শেষ হয়ে গেল। কিন্তু হিন্দুদের কাছে এইটাই হয়ে যাচ্ছে চক্রাকারে – দিন রাতে পরিবর্তিত হয়, রাত দিনে পরিবর্তিত হয়, তার মানে একটা থেকে আরেকটার পরিবর্তন হচ্ছে, কিছু একটা থেকে আরেকটা কিছু আসেছে। সেমেটিক ধর্মে বলছে – না, একবার যা হয়ে শেষ হয়ে গেল সেটা ঐখানেই শেষ, আবার যেটা আসবে সেটা শূন্য থেকেই আসছে। এই হচ্ছে দুই ধরণের মত। বেদান্তের অনেক শাখা আছে, তার মধ্যে একটা শাখা হচ্ছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, এই শাখা অনেক কিছুকে নিয়েছেন আবার অনেক কিছুকে ছেড়ে দিয়েছেন। স্বামীজী বারবার বলেছেন – creation out of nothing is not accepted, কিন্তু তাই বলে হিন্দুদের এই মত নেই, নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু এই থিয়োরিটা একটা ছোট্ট শাখা হয়ে কোথাও পড়ে আছে। কিন্তু যেহেতু স্বামীজী creation out of nothing কে অসম্ভব বলে অস্বীকার করেছেন সেইজন্য আমাদের কাছে স্বামীজী কথাকেই বেদবাক্য বলে মানতে হবে।

পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে তারমধ্যে বেশির ভাগই হচ্ছে আদিবাসীদের ধর্ম। বিভিন্ন অঞ্চলে যে ছোট ছোট আদিবাসীরা বাস করে এই সব ছোট ছোট গোষ্টিদের আলাদা আলাদা ধর্ম। মানুষের মনের মধ্যে এই সব ধর্ম কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে এই নিয়ে বিভিন্ন রকমের আলোচনা আছে। এর মধ্যে একটা আলোচনা হয় যে, একজন আছে যে রাতের অন্ধকারকে ভয় পায়, এখন তার বাবা একদিন মারা গেল, এখন বাবা তার যতই কড়া ধাতের মানুষ হয়ে থাকুক না কেন, বাবা এখন অদৃশ্য হয়ে গেলে, সে এই রাতের বেলা যে অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না এই অদৃশ্য ব্যাপারটাকে ভয় পায়। এখন রাত্রে কিছু এমন একটা হল সেটা থেকে সে ভাবছে যে আমার বাবা যিনি এই দেহে আর নেই, তিনিই এই জিনিষটা করছেন। রামকৃষ্ণ মঠের কোন এক আশ্রমে একটি মেদিনীপুরের কর্মচারী ছিল, তার এক সময় এমন অবস্থা হয়ে গিয়েছিল তাদের সবাইকে গ্রাম ছেড়ে আসতে হয়েছিল। এই ব্যাপারে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলেই বলত যে তাদের এমন অবস্থা হয়েছিল গ্রামে বেশি দিন থাকলে না খেয়েই মরে যেতে হত। সবাই মনে করল যে অভাব দারিদ্রতা থেকেই হয়তো না খেয়ে মরে যেত। কিন্তু ছেলেটি যা বলল শুনে সবাই অবাক হয়ে গেল, বিশ্বাসই করতে চায়না। হয়েছি কি, ছেলেটি বলল যে ওর বাবা হঠাৎ কি একটা অসুখে অল্প কয়েক দিন ভুগেই মারা যান, মরে গিয়ে তিনি ভূত হয়ে ওদের বাড়িতেই থাকত। মা ভাত রান্না করে রাখতেন, খাওয়ার সময় দেখি হাড়ির ভাত ছাই হয়ে গেছে। মা মাছ রান্না করে রেখেছেন, খেতে গিয়ে দেখি মাছগুলো পাঁক হয়ে গেছে। সব মহারাজরা শুনে বলছেন পুরো ধাপ্পা। ছেলেটি সবাইকে বলছে – আপনাদের কাছে ধাপ্পা হতে পারে, কিন্তু আমরা, আমার মা আর আমাদের দুটো ছোট ছোট ভাই দিনের পর দিন যে না খেয়ে থেকেছি এটাকে তো আমি ভুলতে পারিনা, রান্না করে সঙ্গে সঙ্গেই যে খেয়ে নেব তা তো হয় না, একটু সময় রেখেছে কিছুক্ষণের মধ্যে সব এই রকম হয়ে যাচ্ছে, জল এনে রেখেছে কুঁজোতে, জল খেতে গিয়ে দেখি কুঁজো ফাঁকা। তারপরে এক তান্ত্রিককে আনা হল, তিনি কি সব করে টরে বললেন যে আমার বাবা অতৃপ্ত আত্মা হয়ে এইসব করছেন। তখন আমরা জলে দরে আমাদের সব জমি বাড়ি বিক্রী করে পালিয়ে বাঁচি। এখন যেখানে আছি সেখানে আর কোন উৎপাত নেই। মহারাজরা বললেন যে পাড়ার কোন লোক হয়তো কোন বদমাইসি করার জন্য এই রকম করেছে। ছেলেটি দৃঢ়তার সাথে বলছে – মহারাজ কি বলছেন, দরজায় তালা লাগিয়ে দেখেছি তাও এই জিনিষ প্রতিদিন হয়ে চলেছে।

ছেলেটি এত সহজ সরল যে ওর কথাতে অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। সে যে মজা করার জন্য আমাদের এতজন মহারাজকে বোকা বানাবার জন্য মিথ্যে কথা বলবে সম্ভবই নয়, সে যে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এই কথা গুলো বলছে তাও সম্ভব নয়, কিন্তু যাই হোক, তাকে আর তার পরিবারের সবাইকে কষ্ট পেতে হয়েছিল। কিসের কষ্ট? ছেলেটি এই কষ্টটার জন্য দোষ দিচ্ছে তার নিজের বাবার অতৃপ্ত আত্মাকে। এই সব ঘটনার ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারিনা। একেবারে অবিশ্বাসও করা যায় না, আর বিশ্বাস করে রহস্য খোঁজারও কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করা উচিৎ নয়, কেননা অনেক কিছুই হতে পারে যার কোন ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। বেড়াল রাস্থা কেটে দেওয়া বা এই ধরণের অনেক সংস্কার আমাদের অনেকেই মানে। এখন এর মধ্যে কিছু কিছু জিনিষ লেগে যায় আবার অনেক কিছু খাটেনা। অনেক সময় দেখা যায় কম্প্যুটারে কিছু বাজে কাজ করতে যাচ্ছে তখন মেশিনটা খারাপ হয়ে গেল। আবার অনেকে মনে করেন যে কম্প্যুটারে কোন চিঠি লিখতে যাচ্ছেন কাউকে বা কোন কাজ করতে যাচ্ছেন তখন যদি মেশিনটা খারাপ হয়ে যায় তখন তারা মনে করেন যে ঠাকুরের হয়তো ইচ্ছে নয় আমি এই কাজটা করি। এই ধরণের মনোভাব যে সবার হবে তা নয়, বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকমের হয়।

পিতৃপুরুষদের পূজার ক্ষেত্রেও ঠিক এইটাই হয়। সবারই বাড়িতে এসে তার মৃত বাবা বা মার অতৃপ্ত এসে এই ধরণের উৎপাত করবে তা নয়। অনেক এসে বলেন যে শ্রাদ্ধ করার সময় যে ঘটিতে জল দেওয়া হয়ে সেই জল কেউ খেয়ে ঘটিটা ফাঁকা করে দিচ্ছে। আমি মানি না মানি সেটা কোন ব্যাপার নয়, কিন্তু যার সঙ্গে এই ধরণের ঘটনা ঘটে সে পুরোপুরি মানতে বাধ্য হয়ে যাচ্ছে। দেখা যায় গ্রামেই এই

জিনিষ গুলো বেশি হয়। শহরে কেউ কাউকে চেনে না। কিন্তু গ্রামে বিশেষ করে আদিবাসী প্রধান গ্রামে প্রত্যেকে প্রত্যেকে চেনে জানে। এখন গ্রামের একজনের মাথায় যদি আসে আমার বাবা রান্না করা খাবার খেয়ে চলে যাচ্ছে, কারণ সে অভুক্ত ছিল, তখন তাকে কেউ বলে দিল যে বাবাকে কষ্টি দিতে নেই, রোজ প্লেটে করে বাবার উদ্দেশ্যে একটু খাবার রেখে দিস্। এইখান থেকে শুরু হয়ে গেল পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে পূজো দেওয়া।

ধীরে ধীরে এই জিনিষটাই বিভিন্ন ভাবে রূপ নিতে থাকল। তারপরে যখন পণ্ডিতরা এতে মাথা গলালেন তখন এই ধরণের ব্যাপার গুলিকে আরও গতিশীল করে দেন। বেশির ভাগ ধর্মই, বিশেষ করে জুদাইজমের মত ধর্মগুলি এবং চীনের সমস্ত ধর্মই এই পিতৃপুরুষদের পূজার মধ্য থেকেই বিস্তার লাভ করেছিল। পিতৃপুরুষদের পূজার সবথেকে প্রকৃষ্ট নমুনা পাই তাজমহলের স্থাপত্যে। তাজমহল আসলে পিতৃপুরুষদের পূজারই একটি বিশেষ রূপ। মুসলমানরা একদিকে বলে আমরা মুর্তিপূজা করিনা কিন্তু তাজমহল অন্য কথা বলছে। একটা কবর দিয়ে রোজ সেখানে নানা রকমের ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। ভারতে এই জিনিষ কখন হয়নি, ভারতে যেটা হয়েছে তা হচ্ছে যখন তারা কোন একটা ঘটনাকে দেখেছে, যেমন তার দেখছে মাটি জন্ম দিচ্ছে ধান গম, দেখছে এই প্রকৃতির জন্যই আমরা বেঁচে আছেই। সেইখান থেকে তারা প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে সম্মান দিতে লাগল, তারপরেই তার একটা রূপ দিয়ে দিল। এখন তারা প্রকৃতির যে শক্তি তাকে একটা আকৃতি বানিয়ে নিল। প্রকৃতি থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, এই বৃষ্টির উপরেই আমাদের জীবন টিকে আছে। প্রকৃতিতে এই শক্তি বৃষ্টির একটা নাম ও রূপ তৈরী করে দিল। এই ভাবেই বৈদিক ধর্ম চলতে শুরু করেছিল। প্রকৃতি সেই শক্তির যেগুলো স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, যখন সেই শক্তিকে দেবতা বানান হয়ছে তখন সেই দেবতারা মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্যই গুলোই ঢেলে দেওয়া হয়েছে। যেমন অগ্নি দেবতা, অগ্নিতে সবাই আহুতি দেয়, অগ্নি অনেক কাজে লাগে, এখন অগ্নির যে বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যগুলিও অগ্নি দেবতার মধ্যে চাপিয়ে দেওয়া হল। এরা দেখলো যে বিদ্যুত যখন চমকায় তখন সে অনেক ঘর-বাড়ি, গাছপালা ধ্বংস করে দেয়। মেঘের ভেতর থেকে বিদ্যুত চমকায় তাই মেঘের দেবতাকে বানালেন ইন্দ্র, নাম দিলেন মঘবন। যখন ইন্দ্রকে মেগের দেবতা করে দিল তার অস্ত্র করে দিল বজ্র, যার উপরে চালাবে সেই সাথে সাথে ধ্বংস হয়ে যাবে।

বেদে যদিও ঈশ্বর এই শব্দ ব্যবহার করা হয় না আর যদিও এখানে আমরা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির আরাধনা করতে দেখছি কিন্ত বেদের যত ঋচা রয়েছে সবই সেই ঈশ্বরেকে উদ্দেশ্য করেই রচিত হয়েছে। বেদের ঋচা গুলি তিন চার ধরণের হয়। কিছু ঋচা আছে যেখানে প্রকৃতিতে যা কিছু আছে, নদী, পাহাড়, সমুদ্র এদের স্তুতি করছে, পিতৃপুরুষদের স্তুতি করে ঋচা আছে তাও নয়, ভগবানের স্তুতি করছে তাও নয়, বেশির ভাগ দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তুতি করছে। যখন পুরানে আসব তখন দেখব যে সেখানে শুধু ভগবানেরই স্তুতি করা হচ্ছে।

তারপরে আসছে বেদের অনন্তের ভাবনা। বেদে অনন্তের যে ভাবনা দেওয়া হয়েছে এটি একটি খুবই উল্লেখনীয়, এই ধরণের ভাবনা আমরা আর কোন ধর্ম শাস্ত্রে পাইনা। মানুষ যখন ভগবানের সঙ্গে বা কোন উচ্চ আধ্যাত্মিক সত্তার সাথে সম্পর্ক তৈরী করে, তখন সে কিভাবে সেই সম্পর্কটা তৈরী করে? একজন আরেকজনের সাথে বন্ধুত্ব করতে গেলে হাতে হাত মেলায়, বিয়ের সময় বর ও কনেকে কাপড়ের সাথে বেঁধে দিয়ে বলে তোমাদের জীবনকে একসাথে বেঁধে দেওয়া হল। মানুষ ভগবানের সাথে যে ভাবে নিজেকে বেঁধে নেয় সেইটাই হচ্ছে ধর্ম। যেখানে একজন ভগবানকে কোন একটা উপায়ে ধরার চেষ্টা করছে সেই উপায়টাই হচ্ছে ধর্ম। ধর্ম সব সময় মানুষই তৈরী করে। কেউ কেউ যে একাদশীর দিন উপবাস করছে, বা অন্য অন্য তিথি পার্বণে মেয়েরা উপবাস করছে, যে কোন মন্দিরে যাওয়া, মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করছে, গঙ্গা স্নান করছে, এই সবই হচ্ছে ধর্মীয় কাঠামো। এই ধর্মীয় কাঠামোর মধ্য দিয়ে মানুষ সব সময় ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক করতে চাইছে, তাঁকে ধরার চেষ্টা করছে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতায় এই ধরা ধরির চেষ্টাটা

সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। আধ্যাত্মিকতাতে মানুষ অনুভব করে যে ঈশ্বর তাঁর মধ্যেই আছে বা সে ঈশ্বরের মধ্যেই আছে। বাপ আর ছেলে যখন এক হয়ে যায় তখন আর কোন হিসেব নিকেশ থাকে না। স্বামী-স্ত্রী যখন একসাথে দীর্ঘ চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ধরে আছে, তখন তাদের মধ্যে ঐ বোধটা আসেনা যে আমি আলাদা তুমি আলাদা, এটা তোমার ওটা আমার এই মনোভাবটা চলে যায়। প্রথমের দিকে নানা রকমের ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে, এই শাড়িটা আমি বাপের বাড়ি থেকে এনেছি, এই শাড়িটা আমার শ্বশুড় বাড়ি থেকে দিয়েছ, এই ধরণের হিসাব-কিতাব চলে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রথমের দিকে নিজের সম্বন্ধে যে ধারণা থাকে সেই ধারণার মধ্য দিয়েই সে ঐশ্বরীয় সত্তাকে বোঝার চেষ্টা করে। কিন্তু একেবারে অন্তিমে যখন দেখে যে ঈশ্বর আর আমি আলাদা নই, ঈশ্বরের সঙ্গে যখন একত্ব অনুভব করে তখনই প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার জন্ম হয়। যিশু যখন জিউসদের সমালোচনা করে আক্রমণ করলেন তখন তিনি বলছেন – Your religion is of man, my religion is of my Father. সেই সময় কি অবস্থা হয়, এতদিন ধরে যা যা করে আসছিল, এতক্ষণ পূজো করতে হবে, বলি দিতে হবে, তীর্থে যেতে হবে এই সব করে করে সে ঈশ্বরকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে, কিন্তু এখানে যিশু আর ঈশ্বরকে ধরে রাখার কোন চেষ্টাই করছে না, কারণ তিনি দেখছেন – I am in my Father and my Father is in me. ঠাকুরের জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই আমরা এই একই জিনিষের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই। প্রথমের দিকে ঠাকুরের সব ধরণের সাধনাই ছিল ধর্মীয় সাধনা – এই ভাবে পূজো করতে হবে, এই ভাবে মন্ত্র পড়তে হবে, এই এই করতে হবে, এই সবই ছিল ধর্মীয় আচার পদ্ধতি অনুসারে সাধনা। কিন্তু যেদিন তিনি মায়ের দর্শন পেলেন সেইদিন থেকে তিনি সমস্ত ধরণের আচার কে ত্যাগ করে দিলেন। তিনিও দেখছেন মা তাঁর মধ্যেই আর তিনিও মায়ের মধ্যে বিরাজ করে আছেন। ধর্মসাধন আর আধ্যাত্মিকতার মধ্যে এইটাই পার্থক্য করে দেয়।

মনে করা যায় আমি এইভাবে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঈশ্বরকে ধরবার চেষ্টা করছি, তারপর করতে করতে আমি ঈশ্বরের সাথে একত্ব অনুভব করলাম। এখন অন্য একজন আমার এই প্রচেষ্টার শুরু করা, মাঝপথে সাধনা করা পরে সাধনার চরমে আত্মানুভূতি বা আমার ঈশ্বর দর্শন লাভকে দেখে অন্য একজন এই পুরো ব্যাপারটাকে তথ্যগত ও তত্ত্বগত ভাবে সাজিয়ে একটা আকার দিলেন, এই যে এটাকে একটা আকার দেওয়া হল এইটাই হয়ে গেল দর্শন। Religion is community affair, spirituality is your individual affair, philosophy is academic affair. মানে ধর্ম হচ্ছে গোষ্টিগত দিক, আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে ব্যক্তিগত দিক আর দর্শন হচ্ছে শিক্ষার দিক। মানুষ যখন যে কোন নিয়মকে মেনে একটা ধর্ম স্রোতের দিকে অগ্রসর হয় তখন প্রথমে তাকে দর্শনের সাহায্যেই তাদের বক্তব্যটাকে বুঝতে হবে। তারপর সে দর্শনের সাহায্যে বুঝে নিয়ে ধর্ম পথে যাত্রা শুরু করে। শেষে সে আধ্যাত্মিকতার অবস্থাতে পৌঁছায়। আধ্যাত্মিকতার দর্শন শাস্ত্র আগে বলে দিচ্ছে সাধক যখন ঐ স্তরে পৌঁছাবে তখন সে কি দেখবে? বলে দিচ্ছে অহং ব্রহ্মাস্মি। এই অহং ব্রহ্মাস্মি অবস্থাতে যাওয়ার জন্য যে যে পদ্ধতি আমি অনুসরণ করেছি সেটাই হচ্ছে ধর্মীয় দর্শন, আর অহং ব্রহ্মাস্মির অবস্থাতে পৌঁছে আমার যে যে ধারণা হচ্ছে সেটাই হচ্ছে আধ্যাত্মিক দর্শন।

বেদের অনন্তের ধারণা ঠিক এই ভাবে এগিয়েছে। প্রথমে সে প্রকৃতিকে নিয়ে যাত্রা শুরু করে। দেখছে আকাশে মেঘ হয়েছে, মেঘকে সে সব থেকে ক্ষমতাশালী মনে করছে। কেন মনে করছে? মেঘ থেকে বর্ষণ হচ্ছে, সেই জল থেকে মাটি সরস হচ্ছে, মাঠে ফসল হচ্ছে, এই ফসল সমস্ত প্রাণি খাদ্য রূপে আহরণ করছে। সমস্ত প্রাণীর জীবন এই মেঘের উপরেই নির্ভর করে আছে। এখন এই মেঘের যে নির্বিশেষ গুণগুলি কে নিয়ে বানিয়ে দিচ্ছে ইন্দ্র দেবতা। তারপরে অনন্তের যত গুণ থাকতে পারে সব একত্রে ইন্দ্রের উপরে আরোপ করে দিচ্ছে। কিছু দূর পর্যন্ত গিয়ে দেখছে যে ব্যাপারটা ঠিক তেমন জমছে না। অনন্তের ধারণা একটা জায়গা পর্যন্ত গিয়ে যেন আটকে যাচ্ছে। তখন সে ইন্দ্র দেবতাকে ছেড়ে দিয়ে আরেক দেবতাকে ধরল। এবার এই দেবতার ওপরেও অনন্তের সব গুণকে আরোপ করে দিল, এখানেও পরে এসে

দেখছে যে কোথায় যেন একটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তারা এটা বুঝলেন যে যার একটা নাম আছে, যার একটা রূপ আছে সে কখনই অনন্ত হতে পারেনা। শঙ্করাচার্য গীতার মচ্চিত্ত মৎপরঃ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলছেন – একটা ছেলে একটা মেয়েকে ভালোবাসে বলবে তুমিই সেই দেবী, তোমার মত আর কেউ সুন্দরী নেই, এইভাবে যত রকমের গুণ থাকতে পারে সব গুণ দিয়ে তাকে বিভূষিত করে দেবে। তারপর দেখে এরও রাগ হয়, এরও ক্রোধ হয়, এরও শরীর খারাপ হয়, এতো দেবী হতে পারেনা। তখন তার মোহ ভঙ্গ হয়ে যায়। এইভাবেই বৈদিক দর্শন বিকাশের দিকে এগিয়ে যেতে থাকল, ধর্মের আবরণ গুলো খুলতে খুলতে আধ্যাত্মিকতার বিকাশ হতে লাগল। পরের দিকে সচ্চিদানন্দেকম্, সচ্চিদানন্দই আছেন তাছাড়া আর কিছুই নেই, এই ধারণাটা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে এই দর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। কিন্তু ওনারা এক ধাক্কাতেই এখানে পৌঁছে যাননি।

ইসলাম ধর্মে যেমন প্রথমেই সোজা বলে দেয় যে 'লা ইলা ইল্লাহা' এক আল্লাই আছেন, আমাদের হিন্দু ধর্মে এভাবে বলা হয়নি। মহম্মদের ক্ষেত্রে কি হয়েছে, তিনি জিউস্ ধর্ম আর খ্রীশ্চান ধর্ম দুটোই আগে থাকতে জানতেন। কিন্তু বেদে কি হয়েছে, প্রথমে তারা প্রকৃতিকে নিয়ে তার উপরেই অনন্তের সব গুণ আরোপ করল, কিন্তু তখন দেখছে অনেক কিছু খাপ খাচ্ছে না। তখন ঐটাকে ছেড়ে দিয়ে আরেকটাকে ধরল। এইভাবে করে করে যখন শেষে বুঝল যে এক ছাড়া আর কিছু নেই, একই বহু রূপে প্রকাশিত হচ্ছে, এই ধারণটাই নিয়ে গেল নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মের ধারণাতে। এইটাকে তারপরে তার খুব সুন্দর ভাবে অভিব্যক্ত করছে – একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি। সব জিনিষই এক, ঐ যে অনন্ত আছে, সেই অনন্তের উপরে একটা একটা করে মুখোশ লাগিয়ে গেছে। একটা মুখোশ ইন্দ্র, একটা মুখোশ বরুণ। তারা কিন্তু আগে জানতেন না যে এটাই অনন্ত। তার আগে যেটা করেছিলেন তা হচ্ছে, ইন্দ্র একটা মুখোশ ধরে সেটাকে নিয়ে অনন্তের দিকে এগিয়ে গেছে। যখন দেখল ইন্দ্র হচ্ছে একটা সাকার রূপ, একে চলবে না, অনন্তে যাওয়ার আগেই হারিয়ে যাচ্ছে তখন আরেকটা মুখোশকে নিল, তারপর দেখল এটাও সাকার একেও অনন্তের সঙ্গে মেলান যাচ্ছে না। এইভাবে এক সময় তারা বুঝতে পারলেন অনন্ত সেই এক, আর এই মুখোশ গুলো সবা আলাদা, সেই অবস্থাতে তার এইটাই উপলব্ধি করলেন যে একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত। সৎ সেই এক, এখানে এই সৎ বোঝাচ্ছে সেই অনন্তকে, আর বহুধা হচ্ছে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ইত্যাদি দেবতারা।

ঠাকুরও যখন বলছেন মত আর পথ, ঠাকুরে এইখানে বেদের বাইরে নতুন কিছু বলছেন না। সব ধরণের মত যতক্ষণ হয়ে আছে, মতের অমিল থাকবেই, কিন্তু সবই সেই এক সত্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি আর আপনি কখনই এক হব না কিন্তু আমি আপনি সেই এক সচ্চিদানন্দরই প্রকাশ। মানুষ, জীব, পুরুষ হিসেবে আমি আপনি যেমন এক ঠিক তেমনি চৈতন্যস্বরূপের দিক থেকেও আমরা এক। কিন্তু ব্যক্তি সত্তা হিসেবে আমরা সবাই আলাদা আলাদা। ঠাকুর বলছেন পথ যেখানে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে গিয়ে সবাই এক, কিন্তু পথ আলাদা হতেই পারে, বিভিন্ন পথ সেই একের দিকেই নিয়ে যায়। একজন সিঁড়ি দিয়ে ছাদে যাচ্ছে, আরেকজন মই বেয়ে ছাদে উঠছে, সিঁড়ি আর মই কখনই এক হবে না। আমরা মুর্খের মত বলে বেড়াই হিন্দুও যা খ্রীশ্চানও তাই, হিন্দুও যা মুসলমানও তাই কখনই নয়। সব ধর্মই আলাদা আলাদা পথ, কোন ধর্মই অন্য ধর্মের সাথে এক নয়, কিন্তু যেটা সাধারণ তা হচ্ছে সব ধর্ম যে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে, সেই লক্ষ্যটা সব ধর্মের এক। যে কোন ধর্মের পথকে ঠিক ঠিক ধরে থাকলে সেই সচ্চিদানন্দে গিয়ে পৌঁছাবেই পৌঁছাবে। বেদে যে এত দেবতার কথা বলা হয়েছে তাই বলে ওনারা যে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে এত দেবতার জন্ম দিলেন তা নয়, তাঁরা সেই অনন্তের সন্ধানে একটা সান্ত সাকার রূপকে ধরে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেছেন। পরে দেখলেন যে সান্ত দিয়ে অনন্তকে ধরা ছোঁয়া যায় না, তখন তারা অনন্তকে দিয়েই অনন্তের সন্ধানে ডুব দিলেন। অনন্তের সন্ধানে ডুব দেওয়ার পর তাঁদের উপলব্ধি হল যে আত্মাই হচ্ছে ব্রহ্ম।

বেদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হচ্ছে একেশ্বরবাদ। বেদে যদিও একেশ্বরবাদের ধারণার পরের দিকে আসতে শুরু করেছিল, কিন্তু তার আগে আমাদের জানা দরকার যে ভয়, ভীতি আর পাপবোধ থেকে ধর্মের শুরু হয়। অনেকে ব্যঙ্গ করে বলে যে যাদের বেশি পাপ আছে তারাই ধর্ম করতে যায়। বেদেও কিন্তু এই বোধটা এসেছিল। বরুণ দেবতাকে এমন এমন সব ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, আর বরুণের নামে বলা হয় যে সব দিকে বরুণ দেবতার চরেরা ঘুরে বেড়ায়, চরেরা সব ঘুরে ঘুরে খবর রাখে কে কি খারাপ কাজ করছে, পাপ কাজ করছে। সেইজন্য বয়োজেষ্ঠ্যরা সবাইকে সাবধানে থাকতে বলতেন। এটাই হচ্ছে ভয় দেখিয়ে ধর্ম করতে বলা। কিন্তু যে কারণেই হোক ঋষিরা এই বোধটাকে খারাপ বলে একেবারেই বাতিল করে দিলেন।

প্রায়ই দেখা যায় যখন অন্ধকারে হয়তো কোথাও যাচ্ছি, হঠাৎ সেই অন্ধকারে কোন কিছুর উপস্থিতি অনুভব করলাম, আর বুঝতে পারছি যে সে আমারই দিকে এগিয়ে আসছে, তখন মনের মধ্যে নানান ধরণের চিন্তা উঠতে শুরু করে দেবে। আর তখন কি কি হতে পারে এই ধরণের সম্ভবনা গুলিকে সরিয়ে দেওয়া হতে থাকে। যেমন প্রথমে আমি বলব এটাতো কুকুর নয় কারণ এটা দু পায়ে আসছে। তখন মস্তিষ্ক এত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে থাকে সেই সময় দ্রুততার সাথে যা যা সম্ভবনা হতে থাকে সেই সম্ভবনা গুলোকে বাতিল করা হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত চারটি কি পাঁচটা সম্ভবনাতে গিয়ে দাঁড়ায়। সেই পাঁচটা থেকে তারপর একটাতে গিয়ে দাঁড়ায়। অন্তিমে যখন বাস্তবতার সম্মুখীন হয় তখন হয় বাস্তবের সাথে ঐ একটি সম্ভবনা মিলে যাতে পারে হয়তো নাও মিলতে পারে। যদি বাস্তবের সঙ্গে ঐ সম্ভবনাটি না মেলে তাহলে বুঝতে হবে যে ঐ সম্ভবনাকে আপনি ঠিক বিবেচনা করেননি। এই পদ্ধতিটাই হচ্ছে নেতি নেতি।

আমরা সবাই কিন্তু সারাদিন সব সময় অজান্তে নেতি নেতি অনুশীলন করি। এইটা খুবই আশ্চর্যের যে অদ্বৈত বেদান্ত যে বলছে এটা নয়, এটা নয় এই জিনিষটাই আমরা সারাদিন ধরে করে চলি। কিন্তু এই ব্যাপারে আমরা কখনই সচেতন নই। ছোটবেলা আমাদের যখন অঙ্ক শেখানো হয় তখন বলা হয় দুই যোগ দুই চার। আমরা মনে করি এটাই নিশ্চিত উত্তর, কিন্তু তা নয়। আসলে এটা non-negativity, বাচ্চা বয়সে যখন অঙ্ক শেখানো হয় তখন বলে দুই যোগ দুই এক হবে না, দুই যোগ দুই পাঁচ হবে না, এই ভাবে নানান রকমের non-negativity থেকে সরিয়ে সরিয়ে একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড় করান হয়। আর যত রকমের জ্ঞান হয়, জানা হয় সব সময় তা এই non-negativity পদ্ধতিকে অনুসরণ করেই হয়। non-negativity,পদ্ধতি হচ্ছে যেটা নয় সেটাকে বাতিল করে করে আসলটাকে ধরা – একটা জিনিষ সামনে এসেছে, তখন তাকে প্রথমে বলবে এটা এই জিনিষটা নয়, এটা নয়, শেষে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে non-negativity সেটাকে আর বাতিল করা যায় না। শার্লক হোমস্ তার সহকারী ওয়াটসনকে একটা জায়গায় বলছে – যখন তুমি যে জিনিষগুলো সম্ভব নয় সেই জিনিষগুলিকে বাদ দিয়ে দিয়ে যেটা থাকল সেটা যতই অসম্ভব বলে মনে হোক না কেন সেটাই হচ্ছে একমাত্র সত্য। ফিজিক্সও ঠিক এই থিয়োরিটাই অনুসরণ করে। ফিজিক্সেও এরা প্রথমে যে থিয়োরি গুলো সম্ভব নয় সেইগুলো বাদ দিয়ে যখন শেষ দেখলো তিনটে থিয়োরিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তখন তারা এই তিনটে থিয়োরিকেই রেখে দেয়। পরে যখন অন্যান্য তথ্য আসতে থাকল তখন সেই তথ্যের ভিত্তিতে একটা থিয়োরি বাদ চলে যাবে। তখনও যদি দেখে কোথাও কিছু অমিল ঠেকছে তখন তারা intuition এর সাহায্য নেয়, আমার মন বলছে এইটা হবে। কেমেস্ট্রি, বায়োলজিতে বেশি থিয়োরি থাকে না, এদের কয়েকটা ডাটাকে নিয়েই থিয়োরি দাঁড়িয়ে যায়, কিন্তু বিজ্ঞানের মূল যে থিয়োরি গুলি আসা যাওয়া করে সেটা ফিজিক্সের ক্ষেত্রেই করে। সেইজন্যই এর নামই হচ্ছে Theoretical Physics। এরা সংশয় হলে এইভাবে এগিয়ে গিয়ে যখন কোন থিয়োরিকে ধরবে তখন তারা বলবে আমার মন বলছে এইটাই হবে। কয়েক ক্ষেত্রে দেখা গেছে দুটো তিনটে থিয়োরি এসে গেছে, এই তিনটে থিয়োরিকে নিয়ে নামকরা বিজ্ঞানীরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে তুমুল বাগবিতণ্ডা লাগিয়ে দেবে, যেমন অদ্বৈত আর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর মধ্যে বিতর্ক হয়। তারপর এরা বসে থাকবে কোথাও

থেকে যদি কোন ডাটা আসে। আইনস্টাইনের নিজের Theory of Relativity, যার থেকে আরেকটা নতুন থিয়োরির জন্ম নিল, তিনি নিজে সেই থিয়োরিকে বাতিল করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। অন্যান্য বিজ্ঞানীরা আইনস্টাইনের কাণ্ড দেখে হাসছেন – আপনার থিয়োরিকে ভিত্তি করে আজকে আণবিক বোমা বেরিয়ে গেছে। কিন্তু আইনস্টাইন কিছুতেই মানবেন না, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সেই থিয়োরি থেকে একটা নতুন কিছু আবিষ্কার হয়ে গেল, তখন আইনস্টাইনের পক্ষে সেই থিয়োরিকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। তিনি নিজেও জীবনের শেষের দিকে বলেছিলেন – এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। কিন্তু তিনি যদি বেদান্তের এই নেতি নেতিকে, মানে এটা নয়, এটা নয়, এই পদ্ধতিকে অনুসরণ করতেন, তাহলে তাঁর এই সমস্যা হতো না।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এই ধরণের জিনিষই প্রতিনিয়ত হচ্ছে। একটা কোন খবর এলেই আমরাও এটা হতে পারে না, এটা নয় এই করে করে যত তাড়াতাড়ি আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারাটাই হচ্ছে নেতিবাচক সম্ভবনাকে বাতিল করা। কার কত বড় মস্তিষ্ক এইখানেই ধরা পড়ে। It is the power of brain canceling out the negative, আমাদের পূর্বজরা ঠিক এই জন্যই ভয়ের আর পাপের ধারণাকে একটা সময় নিয়ে এসেছিলেন যেখানে বলা হয়েছিল একজন মানুষ ভয় ও পাপবোধের জন্য ঈশ্বরে ভক্তি করবে। কিন্তু তারপরেই এই ধারণটাকে দূর করে দিলেন, ভয় আর পাপবোধ নিয়ে ভগবানকে কখনই ঠিক ঠিক ভক্তি করা যায় না। যদিও ঋকবেদে বরুণ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র পাই যেখানে বলা হচ্ছে বরুণ দেবতার চরেদের ভয়ে সবাই কাঁপছে, কেন কাঁপছে? বরুণ দেবতার চরের সর্বত্র ছড়িয়ে সবার সব কিছুর উপরে নজর রাখছে।

আমরাও মনে করি যে ভগবান সব কিছু দেখতে পান, আমরা লুকিয়ে চুরিয়ে যা কিছু খারাপ কাজ করি না কেন ভগবানের দৃষ্টিকে এড়িয়ে কিছুই করতে পারব না। একবার এক ভদ্রমহিলা দীক্ষার পর এক মহারাজকে জিজ্ঞেস করছেন ‘মহারাজ আমি একটা বিরাট সমস্যায় পড়েছি। আমি যখন শাড়ি পাল্টাই তখন ঘরেতো ঠাকুরের ছবি লাগানো আছে, তাই কি করে ঠাকুরের ছবির সামনে শাড়ি পাল্টাবো’? মহারাজ তখন ভদ্রমহিলাকে বলছেন ‘কেন, আপনি যখন বাথরুমে স্নান করেন তখন কি শাড়ি পড়েই স্নান করেন? সেখানে কি ঠাকুর নেই’! ভদ্রমহিলা সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠেছেন ‘এই ব্যাপারটা তো কখন ভেবে দেখিনি’। মজার ব্যাপার হচ্ছে খ্রীশ্চান নান যারা হন তাঁরা কখনই স্নানের সময় বাথরুমে জামা কাপড় ছাড়েন না। নানদের মনের মধ্যে বদ্ধ হয়ে আছে যে যিশুর চোখ তাদের দিকে রয়েছে। সেইজন্য ওরা বাথরুমেও কাপাড় ছাড়ে না। কিন্তু এনারা একবারও ভাবলেন না যে যিশুর মনে যদি ইচ্ছে হয় তোমাকে যে কোন অবস্থাতে দেখেন, তাহলে কি তাঁর সেই ক্ষমতা নেই যে তোমাকে যে কোন অবস্থাতে দেখে নিতে পারবেন না। এগুলো হচ্ছে মুর্খামি। একটা মানুষ না খেয়ে মরে গেল, একটা মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা গেল, তখন বলবে সব ঠাকুরের ইচ্ছাতে হয়েছে। মদ খেয়ে পুরো মত্ত হয়ে অন্ধকার রাত্রে ফুল স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছে, বলে ভগবানই নাকি গাড়ি চালাচ্ছেন, তারপর দুর্ঘটনাতে প্রাণটা চলে গেল তখন বলবে ভগবানের ইচ্ছাতেই মরেছে। এগুলো একেবারেই ধর্মও নয় ঈশ্বরে বিশ্বাসও নয়। মানুষকে ঠকানোর জন্য এই সব ধাপ্পা মার্কা কথা বলতে হয়। গলা টিপে একটা শিশুকে হত্যা করছে সে হচ্ছে খুনি আবার আরেকটি শিশু অযত্নে অবহেলায় মারা যাচ্ছে তখন সেটাকেও নিয়ে যাচ্ছে ভগবানের ইচ্ছাতে, ভগবানকে কত বড় খুনি বানিয়ে দিচ্ছে এই ধরণের ধার্মিক লোকেরা। এইটাই হচ্ছে ধর্ম আর আধ্যাত্মিকতার তফাৎ। যখন মানুষ মানুষকে ঠকাতে চাইবে তখন ধর্ম তাকে অনেক সুযোগ সামনে যোগান দেয়। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা মানুষকে কখনই খারাপ কর্মের সুযোগ করে দেয় না। আমি ঘরে ঠাকুরের ছবি রেখেছি, ঠাকুর এই ঘরের মধ্যে সব কিছু দেখছেন তাই এই ঘরে আমি খারাপ কিছু করব না, এই ধরণের কথা যারা বলে তারা সত্যি সত্যি বোকা, আহাম্মক কিংবা ধাপ্পাবাজ। কিন্তু শাস্ত্র যখন বলে দিচ্ছে, এটা ভুল কাজ, এটা ঠিক কাজ, শাস্ত্র যদি বলে

থাকে ঠাকুরের ছবি দেখে তুমি কখন অন্যায় কাজ বন্ধ কর, সেটাকে কেউ না করছে না, তাহলে সেই বাক্যকে অন্য জায়গাতেও মানা উচিৎ।

আমাদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের নজর সব সময় সব জায়গাতে আছে। বেদের এই একটা ধারণা যখন এসেছে বরুণের চর তোমাকে লক্ষ্য রাখছে, আবার তাদেরই মনে পরে যখন অনুভব হল এই ধারণাটা ঠিক নয় তক্ষুনি ভয় এবং পাপবোধের ধারণাকে পরিত্যাগ করে দিলেন। কিন্তু পরবর্তি কালে খ্রীশ্চান ধর্ম এই পাপ বোধের ধারণার উপরেই বেশি জোর দিল। এই পাপ বোধের ধারণাকে যদি খ্রীশ্চান ধর্ম থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে খ্রীশ্চান ধর্মের আর কোন অস্তিত্বই থাকবে না। যখন কোন পাপ খঁজে পায়না তখন এরা সেই প্রথম পাপকে নিয়েই পড়ে থাকবে। প্রথম পাপ হচ্ছে আদম আর ইভের পরস্পরের প্রতি যে আকর্ষণ জন্ম নিয়েছিল, সেই থেকে মানবজাতির সৃষ্টি হয়েছে, সেই আদি পাপ এখন আমাদের কাঁধে চেপে গেছে। যিশুকে ক্রুসিফাই করার পুরো দোষটা খ্রীশ্চানরা জিউসদের উপরে চাপিয়ে দিয়ে দু হাজার বছর ধরে কোটি কোটি জিউসদের খুন করে যাচ্ছে। এদের ধর্মের প্রধান প্রবক্তারও এই খুনের সমর্থন করে যাচ্ছে। যার জন্যে হিটলার লক্ষ লক্ষ ইহুদিদের গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে হত্যা করে দিল। কিন্তু আজকে যে মাদার মেরীকে খ্রীশ্চানরা পূজা করছে তিনি নিজেও ইহুদী ছিলেন, তারা ভুলে গেলেন যে যিশুও ইহুদি ছিলেন, তাঁর বাবা, ভাই, সবাই ছিলেন ইহুদী। কেন তারা এই কাণ্ডটা করল? এর একমাত্র কারণ হচ্ছে এই পাপবোধ। ঠাকুর বলছেন – যে শালা পাপ পাপ করে সেই পাপী হয়। তাই আমাদের হিন্দুদের মধ্যে কখনই পাপবোধ কে প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি, ভগবানকে ভয় থেকে পূজা করাকে কখনই হিন্দুরা সমর্থন করে না। হিন্দুদের কাছে ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্ক হচ্ছে একমাত্র ভালোবাসা। উচ্চ অবস্থা হচ্ছে ভগবানের জন্য হৃদয়ের সর্বস্ব ভালোবাসাকে উজাড় করে দেওয়া আর তার উপরে উচ্চতম অবস্থা হচ্ছে আত্মজ্ঞান। স্বামীজী বারবার বলেছেন যে জগতে পাপ বলে কিছু নেই, যা হয়েছে সেটা ভুল হয়ে গেছে।

মহাভারতে একটা কাহিনী আছে বিশ্বামিত্র এত বড় ঋষি সে চণ্ডালের বাড়িতে গিয়ে মরা কুকুরের মাংস চুরি করছে। চণ্ডাল বলছে – কে হে তুমি, যে চণ্ডাল অস্পৃশ্য, কুকুর তার থেকে আরও অস্পৃশ্য, তাও আবার মরা কুকুর একেবারেই অস্পৃশ্য, তার আবার পেছনের অংশকে তুমি চুরি করতে যাচ্ছ? মানে সব দিক থেকেই যেটা জঘন্যতম সেটাকেই আবার তুমি চুরি করতে এসেছ? বিশ্বামিত্র যদি এখন বলেন আমার কাছে এই শরীরই হচ্ছে প্রধান, তাহলে যে মানুষ ক্ষুধার্ত হয়ে চুরি করে সেই মানুষকে কি আমি পাপী বলব? ধর্মের পরাকাষ্টায় মহাভারত এটাকে কিভাবে দেখছে? মহাভারতে এটাকে পাপ বলে কখনই দেখছে না, এটা একটা ভ্রান্তি। কিসের ভ্রান্তি? এই ভুলটা হচ্ছে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। এখন আমাদের লক্ষ্যটা কি, আমরা কোন লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি? আমি যদি পরিষ্কার করে বলি আমার লক্ষ্য হচ্ছে আত্মজ্ঞান, আমি সত্যি সত্যি জানি যে আমার লক্ষ্য হচ্ছে ঈশ্বর দর্শন। সমস্যা হচ্ছে যে আমরা কেউই সৎ নই। গীতাতে ভগবান বলছেন – *চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহর্জুন। আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতবর্ষভ।।* চার রকমের মানুষ আমাকে ভজনা করে, তারা কারা কারা? আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু আর জ্ঞানী। এই তিন ধরণের মানুষের দেখা পেলেও পাওয়া যেতে পারে কিন্তু সত্যিকারের চতুর্থ ধরণের মানুষ পাওয়া যাবে না, যে চুর করে বলতে পারে যে আমি চুরি করেছি, মিথ্যে কথা বলে বলতে পারে আমি মিথ্যে কথা বলি, চরিত্র যদি খারাপ থাকে অথচ বলতে পারে আমার চরিত্র ভালো নয়, কিন্তু আমার পথ হচ্ছে মুক্তির পথ, আমি জানি আমি যদি এগুলো না করি তাহলে আমার শরীর বিধ্বস্ত হয়ে যেত, আমার যাত্রা এখানেই শেষ হয়ে যাবে।

মহাভারতে বিভিন্ন কাহিনীর মধ্যে দিয়ে এই মূল্যবোধগুলিকে খুব সুন্দর ভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে। এক ঋষি দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে একটা জনপদের মধ্য দিয়ে এক রাজার কাছে যাচ্ছেন। রাজার ওখানে গেলে কিছু অর্থ পাওয়া যাবে এই উদ্দেশ্যে চলেছেন। যেতে যেতে পথে তার প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে।

তিনি চলতে পারছেন না, খুব কষ্ট করে শরীরটাকে টেনে টেনে চলেছেন। একটা জায়গায় গিয়ে এক মাহুতের সঙ্গে রাস্থায় দেখা হয়েছে। মাহুত ভেজান ছোলা খাচ্ছে। ঋষি গিয়ে মাহুতকে বলছে – ভাই তুমি যে ছোলা খাচ্ছ ওখান থেকে আমাকেও দুটো ছোলা দাও। মাহুত বলছে – হুজুর, আমি নিচু জাত, আর এটা আমার মুখের এঁটো, আমি কি করে আপনাকে আমার মুখের এঁটো দিতে পারি। ঋষি বলছেন – না, আমাকে তাই দাও, আমার শরীর রক্ষার জন্য তাই খেতে হবে। তারপর সেই মাহুত তাকে তার এঁটো জলটা এগিয়ে দিয়েছে। ঋষি তখন বলছেন – আমিতো এই জল খেতে পারিনা, এটা তোমার মুখের জল। মাহুত অবাক হয়ে বলছে – এই মাত্র আপনি আমার এঁটো ছোলা খেয়ে নিলেন, তাহলে জল কেন পান করবেন না। ঋষি তখন বলছেন – আমার খাবার কিছু ছিল না বলে তোমার এঁটোটা খেলাম, জলতো পাওয়া যাচ্ছে, তাই কেন তোমার মুখের এঁটো জল খেতে যাব। এই ঘটনাকে আমরা যদি কোন খ্রীশ্চান, কোন মুসলিমের কাছে বা অন্য কোন ধর্মের লোকের কাছে, যে কোন যুক্তিবাদীর কাছে নিয়ে যান, সবাই বলবে এই হিন্দুরা হচ্ছে প্রচণ্ড ধাপ্পবাজ, এদের নিজেদের পছন্দমত সুবিধামত মূল্যবোধ বানিয়ে রেখেছে। কখনই না, এটাই হচ্ছে সত্যিকারের মূল্যবোধের পরিচয়। এই মূল্যবোধটাকেই ঠিক ঠিক বুঝে নিতে হবে যে ঋষি যেটা করেছেন এটা তিনি ঠিকই করেছেন। আমার লক্ষ্য হচ্ছে মুক্তি। এই লক্ষ্যে যদি আমি এই শরীরে না পৌঁছাতে পারি, আমার মৃত্যুর সময় মনের মধ্যে কোন্ ধরণের চিন্তা ভাবনা আসবে আর যেদিন মরব তখন সেই চিন্তার ফলে আমি বেড়াল হয়ে কুকুর হয়ে কোন যোনিতে চলে যাব, কত জন্ম পিছিয়ে পড়ব কোন ঠিক নেই। একজন সন্ন্যাসী মরে গিয়ে যদি আবার সন্ন্যাসী হয়, সে সন্ন্যাসী হয়ে আবার সাধনাই করতে থাকল, এইভাবে আরও দু চার জন্ম লেগে গেল তাতে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু সন্ন্যাসীর মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত তার পেছনে যে কর্মের পোটলাটা বাঁধা রয়েছে সেখান থেকে কোন কর্ম সংস্কার মরার সময় প্রবল হয়ে সন্ন্যাসীকে হয়ত বেড়াল বানিয়ে দিল। তারপর সে এই বাড়ি থেকে মাছ চুরি করে খাচ্ছে, ঐ বাড়িতে দুধ চুরে করে খাচ্ছে, তখন আবার নতুন করে অনেক কর্মের বোঝা তার ঘাড়ে চেপে গেল। তখন এক জন্মে যেটা হয়ে যেত সেটাই পূর্ণ করতে হয়তো চার হাজার জন্ম লেগে যাবে। সেইজন্য আমার মুক্তি এই শরীর থাকতে থাকতে এই জন্মেই যত তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় তার জন্যই আমাকে বেশি নজর দিতে হবে। সব সময় সতর্ক থাকতে হবে যেন কোন ধরণের দুর্ঘটনার মধ্যে পড়ে নিম্ন যোনিতে না চলে যাই। এই ব্যাপারে আমাকে সব সময় নিশ্চিত থাকতে হবে। আমি এখন অভুক্ত, আমার মাথায় এখন খালি খাওয়া আর খাদ্যের চিন্তাই কিলবিল করছে। যে মানুষ ক্ষুধা নিয়ে মরবে, মৃত্যুর সময় যা চিন্তা করে মরবে সে সেই রকম যোনিতে জন্মাবে, এখন ক্ষুধা নিয়ে মরলে মরার পর সে তো ইঁদুর হয়ে জন্মাবে। তাই ঋষি যদি এঁটো খেয়ে থাকে তাতে কি ভুল করেছে? একেবারে ঠিক কাজই করেছে।

যখন মুসলমানরা ভারতে হিন্দুদের ধরে ধরে ধর্মান্তর করছিল তখন যারা সৎ ব্রাহ্মণ ছিল, যারা মুসলিম ধর্ম কিছুতেই গ্রহণ করবে না, তখন মুসলমানরা বলছে হয় তুমি মুসলমান হও না হও তো তোমার গর্দান যাবে। সেই ব্রাহ্মণ বলছে তুমি আমার গর্দান নিয়ে নাও, আমি মুসলমান হব না। মোঘল আমলে এইভাবে লক্ষ লক্ষ হিন্দুদের হত্যা করা হয়েছিল। এরা নিজেদের ধর্মের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত, উচ্চ মূল্যবোধের জন্য আমি সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে পারি এই শরীরতো অতি তুচ্ছ, তুমি আমার জীবন নিয়ে নাও। এটা হচ্ছে একটা আলাদা বিষয়। কিন্তু মনের কোন চাহিদা নিয়ে যদি কেউ মরে তাহলে কিন্তু মুশকিল হয়ে যাবে।

একটি পুরুষ একটি মেয়েকে ভালোবাসে। সেই মেয়েটিকে সে পেলো না বলে ভাবছে আমার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল, তারপরেই আত্মহননের পথ বেছে নিল। সে না পাবে এই জীবন ফিরে, না পাবে আর কোন মনুষ্য জন্ম। কোথায় কত লক্ষ লক্ষ বছর পরে থাকবে কেউ বলতে পারবে না। হিন্দু ধর্মের এই যে একটা সঙ্গতিপূর্ণ পথ, যে পথ ধরে এগিয়ে গেলে মুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে, এখানে কোন পাপ বোধ, ভয় বোধ, অপরাধ বোধ কাজ করে না, ভ্রান্তি আসবে, সেই ভ্রান্তিকে দূর করবার জন্য তোমাকে সুযোগ

দেওয়া হবে, কিন্তু কোন ভাবেই লক্ষ্য থেকে দৃষ্টিটাকে সরিয়ে নিও না। সেইজন্য সেমেটিক ধর্মে পাপবোধ, ভয়বোধের খুঁটিকে আকড়ে থাকার জন্য অনেক সমস্যা এসে যায়। ভয় আর পাপ এদেরকে নাচিয়ে যাচ্ছে।

হিন্দুরাও যে এই জিনিষকে নিয়ে নাড়াচাড়া করেনি তা নয়, তাদের মধ্যেও এই ধরণের ভাবনা চিন্তাগুলি এসেছিল। কিন্তু আগে যেটা বলা হয়েছিল নেতে নেতি, একটা আইডিয়া মাথায় এলো তখন সেটাকে তারা এই নেতি নেতি করে দেখে বাতিল করে দেবে। কিছুক্ষণের জন্য একটা আলো নাচছে, তারপর দেখলে যে এটা একটা কাঁচের টুকরো, যেই দেখলো এটা কাঁচ সেই মুহূর্তে ওটাকে ফেলে দিয়ে এগিয়ে যাবে। বেদ বেদান্তে এই একই পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। খুব দ্রুততার সাথে এনারা নেতি নেতি কর বেরিয়ে এসেছে। এক আধটা কথাতে বোঝা যায় যে এই ধরণের একটা আইডিয়া হিন্দু ধর্মের কোথাও কোথাও এক সময়ে ছিল। মানে হচ্ছে, যখনই কোন নতুন একটা আইডিয়াকে তারা নিয়েছিলেন সেটার ওপরে খুব গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করে আইডিয়াটাকে বিচার করলেন। তারপর দেখলেন এই আইডিয়াতে তাদের লক্ষ্য থেকে সরিয়ে দিচ্ছে তক্ষুণি হিন্দুরা এগুলি খুব দৃঢ়তার সাথে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। সেইজন্য সাধারণ মানুষের যেসব ধর্ম ভাবনা ভারতে দেখা যায় তার প্রত্যেকটিই হচ্ছে স্পষ্ট ও দৃঢ়, আমাদের নতুন করে বাজিয়ে দেখার দরকার পড়ে না। মাধ্বাচার্যের যে অনন্ত নরকের আইডিয়া আমরা পাই, এই আইডিয়াটা এসেছিল মুসলমান আর খ্রীশ্চানদের সঙ্গে পরস্পরের মেলামেশা ও ভাবনা চিন্তার আদান প্রদান থেকে। হিন্দু ধর্মের আর কোন শাখাতে মাধ্বাচার্যের এই অনন্ত নরকের আইডিয়াকে পাওয়া যাবে না। হিন্দুরাও মাধ্বাচার্যের এই আইডিয়াটাকে বাজিয়ে দেখেছিল, দেখেই এটাকে নেতি নেত করে ছেড়ে দিয়েছে। মজার ব্যাপার হল, হিন্দুরা নেতি নেতি পদ্ধতিতে যে জিনিষগুলিকে ফেলে দিয়েছে অন্যান্য ধর্ম সেইগুলিকেই কুড়িয়ে নিয়ে তাদের ধর্মের প্রধান একটা পদ্ধতি বানিয়ে নিল।

আমরা সব কিছুর পেছনে একজন স্রষ্টাকে খুঁজি। এই বোতলটা আছে, কেউ একে সৃষ্টি করেছে, আমি এখানে আছি, আমার বাবা-মা আমাকে সৃষ্টি করেছেন। স্বাভাবিক ভাবে এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে এরও একজন স্রষ্টা আছেন। হিন্দু মনেও এই সৃষ্টির পেছনে যিনি স্রষ্টা রয়েছেন, তাঁর অনুসন্ধানের ইচ্ছা জেগেছিল। তারপর তারা বাইরের দিকে খুঁজতে আরম্ভ করল, কিন্তু তারপরে দেখলে এইটা কখন জানা যায় না। তারপর তারা ভেতরের দিকে মানে অন্তর্জগতের দিকে নজর দিল, তখন বুঝলো, যে প্রশ্নের উত্তর পেতে তারা বাইরের দিকে ছোটাছুটি করেছিল সেই প্রশ্নের উত্তর তার নিজের অন্তরের মধ্য থেকেই পাওয়া যেতে পারে।

মনে করা যাক একটা ঘর আছে, আর সেই ঘরে সমস্ত রকমের অলঙ্কার রাখা আছে। এখন মনে করা যাক একটা ছোট্ট পিঁপড়ের মধ্যে মানুষের চৈতন্য দেওয়া হয়েছে, সেই ছোট্ট পিঁপড়েটা দেখতে শুরু করল এই ঘরে কি আছে, এখন একটা ছোট্ট নাকছাবি হাতে নিল তারপরেই একটা নেকলেস নিল, এখন এই দুটোকে যদি সে মেলাতে যায় তখন কিছুতেই মেলাতে পারব না। তারপরে ঘরে যত অলঙ্কার আছে সব কটাকে সে ছোট থেকে বড় একটা তালিকা বানাতে শুরু করছে তখন দেখছে একেকটা একেক রকমের বাহারের, একেক রকমের আকারের। পিঁপড়েটা অবাক হয়ে ভাবছে এগুলো কি। এইভাবে বস্তুর রহস্য সে কোন দিনই খুঁজে পাবে না। কিন্তু এদের উপাদানকে যদি সে জানতে পারে তাহলে দেখবে এই সব কিছুর উপাদান হচ্ছে সোনা। যদি সোনা কি জিনিষ একবার সে জেনে যায় তাহলে এই ঘররের যত অলঙ্কার আছে সব কটা বস্তুকেই সে জেনে যাবে। এখন পিঁপড়ে তার মনুষ্য চৈতন্য নিয়ে জানতে চেষ্টা করল সোনা কি বস্তু। একটা সময়ে সে সোনাকে জেনে নিল, বুঝে নিল এই যত অলঙ্কার আছে এগুলি যদি এক সঙ্গে গলিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সবই সোনা হয়ে যাবে। সোনার জড় উপাদান, রাসায়নিক উপাদান তার জানা হয়ে গেল, এখন এই সোনা থেকে সব ধরণের এই অলঙ্কার তৈরী করা যাবে। অলঙ্কারের বিভিন্ন আকার দেখে এখন আর সে অবাক হয়ে যাবে না, কারণ অলঙ্কারের রহস্য তার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেছে। ধর্মের ক্ষেত্রেও ঠিক এই ব্যাপারটাই হয়েছে। যখন তাঁরা এই বহির্জগতের সমস্ত নক্ষত্র, গ্রহ, তারাপুঞ্জ সব দেখছে

তখন তারা এর সৃষ্টি কর্তার অনুসন্ধান শুরু করল। অনেক ধরণের তত্ত্ব তাদের সামনে এল এই অনুসন্ধানের ফলে কিন্তু কোন সদুত্তর তারা পেলেন না। শেষে তারা ঠিক করলেন অন্তর্জগতে এই অনুসন্ধান করা যাক। যখনই তাঁরা অন্তর্জগতে অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন তখন এই জগতের সমস্ত রহস্য তাঁদের উন্মোচন হতে থাকল, বস্তুর উপাদানকে তারা পেয়ে গেলেন। এইটাকে জেনে নিয়েই তারা সন্তুষ্ট হয়ে গেল, এতেই তাদের সমস্ত কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। আমরা এখন সবাই জানি এই ব্রহ্মাণ্ড কি উপাদান দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে। এখন যদি কেউ তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করতে যায় – আপনি কি জানেন এই সৃষ্টি কি ভাবে হয়েছে? তাদের উত্তর দিতে বয়ে গেছে, তারা বলবেন এই ব্যাপারে তাদের কোন আগ্রহ নেই, আমি জেনে গেছি কি দিয়ে এই সৃষ্টি হয়েছে। যে অলঙ্কার গুলিকে নিয়ে তুমি এতো লাফালাফি করছ এগুলো সোনা ছাড়া আর কিছু নয়, এখন সোনা থেকে কিভাবে অলঙ্কার তৈরী করা হয়েছে সেটা জানার ব্যাপারে আমার কোন মাথা ব্যাথা নেই। হৃদয়রাম আর ঠাকুর কলকাতার রাস্থা দিয়ে যাচ্ছেন, হৃদয়রাম লাট সাহেবের বাড়ি দেখিয়ে বলছে – মামা এটা হচ্ছে লাট সাহেবের বাড়ি। ঠাকুর বলছেন – মা আমাকে দেখিয়ে দিলেন এটা একটা ইটের ঢিপি। তাহলে এটা কি লাট সাহেবের বাড়ি নয়, নিশ্চয়ই লাট সাহেবের বাড়ি, আমার আপনার মত সাধারণ মানুষের কাছে। আগামীকাল যদি কলকাতায় একটা বিশাল ভূমিকম্প হয়ে যায় তাহলে লাট সাহেবের বাড়ির যা দশা হবে তার পাশে একটা বস্তিরও সেই একই দশা হবে। দুটোই একটা ইটের ঢিপিতে পর্যবসিত হয়ে যাবে।

সেইজন্য বৈদিক ঋষিরা বহির্জগতের দিকে অনুসন্ধান বন্ধ করে অন্তর্জগতের দিকে দৃষ্টি দিলেন। তাই উপনিষদ বলছে – কশ্চিদ ধীরঃ প্রত্যগাত্মা – তুমি যদি অমৃতের সন্ধান পেতে চাও, তুমি যদি সমস্ত কিছুর রহস্যকে জানতে চাও তাহলে আবৃত্ত চক্ষুঃ, মানে চোখটাকে ঢেকে দিতে হবে, এখানে চোখ ঢাকা দেওয়া বলতে বোঝাচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে ঢেকে দেওয়া। যে ইন্দ্রিয় আমাদের চেতনাকে বার বার বাইরের দিকে টেনে নিয়ে আসছে সেই ইন্দ্রিয়ের উপরে কর্তৃত্ব করা। ঠাকুরের কথামৃতে আছে ঠাকুরের একবার খুব ইচ্ছে হয়েছে মাইক্রোস্কোপ জিনিষটা কি। কিন্তু মাইক্রোস্কোপ যখন ঠাকুরের কাছে নিয়ে আসা হল তখন তাঁর আর দেখা হল না। ভেতর থেকে মনটাকে বাইরে নিয়ে এসে যে মাইক্রোস্কোপ দেবেন সেই ইচ্ছেই আর হল না। আবার একদিন মাস্টারমশাই মাটিতে এঁকে এঁকে ঠাকুরকে বোঝাচ্ছেন চন্দ্র গ্রহণ আর সূর্য গ্রহণ কিভাবে হয়। কিন্তু ঠাকুর একটু দেখেই তাঁর মনটা হারিয়ে গেছে, বলছেন আমার মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। কারণ তিনি সব কিছুর রহস্য বুঝে গেছেন। তিনি কি সূর্য গ্রহণ চন্দ্র গ্রহণের রহস্য জেনে গেছেন? মোটেই নয়। তিনি বুঝে গেছেন যে এই জগতের রহস্যের সমাধান সূর্য গ্রহণ আর চন্দ্র গ্রহণকে জেনে হবে না। এগুলোকে জানার দরকার অবশ্যই আছে, যাদের দরকার আছে তাদের কাছে থাকুক, কিন্তু আমরা এখানে আরও বৃহৎ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি।

আমরা এর আগে যে ফিজিক্সের cyclic creation এর থিয়োরির কথা বলেছি, সেই থিয়োরির সাথে আমাদের পৌরানিক সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে অনেক মিল আছে। আমরা যে বারবার বলছি বৈদিক ঋষিরা জগতের রহস্যকে ধরতে পেরেছিলেন, কি সেই রহস্য? একটা অবস্থার পর এই সৃষ্টির রহস্যকে জানা যায় না, এইটাকেই ওনারা ধরতে পেরেছিলেন। কোন অবস্থার পর? সেই বৃহৎকে জানার পর। এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের একটা পরিমাপ তাঁরা দিয়েছে আর তা আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণার সাথে অনেক মিলে যাচ্ছে। আমরা বলতে চাইছি না যে হিন্দু ধর্ম আর বিজ্ঞান এক কথা বলছে। হিন্দু ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের ধারণার মিল বার করা উদ্দেশ্যও এখানে নেই। কিন্তু এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডকে যখন তারা ধরে নিলেন তখন এটাও বুঝতে পারলেন যে এর পরে যে সীমারেখা আছে তাকে কখনই অতিক্রম করা যাবে না। হিন্দু ধর্মের ঋষিরা যে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা আমাদের দিয়েছেন বিজ্ঞান এখনও তার ধারে কাছেই যায়নি, তার আবার সীমারেখাকে ধরাতো অনেক দূরের কথা। এই সীমার বাইরে কি আছে জানতে চাইলে তুমি কখনই এর উত্তর জানতে পারবে না, কিন্তু যদি তুমি এর উত্তর পেতে চাও তাহলে তোমাকে তোমার অন্তর্জগতে ডুব

দিতে হবে, কঠোপনিষদে এই কথাটাই বলা হয়েছে – *পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্ত্রাত্মন্*, মানে তুমি যদি বাইরে কিছু জানতে চাও তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কারণ তোমার ইন্দ্রিয়গুলোকে ঐ ভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু *কশ্চিদ্ধীরাঃ প্রগাত্মানমৈক্ষদ্*, ইতিহাসের মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র আছেন যাঁদের মনে এই রহস্যের সত্যিকারের সমাধানকে জানতে ইচ্ছে হয়, তাঁরা এই বহির্জগতের দিক থেকে দৃষ্টিটাকে ঘুরিয়ে ভেতরের দিকে ফেলে।

গত কয়েক দিন ধরে আমরা বেদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি তারা সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কি বলছেন, বিভিন্ন দেবতাদের বৈশিষ্ট্য কি রকম, বেদে দেবতাদের সম্বন্ধে বিভিন্ন যে ধারণা ছিল। সেখান থেকে দেখলাম তারা কিভাবে একটা সময় একজন দেবতাকে ধরে নিয়ে সেই দেবতার মধ্যে অনন্তকে কল্পনা করতে চেষ্টা করছে, যখন অনন্তকে ধরতে পারল না সেই দেবতাতে তখন আরেকজন দেবতাকে বেছে নিল, সেই দেবতাকে অনন্তের দিকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে বিফল হয়ে গেল, তখন সেই দেবতাকেও ছেড়ে দিয়ে আরেকজন দেবতাকে ধরল। তখন তারা বুঝতে পারলেন যে দেবতারা কেউই অনন্ত নয়। তারা দেখলেন বহু বলে কিছু নেই, সেই একই আছেন আর তিনিই অনন্ত। সেই অনন্ত আর আমার ভেতরে যে অনন্ত রয়েছে এই দুটো এক। সেই অনন্তকে আমার ভেতরেই পাব, বাইরে তাঁকে ধরা যাবে না। বেদের আসল ধর্ম ছিল যজ্ঞ। যজ্ঞ মানেই বাইরের ক্রিয়া। তাই তারা ভেতরের দিকে সব ক্রিয়াকে ঘুরিয়ে দিল। এইটাই গিয়ে বেদান্ত ধর্মের দর্শনে প্রতিষ্ঠিত হল। যতক্ষণ আমরা বাইরের কর্ম করছি ততক্ষণ আমরা বৈদিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছি। যখন অন্তর্মুখী হচ্ছি তখন এটাই বেদান্ত ধর্ম হয়ে যাচ্ছে। আমরা বলতে পারি বেদ আর বেদান্তের মধ্যে পার্থক্য আছে, এও বলতে পারি যে সমগ্র বেদের মধ্যে উপনিষদ হচ্ছে একটা অঙ্গ। এই কারণেই বেদের ধর্মকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে – একটা হচ্ছে প্রবৃত্তিমার্গ লক্ষণ আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে নিবৃত্তিমার্গ লক্ষণ ধর্ম – অর্থাৎ যজ্ঞের পথ আর সাধনার পথ। বহির্জগতের অনুসন্ধান আর অন্তর্জগতের অনুসন্ধান এই দুটোই বেদে আছে।

কিন্তু বেদান্ত বা উপনিষদকে বেদ থেকে আলাদা করে দেখা হয় তাহলে বেদ আর উপনিষদের মাঝখানে একটা বিভাজন রেখা এসে যায়। একদিকে হচ্ছে জাগতিক অভ্যুদয়, সামাজিক উন্নতি, সংসারে কিভাবে বেশি টাকা পয়সা উপার্জন করতে হবে, সুখ-স্বাছন্দ কিভাবে আসবে, স্বর্গে কিভাবে যাব, এইটাই হচ্ছে আনন্দকে বাইরে অনুসন্ধান করা। লাইনের এই দিকটায় অনুসন্ধান ভেতরের দিকে হতে থাকে, যেখানে সমস্ত কিছুকে পরিত্যাগ করে দিচ্ছে, যে জিনিষগুলিকে বৈদিক সময় ভালো বলে বিবেচনা করা হত সব কিছুকে ছেড়ে দিয়ে অন্তর্জগতে ডুব দিল।

বেদ – ২৮শে মার্চ ২০১০

বেদে যেসব দেবতাদের নাম আমরা উল্লেখ পাই সেই সব দেবতাদের নিয়ে অনেক ধরণের গবেষণা করা হয়েছে। আর এই বেদের দেবতাদের নিয়ে অনেক আলোচনা, প্রবন্ধমূলক বই পাওয়া যায়। এই ধরণের যত বড় বড় কাজ সব বিদেশীরাই বেশি করেছে। বেদ ও পুরানের উপরে ক্যাম্বেল কয়কটি খণ্ডে একটা বই লিখেছেন, ঠিক তেমনি বেদ পুরানের বিভিন্ন বিষয়কে নিয়ে অনেকে অনেক কাজ করেছেন। যে কাজ গুলি তারা করেছেন সব গুলোই অনেক বিস্তারিত ভাবে করেছেন, একটা দুটো কথাতে সেরে ফেলেননি। এর মধ্যে একটা নামকরা কাজ হচ্ছে Golden Bough, এই বইটিতে সারা বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন ধর্মের যত রকমের রীতি নীতি ও পদ্ধতি আছে এইটাকে নিয়ে এক বিশাল কাজ করা হয়েছে। অনেক আগেকার বই হলেও এখন এই বইগুলিকে ক্লাসিক বই বলে মনে করা হয়। যারাই বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মীয় আচার ব্যবহার, অতিন্দ্রীয়বাদ, অধ্যাত্মবাদ নিয়ে গবেষণা করতে যান তাদেরকে বইগুলোকে অধ্যয়ন করতে হয়। এই সব বই গুলো কে তুলনামূলক হিসাবে পড়াশুনা করলে বোঝা যায় ধর্মটা কিভাবে বিবর্তন হয়েছে। বিশ্বে বিভিন্ন পরম্পরা আছে যেমন ইন্দো-ইউরোপিয়া, ইন্দো-ইরানিয়ান আর কিছু কিছু আছে গ্রীক দেশের। আদিম অবস্থা থেকে বিভিন্ন জায়গায়, নানান সভ্যতা যখন প্রসারিত হতে থাকল তখন তাদের যে ভাষা, তাদের যে সংস্কৃতি, তাদের ধর্ম আর সেই সব ধর্মের যেসব বিশ্বাস ছিল সেগুলো কিভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠির মধ্যে আদান-প্রদান হতে হতে সংস্কৃতি, ধর্মের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে তার এক বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে আমরা এই দেবতাদের কথাও পাই।

বৈদিক দেবতাদের সাথে সব থেকে মিল পাওয়া যায় পার্সিদের ধর্মগ্রন্থ জেন্দাভেস্তাতে যেসব দেবতারা আছেন তাদের সাথে। জিউস, পার্সি আর হিন্দু এই তিনটে ধর্মের যারা ছিলেন তারা অন্য ধর্ম থেকে নিজেদের ধর্মে ঢুকতে দিতেন না। একমাত্র জন্মসূত্রেই তুমি এই ধর্মের লোক হতে পারবে। এই কারণে জহুদের সংখ্যা অনেক কমে গেল। পার্সিরা তো একেবারে তলানিত এসে গেছে। পার্সিদের ধর্মে এত নিয়ম-কানুন আছে, আর এর কোন মতেই অন্য ধর্মে বিয়ে করবে না। যখন কোন সমাজে লোকের সংখ্যা কমে যায় তখন inbreeding হতে শুরু করে। স্বামীজীও বলেছেন যে হিন্দু ধর্মে inbreeding করে করে জাতিটা দুর্বল হয়ে পড়ছে। আগে যারা ব্রাহ্মণ ছিলেন তাদের নিজেদের মধ্যে বিয়ের ব্যাপারটা একটা ছোট্ট গণ্ডির মধ্যেই বেঁধে রেখেছিল, পরে তারা সেইখান থেকে ছড়িয়ে যায়, তারপরে অন্য বর্ণের মধ্যেও বিয়েটাকে ছড়িয়ে দিয়েছিল। এখন তো ভারতে inter cast বিবাহ অনেক বেড়ে গেছে। Inbreeding মানে হচ্ছে একটা ছোট্ট গোষ্ঠির মধ্যে যখন বিয়ে থা চলতে থাকে তখন ঐ ছোট্ট গোষ্ঠির মধ্যে নানা জেনেটিক রোগের প্রাদুর্ভাব হতে থাকে, যে রোগগুলো সারান যায় না। আবার যখন cross-breeding হতে শুরু করবে তখন ঐ রোগগুলো নির্মূল হতে থাকে। এই কারণেই পার্সিদের সংখা খুব দ্রুত কমে আসছে।

ভারত হচ্ছে ধর্মের দেশ। কিন্তু ধার্মিক লোক, আধ্যাত্মিক পুরুষ শুধু যে হিন্দু ধর্মেই আছে তাই নয়, প্রত্যেক ধর্মে, প্রত্যেক দেশেই ধার্মিক ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব আছে। কিন্তু তফাৎটা একটা জায়গায়। ভারতের এইটাই ঐতিহ্য যে ভারতের যারা নেতা হয়েছিলেন তারা সবাই আধ্যাত্মিক বা ধার্মিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন, অন্যান্য দেশে এই জিনিষটা দেখা যায়নি। অন্যান্য দেশে বিজ্ঞানী, দার্শনিক, সাহিত্যিকদের থেকেই নেতারা এসেছে কিন্তু এখানে সাধুপুরুষদের কেই ভারত নেতার পদে বসিয়েছে। আর ভারতের যে সমাজ তারা সাধুকেই অনুকরণ করে। যার জন্যে গান্ধীজী যখন ভারতের জনজীবনের দৃশ্যপটে আবির্ভাব হলেন তখন পুরো দেশ গান্ধীজীকেই অনুসরণ করতে থাকল। নেহরু খুব সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন – If I want to convince India I only have to convince Gandhi. গান্ধীজী যদি বলে এইটা হোক, সারা দেশ বলবে এইটা হোক। সবাই কিন্তু এক বাক্যে স্বীকার করেন, সারা দেশ গান্ধীজীকে মেনেছে সাধু হিসাবে। কারুর গায়ে সাধুর লেবেল দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তার কথা সারা দেশ শুনবে, সে যতই

ধাপ্পাবাজ বা জোচ্চর হোক। যে কোন রাজনৈতিক নেতার সভার থেকে রামদেও বাবার সভাতে লোক উপচে পড়বে। রামদেও বাবা বলে দিয়েছে সকালে উঠে যোগভ্যাস কর, সার দেশ এখন তাই করছে। এটাই এই দেশে হয়। আমাদের রক্তের মধ্যে এই ব্যাপারটা রয়েছে। বেদে আমাদের ঋষিরা দেবতাদের যেভাবে ছবি এঁকেছেন দেশের সমস্ত লোক সেইভাবে ভেবেছে। কিন্তু অন্যান্য দেশে যেহেতু আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বদের নেতার আসনে বসান হয়নি তাই এই ধরণের আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় চিন্তা ভাবনা গুলো যে স্তর পর্যন্ত নিয়ে যাবার কথা সেই স্তর পর্যন্ত ওনারা নিয়ে যেতে পারেননি। কিন্তু ভারতে হাজার হাজার বছর ধরে একের পর এক ঋষিরা এসে এই জিনিষগুলোকে ঠেলতে ঠেলতে এত দূর নিয়ে গেছেন যে তারপরে আর কিছু বলার থাকে না। ম্যাক্সমূলার তাই বলছিলেন – বেদের ঋষিরা যেন পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে শুরু করেছেন, শুধু যুক্তি বিচারকে অনুসরণ করে উঠতে উঠতে ওনারা এমন উঁচুতে চলে গিয়েছিলেন সেখানে যারা সাধারণ লোকেদের অক্সিজেনের অভাবে বুক ফেটে যাবে, কিন্তু এনারা সেখানেও পৌঁছে গিয়েছিলেন। একটা অবস্থার পর যুক্তি দিয়ে বিচার করতে গেলেই বুক ফেটে যাবে।

এই কারণেই ভারতকে আধ্যাত্মিক দেশ বলা হয়। তার প্রথম কারণ হচ্ছে দেশের জনসংখ্যার শতকরা হিসাবে বেশির ভাগ মানুশ ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতাতে উৎসর্গিকৃত, আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, ভারতের বেশির ভাগ মানুষই সাধারণ ভাবে ধর্মীয় নেতাদেরকেই অনুসরণ করে। অন্যান্য দেশে ধর্মীয় নেতাদের অনুসরণ করা হয় না।

ঋষিরা প্রকৃতির একটা বিষয়কে নিয়ে তার উপরে ধ্যান করতে শুরু করলেন। ধ্যান করতে করতে একেবারে শেষ অবস্থায় তার সেই শক্তির কাছে পৌঁছে যেতেন। যেমন ধরুন কালবৈশাখীর ঝড়, এই ঝড়কে নিয়ে তাঁরা ধ্যানে বসে গেলেন, ধ্যান করতে করতে এই ঝড়ের পেছনে কোন আধ্যাত্মিক শক্তি থাকতে পারে কিনা সেই পর্যন্ত চলে যেতেন। সেই শক্তির উপরে ধ্যান করতে করতে তাকে অতিক্রম করে দেখছেন এই শক্তি হচ্ছে প্রাণ। এই প্রাণ মানে সমস্ত প্রাণীর যে প্রাণ আছে সেই প্রাণকে বলছে না। এই প্রাণ হচ্ছে vital energy, স্বামীজী যখন সৃষ্টির বর্ণনা করতে গিয়ে বার বার যে আকাশ ও প্রাণের কথা বলছেন এখানে সেই প্রাণের কথা বলা হচ্ছে। সেই অবস্থাতে ওনারা দেখছেন প্রাণের যখন এই রকম প্রকাশ হচ্ছে তখন এইটাই হয়ে যাচ্ছে ঝড়। সেইজন্য উপনিষদে আমরা দেখি প্রাণের পূজা, প্রাণকেই ওনারা আত্মা মনে করছেন। বেদের সময়ে এই ঝড়ের শক্তির উপরে একটা দিব্য ব্যক্তিত্বকে বসিয়ে দিচ্ছে। এটা কোন কবির কল্পনা নয়। ধ্যানের গভীরে যেতে যেতে যেগুলো অপ্রয়োজনীয় ফালতু জিনিষ সেগুলোকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে, তারপর একটা অবস্থাতে গিয়ে এই দিব্য ব্যক্তিত্বকে ইন্দ্র, বরুণ ইত্যাদি দেবতাকে বসিয়ে দিচ্ছে। ঋষিদের আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু হয়েছিল এই প্রাকৃতিক ঘটনা গুলোকে নিয়ে। এই কারণে যে কোন লোকের মনে দ্বিধা দ্বন্দ্ব চলে আসাটা খুবই স্বাভাবিক। যেমন বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রকে করে দেওয়া হল, এখন মনে হবে ঋষিরা মেঘকে দেখে কল্পনা করতে লাগলেন যে এই মেঘের পেছনে একটা দৈবী শক্তি আছে সেখানে থেকে ইন্দ্র দেবতার সৃষ্টি হয়ে গেল, আদপেই কিন্তু সেই ভাবে হচ্ছে না। গভীর ধ্যানের মধ্যে গিয়েই তাঁরা এটাকে প্রত্যক্ষ করেন, আর যে কেউ যদি ঋষিদের পদ্ধতি অনুসরণ করে ধ্যানের শক্তিতে ইন্দ্রের উপাসনা করে তাহলে বৃষ্টি হবেই।

গীতাতে এসে আমরা পাই প্রকৃতির সব কিছুর মালিক হচ্ছেন ভগবান, এখানে দেবতাদের জায়গায় ভগবানই সব কিছুর অধীশ্বর হয়ে গেলেন, সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলে দিলেন ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ইত্যাদি দেবতাদের আর উপাসনা করার দরকার নেই। সাক্ষাৎ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে একই জিনিষ হবে। দেবতা থেকে ভগবানে উত্তরণের এই ব্যাপারটা একটা আলাদা গবেষণার বিষয়। মহাভারতে গেলে আরও ভালো করে বোঝা যায় মানুষের চিন্তা-ভাবনা কিভাবে পরিবর্তন হতে হতে চলেছে।

ঋষির যখন চরমে গিয়ে দেখছেন অনন্ত ছাড়া আর কিছুই নেই, এই দেবতারা, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, যম, আদিত্য এর সবাই হচ্ছেন সেই অনন্তের মুখ, তখন ঋষিরা ভাবলেন এরা যদি অনন্তের মুখই হয়ে থাকে তাহলে আমি দেবতাদের কেন ধরতে যাব, দেবতাদের জায়গায় আমি অনন্তকেই ধরব। কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা হয়ে যায়, সাধারণ মানুষের মধ্যে যারা ধর্মের দিকে যেতে চান তাদের প্রত্যেকরই চিন্তা, ভাবনা, মানসিক গঠন আলাদা আলাদা। কিছু লোক আছে যারা দেবতাদের কীর্তি-কলাপ, বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনীর কথা শুনতে চায় – অর্থাৎ তারা পৌরানিক কাহিনীগুলোকে জানতে চান, পুরানের নানান রকমের গালগাপ্প না থাকে ততক্ষণ তাদের মন ভরে না। বেদ হচ্ছে পুরানের স্বর্ণখনি। বেদে এমন অনেক ছোট ছোট কাহিনী আছে যেখান থেকে বিরাট পৌরানিক কাহিনী তৈরী করা যায়। আমাদের পুরানে যত ধরণের আখ্যায়িকা আছে তার শেকড় কিন্তু বেদেই পাওয়া যাবে।

প্রকৃতির একেকটি দিক নিয়ে ধ্যান করে করে যখন এক দেবতাকে তাঁরা জন্ম দিয়েছিলেন, আবার সেই দেবতাদের মধ্যে তাঁরা দেখতে পেলেন যে এঁরা হচ্ছেন সব অনন্তেরই মুখ। এই অবস্থাতে এসে ঋষির মুখে আমরা শুনতে পেলাম – একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি। সবাই সেই এক, সবাই সেই অনন্ত, তাঁকে ঋষিরা বিভিন্ন নামে ডাকছে। ইন্দ্র, বরুণ, যে দেবতার নামই বলা হোক না কেন এরা হচ্ছেন বহুধা, কিন্তু আসলে তাঁরা সকলে এক। এই উপলব্ধির পর ঋষিরা কিন্তু দেবতাদের পরিত্যাগ করে দিলেন না, দেবতাদের কেও ঋষিরা ধরে রাখলেন। তার মধ্যে কিছু কিছু দেবতা পরবর্তি কালেও টিকে ছিলেন আবার নতুন নতুন দেবতাদেরও জন্ম হয়েছে কিন্তু মূল ভাব থেকে ঋষিরা কখনই সরে আসেননি। আজকের দিনেও যখন গ্রামের সাধারণ মানুষকে যখন দেখা যায় গাছের পূজা করছে, পাথরের পূজা করছে, নদীর পূজা করছে, তখন সাধারণ মানুষও জানে যে আমি পাথর কিংবা গাছের পূজা করছি না, এই পাথরটি হচ্ছে শিবের প্রতীক, শিবকে এই পাথর মনে করিয়ে দিচ্ছে, আর শিব হচ্ছেন সেই অনন্ত। সাধারণ লোক জানে যে গঙ্গাজল আর কূয়োর জলের রাসায়নিক উপাদান একই অথচ সারা ভারতের লোকের বিশ্বাস যে গঙ্গাজল একটু মুখে দিলে আর মাথায় ছিটিয়ে দিলে গত চব্বিশ ঘন্টায় যত অপবিত্র কাজ করেছিল তার সব পবিত্র হয়ে যাবে। কারণ যারা গঙ্গাজল ছেটাচ্ছেন তারা জানেন যে আমি এটা কোন মামুলি জল ছেটাচ্ছি না, পবিত্র করার যত রকমের রূপ হয় তার মধ্যে এইটি হচ্ছে সব থেকে মাহাত্মপূর্ণ। শ্রীমায়ের জীবনীতে আছে, মায়ের ভাইঝি নলিনীর ছিল শুচিবাঈ। নলিনীর মাথায় নাকি কাকে পেচ্ছাপ করেছে, তাই রাত্রিতে সে স্নান করতে যাবে। শ্রীমা নলিনীকে বলছেন মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে নিতে। সে মানবে না। তখন শ্রীমা বলছেন – ঠিক আছে, তুই আমাকে ছুঁয়ে দে তাহলেই তুই পবিত্র হয়ে যাবি। এটা মায়ের কত বড় কথা।

আমরা যদি এই পবিত্রতার উপরে ঠিক ঠিক ধ্যান করতে থাকি তাহলে শেষে গিয়ে পবিত্রতার যে আধ্যাত্মিক রূপ দেখব সেই রূপটা হচ্ছে অনন্ত। যখন আমরা এই অনন্তের সঙ্গে নিজেকে এক করে ফেলি তখন আমরা চিরদিনের মত পবিত্র হয়ে যাব। ঠাকুর নরেরন নামে যার জন্য বলছেন – নরেনের মধ্যে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে কলাগাছ দিলেও পুড়ে যাবে। তার মানে নরেরন মধ্যে পাপ বলে কিছু নেই। কেন নরেরন মধ্যে পাপ নেই? কারণ তিনি অনন্তের সাথে নিজেকে এক করে ফেলেছেন। যে মুহুর্তে কেউ অনন্তের সাথে নিজেকে এক করে ফেলতে পারে তখন সচ্চিদানন্দের যত রূপ হতে পারে সে ঐ সমস্ত রূপের সাথেও এক হয়ে যাবে। সচ্চিদানন্দের প্রথম রূপ হচ্ছে সৎ - এই সৎএর সাথে যখন এক হয়ে যাব তখন আমার মৃত্যু ভয় চলে যাবে, তারপরে আসছে চিৎ - সচ্চিদানন্দের চিৎ এর সাথে এক হয়ে গেলে সমস্ত সংশয়, দ্বিধা সব মুছে যাবে, শেষে আসছে আনন্দ – আনন্দের সাথে এক হয়ে গেলে জগতে এমন কোন জিনিষ নেই যেটা থেকে আমার দুঃখ আসবে, হতাশা আসবে, তখন মানুষ সমস্ত ধরণের শোক আর মোহকে অতিক্রম করে যায়। শোক মোহকে পার করে গেলে তাকে আর অপবিত্রতা স্পর্শ করতে পারে না, সেই যাই করুক না কেন, কোন ভাবেই সে আর অপবিত্র হবে না। এইটাই আমরা গীতাতে পাই – ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। কারুর গলা যদি সে কেটে দেয় তার জন্য তার কোন অনুতাপই হবে না, আবার

কেউ যদি তার গলা কাটতে আসে তাতেও তার কিছু আসবে যাবে না। কারণ সে তখন সৎএ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। আর আনন্দে আছে বলে কারুর গলা কেটে দিলে তার কোন দুঃখ হবে না। ঠাকুর কথামৃতে অনেকবার এইটাকে বলছেন – শুচি অশুচির পারে চলে যায়। তখন তার গঙ্গাজল আর নর্দমার জল এক মনে হবে। কথামৃতে কতবার এই কথাগুলো আমরা পড়ি কিন্তু এই জিনিষগুলো কে ধারণা করা অত্যন্ত কঠিণ। মানুষ যদি একবার বুঝে নেয় যে আমি অপবিত্র, আমি পাপী তাহলে আজ হোক কিংবা আগামী কাল হোক সে পাগল হয়ে যাবে। তার পাপবোধই তাকে শেষ করে দেবে। একটা বাচ্চা ছেলেরও যদি একবার মনে হয় তার গায়ে নোংরা সে অনবরত মার পেছন পেছন দৌড়াবে আর চেঁচাতে থাকবে – মা আমাকে পরিষ্কার করে দাও। কোন মানুষই মনের মধ্যে অপবিত্রাকে বহন করতে পারেনা। কিন্তু এই ধরণের কোন অনুভূতিই নেই কারণ আমরা কেউই অনন্তের সাথে এক হতে পারিনি। অনন্তের সাথে নিজেকে এক করে নিতে পারলে তখন এই জিনিষগুলো তাকে আর স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু যারা এখন নিজেদেরকে অনন্তের সাথে এক করতে পারেনি তাদের কি হবে? যতক্ষণ না অনন্তের সাথ এক হচ্ছে ততক্ষণ তাকে অনন্তের যে কোন একটা মুখকে তাকে ধরে থাকতে হবে। এই অনন্তের একটা মুখই তার পবিত্রার ভাবকে রক্ষা করে, তখন এই গঙ্গাজলকেই পবিত্র মনে হবে। অনেকে এই গঙ্গাজলের নমুনা পরীক্ষা করে গঙ্গাজলের পবিত্রতাকে যদি খুঁজতে যায়। আবার অনেকে মনে করেন ঋষিরা এই গঙ্গার তীরে তপস্যা করেছিলেন বলে গঙ্গাজল পবিত্র, আবার অনেকে অনেকে মনে করেন হিমালয়ের অনেক জড়িবুটি গঙ্গাজলে মিশে থাকে বলে গঙ্গাজলে পোকা ধরেনা, এটা ঠিকই যে গঙ্গাজল ঘরে যত দিনই রেখে দেওয়া যাক না কেন, যেমন ছিল তেমনটিই থাকে, কোন পোকা ধরে না। এগুলোর কোন গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব হচ্ছে কত নদীই তো আছে, নর্মদা, যমুনা, গোদাবরী আছে, কিন্তু ঋষিরা যখন ধ্যান করছেন তখন ওনারা উপলব্ধি করলেন যে গঙ্গাজলের যে আধ্যাত্মিকতা আছে তাতে সমস্ত কিছুকে পবিত্র করার শক্তি আছে। রামকৃষ্ণ মঠের অনেক মহারাজ কাছে জয়রামবাটীর সিংহবাহিনী মন্দিরের মাটি রেখে দেন, রোজ একটু করে সেই মাটি তাঁরা খান। এখন মঠের যাঁরা ঋষিরা ছিলেন তাঁরা ধ্যানের গভীরে দেখলেন যে সিংহবাহিনী মাটির মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতা আছে তাতে এই মন্দিরের মাটি খেলেও তুমি পবিত্র হবে। আমাদের মত সাধারণ লোকেরা এগুলো বুঝতে পারব না, আমরা শুধু জানি এগুলো ঋষিরা করতেন আর আমরাও যাতে করি সেই অনুসারে তাঁরা বলে গেছেন। রাজা মহারাজের অসুখ করেছে ঠাকুর বলছেন – নে একটু জগন্নাতের আট্‌কে প্রসাদ খা, রোগ ভালো হয়ে যাবে। ঋষিরা যেটা বলে গেছেন সেটাই বেদবাক্য হয়ে গেছে। একাধিক ঋষিরা বলে গেছেন যে গঙ্গাজলে আমাদের মানসিক অপবিত্রতা, শারীরিক অপিবত্রতা দূর হয়, সেইজন্য সারা ভারত এটাকে ধরে রেখেছে। এখন গঙ্গাজল আমাদের কিভাবে পবিত্র করছে আমরা বলতে পারব না, সেটা বুঝতে গেলে আমাদের ঋষি হতে হবে।

এইটাই হচ্ছে ধারা, যে ধারা অনুসারেই আমাদের মধ্যে কোন জিনিষের প্রতি আধ্যাত্মিকতার ভাব জন্মেছে। কিন্তু এই ভাবধারাও পাল্টাতে থাকে। যেমন ঠাকুর ও শ্রীমার আগমনের আগে সিংহবাহিনী মন্দিরের মাটির প্রতি এই ভাবটা ছিল না। আর ভারতের মাটি খুব বিচিত্র, এই মাটিতে যেটা একবার এসে পড়ে সেটা আর কখন নষ্ট হয় না। যেমন পার্সি ধর্ম, সারা বিশ্ব থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কিন্তু ভারতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন এখনও রয়ে গেছেন। যে কোন ধর্মীয় ভাব একবার ভারতে ঢুকে পড়লে সেটা আর কখন নষ্ট হয় না।

বেদের খুব গুরুত্ব এবং উল্লেখনীয় দেবতা হচ্ছেন ইন্দ্র। ঋকবেদ, চারটে বেদের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বড় সেটির এক চতুর্থাংশ মন্ত্র ইন্দ্রের প্রতি উৎসর্গ করা। সচরাচর আমরা ইন্দ্রকে যে ভাবে কল্পনা করি এবং পুরানে ইন্দ্রকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে বেদে সেভাবে ইন্দ্রকে দেখা হয় না, ইন্দ্র হচ্ছে অনন্তের যে শক্তিকে ভাবা হয়, ইন্দ্র হচ্ছেন সেই শক্তির রূপ। পার্সিদের ধর্মগ্রন্থ জেন্দাবেস্তাতেও ইন্দ্র, মিত্র বরুণ দেবতাদের নাম পাওয়া যায়। ইন্দ্রের প্রধান অস্ত্র হচ্ছে বজ্র। পুরানে বর্ণনা আছে ইন্দ্র এই বজ্র দিয়ে

বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন। বৃত্রাসুর জলকে ধরে রাখে। এর তাৎপর্য হচ্ছে – আমরা সবাই জানি মেঘ জলকে ধরে রাখে। কিন্তু আকাশে মেঘ হলেই বৃষ্টি হয় না। কিন্তু যখন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল, মেঘের গর্জন হতে থাকল তখন মেঘ থেকে জল ঝরতে শুরু করল। অনেকে ব্যাখ্যা করেন ইন্দ্র আর বৃত্রাসুরের কল্পনা এই ভাবেই এসেছে। বৃত্রাসুর হচ্ছে অসুর, তার শরীরের রঙ কালো, সে জলটাকে ধরে রেখেছে, সে ছাড়বে না। কিন্তু এই জল না পেলে প্রাণী জগৎ, বৃক্ষ জগৎ নাশ হয়ে যাবে। তখন ইন্দ্র বিশ্বকর্মাকে দিয়ে বজ্র তৈরী করালেন। এইবার এই বজ্র যখন বৃত্রাসুরের উপর চালালেন তখন সে ছিটকে পড়ে গেল, যে জলটাকে সে ধরে রেখেছিল এখন সেটাই বর্ষণ হয়ে জীব জগতের প্রাণ রক্ষা হল। বেদের এই একটি আখ্যায়িকার উপরে যে কত ধরণের ব্যাখ্যা আছে, আর এখনকার যারা পণ্ডিত তারাও এর উপরে নতুন নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের কাছে, যারা Indian Spiritual Heritage কে জানতে এসেছি, ইন্দ্র হচ্ছে অনন্তের যে শক্তি, তার যদি কোন মুখ থাকে তাহলে সেই মুখ হচ্ছে ইন্দ্র। মানুষের মধ্যে যারা মহৎ, যারা ভালো লোক, তাদের ভালোর জন্য ইন্দ্র সব সময় নিজের কাজ করে যাচ্ছেন। অনেক পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকরা ইন্দ্রের পরিচিতিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, যখন আর্যরা ভারতে প্রবেশ করেছিল তখন আর্যরা ভারতে সেই সময় যত জাতি উপজাতিরা থাকত তাদের মেরে কেটে অঞ্চল দখল করেছিল, সেই আর্যদের যে রাজা ছিল তাকেই পরে ইন্দ্র রূপে চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অনেকে এই ধারণাটাকে অস্বীকার করেন। আমরা বাল্মীকি রামায়ণে এবং পুরানেও ইন্দ্রকে পাই, কিন্তু বেদের ইন্দ্র হচ্ছেন খুব উচ্চমানের দেবতা।

পুরানে একটা খুব সুন্দর কাহিনী আছে। দৈত্য আর দেবতাদের অশান্তি সব সময় লেগেই আছে। দৈত্যর সব মিলে ঠিক করল যে করেই হোক ইন্দ্রকে হারাতে হবে। দৈত্যদের পিতা কাশ্যপ মুনির কাছে দৈত্যরা গিয়ে ইন্দ্রের নামে নানা রকমের অন্যায় কাজের কথা জানাল, এটা বোঝাতে চাইল যে ইন্দ্র খুবই গোলমেলে দেবতা। কাশ্যপ সব শুনলেন, তিনি দেখলেন এই দৈত্যরা যা বলছে ঠিকই বলছে, আমিও জানি ইন্দ্র বরাবরই গোলমেলে কিন্তু বাকী যারা আছে তারা ইন্দ্রের থেকে আরও অনেক বেশি গোলমেলে। সেইজন্য ইন্দ্রকে দৈত্যদের দিয়ে পিটিয়ে, মার খাইয়ে হারিয়ে দেওয়াটা কখনই সঠিক কাজ হবে না। এটা মনে রাখতে হবে যে দৈত্য অসুরদের সম্বন্ধে ইদানিং কালে যে সব ধারণা, বেদের দৈত্য অসুরেরা সেরকম ছিল না, দৈত্য অসুররা দেবতাদের ভাই ছিল, পরে সাহিত্যিকরা তাদের কল্পনা আর কলমের জোরে দৈত্য অসুরদের নীচে নামিয়ে দিয়েছে। তবে ইন্দ্রের সব থেকে যেটা গোলমেলে ছিল তা হল, যদি দেখত কেউ অনেক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যাচ্ছে তখন ইন্দ্র ছলবলে তার ক্ষমতাকে কেড়ে নিত কিংবা তার পতন যাতে হয়ে যায় সেই মত ব্যবস্থা করতে যে কোন ধরণের অসদুপায় অবলম্বন করতে কোন দ্বিধা করত না। মানে মানবীয় যত রকমের খারাপ গুণ থাকতে পারে সবই ইন্দ্রের মধ্যে ছিল। কিন্তু অন্যরা আরও খারাপ। সেইজন্য কাশ্যপ মুনি দৈত্যদের কথায় কান দিলেন না। ইন্দ্রের প্রথম পরাজয় শুরু হল যখন শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক সাহিত্যগুলো আসতে আরম্ভ করল, অর্থাৎ মহাভারত, ভাগবতাদি আসতে শুরু হল। মহাভারত থেকেই বৈদিক দেবতাদের পতন হয়ে আঞ্চলিক দেবতাদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেতে থাকল।

যেখানে কোন কিছুর আধিক্য হয়েছে সেখানেই ইন্দ্র নাক গলাবে, যদি দেখে কারুর সৌন্দর্যের আধিক্য আছে সেইখানে ইন্দ্র ঝাপিয়ে পড়বে, যদি দেখে কারুর শক্তির আধিক্য হয়েছে ইন্দ্র সেইখানে গিয়ে তার শক্তির আধিক্য যাতে খর্ব হয় তার চেষ্টাতে নিজেকে ব্যস্ত রাখবে। মানে যার যেটা বেশি আছে সেটাই ইন্দ্রের চাই। ইন্দ্রের এই দুর্বলতাটা খুব বেশি মাত্রায় ছিল। কিন্তু যদি কেউ নিজেকে সর্বোচ্চ না ভাবে তাহলে ইন্দ্র কোন ঝামেলা করবে না, তখন সে পরোপকারী, উদার, বিপদে লড়াই পর্যন্ত করবে। এমনিতে ইন্দ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য সব সময় চেষ্টা করবে, শুধু যদি কেউ একশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করে দেয় তখন সে হয়ে যাবে ইন্দ্র, তখন ঐ ভয়ে ইন্দ্র তার ঘোড়াটাই হয়তো লুকিয়ে দেবে।

বেদে ইন্দ্রের পরেই অগ্নি দেবতা বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। প্রায় দুশোর মত মন্ত্র অগ্নিকে নিয়ে। আমরা আগে বলেছিলাম যে বেদে আমরা তিন ধরণের দেবতা পাই, কিছু দেবতা আছেন যারা পৃথিবীলোকের, কিছু

দেবতা স্বর্গলোকের আর কিছু দেবতা অন্তরীক্ষলোকের। যদিও আমরা জানি অগ্নি হচ্ছেন পৃথিবীলোকের দেবতা, কিন্তু বাস্তবে অগ্নির তিনটে রূপই আছে। পৃথিবীলোকের যে অগ্নি দেবতা, তাঁর খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। সেখানে বলছে অরণিকাঠ থেকে অগ্নির জন্ম। এখনকার দিনে যেমন লাইটার বা দেশলাই দিয়ে আগুন জ্বালান হয় কিন্ত আগেকার দিনে দুটো কাঠকে ঘষে ঘষে আগুন জ্বালান হত, এই কাঠকে বলা হত অরণি। অগ্নির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অগ্নি জন্ম নিয়েই সে নিজের বাবা-মাকে ভক্ষণ করে নেয়। আসলে আগুন লাগালে কাঠটা পুড়ে যায়, এইটাকেই বেদে কাব্যিক ঢঙে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অগ্নির কখনই সে বয়স বাড়ে না, চিরদিনই তিনি নব্য যুবকের মত থাকেন। আসলে তখনকার দিনে বাড়িতে প্রত্যেক দিন যজ্ঞ যাগ হত, এখন রোজই নতুন করে অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করে যজ্ঞ করা হত বলে অগ্নি দেবতা সব সময়ই যুবক থেকে যান। অগ্নিকে প্রথম আদি দেবতা বলা হয়। কারণ প্রথম যখন যজ্ঞ আরম্ভ হয়ে ছিল তখন একমাত্র অগ্নিদেবতাই ছিলেন। একদিকে অগ্নি হচ্ছে সব থেকে প্রথম দেবতা আবার অন্য দিকে অগ্নি দেবতাকে সব দেবতা থেকে কনিষ্ঠ দেবতা রূপে গণ্য করা হয়। অগ্নিকে অতিথি রূপেও ভাবা হয়। অগ্নির আরেকটি নাম হচ্ছে বরডোয়ানা, এর মূল অর্থ হচ্ছে সমুদ্রের অগ্নি। মহাভারতে একটি কাহিনী আছে সেখানে বলছে একজন ঋষি কোন কারণে খুব ক্রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তিনি রাগে সমস্ত সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দিতে চাইছিলেন। তিনি তাঁর তপস্যার শক্তিতে যখন সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দিতে যাচ্ছেন তখন দেবতারা এসে তাঁকে নিষেধ করলেন এই রকম করতে। তখন তিনি বলছেন ‘আমি এই যে আগুন সৃষ্টি করেছি গোটা বিশ্বকে ধ্বংস করার জন্য এখন এই অগ্নিকে দিয়ে যদি সৃষ্টিকে না জ্বালিয়ে দিই তাহলে এই অগ্নি আমাকেই শেষ করে দেবে। এই অগ্নি হচ্ছে ক্রোধাগ্নি, আমি রেগে গেছি। এখন এই ক্রোধাগ্নিকে আমি রাখব কোথায়’। মা যখন কারুর উপর রেগে যায় তখন যার উপরে রেগে গেছে তাকে কিছু না করতে পেরে নিজের ছেলেকেই মেরে দেয়, ছেলে হয়তো কিছুই করেনি। এই ধরণের সমস্যা এখনও আছে আগেও ছিল। বাড়ি থেকে বউএর সঙ্গে ঝামেলা করে বেরিয়ে অফিসে এসে তার অধঃস্তন কর্মচারীর উপরে সেই ঝালটা মেটাবে। সেই কর্মচারী আবার আরেকজনের কাছে ঝাল মেটাবে। এই ভাবে হতে হতে শেষে দেখা যাবে যে অফিসের পিওন থাকে তার কাছে এসে ঝালটা ঝাড়বে। এখন অফিসের পিওন কার উপরে ঝাল মেটাবে, কাউকে না পেয়ে সে একটা ইট তুলে একটা কুকুরকে মেরে ঝাল মেটাবে। যেখানে যা গোলমাল হোক শেষে ইটটা খাবে ঐ কুকুরটা।

ঋষির কথা শুনে তখন দেবতারা তাঁকে বললেন ‘দেখুন এই যে জল, এই জলও হচ্ছে সৃষ্টি, আর এই জল থেকেই সব কিছু সৃষ্টি হচ্ছে, আপনি আপনার ক্রোধাগ্নিকে ঐ জলে গিয়ে স্থাপন করে দিন’। তখন ঋষি তাঁর ঐ ক্রোধাগ্নিকে জমিয়ে সমুদ্রে রেখে দিয়ে এলেন, সমুদ্রের আগুন এখনও জ্বলছে, সেই অগ্নির নাম হল বরডোয়া। বলা হয় সেই আগুন নাকি এখনও সমুদ্রে জ্বলছে, অগ্নির জন্ম ঐ বরডোয়া থেকে। আবার অগ্নির উৎস হচ্ছে সর্বোচ্চ স্বর্গে, সেখান থেকে মাতরিশ্ব অগ্নিকে অবতরণ করার জন্য অগ্নির নাম মাতরিশ্ব। গ্রীক পৌরানিক কাহিনীতেও ঠিক এই ধরণের কাহিনী পাওয়া যায় যেখানে বলা হয়েছে স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে নিয়ে আসা হয়েছিল।

এরপর আসছে বরুণ দেবতা, যাকে বলা হয় upkeeper or Ritam, এই ব্রহ্মাণ্ডে যে সব কিছু একটা সুনিয়ন্ত্রিত নিয়মের মধ্য দিয়ে চলে এরও উৎস কিন্তু সেই অনন্ত। বিভিন্ন জিনিষকে যে নিয়মের মধ্যে ধরে রাখছে তার যে দেবতা তিনি হচ্ছেন বরুণ। ঠিক সময়ে ঋতুর পরিবর্তন হচ্ছে, ঠিক সময়ে বৃক্ষে ফুল হচ্ছে, ফুল থেকে ফল হচ্ছে, এই জিনিষগুলো যে ঠিক সময়ে ঠিক ভাবে হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে ঋতম্। আমরা যখন পরিবারের মধ্যে বাস করি, যখন সমাজে চলাফেরা করি তখন আমাদের পরিবার ও সমাজে সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে সবাইকে বসবাস করা জন্য কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয়, ঠিক তেমন এই ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু হচ্ছে তারও কিছু প্রাকৃতিক নিয়ম বিধি আছে, যেগুলো আমাদের সবাইকে মেনে চলতে হয়। এই নিয়মের জোরেই নিত্য সূর্য উদয় হয়, ঠিক সময়ে ঋতুর আবির্ভাব হয়, গরু দুধ দেয়। এখন কে

এই নিয়মগুলির দেখভাল করছে? সমাজ ও দেশের নিয়মগুলিকে দেখভাল করার জন্যে একটা সরকার যদি না থাকত তাহলে সবাই লুটেপুটে খেত, সবলের অত্যাচারে দেশ উচ্ছন্নে চলে যেত। এই ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু নিয়ম আছে সেগুলোকে দেখাশুনোর জন্য যদি কেউ একজন না থাকে তাহলে কেউ আর নিয়মকানুনকে মানবে না। ব্রহ্মাণ্ডের এই নিয়মকানুনকে বলা হয় ঋতম্, আর এই ঋতমের যে আচরণ-বিধিকে পালন করা হয় বরুণের মাধ্যমে।

বেদে বিষ্ণু খুব ছোট দেবতা, বেদে এর খুব একটা দাম নেই। পুরানে দেখা যায় হিরণ্যকশ্যিপু দৈত্যরা বিষ্ণুকে গ্রাহ্য করত না। উরুক্রম হচ্ছে বিষ্ণুরই আরেকটা নাম, তিন পাদ বিশিষ্ট, এই বিষ্ণুই পুরানে বামন অবতারে উল্লেখিত হয়েছেন। মহাভারতে এসে বিষ্ণুর অবস্থানটা পাল্টে গেল। এখানে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্রকে নীচে করে দেওয়া হল আর বিষ্ণুকে উপরে নিয়ে আসা হয়েছে। তবে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী যে নারায়ণের কথা আমরা জানি এই বিষ্ণু কিন্তু সেই বিষ্ণু নন। বিষ্ণু আমরা বেদে যাকে পাচ্ছি তিনি সেখানে অতি সাধারণ দেবতা। পরেও যে বিষ্ণুকে আমরা পাচ্ছি সে কিন্তু ভগবান নন। ভগবান আর দেবতার মধ্যে অনেক পার্থক্য এসে যায়। ভগবানকে বেদে পুরুষ রূপে দেখা হতে, যেটা আমরা পুরুষসূক্তমে দেখতে পাই, কিন্তু দেবতারা হচ্ছেন তাঁর থেকে অনেক অনেক নীচে। বিষ্ণুও এই রকম একজন দেবতা, তাও আবার ইন্দ্রের অধীনে। কিন্তু মহাভারতে এসে এই জিনিষটাই উল্টে গেছে। বিষ্ণু চলে এলেন ওপরে আর ইন্দ্রের তো এখন কোথাও পূজোই হয় না। ভারতের ঋষিরা ইন্দ্রকেও মূল্য দেয়না, বিষ্ণুকেও মূল্য দেয়না, আবার ইদানিং কালের যারা মহাত্মা হয়েছেন তাদেরকেও ভারত মূল্য দেয়না, ভারত মূল্য দেয় সেই অনন্তকে। এখন অনন্তকে আমরা কোন রূপে দেখব তাতে কিছুই যায় আসে না। যদি এখানে ইন্দ্রকে একটা ব্যক্তিত্ব হিসাবেই দেখত তাহলেই কিন্তু এই ছোট বড় করাটা অন্য রকমের হয়ে পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। শ্রীরামকৃষ্ণকে যদি আমরা একজন মানুষ বা ব্যক্তি রূপে দেখি তাহলে কিন্তু আমাদের অনেক সমস্যা হবে। ঋষিরা সব দেবতাকে দেখছেন অনন্তের একেকটি রূপে। অনন্তের একটি রূপে দেখলে আমরা কাকে দেখছি সে নিয়ে কোন সমস্যা হবে না। কাল যদি হঠাৎ আমরা বলি সেই সচ্চিদানন্দই একমাত্র সত্য, ইন্দ্র হচ্ছেন সেই সচ্চিদানন্দ, তখন কাল থেকে ইন্দ্রের পূজা আরম্ভ হয়ে যাবে। মহাভারতে এসে আমরা দেখতে পাই সেখানে যখন ইন্দ্রকে আঁকা হচ্ছিল তখন তাঁকে একজন ব্যক্তিত্বের আধারে, সত্ত্বগুণী আধার রূপে চিন্তা করে আঁকা হয়েছে। কিন্তু বিষ্ণুকে পুরোপুরি অনন্তের সঙ্গে এক করে দিলেন। ভারতের এটাই বৈশিষ্ট্য এখানে যাকেই অনন্তের সঙ্গে এক করে দেওয়া হবে সেইই ভারতে প্রাধান্য পাবে। মহাভারতে বিষ্ণুকে এইটাই করা হয়েছে, অনন্তের যে রূপ সেই রূপকে বিষ্ণুর মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে, ইন্দ্রকে তুলে ধরার জন্য কেউ ছিল না সেইজন্য ইন্দ্র নীচে পড়ে গেলেন। আজকে আমরা যখন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের দিকে তাকাই তখন দেখি তিনি মা কালীর মধ্যে অনন্তকে দেখেছিলেন, কিন্তু আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে অনন্তের সঙ্গে এক করে দিচ্ছি।

এখন যদি কেউ এসে বলে শ্রীরামকৃষ্ণ মা কালীর আরাধনা করেছিলেন কিন্তু বেলুড় মঠে কেন কোন কালীর মন্দির বা কালীর পূজা হয় না। এর কি উত্তর দেবে। এর কোন উত্তর নেই। আমি শ্রীরামকৃষ্ণকে অনন্ত রূপে দেখছি তাই সেইখানে আর কোন কিছুর স্থান থাকবে না। এটাই ভারতের বৈশিষ্ট্য এখানে যার সঙ্গে অনন্তকে জুড়ে দেওয়া হবে সেই প্রাধান্য পাবে। ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ এনারা সবাই কিন্তু অনন্তের সঙ্গে এক। একজন সাধক যে জিনিষের উপরে অনন্তকে জুরে দিয়ে জোর দেবে তার উপর নির্ভর করবে সারা ভারতের দৃষ্টি কোন দিকে চলে যাবে। আমরা যে বলছি ইন্দ্র, বরুণ এরা নীচে চলে গেলেন আর বিষ্ণু উপরে চলে গেলেন এটা কোন শক্তির তারতম্যের জন্য উপর নীচ হয়ে যায়নি, রচনাকারের দৃষ্টিভঙ্গীতে তিনি যাকে অনন্তের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন সেইই উপরে চলে গেলেন। ব্যসদেব ইন্দ্রকেও গুরুত্ব দিচ্ছেন না আবার বিষ্ণুকেও গুরুত্ব দিচ্ছেন না, তিনি জোড় দিচ্ছেন অনন্তের উপরে। মহাভারতের সময়ে ব্যসদেব দেখলেন ইন্দ্রের উপরে সাধারণ মানুষ এত বেশি ব্যক্তিত্বের আরোপ করেছে আর ইন্দ্রের চরিত্রে এত বেশি

গণ্ডগোল রয়েছে তিনি তখন ইন্দ্রকে ছেড়ে দিয়ে অন্য একটি আদর্শকে নিয়ে আসা অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করলেন। এই কারণে তিনি ইন্দ্রকে ছেড়ে দিয়ে বিষ্ণুকে নিয়ে এলেন। এখানে তিনি কোন ভুল করেননি, কারণ সব দেবতাই হচ্ছেন অনন্তের মুখ, আমি কাকে পছন্দ করছি কি করছি না তাতে কিছুই যায় আসে না। বেদের ইন্দ্র আর মহাভারত বা পুরানের বিষ্ণুর ধারনার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে মহাভারতে যে পার্থক্যটা করা হয়েছে তা হচ্ছে, মহাভারতে বিষ্ণুকে পুরুষের সঙ্গে এক করে দেওয়া হয়েছে, এখানে বলা হয়েছে যে বিষ্ণুই হচ্ছেন আদি পুরুষ, আর ইন্দ্রকে একজন সীমিত ব্যক্তিত্বের আধারে নামিয়ে দিয়েছে। আবার পুরানে বিষ্ণু আর শিবকে অনন্তের সাথে এক করে দিয়েছে। যারা বিষ্ণু ভক্ত তারা বিষ্ণুকে অনন্ত মনে করে আবার যারা শিব ভক্ত তার শিবকে অনন্ত মনে করে। আর যারা শক্তির ভক্ত তারা শক্তিকে অনন্ত মনে করে। আমাদের কাছে ঠাকুর হচ্ছেন অনন্তের মুখ, সেইজন্য অন্যান্য দেব-দেবীর সম্বন্ধে ধারনার ব্যাপারে আমাদের মনে কোথায় যেন একটা ঘাটতি থেকে যায়।

রুদ্রও হচ্ছেন বেদের খুব সাধারণ এক দেবতা। অথচ রুদ্রকে নিয়েও খুব বিখ্যাত মন্ত্র বেদে পাওয়া যায়, যেমন *ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্*। পরে একাদশ রুদ্রের যে দলপতি তাঁর সঙ্গে শিবকে এক করে দেওয়া হয়েছে। শিব, শঙ্কর, রুদ্রকে এক করে দিয়ে সেই অনন্তের সঙ্গে এক করে দিয়েছে। বেদে শিব বলে কিছু নেই বিষ্ণু আর রুদ্রকেই বেদে পাওয়া যাবে। তবে এনারা দুজনেই ইন্দ্রে অধীনে খুবই সাধারণ দেবতা। ভারত কিন্তু দেব-দেবীর পূজারী নয় দেব-দেবীর মধ্য দিয়ে আসলে ভারত অনন্তেরই আরাধনা করে আসছে। কিন্তু অনন্তকে এই ভাবে ঠিক পূজা করা যায় না বলে তারা একটা মুখকে ধরে নিয়ে সেই মুখকেই অনন্তের মুখ ধরে নিয়ে সমস্ত পূজা করে যাচ্ছে।

আমরা এখন বেদের কয়েকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রের ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি। কয়েকটি মন্ত্রকে ঠিক ঠিক ভাবে বুঝে নিলে বোঝা যাবে যে বেদ আসলে কি বলতে চাইছে, আর বেদের দর্শন কি ভাবে এগিয়েছে। একটি মন্ত্র আছে – ***য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব, উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবঃ। যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম*** (ঋ-১০/১২১-২) – বলছেন *কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম* – কোন দেবতাকে আমরা পূজো করব। হবিষার অর্থ যেটা আহুতি দেওয়া হচ্ছে, এখানে বলা হচ্ছে কোন দেবতাকে আমরা আহুতি দেব। এখানে যেটা বলা হচ্ছে সেটা দুটো অর্থে নেওয়া যেতে পারে। একটা অর্থ যিনি শ্রেষ্ঠ দেবতা তাঁরই আমরা ভজনা করব। *য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্বঃ*, যিনি শক্তি দিচ্ছেন, আমাদের সামর্থ্য দিচ্ছেন, আর *উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ* – যাঁর নিয়মকে সারা বিশ্ব পালন করে। *যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ* – যার ছায়া হচ্ছে একাধারে অমৃত আবার মৃত্যুও, দুটোই। মানে মৃত্যুও তাঁর অমৃতত্বও তাঁর। এখানে দুটো বিপরীতে জিনিষকে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে, মানে অমৃত আর মৃত্যু এই দুটোই তাঁর। সংস্কৃতে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, প্রশ্নবোধাত্মক চিহ্ন যেটা ইংরাজীতে এসেছিল সেটা সংস্কৃতে ছিল না। তার ফলে আগেকার দিনের সংস্কৃত বাক্যের অনেক সংশয়মূলক অর্থ হয়ে যেতে পারে। এই মন্ত্রটা খুবই অদ্ভুৎ এখানে প্রশ্ন করা হচ্ছে *কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম* – আমরা কোন দেবতার ভজনা করব কিন্তু এখনে কস্মৈ শব্দের কঃ হচ্ছে দেবতার নাম, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ যেমন দেবতার অনেক নাম আছে ঠিক তেমনি এই মন্ত্রের দেবতা হচ্ছেন একজন নৈর্ব্যক্তিক দেবতা, যাঁর নামই হচ্ছে কঃ। আবার কঃ শব্দের অর্থ হচ্ছে কে, কে সেই দেবতা যাকে আমরা ভজনা করব। এই কারণে এই মন্ত্রের অনেক ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যিনি শক্তি দেন, এখানে ইন্দ্র হতে পারেন, যাঁর নিয়মকে সবাই পালন করে এখানে বরুণ হয়ে যেতে পারেন, আবার যখন বলছেন *যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ* তখন অনেক দেবতা হয়ে যেতে পারেন। বেদে কিন্তু উল্লেখ করা হয়েছে এই মন্ত্রের দেবতা হচ্ছেন কঃ, কিন্তু ইদানিং কালে যখন কস্মৈ যেই এসে যাবে তখন এটা প্রশ্নবোধক হয়ে যাবে, তখন এর অর্থ হয়ে যাবে – এতগুলো দেবতার মধ্যে আমি কার পূজা করব। কিন্তু আবার এটাও হতে পারে কঃ বলে যে দেবতা আছেন যার মধ্যে এই গুণগুলো রয়েছে, যেমন যিনি শক্তি দেন, যাঁর নিমকে সবাই পালন করেন, যাঁর ছায়া মৃত্যু ও অমৃতত্ব, আমরা তাঁরই উপাসনা করছি।

তারপরের মন্ত্র হচ্ছে ***ত্রাতা নো বোধি দদৃশান আপিরভিখ্যাতা মর্ডিতা সোম্যানাম্। সখা পিতা পিতৃতমং পিতৃণাং কর্তেমু লোকমুশতে বয়োধাঃ।।*** *(ঋ-৪/১৭-১৭)।* আমরা এত দিন ধরে বেদের আলোচনা করে আমাদের একটা ধারণা আশা করি স্পষ্ট হয়েছে যে বেদের ঋষিরা ধ্যান করে করে যখন অনন্তে পৌঁছালেন তখন সেইখান থেকে তার অনন্তেরই একটা রূপ দিয়ে দিলেন ইন্দ্রাদি দেবতাদের মধ্যে। আরেকটা যেটা সম্ভবনা আছে, যেটা স্বামীজীও বলেছেন, প্রকৃতির যে বিভিন্ন শক্তিকে সব সময় দেখছেন, প্রকৃতির মধ্যে যে বিভিন্ন রকমের কাজ হচ্ছে, ঋষিরা প্রকৃতি থেকে তার শক্তিটাকে টেনে এনে তার যে আধ্যাত্মিক দিক আছে সেইটাকে ধ্যান করে করে তাঁরা একেবারে উচ্চতম অবস্থাতে নিয়ে গেছেন। অনেকে মনে করে বেদের দর্শন হচ্ছে কর্মকাণ্ড, এই এই যজ্ঞ কর, এই এই আহুতি, এই এই মন্ত্র পাঠ করলে তোমার এই এই ফল হবে আর মৃত্যুর পর তুমি ভালো স্বর্গে যাবে। কিন্তু বেদ যে শুধু কর্মকাণ্ডের কথাই বলেছে তা নয়, বেদ হচ্ছে উচ্চ দর্শনের বিশাল স্বর্ণখনি। বেদের এই উচ্চ দর্শনের জন্যই হিন্দু ধর্ম আজও পুরো আধ্যাত্মিক দর্শন ও উচ্চ তত্ত্বের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। এই মন্ত্রটা হচ্ছে ঋকবেদের মন্ত্র। এই মন্ত্রটি ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে, এখানে ইন্দ্রের কাছে যিনি অনন্ত তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে *ত্রাতা নো বোধি দদৃশান আপিরভিখ্যাতা মর্ডিতা সোম্যানাম্।* – তুমি আমার ত্রাতা হও। আর *দদৃশান আপির* – তুমি আমার আপনার জন হও। আমরা ইদানিং কালে যে ধরণের প্রার্থনা করি বেদেও ঠিক এই ভাবটাকেই পাচ্ছি।*অভিখ্যাতা মর্ডিতা সোম্যানাং* - তোমার সৌম্য রূপ, যেটা তোমার শান্ত রূপ, তোমার মঙ্গলময় রূপ সেই রূপ আমাদের দিকে দেখাও যাতে আমাদের মঙ্গল হয়। *সখা পিতা পিতৃতমং পিতৃণাং* তুমি আমার সখা, পিতা, *পিতৃতমং পিতৃণাং*, পিতৃণাং বলতে এক প্রকার ছোট দেবতাদের বোঝায়। আমাদের যেসব পূর্বপুরুষরা ভালো কাজ করে পিতৃলোকে গিয়ে বাস করছেন, যারা মৃত্যুর পর ভূত, প্রেত হয়ে যাননি, এই পিতৃপুরুষদেরও থেকেও আপনি শ্রেষ্ঠ। আর সখা, পিতা, আপনি হচ্ছে বন্ধু আপনিই আমার বাবা। এই যে এখানে বলছে আপনি আমার বন্ধু, আপনি আমার পিতা, আপনি আমার পিতারও পিতা, আপনি আমার পিতৃপুরুষদেরও পিতা, এই ভাবটা কখনই একজন ব্যক্তি ইন্দ্রের উপরে আরোপ করা যায় না। একটা জনপ্রিয় প্রার্থনা আমরা প্রায়ই শুনি – *ত্বমেব মাতা পিতা চ ত্বমেব*। গীতাতেও আমরা এই ভাবটা পাই – *পিতাহহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ*।(৯/১৭) বেদে ভক্ত যেটা প্রার্থনা করছে ভগবানকে উদ্দেশ্য করে, গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে ভক্তকে বলছেন – এই জগতের আমি পিতা, এই জগতের আমি মা, আর এই জগতের আমি বিধাতা, আমিই এই জগতকে ধারণ করে আছি, আর আমি হচ্ছি পিতামহ মানে আমি সবার ঠাকুর্দা। শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে বলছেন – পিতা মানে তিনি হচ্ছেন পরমপুরুষ, তাঁকে মাতা বলা হচ্ছে কারণ প্রকৃতি থেকেই সৃষ্টি হয়, তিনিই প্রকৃতি, আবার অন্য দিকে বলা হয় ব্রহ্মাই সব সৃষ্টি করেছেন, আমি এই ব্রহ্মারও বাবা। নারদ শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন – আপনি আমার পিতামহ। কারণ নারদ হচ্ছেন ব্রহ্মার মানসপুত্র, আর শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মারও পিতা। সেইজন্য কেউ যদি শ্রীরামকৃষ্ণকে দাদু বলে সম্বোধন করে তাহলে তাতে কোন ভুল হবে না। শ্রীরামকৃষ্ণকে মা বলে সম্বোধন করলেও কোন ভুল হবে না। ঋকবেদেই আমরা এই ভাবটা পাচ্ছি। এই ভাবগুলো আগে থাকতেই বেদে রয়েছে, কিন্তু বেদ ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কেউ পড়ত না বলে ব্যাসদেব বেদের এই ভাবগুলিকে নিয়েই আরেক শ্রেণীর নতুন সাহিত্য তৈরী করলেন।

বিদেশীরা যখন বেদের মন্ত্রগুলোকে অনুবাদ করল তখন তাদের অনুবাদের সাথে ভারতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের তীব্র মত পার্থক্য হয়। তার কারণ বিদেশীরা ইন্দ্রকে যে ভাবে উপস্থাপিত করল তার সাথে আমাদের যে পরম্পরাতে যে ইন্দ্রের ভাব পাই তা কখনই মিলবে না। পুরানে ইন্দ্রকে যে ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যেখানে বলছে ইন্দ্র লম্পট, ইন্দ্র মদ খেয়ে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু এই মন্ত্রে ইন্দ্রকে কিভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। ইন্দ্রের যে আসল ব্যক্তিত্ব সেটা আমরা বেদেই পাব, আর বেদ হচ্ছে সব কিছুর উৎস। বেদে ইন্দ্রকে কি বলছে – *ত্রাতা নো বোধি দদৃশান আপিরভিখ্যাতা* – তুমি আমার ত্রাতা হও, কারণ তুমি হচ্ছ আমার সখা, পিতা, পিতামহ, তুমি আমার পূর্বজদেরও পিতা। *কর্তেমু লোকমুশতে বয়োধাঃ*– যারা তোমার ভজনা করে, যারা তোমাকে পূজা করে তার সব কিছুতেই সুবিধা হয়ে যাচ্ছে। মনে রাখতে হবে আমরা

এখন ভগবান বলতে যাঁকে বুঝি তাঁকে এই প্রার্থনা করা হচ্ছে না। এখন যেমন শীতলাদেবী, মা ষষ্ঠীর মত ছোটখাটো দেব-দেবীর পূজা করা হয়, বেদের দেবতারা এই রকম দেবতা ছিলেন না, তাঁরা হচ্ছে একেকটি অনন্তের মুখ। বেদের দর্শনকে ঠিক ঠিক বুঝতে হলে এই জিনিষটাকে সব সময় মাথায় রেখে অধ্যয়ন করতে হবে।

সেই এক সত্তা কিন্তু তাঁর অনেক নাম – এই ভাবটাকেই এই মন্ত্রের মধ্যে খুব সুন্দর করে প্রকাশ করা হয়েছে। ***যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্ব। যো দেবানাং নামধা এক এব তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্য।।*** (ঋ-১০/৮২-৩)। *যো নঃ পিতা* – যিনি আমাদের বাবা, *জনিতা* – যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, যো বিধাতা – তুমি হচ্ছ সেই বিধাতা। বিধাতার সঠিক অর্থ হচ্ছে যার যেটা প্রাপ্য যিনি তাকে সেটাই দেন তিনিই হচ্ছেন বিধাতা। আমরা অনেক সময়ই মনে করি বিধাতা মানে ভগবান, ঠিক যেই অর্থে আমরা ভগবানকে বুঝি ঠি সেই অর্থে বিধাতাকে ভগবান বলা হয় না। মানুষ যখনই কোন কর্ম করছে তার একটা ফল হয়, এখন সেই কর্মের ফল সে ঠিক ঠিক পেল কি পেলনা এইটা যিনি দেখেন তিনিই হচ্ছে বিধাতা। বিধাতা হচ্ছেন কর্মফল দাতা, সবারই কর্মফল, একটা পিঁপড়ে থেকে শুরু করে পশু, পাখি, মানুষ সবারই কর্মফল দাতা তিনি, কর্মফল দাতা রূপে তিনিই হচ্ছেন সবার উপরে, সর্বশ্রেষ্ঠ। যে যেমনটি কর্ম করছে সে যেন তেমনটি ফল পায়।

আরেকটি ঠিক এই ধরণের মন্ত্র আমরা ঋক বেদেই পাচ্ছি – ***যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্ব। যোদেবানাং নাওমধা এক এব, তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্যা।।***(ঋ-১০/৮২-৩)। এই মন্ত্রের দেবতা হচ্ছেন বিশ্বকর্মা। আমরা আবার বিশ্বকর্মা বলতে বুঝি যাঁর পূজোর দিন ঘুড়ি ওড়ায়, কিন্তু এই বিশ্বকর্মাকে এখানে বলা হচ্ছে না। এই বিশ্বকর্মা হলেন একজন বৈদিক দেবতা। এর আগের মন্ত্রে দেখলাম ইন্দ্রকে পিতা বলা হয়েছে, এখন বিশ্বকর্মাকে পিতা বলা হচ্ছে। তারপরে বলছেন ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্ব – কার কি স্থান, কে কোথায় আছে সবটাই তিনি জানেন। *যো দেবানাং নামধা এক এব* – মূল ভাবটা এই লাইনেই বলা হচ্ছে। তিনি এক, এক ছাড়া দুই নয়। এক হয়েও তিনি বহু নাম বহু রূপের মধ্যে নিজেকে প্রকাশিত করে আছেন। বেদে বিচিত্র ধরণের ভাব আছে, একটা ভাবকে তাঁরা ধরে নেন, তারপর সেই ভাবেরই একজন দেবতা বানিয়ে দেন। বেদে ঈশ্বর বলে কিছু নেই, বেদে পুরুষের কথা আছে, ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ভাব ধারণা ইদানিং আমাদের আছে এই ভাবটাই ছিল পুরুষের মধ্যে, এই পুরুষই হচ্ছেন আদি পুরুষ। সেই পুরুষের ভাবমুর্তি বিশ্বকর্মার মধ্যে আরোপিত করে দেওয়া হল, যে বিশ্বকর্মা এই বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন, সেইখান থেকে বিশ্বকর্মাকে একজন দেবতা বানিয়ে দিল। সেইজন্য বেদাদি যদি ঠিকমত না বুঝে পড়া হয় তাহলে আমাদের অনেক সংশয়ের জন্ম দেবে। এই রকম অনেক কিছুতেই পাওয়া যাবে। যেমন দ্যাবা পৃথিবী, পৃথিবী নামে একটা জিনিষ আছে, সেইখান থেকে পৃথিবীকে একজন দেবী বানিয়ে দেওয়া হল। আবার সেই দেবী থেকে আবার অন্য একটা কিছু বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এখন বিশ্বকর্মা হচ্ছেন ভগবান, তিনি এই বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন। প্রথমে দেখছেন দেবতা এই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনিই হচ্ছেন এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, তারপরের ধাপে বলছেন সৃষ্টিকর্তা আর দেবতা এক। এই দেবতা হচ্ছেন ইংরাজী ছোট অক্ষরের ‘জি’ কিন্তু তাঁর মধ্যে ভগবানের সব গুণই আরোপিত করা হয়েছে। ভগবানের একটি কাজ যেমন সংহার মানে মৃত্যু, তাই ভগবানের একটি ক্ষমতা হচ্ছে বিনাশকারী। এই বিনাশরই একজন দেবতাকে দাঁড় করিয়ে দিল, যমরাজ। ঠিক সেই রকম, ভগবানের আরেকটি ক্ষমতা হচ্ছে তিনিই সৃষ্টি করেন, তিনি যখন সৃষ্টি করছেন তখন এটি তাঁর একটি কার্য হয়ে যাচ্ছে যার নামে হচ্ছে বিশ্ব কর্মণ, এখান থেকে বেদে করল কি একজন দেবতাকে সৃষ্টি করে দিয়ে নাম দিলেন বিশ্বকর্মা। কিন্তু বিশ্বকর্মা হয়ে গেছেন একজন মামুলি দেবতা, কিন্তু বেদের ঋষিরা এই বিশ্বকর্মাকেই অনন্তেরি একটি মুখ রূপে দেখেন। এখানে অনন্তের মুখ কিভাবে দেখা হচ্ছে? বিশ্বের সৃষ্টিকারী রূপে। যিনি অনন্ত তাঁর অনেক মুখ, বলা হয় বিশ্বতো মুখম্, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুখ, এই সব মুখের মধ্যে তাঁরই একটি

মুখ আছে যেটা দিয়ে তিনি এই জগৎকে সৃষ্টি করেন। এই একটি মুখও হচ্ছে অনন্ত, সেই একটি মুখই হচ্ছে বিশ্বকর্মা একজন দেবতা। একদিকে বিশ্বকর্মা হচ্ছেন একজন দেবতা আরেক দিকে তিনি হচ্ছে সেই অনন্তেরই একটি মুখ। এইটাই এইখানে বলছে *যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা*, কিন্তু আমরা বিশ্বকর্মা বলতে বুঝে যন্ত্রপাতির দেবতা, কলে কারখানাতে তাঁর পূজা হয়, আর ঘুড়ি ওড়ান হয়। কিন্তু বেদের বিশ্বকর্মা হচ্ছেন যিনি বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি ইন্দ্র, মিত্র, বরুণের মত একজন আলাদা দেবতা। ভগবানের থেকে দেবতা অনেক নীচে কিন্তু তা হোক, এই দেবতাদের আবার সে অনন্তের সাথে এক করে দেওয়া হচ্ছে। বেদের এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই সব কারণে বেদ বোঝা খুব কঠিন। এই কারণেই ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কাউকে বেদ পড়তে দেওয়া হত না। তাও আবার বত্রিশ বছর গুরুর কাছে মুখ থুবড়ে পড়ে থাক। মনু স্মৃতি বর্ণনা করা হয়েছে ব্রাহ্মণকে বত্রিশ বছর ধরে কি কি করতে হবে, বিয়ে করবে না, গুরুর কাছে পড়ে থেকে গুরুর সেবা করবে, রোজ গঙ্গা স্নান করবে, জপ করবে, হবিষ্যান্ন খাবে, জুতো পড়বে না, ছাতা ব্যবহার করবে না ইত্যাদি।

তারপরে বলছেন - *যো দেবানাং নামধা এক এব* – তিনি এক, সেই অনন্ত ঈশ্বর অথচ তাঁর অনেক নাম, যেমন তাঁর নাম ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অগ্নি। এখানে পূজা করা হচ্ছে বিশ্বকর্মাকে কিন্তু তাঁকে অনন্তের সাথে এক করা হচ্ছে, শুধু যে অনন্তের সাথে এক করে দেওয়া হচ্ছে তা নয়, অনন্তের যে আরো বিভিন্ন রূপ আছে তার সাথেও তাঁকে এক করে দেওয়া হচ্ছে। যারা বেদকে পৌত্তলিক পূজার প্রবর্তক বলে তারা যে কিছু না জেনে বুঝে বলছেন, এইখানে এসে সেটা পরিষ্কার ধরে পড়ে যায়। এদের হচ্ছে সব বই পড়া বিদ্যা, দর্শনের সম্বন্ধে কোন ধারাণাই নেই। বিশ্বকর্মার এই প্রার্থন ঋকবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদেও আছে। তাই এই প্রার্থনা মন্ত্রটি বেদের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র। আমরা আগে দেখেছি ঋকবেদের মন্ত্র হচ্ছে স্তবনের জন্য আর যজুর্বেদের মন্ত্র দিয়ে আহুতি দেওয়া হয়। এই মন্ত্রটি দিয়ে তাই দুটোই করা যায়, আহুতিও করা যায় আবার স্তুতিও করা যায়। যিনি এক তাঁকেই বিভিন্ন নামে সম্বোধন করা হয় - *যো দেবানাং নামধা এক এব। তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্য* – এই জিনিষটা বেদে অনেক জায়গায় আসে, যিনি সেই অনন্তের মুখ তাঁর দিকে যেন অবাক বিস্ময়ে, সংপ্রশ্নং, মানে প্রশ্নের দৃষ্টি নিয়ে তাকায়। ঋষি বলছেন – পুরো জিনিষটাই অবাক হয়ে যাওয়ার মত, ভক্ত অবাক বিস্ময়ে দেখেন তিনি সেই ভগবান, তিনিই এই বিশ্বকে সৃষ্টি করছেন, তিনি সেই এক, তাঁর বহু নাম।

একটা শিশু যখন জন্ম নেয় সে তখন কিভাবে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের দেবত্বের সাথে এক হয়ে যায় সেটাই এই মন্ত্রটিতে বলা হচ্ছে। পরের দিকে এই ভাবটাই উন্নীত হয়ে চলে আস অহং ব্রহ্মাস্মি তে, আমি সেই ব্রহ্মের সাথে এক – ***প্র ভ্রাতত্বং সুদানবোহধ দ্বিতা সমান্যা। মাতুর্গর্ভে ভরামহে।।*** (ঋ – ৮/৮৩-৮)। এই মন্ত্রের দেবতা হচ্ছেন বিশ্বেদেবা, বিশ্বেদেবা এক বিশেষ গোষ্টিভুক্ত দেবতা। ভগবান সর্বত্র বিরাজমান আবার সবার মধ্যেই তিনি আছেন, অর্থাৎ সারা বিশ্ব জুড়ে তিনিই আছেন – ভগবানের এই বৈশিষ্ট্যতাকে নিয়ে এক শ্রেণির দেবতা বানিয়ে দিলেন আর তার নাম দিলেন বিশ্বেদেবা। সেই বিশ্বেদেবাকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে – হে বিশ্বেদেবা, হে প্রাচুর্যদাতা, আমি যে মুহূর্তে মাতৃগর্ভে এসেছি সেই মুহূর্ত থেকে আমি তোমার দিব্য স্বভাব আর তোমার সাথে এক হয়ে গেলাম। এই মন্ত্রের যেটা বলতে চাইছে তা হচ্ছে, প্রকৃতির সাথে সমস্ত প্রাণির একটা একত্ব ভাব আছে, কোন আত্মা বা জীবাত্মা কোন ভাবেই প্রকৃতির থেকে বিছিন্ন নয়। একটা ক্ষুদ্র জীবাত্মার মধ্যেই এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটা ক্ষুদ্র সংস্করণকে ধরে রাখা হয়েছে। কেউ নিজেকে সবার থেকে আলাদা, পৃথক, বিচ্ছিন ভাবতে পারেনা। যে মুহূর্তে মাতৃগর্ভে জীবাত্মা নিজের অস্তিত্বকে নিশ্চিত করছে সেই মুহূর্তে থেকে সে এই বিশ্বেদেবার সাথে এক হয়ে গেল। ইদানিং কালে আমাদের মধ্যে যে সব ধারণা এসেছে, যেমন জীবাত্মা, যে জন্মেছে সে মরবেই, যে মরে গেছে যতক্ষণ তার মুক্তি না হয় তাকে আবার জন্ম গ্রহণ করতে হবে ইত্যাদি, এই ধারণাগুলো বেদে এত বেশি পুষ্টি লাভ করেনি। তাই বেদের ধারণা মাতৃগর্ভের প্রথম যে অস্তিত্ব পাচ্ছে সেই পর্যন্তই গেছে। বিজ্ঞানের কাছে এখন

সমস্যা যে মানুষের ব্যক্তি চৈতন্য প্রথম কখন আসছে? মাতৃগর্ভে আসছে, নাকি জন্মাবার পর আসছে? এটা একটা বিরাট সমস্যা। বিজ্ঞান এই ব্যাপারে এখন এক মত হতে পারছে না, বিভিন্ন ধর্মও এক মত হতে পারছে না। তবে মাতৃগর্ভে ছয় থেকে সাত মাস হলে শিশুর ব্যক্তি সত্তার চৈতন্য হয়, এটাই মোটামুটি এখন সবাই মেনে নিয়েছে। এই মন্ত্রে এইটাই প্রমাণ করছে যে বেদ জন্ম নেওয়ার পর শিশুর আলাদা সত্তা তৈরী হচ্ছে এটাকে মানছে না। বলা হচ্ছে আমি যখন মাতৃগর্ভে এলাম, এখানে আবার বলছে না যে মাতৃগর্ভে আসার কত দিন পরে হচ্ছে। আমরা পুরানে যে ভাবে পাই, আজকে হিন্দুদের মধ্যে যে বিশ্বাস তাতে বলা হচ্ছে মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যু চক্র চলতেই থাকবে। এই ধারণাকে গ্রহণ করলে এই মন্ত্রের কোন মূল্য নেই। কারণ যখন কেউ স্বর্গে থাকে, কেউ পশু পাখি হয়ে থাকে তখনও কিন্তু তার বিশ্বেদেবার সঙ্গে সম্পর্ক হয়ে রয়েছে। জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবাত্মা সূক্ষ্ম শরীরকে নিয়ে যে বিভিন্ন যোনি, বিভিন্ন লোকে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই ধারণাটা বেদের সময়ে তখনও পাকাপোক্ত হয়নি। কিন্তু এই মন্ত্রে এই ধারণারই একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তারপরে বলছেন –মা বাবা যেমন নিজের সন্তানকে আইনত ত্যাগ করতে পারেনা ঠিক তেমনি হে বিশ্বেদেবা, তুমি কিন্তু আমাকে কখনই ছেড়ে চলে যেতে পারবে না। আর আমি তোমার দেবত্বের একটি অঙ্গ হয়ে গেলাম।

এই মন্ত্রটাকে নিয়ে পরবর্তিকালে অনেক দর্শন তৈরী হয়েছে, অনেকেই অনেক কিছু লিখেছেন। যেমন বলা হয়েছে – যে মুহূর্তে আমি মাতৃগর্ভে এসেছি সেই মুহূর্তে আমি তোমার দিব্য স্বভাবের অবিচ্ছেদ অঙ্গ হয়ে গেছি। এরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়, যেটা স্বামীজী উল্লেখ করেছিলেন – *শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্যা পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি*। মানুষের মধ্যে যে দেবত্বের কথা বলা হয়, এই দেবত্ব ঠিক কোন জায়গা থেকে শুরু হয়? বলা হচ্ছে যে মুহূর্তে সে মাতৃগর্ভে এলো, এই বিন্দু থেকেই সে দেবত্বের অধিকারী হয়ে গেল। সাধনা করে করে আমি যখন ঈশ্বরের সঙ্গে আমার একত্বকে উপলব্ধি করার পরেই যে আমি দেবত্বের অধিকারী হচ্ছি তা নয়। দেবত্ব আমার মধ্যে সুপ্ত হয়ে রয়েছে, এই সুপ্ত অবস্থার কথাই এই মন্ত্রে বলা হচ্ছে। সাধনার দ্বারা যখন আমার জ্ঞান হবে তখন এই সুপ্ত দেবত্ব প্রকাশ হবে। মাতৃ জঠরে যখন কোন প্রাণের সঞ্চার হয় তখন তার মধ্যে দেবত্ব সুপ্ত অবস্থায় চলে আসে। এই দেবত্বকেই এখন উপলব্ধি করতে হবে। অন্তর্নিহিত সুপ্ত দেবত্বকে জাগ্রত করার কথাই এই মন্ত্রে বলা হচ্ছে।

কারা ভগবানের পূজা করে? গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন চার ধরণের মানুষ ভগবানের আরাধনা করে – আর্ত, যে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে আছে, জিজ্ঞাসু, যার মনে ভগবানকে নিয়ে, ধর্ম নিয়ে নানা রকমের প্রশ্ন উঠছে, তৃতীয় হচ্ছে অর্থার্থী, যে টাকা পয়সা চায়, সুখ ভোগ করতে চাইছে আর চতুর্থ হচ্ছে জ্ঞানী, যিনি নিজের স্বভাবকে জানেন আর ভগবানের স্বভাবকেও জানেন। শ্রীকৃষ্ণ তারপর বলছেন – এই চারজনই আমার প্রিয়, যে ভোগ করতে চাইছে বলে আমার আরাধনা করছে, যে দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত হতে চাইছে, আর যার মনে অনেক অনুসন্ধিৎসা এরা সবাই আমার প্রিয় কিন্তু জ্ঞানী যারা তারাই হচ্ছে আমার সবার থেকে প্রিয়, তারাই হচ্ছে আমার প্রকৃত প্রেমিক, জ্ঞানীরা আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে আমিও জ্ঞানীদের সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। গীতার এই ভাবটা আমরা কিন্তু বেদেই পেয়ে যাই – ***অগ্নিং মন্দ্রং পুরুপ্রিয়ং, শীরং পাবকশোচিষম্। হৃদিভির্ মন্দ্রেভির্ ঈমহে।।*** (ঋ-৮/৪৩-৩১)। এই মন্ত্রের দেবতা হলেন অগ্নিদেবতা। আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে আমি অগ্নির কাছে প্রার্থনা করছি। মন্দ্রং মানে আনন্দলোক, আমি আমার আনন্দ দিয়ে সেই আনন্দের পূজা করছি। বৈদিক ধর্মের সাথে অন্যান্য প্রাচীন ধর্মের মধ্যে এইখানেই পার্থক্য দেখা যায়। ফ্রয়েডের থিয়োরিতে ধর্মের উৎস হচ্ছে ভয়। তাদের মতে জগতে যা কিছু হয় লিভিডো আর মর্ডিডোর জন্য, লিভিডো হচ্ছে ভালোবাসার আকাঙ্খা আর মর্ডিডো হচ্ছে ধ্বংস করার বাসনা। এদের কাছে desire to love and desire to destruction এই দুটো ছাড়া জগতে আর কিছু নেই। যদিও ফ্রয়েডের থিয়োরি সভ্য সমাজ বাতিল করে দিয়েছে কিন্তু এক সময় সারা বিশ্বের সমস্ত বুদ্ধিজীবিদের বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ফ্রয়েডের থিয়োরি প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল। এখনও অনেকে অনেক

ব্যাপারে ফ্রয়েডের কথা উল্লেখ করেন। ফ্রয়েড বললেন ধর্মের উৎস এই লিভিডো আর মর্ডিডো। কালীঘাটে বলি দেয় এর পেছনে আছে desire to destruction, নিজের ভেতরে যে হিংসা ভাব রয়েছে সেই হিংসা ভাবটা পাঁঠাকে বলি দিয়ে মিটিয়ে নিচ্ছে। আবার মানুষ যেমন নিজের বাবাকে ভালোবাসে, আবার ভয়ও পায়, এই ভয় থেকে বাবাকে শ্রদ্ধা করে, ঈশ্বরকেও মানুষ ভয়ে ভালোবাসে, পূজা করে। আজকে শ্রীরামকৃষ্ণের যে ধর্ম তার সাথে ওল্ড টেস্টামেন্টের তুলনা করা যাবে না, কারণ ওল্ড টেস্টামেন্টের ধর্ম খুবই প্রাচীন। তখনকার মানুষের যে চিন্তা ভাবনা ছিল তার সাথে আজকের মানুষের চিন্তা ভাবনাকে তুলনা করা যাবে না। কিন্তু ওল্ড টেস্টামেন্টের সাথে আমরা বেদের তুলনা করতে পারি। কিন্তু ওল্ড টেস্টামেন্টের থেকে বেদ আবার পাঁচ থেকে ছয় হাজার বছরের পুরনো। তাতেও দেখা যাবে বেদের তুলনায় ওল্ড টেস্টামেন্টের ঈশ্বরের ধারণা অনেক অপরিণত। আর ওল্ড টেস্টামেন্টের বিভিন্ন অপরিণত ধারণাকে আধার করেই ফ্রয়েড নিজের সব আজগুবি থিয়োরি তৈরী করেছিলেন। এখানে এই মন্ত্রে বেদ কি বলছে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে - অগ্নিং মন্দ্রং পুরুপ্রিয়ং – আমরা হৃদয়ের আনন্দ দিয়ে আমাদের আনন্দের বিগ্রহকে, যিনি আনন্দের প্রতিমুর্তি তাঁর উপাসনা করছি। অথচ কার পূজা করছে? অগ্নির, সে তো সবাইকে তার দাহিকা শক্তি দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। কিন্তু তাঁকেই বলা হচ্ছে আনন্দের প্রতিমুর্তি, আধ্যাত্মিকতার অনুভূতি যতক্ষণ ভেতরে না হবে ততক্ষণ এই জিনিষ কখনই আসবে না। প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক সমাজে সে প্রাচীন কালেই হোক আর আজকেই হোক সব ক্ষেত্রে আগুনকে মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই ভয় পায়। তা সত্ত্বেও বেদ বলছে অগ্নি হচ্ছেন আনন্দের বিগ্রহ, আমরা আমাদের হৃদয়ের আনন্দ দিয়ে তাঁর পূজা করছি। অগ্নির যেটা স্থূল রূপ, যেটাকে জাগতিক রূপে দেখছি, তার যদি পূজা করা হত তাহলে আর এই মন্ত্রটা আসত না।

এবারে আরেকটি মন্ত্র ইন্দ্রের প্রতি, যার নাম হচ্ছে God the Saviour, ***ত্রাতারম্ ইন্দ্রম্ অবিতারম্ ইন্দ্রং হবেহবে সুহবং শূরম্ ইন্দ্রম্। হুয়ামি শক্রং পুরুহুতম্ ইন্দ্রং স্বস্তি নো মঘবা ধাত্বিন্দ্রঃ।।*** (ঋ-৭/৪৭-১১)। এই মন্ত্রের মধ্যে একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখনীয় হল এখানে সর্ব সাধারণের যে অবিনশ্বর দেবতা আছেন তাঁর কতকগুলি গুণাবলীর বর্ণনা করা হচ্ছে। যাঁরা দীক্ষাদি নিয়েছেন তাঁরা নিজেদের মত পূজা করেন, যা পুরোটাই নিজস্ব স্বকীয়তাতে আবদ্ধ। আবার এই পূজা সর্ব সাধারণের মধ্যেও হচ্ছে, যেমন দুর্গাপূজা – এইভাবে পূজা দুই ভাবে করা হয় ব্যাক্তিগত ও জনসাধারণের সমষ্টিগত ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। এই মন্ত্রটির অর্থ করলে দেখা যায় যে এটি সবাই একত্র সমবেত হয়ে ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করছেন।

অনেকে বলেন যে অথর্ববেদে নানান রকমের টোটকা দেওয়া আছে, যেমন কারুর এক বিশেষ ধরণের জ্বর হয়েছে সেটাকে সারাতে গেলে কি করতে হবে, অমুক ঝামেলা হয়ে গেছে সেটা দূর করতে গেলে এই এই করতে হবে ইত্যাদি, কিন্তু এই জিনিষ যে শুধু অথর্ববেদেই আছে তাই নয়, ঋকবেদেও এই জিনিষ পাওয়া যাবে। এই মন্ত্রটা ঋকবেদ থেকে নেওয়া হয়েছে, এই মন্ত্রের শুধু শবার্থ করলে একটা টোটকা মনে হবে। এই মন্ত্রের দেবতাও হচ্ছেন ইন্দ্র। একজন মনের ব্যাথাতে রয়েছেন, এখন সে কোথায় যাবে? ভগবান ছাড়া আর কাউকে জানেই না। সে বেদনার সাথে প্রার্থনা করছে – ***মূষো ন শিশ্না ব্যদন্তি মাধ্যঃ স্তোতারং তে শতক্রতো। সকৃৎ সু নো মঘবন্নিন্দ্র মৃডয়াহধা পিতেব নো ভব।।*** যেমন প্রার্থনার গভীরতা তেমনি তার কবিত্ব। তাঁতিরা যে তাঁত বোনে, সেখানে যে সুতো দিয়ে তাঁত বোনা হচ্ছে তার মধ্যে যদি একটা ইঁদুর ঢুকে পড়ে তাহলে কাপড় বোনার যে আসল সুতোগুলো থাকে ইঁদুর সেই সুতোগুলিকে কেটে দেবে, তখন আর গামছাই তৈরী হবে কি করে আর শাড়িই বা কি করে বানান হবে। ঋষি এখানে বলছেন আমার মনে এমন বেদনা, এমন ব্যাথা যে সেই বেদনা ইঁদুরের মত আমার হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রিগুলোকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। আমি কে? *স্তোতারং তে শতক্রতো* – হে শতক্রতো, আমি আপনার স্তুতিকারী, আমি আপনার একান্ত ভক্ত। শতক্রতো হচ্ছেন ইন্দ্র, হে ইন্দ্র আমি তোমার ভক্ত, তুমি তোমার ভক্তের উপর কৃপা কর। ইঁদুর এসে যেমন তাঁতির তাঁতবোনার সুতোগুলো কেটে দিয়ে যায়, ঠিক তেমন ব্যাথা, বেদনা আমার

হৃদয়কে বিদীর্ণ করে দিচ্ছে। তারপরে বলছেন *সকৃৎ সু নো মঘবন ইন্দ্র*, মঘবনও ইন্দ্রের আরেকটি নাম, হে ইন্দ্র আপনি আরেকবার আমার দিকে কৃপা দৃষ্টি দিন, যেমন *মৃডয়াহধা পিতেব নো ভব* – বেদে মায়ের থেকে পিতাকে বেশি স্থান দেওয়া হয়েছে, শক্তির উপাসনা বেদে খুব সামান্য। দেবীসূক্তম্, মেধাসূক্তম্ এগুলো হচ্ছে বেদের খুব বিরল সূক্তম যা দেবীর উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বেদে যখন সন্তান রূপে প্রার্থনা করছে তখন সে পিতার সন্তান রূপেই প্রার্থনা করছে, মায়ের সন্তান হিসাবে প্রার্থনা করছে না। বেদে মায়ের উল্লেখ প্রায় পাওয়াই যায় না, মাতৃর স্থান, নারীর স্থান খুব নীচে। খুব বিরল কখন একটা দুটো মাতৃ বন্দনা দেখা যায়। বেদে যত দিব্য ব্যক্তিত্ব আছে বেশির ভাগই পুরুষ। সেইজন্য এই মন্ত্রেও বলা হচ্ছে *মৃডয়াহধা পিতেব নো ভব* – বাবা যেমন তাঁর সন্তানকে রক্ষা করেন তুমিও সেই রকম আমাকে রক্ষা কর। আমার যে এত বেদনা, এত কষ্ট আমি তোমাকে ছাড়া কাকেই বা জানাব আর কোথায় বা যাব। আর আমি তো তোমার ভক্ত, তোমার নিত্য পূজা করি, আমি যা তা কেউ নয়, আমি তোমার দরবারে হঠাৎ উটকো লোক হিসেবে হাজির হয়নি। ঋকবেদ হচ্ছে বিশেষ করে স্তুতি গ্রন্থ। একজন ভক্ত ব্রাহ্মণ খুব অভিমান করে এই স্তুতি করছেন। এই মন্ত্রকে একটা নিছক সুন্দর কবিতা বলে মনে করলে খুব ভুল হবে। যারই মনে ব্যাথা আছে বুকে একরাশ বেদনা আছে সে যদি এই মন্ত্রটিকে সাধনা মনে করে রোজ প্রার্থনা করে তাহলে তার অন্তরের সব ব্যাথা বেদনা চলে যাবে। বেদের প্রত্যেকটি মন্ত্রের একটা আধ্যাত্মিক মূল্য আছে, আধ্যাত্মিক মূল্য মানে, যে কোন মন্ত্রকে যদি সাধনা মনে করে কেউ প্রার্থনা করে তাহলে ঐ মন্ত্রের শক্তি তার মধ্যে কাজ করে তার অনেক কিছু বাধা বিপদ কাটিয়ে দেবে। যেমন মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র, এই মন্ত্র যদি কেউ জপ করে তাহলে যার কোন বিপদ হবার সম্ভবনা আছে সেটা কেটে যাবে।

বেদ – ৩রা এপ্রিল ২০১০

বেদের প্রধান বিষয় হল যজ্ঞ। যজুর্বেদের মন্ত্রগুলি যজ্ঞে ব্যবহৃত হত। ঋকবেদের মন্ত্র স্তুতির কাজে ব্যবহার করা হত। সামবেদের মন্ত্রগুলি গানের জন্য, যার জন্য সামবেদের মন্ত্রগুলিকে সামগান নামে অভিহিত করা হত। হিন্দুদের ধর্মই হল যজ্ঞ প্রধান। যখন কোন মানুষ, কোন সমাজ বা কোন দেশ কোন ধর্মীয় কাজ করে, কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে তখন তাকেই আমরা যজ্ঞ বলি। ধর্মমূলক বা ধর্মভাব নিয়ে যাই করা হবে সেটাকেই যজ্ঞ বলা হয়। আমরা সারাদিনে অনেক রকম কাজ করে থাকি, খাওয়া, শোওয়া, বসা, হাঁটা চলা, থুতু ফেলা সবই কাজ, কিন্তু এই কাজগুলিকে আমরা সাধারণত বলি জাগতিক কাজ। এমনকি যাদের মন এখনও নিয়ন্ত্রিত হয়নি, তাদের কাছে এগুলো জাগতিক কাজ রূপেও ধরা হয়না, এগুলোকে গর্হিত কর্ম রূপে গণ্য করা হয়ে থাকে।

আমাদের মত সাধারণ লোকেরা সারাদিন ধরে যা কাজ করছি এই সমস্ত কাজ জাগতিক থেকে গর্হিত কর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। মানব জীবন জাগতিক কর্ম আর গর্হিত কর্মের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। কিন্তু যে কোন কাজই, সেটা জাগতিক হোক কিংবা গর্হিত হোক, যখন ধর্মের মনোভাব নিয়ে করা হবে, যে কোন কাজের পেছনে ধর্মের যোগানটাকে লাগিয়ে দেওয়া হয় তখন এই কাজটাই যজ্ঞ হয়ে যাবে। আগেকার দিনে, এখনও কোথাও কোথাও যখন চাষের কাজ শুরু হয় তখন চাষীরা ভগবানের নাম করতে করতে বীজ রোপণ করে, যখন বৃক্ষাদির চারা রোপণ করা হয় তখনও ভগবানের নাম নিয়ে চারা লাগান হয়। বেদে বৃক্ষা রোপণের মন্ত্র আছে। শ্রীমায়ের জীবনে তেলেভুলো মাঠের ডাকাত বাবা মার কাহিনী আমরা সবাই জানি। ডাকাতি করতে যাচ্ছে তখনও মায়ের নাম করে ডাকাতি করতে যাচ্ছে। ডাকাতি কর্ম হচ্ছে অত্যন্ত গর্হিত কর্ম, কিন্তু তার কাছে এসব কিছুই নয়, মাকালীর কাছে পূজা দিয়ে সেই কাজ করতে যাচ্ছে, তার মনে এর জন্য কোন পাপ বোধ নেই। কেন তার মনে পাপ বোধ নেই? কারণ সে ওটাকে যজ্ঞ হিসাবে নিচ্ছে। কোন পশুকে বলি দেওয়াটাও একটা গর্হিত কর্ম, কিন্তু বলিটা যজ্ঞ রূপে নিচ্ছে। যখনই কোন কর্মের পেছনে ধর্মের শক্তিকে লাগিয়ে দেবে, তা যতই গর্হিত কর্ম হোক না কেন, সেটাই যজ্ঞ হয়ে যাবে।

গীতাতে ভগবান বলছেন যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস অত্যন্ত সাধারণ জিনিষ, শিশু জন্ম নিয়েই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে, সেটাও যজ্ঞ রূপে করতে বলছেন। যে মানুষ মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার জন্য অপেক্ষা করছে আর যে শিশু জন্ম নিয়েই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে শুরু করল, সেই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকেও যজ্ঞ রূপে নিতে বলা হচ্ছে। এই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকে কিভাবে যজ্ঞ রূপে নিতে বলছেন? এই নিঃশ্বাস প্রশ্বাসকে যখন আধ্যাত্মিক রূপ দিয়ে দেয় তখন সেটাই হয়ে যায় প্রাণায়াম। *অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাহপরে। প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণঃ।*(৪/২৯)। আমরা যে যজ্ঞের কথা বলছি গীতার তৃতীয় আর চতুর্থ অধ্যায়ে যজ্ঞের এই ভাবটাকে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন। স্বামী স্ত্রী যখন এক সঙ্গে থাকে তখন সেটাকেও যজ্ঞ রূপে নিতে বলা হচ্ছে। সমস্ত কর্মকেই যজ্ঞ রূপে নিতে বলছেন। এমন কোন কর্ম আমাদের জানা নেই যে যেটাকে যজ্ঞ রূপে করা যায় না, শুধু ঐ কর্মের সঙ্গে ভগবানকে জুড়ে দিতে হবে। ঠাকুর কালিপদ ঘোষকে বলছেন – যখন মদ খাবি তখন মাকে নিবেদন করে খাস্। যেই মাকে অর্পণ করে খাবে তখন এই মদ খাওয়া মাতলাম করাটাই যজ্ঞ হয়ে গেল। গ্রামের লোকেরা যখন ওজন করে তখনও রাম নাম নিয়ে ওজন করছে।

যতক্ষণ সমস্ত কর্মকে যজ্ঞে না রূপান্তরিত করা যাবে ততদিন জীবনে অশান্তির শেষ হবে না। যারই জীবনে অশান্তি লেগে আছে বুঝে নিতে হবে সে যা কর্ম করে সেই কর্মগুলি সে যজ্ঞের মনোভাব নিয়ে করে না। যেদিন থেকে প্রত্যেকটি কাজকে যজ্ঞের মনোভাব নিয়ে করতে শুরু করবে, থুতু ফেললাম যজ্ঞ, স্নান করলাম যজ্ঞ, খাচ্ছি যজ্ঞ, ঝগড়া করছি যজ্ঞ আর যে জিনিষটা করতে গিয়ে আমার যজ্ঞ বোধ হবে না সে জিনিষটা আমি কখনই করতে যাব না, জীবনে তার কখনই অশান্তি আসতেই পারবে না। আমরা এখানে

শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে এসেছি, এখানে আমাদের কেউ কাউকে চিনতাম না, কিন্তু আমরা সবাই ঠাকুরকে জানি, ঠাকুরকে কেন্দ্র করেই আমাদের সম্পর্ক তৈরী হয়েছে আর এখানে আমরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে এসেছি, এই কর্মের পেছনে আছে ঠাকুর, তাই এটাও একটা যজ্ঞ। আমাদের সব কর্মকেই এইভাবে দেখতে হবে। আমি একজনকে পছন্দ করিনা, কিন্তু সে আমার সাথে কথা বলতে চাইছে, আমি যদি তার সাথে কথা বলাটাকে যজ্ঞ হিসাবে না নিতে পারি তাহলে আমার উচিৎ তাকে পরিহার করে চলা। যজ্ঞ রূপে না নিলে আমার মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে, আমার মনে অশান্তি চলে আসবে। যদি যজ্ঞ রূপে নিয়ে তার সাথে কথা বলি তাহলে কখনই মনের মধ্যে কোন ধরণের বিকার আসবে না।

আমরা এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিষকে নিয়ে আলোচনা করছি। কারণ সমগ্র বেদ আর তার পুরো সাহিত্যের একটা দিকেই ইঙ্গিত করছে, সেটা হচ্ছে যজ্ঞ। Yajna is the consecration of the mundane to the divine, জাগতিক যা কিছু আছে সব কিছুকে ঈশ্বরের অর্পণ করে দেওয়াটাই হচ্ছে যজ্ঞ। একজন দক্ষিণ ভারতীয় মহিলা চেন্নাই মঠে রাজা মহারাজকে প্রণাম করতে গেছেন। প্রণাম করে ঐ মহিলা রাজা মহারাজকে বলছেন ‘মহারাজ, আমি আপনাকে কিছু দিতে চাই, আপনি বলুন আপনাকে আমি কি দিতে পারি’। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী খুব মুডি লোক ছিলেন, হয়তো শুনলেন কেউ একজন তাঁর সাথে দেখা করতে আসছে, তিনি চাইছেন না ঐ লোকটির সাথে দেখা করতে, তিনি দুই জনকে ধরে তাস বার করে তাস খেলতে শুরু করে দিতেন। সেই লোকটি যখন এসে দেখবে যে যাঁর নামে এত কথা শুনেছি, উনি নাকি শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান, উনি আবার তাস খেলছেন। তাস খেলছে দেখেই ভদ্রলোক চলে যেত। আরেকবার শুনলেন কেউ আসছে, তার সাথে কথা না বলতে হয় তাই উনি তাড়াতাড়ি ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে বসে গেলেন। তাস খেলা, ছিপ দিয়ে মাছ ধরা এগুলো ছিল তার কিছু লোককে কাটাবার জন্য। তখন রাজা মহারাজ ভদ্রমহিলার কথা শুনে বললেন ‘তুমি এক কাজ কর, তোমার সবচেয়ে যেটা প্রিয় জিনিষ সেটা আমাকে দিয়ে দাও’। ভদ্রমহিলা ছিলেন অত্যন্ত বিদুষী, অনেক চিন্তা ভাবনা করার পর উনি বলছেন ‘মহারাজ, আমার অমুক ছেলে আমার সবচেয়ে প্রিয়, এই নিন আমি ওকেই আপনাকে দিলাম’। মানে অর্পণ করে দিলেন। পরবর্তিকালে ঐ ছেলেটিই সাধু হয়ে স্বামী তপস্যানন্দ হলেন। পরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। ওনার অনেক লেখা বই আছে। এইটাই হচ্ছে consecration, এ আমার সন্তান, আমার সবচেয়ে প্রিয়, আমি আমার গুরুকেও ভালোবাসি, তাই সবচেয়ে প্রিয় জিনিষটাই গুরুকে অর্পণ করে দিলাম।

এইটাই হচ্ছে ঠিক ঠিক ঈশ্বরে অর্পণ, যে অর্পণ করছে সে মহৎ হয়ে যায়, যে জিনিষটা অর্পণ করছে সেটাও মহৎ হয়ে যায়। অথচ আমরা যখন অর্পণ করি তখন কত হিসাব কষে ভগবানকে কিছু দেই। একজন সাধুকে তার ভাষণ শোনার পর এক ভক্ত এক টাকা প্রণামী দিচ্ছে তাও বলছে ষোল আনা দিতে হয় তাই দেওয়া। রাস্থার ভিখারীও এক টাকা নিতে চায়না। তাই আমাদের জীবনে অশান্তিরও শেষ নেই। এটা কখনই consecration নয়। যজ্ঞ যখন করতে যাব তখন এই consecration এর মনোভাব নিয়েই যজ্ঞ করতে হবে। আমার যা কিছু জাগতিক আছে, সেটাকে অর্পণ করে দিতে হবে, হে ঈশ্বর এ আমার নয়, এটা তোমারই জিনিষ। গর্হিত জিনিষকে অত্যন্ত পবিত্র জিনিষে এইভাবে রূপান্তরিত করে দিতে হবে। মাংস খাওয়া, মদ খাওয়া এগুলো হচ্ছে গর্হিত, তারপরে ছেলেমেয়েদের যে সম্পর্ক সেটাও গর্হিত এগুলো একেবারেই করতে নেই। কিন্তু এগুলোই যখন যজ্ঞের মনোভাব নিয়ে করা হবে তখন এগুলোই পবিত্র কর্মতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে, তন্ত্রে এইটাই করা হয়, মাছ, মাংস, মদ, মৈথুন এগুলোকে মায়ের কাছে consecrate করে দেওয়া হয়।

একটি হল জাগতিক দুনিয়া আরেকটি আধ্যাত্মিক দুনিয়া। কিন্তু যাঁরা খুব উচ্চস্তরে আছেন, যেমন ঠাকুর, এনাদের কাছে জাগতিক বলে কিছু নেই সবটাই তাঁদের কাছে আধ্যাত্মিক, তাঁরা দেখেন একমাত্র আত্মাই আছেন, আত্মা ছাড়া কিছু নেই। আমাদের মত সাধারণ লোকের দুই রকমের দৃষ্টি – একটা

জাগতিক আরেকটা আধ্যাত্মিক। জাগতিককে থেকে আধ্যাত্মিকে যাওয়ার যে সেতু তা হল যজ্ঞ। যজ্ঞ হচ্ছে জাগতিক ও আধ্যাত্মিকতার সেতুবন্ধন। পাড়ার ইয়ং ছেলেদের কত এনার্জী, সারাটা বছর রকে আড্ডা মারছে, কত রকমের ইয়ার্কি ফাজলামি করে সময় কাটাচ্ছে, কিন্তু যেই দুর্গাপূজা এসে যাবে এদের দেখুন কি উৎসাহ নিয়ে পূজার কাজে নেমে গেল। নাচুক, গান করুক, ঢাক পেটাক যাই করুক, কিন্তু কোথাও তার মনের মধ্যে একটা সুর বাজতে থাকবে যে মা দুর্গার পূজা হচ্ছে। দশ বছর পর যখন সে বিদেশে চলে যাবে তখন সেখানে দুর্গাপূজার সময় তার মনে পড়ে যাবে আমিও এক সময় দুর্গাপূজা করতাম, মনের কোথাও একটা তার জেগে উঠবে। খুব সাধারণ জিনিষই জীবনকে পাল্টে দেবে। কিভাবে? যে কোন জিনিষকে যখনই কিছু ধর্মের সাথে জুড়ে দিচ্ছে, সেইখান থেকেই জীবনটা পাল্টাতে থাকবে, একদিনে হয়তো হবে না, সময় লাগবে, কিন্তু হবেই হবে। এইটাই হচ্ছে যজ্ঞের মহিমা, জাগতিককে আধ্যাত্মিকতার সাথে জুড়ে দিচ্ছে যজ্ঞ।

আমি নিজেকে ছোট করে রেখেছি, কিন্তু শাস্ত্র বলছে তুমি সেই পূর্ণ আত্মা, কিন্তু আমি নিজেকে একটা দ্বিপদ বিশিষ্ট মানুষ রূপে ভেবে রেখেছি, আমার শীত লাগে, আমার গরম লাগে, আমার দুঃখ, আমার আনন্দ হয়, আমার কষ্ট আছে, আমার সুখ আছে। এই প্রকৃতি যেন আমাকে ছোট করে থাকতে বাধ্য করছে। একটা বাঘকে জঙ্গল থেকে ধরে এনে খাঁচার মধ্যে রেখে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিলাম। তারপর যখন না খেয়ে খেয়ে দুর্বল হয়ে যাবে তখন তাকে খুব করে পেটাতে থাকলাম। এরপর একটা বাচ্চা ছেলে যদি একটা ঝাঁটার কাঠি নিয়ে খাঁচার কাছে গিয়ে খোঁচা দেয় তাতেই সে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে শুরু করবে। আমাদের দেশের উচ্চবর্ণের লোকেরা আগেকার দিনে নিম্নবর্ণের লোকেদের না খেতে দিয়ে যে কোন অজুহাত দিয়ে অত্যাচার করত, এইভাবে এইসব মানুষদের ব্যক্তিত্বকে একেবারে শেষ করে দেওয়া হয়েছিল। তাদেরকে ছোট হতে বাধ্য করা হয়েছিল। কিছু দিন আগেও কোন মেয়েকে যখন বিয়ে করে ঘরে আনা হত তারপর থেকেই সেই বধুর উপরে নির্যাতন করে করে তার মানসিকতাকে, তার ব্যক্তিত্বকে ক্ষুদ্র বানিয়ে দেওয়া হত। আজকে গ্রামের লোকেদের পেটে দুটো অন্ন যেতে শুরু করেছে এখন তারাও উল্টো আক্রমণ করতে আরম্ভ করেছে। ঐ বাঘকেই অত অত্যাচার করার পর তাকে কয়েক দিন খুবসে মাংস খাওয়ার পর তাকে একবার খোঁচা দিতে গেলেই সে এমন গর্জন করতে থাকবে যে পিলে চমকে যাবে। তার মানে হচ্ছে, যাকে জোর করে ছোট করে রেখেছিলাম সে এখন জাগ্রত হতে শুরু করেছে। যিনি সর্বব্যাপী, যিনি অনন্ত তাঁকে জোর করে এই শরীরের মধ্যে ছোট্ট করে রাখা হয়েছে। আমাদের সবাই হচ্ছি খাঁচার বাঘের মত, আমরা সেই সর্বব্যপী আত্মা, কিন্তু প্রকৃতি আমাকে জোর করে ছোট করে রেখেছে আর আমরাও জগতের কান্না দেখে কাঁদছি, জগতের হাসি দেখে খিক্ খিক্ করে হাসছি। কারণ আমাদের পেটে অন্ন নেই, আবার উপর থেকে মার খেয়েই চলেছি, পেটে অন্ন নেই মানে, দিব্য আধ্যাত্মিক রসদ যেটা আমাকে পুষ্টি দেবে সেটা যাচ্ছে না, আর অন্য দিকে জগতের সুখ-দুঃখ আমাকে মারছে। ফলে একটু কিছুতেই আমরা ভয়ে কাঁপতে থাকি। যজ্ঞ যখন এসে যায়, যজ্ঞ করে কি ঐ মুক্তির মার্গটাকে দেখিয়ে দেয়। যজ্ঞ যেই এসে যাবে তাকে যেটা জোর করে ছোট করে রাখা হয়েছিল সেটা সরে যেতে থাকে আর ততই সেই নিজেকে প্রসার করে অনন্তের সঙ্গে একাত্ম হতে থাকে।

যজ্ঞ তাহলে কি কি কি করছে? It consecrates the mundane to the divine, transforms the profane in the sacred, is the bridge between material and spiritual and instrument to convert the belittled in the exalted. অর্থাৎ, জাগতিক যা কিছু আছে যজ্ঞ তাকে আধ্যাত্মিকতাতে পরিবর্তন করে দিচ্ছে, গর্হিত কর্মকে পূণ্য কর্মে রূপান্তরিত করছে, যজ্ঞ হচ্ছে জাগতিক থেকে আধ্যাত্মিকতায় উত্তীর্ণ হবার সেতু, আর আমার ক্ষুদ্রত্বকে বৃহৎএর সাথে মহতের সাথে এক করা দেবার যন্ত্র হচ্ছে যজ্ঞ। এই হচ্ছে যজ্ঞের কাজ।

আধ্যাত্মিক জীবনে আধ ক্যাচড়া বলে কিছু নেই। হয় আমি পুরোটাই আধ্যাত্মিক তা নাহলে একেবারেই আধ্যাত্মিক নই। এখন কিছুটা আধ্যাত্মিক আর বাকি সময়টা জাগতিক এই ধরণের কিছু নেই। যারা আধ্যাত্মিক তারা চব্বিশ ঘন্টাই আধ্যাত্মিক ভাবে থাকেন। ধর্ম সাধনের ক্ষেত্রে হতে পারে, তারা সকালে এক ঘন্টা ধর্ম সাধন করলেন আর বাকী তেইশ ঘন্টা ধর্ম সাধন করলেন না, সারাদিন গোলমাল করে বেড়ালেন। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে এটা হবে না। যে একবার আধ্যাত্মিক ব্যক্তি হয়ে গেলে সে কিন্তু জীবনে আর কোন দিন অনাধ্যাত্মিক হবে না। যে একবার মন প্রাণ ভগবানের চরণে দিয়েছে সে চব্বিশ ঘন্টাই সেই ভাব নিয়ে থাকবে, যে এখন মন প্রাণ ভগবানকে দেয়নি বুঝতে হবে এখন সে সেই আধ্যাত্মিকতার অবস্থায় যায়নি। সে এখনও ধর্ম সাধনে পড়ে চেষ্টা করে যাচ্ছে। যার মধ্যে সত্যিকারের আধ্যাত্মিকতা এসে যায় তার প্রত্যেকটি কাজ, আচার, ব্যবহারের মধ্যে আমূল পরিবর্তন এসে যাবে। যদি কখন ভালো সাধুর কাছে যাই তাহলে দেখতে পাবো যে তাঁর প্রত্যেকটি কাজ, জামা-কাপড় ভাঁজ করা থেকে, বই-পত্র সাজান, দাঁত মাজা, খাওয়া-শোওয়া-বসা সবটাই মনে হবে যেন পূজা করছেন। আমি যদি বলি আমার ধ্যান খুব গভীর হয় কিন্তু ঐ দিয়ে আমার আধ্যাত্মিকতার বিচার হবে না, আমি ঝাঁটাটি কেমন দিচ্ছি, খাবার পর আমার থালাতে এঁটো গুলো কেমন ভাবে রাখা আছে, খাবার সময় কত আবর্জনা থালায় পড়ে থাকে এই সব কিছুই বিচার্যের মধ্যে তখন এসে যাবে। খাবার ছেড়ে যখন উঠবে তার থালা বাসন দেখে মনে হবে যেন কেউ মেজে রেখেছে। জীবনের উদ্দেশ্য যদি আধ্যাত্মিক হওয়া হয়, জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ এটা যে বুঝে নিয়েছে তাহলে ঘুম থেকে রাতে শুতে যাওয়া পর্যন্ত তার প্রত্যকেটি কর্মই তার যজ্ঞ হবে।

যজ্ঞের এই ধারণাটা পুরুষসূক্তম্ থেকেই আমরা পাই। পুরুষসূক্তমের পুরো বক্তব্যটাই হচ্ছে যজ্ঞকে নিয়ে, এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু সৃষ্টি হচ্ছে সবটাই যজ্ঞ থেকে। ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সৃষ্টি হয়েছে বলে পুরো ব্যাপারটাকে যেভাবে হাল্কা করে দেওয়া হয় এখানে কিন্তু সেভাবে বলা হচ্ছে না, সেখানে বলা হচ্ছে এই সৃষ্টিটাই একটা যজ্ঞ। সৃষ্টির সব কিছুই যজ্ঞ। খুব সামান্য জিনিষ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া থেকে আরম্ভ করে সৃষ্টি পর্যন্ত যা কিছু হচ্ছে সবটাই যজ্ঞ। এই কথা কে বলছে? বেদ। তার মানে পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে আধ্যাত্মিক। আমাদের মত সাধারণদের পক্ষে চব্বিশ ঘন্টা আধ্যাত্মিক হওয়া সম্ভব নয়, কারণ আধ্যাত্মিকতায় অংশ বলে কিছু হয় না। তাই আমাদের বাঁচানোর জন্য বেদ যজ্ঞের এই ধারণাকে নিয়ে এসেছে। বেদ জানে আমরা সব কিছু যজ্ঞ রূপে করতে পারব না, না নিতে পারলে তো আমি আধ্যাত্মিক পুরুষ হতে পারব না। বেদ তাই বলল ঠিক আছে তোমাকে আধ্যাত্মিক পুরুষ হতে হবে না কিন্তু মাঝে মাঝে তুমি যজ্ঞ কর। তোমার সন্তান চাই? তুমি যজ্ঞ কর। তুমি ধন সম্পদ চাও, তুমি এই এই যজ্ঞ কর। কিন্তু তোমার লক্ষ্য হচ্ছে সব কর্মকে যজ্ঞ রূপে নিয়ে আধ্যাত্মিকতার চরমে পোঁছান, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ। সেখানে পৌঁছাতে হলে মাছের কাঁটাটিও যজ্ঞ মনোভাবে খাওয়ার পাতে সাজিয়ে রাখতে হবে।

বর্তমান প্রেসিডেন্ট স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ এক সময়ে স্বামী বিরজানন্দজীর সেবক ছিলেন। উনি একটা খুব সুন্দর ঘটনার কথা বলছিলেন। শ্যামলাতালে উনি দেখতেন ওখানকার রাঁধুনি প্রত্যেক দিন একটা থালাতে আনাজ, মশলাপাতি খেলনার মত সাজিয়ে স্বামী বিরজানন্দজীর ঘর থেকে নিয়ে রান্নাঘরে নিয়ে যেত। উনি একদিন রাঁধুনিকে জিজ্ঞেস করছেন ব্যাপারটা কি। রাঁধুনি তখন জিনিষটা পরিষ্কার করে দিয়ে বলছে আমি চাল, ডাল, তরি-তরকারি সব মহারাজের কাছে নিয়ে যাই, মহারাজ কি খাবেন, কতটা খাবেন উনি সেটা নির্দিষ্ট করে দেন। উনি নিজে হাতেই সব ঠিক করে এই থালাতে সুন্দর করে সাজিয়ে দেন। এত সুন্দর করে সাজাতেন মনে হবে যেন বাচ্চাদের কোন খেলনা সাজান আছে। এইটাই স্বামী বিরজানন্দের কাছে একটা যজ্ঞের মত ছিল।

দুই ধরণের যজ্ঞের কথা বলা হয় – একটা হচ্ছে ব্যক্তি কেন্দ্রিক যজ্ঞ আরেকটি হল অনেকে মিলে সর্ব সাধারণের মধ্যে যজ্ঞ। যেটা আমরা বর্তমান কালের নিরিখে বলতে পারি ঘরের পূজা আর বারোয়াড়ির

পূজা। দ্বিতীয় যেটা এনার করলেন তা হল জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের নানা রকমের ক্রিয়াকর্ম করতে হয়, যেমন অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, সন্ন্যাস নেওয়া, কোন জিনিষের প্রাপ্তি হল, দুঃখ হল ইত্যাদি যত রকমের ঘটনা আছে সব কটাকে আস্তে আস্তে একেকটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে বেঁধে দেওয়া হল, এইভাবে বেঁধে দিয়ে সব অনুষ্ঠানকে যজ্ঞে রূপান্তরিত করে দিলেন। যেমন, হিন্দুদের মধ্যে এখনও যে বিবাহের অনুষ্ঠান হয় এটাও একটি যজ্ঞ রূপেই সম্পন্ন করা হয়, অগ্নি জ্বালিয়ে, অগ্নিকে সাক্ষী রেখে কন্যাকে সম্প্রদান করা হয়। আবার অনেকে মন্দিরে বিগ্রহের সামনে দেবতাকে সাক্ষী রেখেও বিবাহ করে। মন্দিরে গিয়ে বিয়ে করলেও সমাজ ও সরকার এই বিয়েকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু দুজন বন্ধুকে সাক্ষী রেখে বিয়ে করলে কেউ এই বিয়েকে মানবে না। হয় অগ্নিকে সাক্ষী রেখে অথবা দেবতাকে সাক্ষী রেখে নয়তো কোর্টের অনুমোদিত কোন ব্যক্তির সামনে বিয়ে করতে হবে।

জীবনের প্রত্যেকটি শুভ ঘটনাকে যেমন জন্ম, মৃত্যু, বিবাহে যেসব অনুষ্ঠান গুলি হতে লাগল এই সব ক্রিয়া গুলিকে সংস্কার বলা হয়, আরেকটাকে বলা হল যজ্ঞ। এইভাবে দুই ধরণের যজ্ঞ প্রচলিত হল একটা হচ্ছে সংস্কার আরেকটি হচ্ছে যজ্ঞ। বেদের সময়ে জাতকর্ম, চূড়াকরণ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ এই রকম চল্লিশটি সংস্কারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পরের দিকে চল্লিশ থেকে আঠারোটি সংস্কারে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, মনুস্মৃতিতে এসে ষোলটিতে দাঁড়িয়েছিল, তখন বলা হত ষোড়শ সংস্কার। আবার তন্ত্রের সময়ে আরও কমিয়ে এনে দশটি সংস্কারে এসে দাঁড়াল। দশকর্মা ভাণ্ডার এই দশটি সংস্কার থেকেই নাম করণ করা হয়েছে। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এসে এই দশটি সংস্কারও কমে গেছে। বেদের প্রথমে সবটাই যজ্ঞ ছিল কিন্তু পরের দিকে এই দুটো সংস্কার আর যজ্ঞ আলাদা আলাদা পথে চলতে থাকল।

সংস্কার বাদে যে যজ্ঞগুলো থেকে গেল সেই যজ্ঞগুলিও অনেক ধরণের ছিল। তার মধ্যে একটা হচ্ছে দেবতাদের উদ্দেশ্যে যেটা দেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয় ধরণের যজ্ঞ হচ্ছে যেখানে পিতৃদের উদ্দেশ্যে অর্পণ করা হচ্ছে বা অন্যান্য যেসব ছোটখাটো দেবতারা ছিলেন, অসুর, নিরুক্তি, রাক্ষস এদের সন্তুষ্টির জন্যও অর্পণ করা হত। দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করার সময় যেটা অর্পণ করা হত তাকে বলা হত হবিঃ। এইটাই যখন পিতৃগণকে দেওয়া হয় বা অন্যান্য ছোট ছোট দেবতাদের দেওয়া হয় তখন তাকে বলা হয় বলি। হবিঃ আর বলি এই দুটোই আলাদা। দেবতাদের উদ্দেশ্যে যখন অর্পণ করা হয় তখন স্বাহা মন্ত্রে অর্পণ করা হয় আর পিতৃদের উদ্দেশ্যে যখন অর্পণ করা হয় তখন স্বধা মন্ত্রে অর্পণ করা হয়। হবিঃ যখন দেওয়া হয় তখন তা সব সময় অগ্নিতেই আহুতি দেওয়া হয়, যাকে প্রচলিত কথায় বলা হোম। তাহলে হোমের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে – অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়, হোমের যেটা অর্পণ করা হয় তার নাম হচ্ছে হবিঃ এবং হোমে যা অর্পণ করা হয় তা একমাত্র দেবতাদের উদ্দেশ্যেই অর্পণ করা হয়। বলি যেটা দেওয়া হয় সেটা মাটির উপরে কুশ ঘাস পেতে তার উপরে দেওয়া হয়। এই বিধান গুলো বেদেই আছে। বেদ যেটা মেনেছে সেটাই এখনও হিন্দুদের মধ্যে আজও চলে আসছে, ওর বাইরে কিছুতেই যাবে না।

আমরা এখানে সংস্কার ছাড়া অন্যান্য যজ্ঞের বিষয় আলোচনা করছি। প্রত্যেক যজ্ঞের অবশ্যম্ভাবি বস্তু হচ্ছে অগ্নি। দেবতা বা অন্য যাদের উদ্দেশ্যে যা কিছু অর্পণ করা হচ্ছে সেটা অগ্নি বহন করে উপরে নিয়ে যান। দেবতাদের ছাড়া অন্য যাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা হবে সেখানে যা দেওয়া হবে সেটা মাটিতে দেওয়া হয়। বেদের সময় অসুর, রাক্ষস, ভূত, প্রেত এদের উদ্দেশ্যেও অর্পণ করা হত, এখন আর অসুর, রাক্ষসাদিদের দেওয়া হয় ন, কিন্তু কালীপূজার সময় শিবা ইত্যাদিকে বলি দেওয়া হয়, সেই বলিটা মাটিতে দেওয়া হয়। আবার অনেক সময় বলি মাটিতে না দিয়ে নদীর জলে বা কোন জলাশয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। একটা মতে বিশ্বাস করে যে আগেকার দিনে দেবতাদের যে হবিঃ দেওয়া হত সেটাও মাটিতে দেওয়া হত। কিন্তু পরে এই ভাবে দেবতাদের হবিঃ দেওয়াটা বন্ধ হয়ে যায়। মহাভারতে আছে অগ্নি এসে দুঃখ করে বলছে অগ্নিতে যজ্ঞে এত ঘি ঢালা হত যে এত ঘি খেয়ে খেয়ে অগ্নি দেবতার অজীর্ণ হয়ে গেছে। আগের নিয়ম থেকে সরে এসে ঠিক করা হল এখন থেকে যা কিছু হবিঃ মাটিতে দেওয়া হচ্ছিল এখন থেকে সব

আগুনে অর্পণ করা হবে। এই যে পরিবর্তন এসে গেল এইটাকেই খুব মজার আকারে মহাভারতে উপস্থাপনা করা হয়েছে। অগ্নির এত ঘি খাওয়ার অভ্যেস ছিল না, আর এত এত যজ্ঞ হচ্ছে আর এত এত ঘি খেয়ে খেয়ে তার অজীর্ণ রোগ হয়ে গেছে। এখন অগ্নি দেবতা শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুনকে এসে একটা ওষুধের ব্যবস্থা করতে বলছেন। কি ওষুধ খাবেন অগ্নি দেবতা? তখন অগ্নি দেবতাই বলছেন আমি যদি পুরো খাণ্ডব বনকে খেতে পারি, পুরো মানে, খাণ্ডব বনে যত গাছপালা, পশু, পাখি যা আছে সব কিছুকে আমার খাওয়ার ব্যবস্থা যদি করে দেওয়া যায় তাহলে আমার অজীর্ণ রোগটা সেরে যাবে।

এইভাবেই একেকটা ব্যবস্থা পরিবর্তন হতে থাকে। প্রথমের দিকে সব কিছুই যজ্ঞ ছিল। সেই যজ্ঞই আবার ভাগ হয়ে গেল – সংস্কারগুলি একদিকে চলে গেল আর যজ্ঞগুলো অন্য দিকে চলে গেল। সেই যজ্ঞগুলোর আবার দুটো ভাগ হয়ে গেল – একটা যজ্ঞ দেবতাদের উদ্দেশ্যে আর অন্য যজ্ঞ দেবতা ছাড়া অন্যান্য ছোট ছোট দেবতা, পিতৃদেব, অসুর, রাক্ষস ইত্যাদিদের উদ্দেশ্যে। দেবতাদের যজ্ঞটা শুরু হল অগ্নিতে আর অন্যদের মাটিতে। শ্রাদ্ধাদির সময় সাধারণত জলের কাছাকাছি করা হয়। আজকের দিনে আমরা যে যজ্ঞ করি সব সময় আমরা তা অগ্নিতে দেবতাদের অর্পণ করাকেই বুঝি। দেবতাদের অগ্নির মাধ্যমে যে আহুতি দেওয়া হয় যজ্ঞ বলতে সেটাই বোঝায়। কিন্তু গীতাতে আমরা অনেক ধরণের যজ্ঞের উল্লেখ পাই, যেমন দ্রব্যযজ্ঞ, জপযজ্ঞ ইত্যাদি, কিন্তু যজ্ঞের আগে একটা শব্দকে বসাতে হয়। শুধুই যখন যজ্ঞ এই শব্দটি থাকবে তখনই বুঝতে হবে যে একটা হোম হচ্ছে সেখান কিছু আহুতি দেবতাদের নামে দেওয়া হচ্ছে।

বেদে যখন সংস্কারের কথা বলা হয় তখন এটা হচ্ছে বাধ্যতামূলক, যেমন একটা শিশুর জন্ম হলে তার জাতকর্ম করতেই হবে, বাবা-মা মারা গেলে শ্রাদ্ধ করতেই হবে, এগুলিকে কর্তব্যের মধ্যে গণ্য করা হয়, না করলে পাপ হবে। কিন্তু বেদে যখন যজ্ঞের কথা বলা হয় তখন সংস্কারের থেকে অনেক পার্থক্য রেখেই বলা হয়। যজ্ঞ সব সময়ই কিছু কামনা নিয়ে করা হয়। যজ্ঞ হচ্ছে ঠিক কেউ বড়লোকের কাছে কিছু আশা করে দেখা করতে যাওয়ার মত। যজ্ঞ হচ্ছে কিছু কামনা করে দেবতাদের কাছে আহুতির দেওয়ার মধ্য দিয়ে প্রার্থনা করা। যজ্ঞ যেন জাগতিক আর আধ্যাত্মিকতার মধ্যে একটা যোগসূত্র। আমরা হলাম জাগতিক লোক আর দেবতারা হচ্ছেন আধ্যাত্মিক জগতের। যজ্ঞের যিনি পুরোহিত তিনি হচ্ছেন এই যজ্ঞকর্মের যজমানের প্রতিনিধি আর একই সাথে দেবতাদের মুখপাত্রের কাজ করেন। যজ্ঞে তাই পুরোহিতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। যজ্ঞের পরে পুরোহিত যজমানকে বলেন – দেবতারা খুশি হয়েছেন তাঁরা আপনার মন কামনা পূর্ণ করবেন। আবার দেবতাদের কাছে যজমানের হয়ে পুরোহিত প্রার্থনা করেন। যজ্ঞে যে আহুতি দেওয়া হয় পুরোহিত ছাড়া দেবতাদের উদ্দেশ্যে কোন আহুতি অর্পণ করা যায় না।

যজ্ঞে যে অগ্নিতে আহুতি অপর্ণ করা হবে সেখানে তিনটি অগ্নি স্থাপন করা হয়। মঠে পূজার সময় যখন হোম হয় তখন যে মন্ত্রগুলো পাঠ করা হয়, ভালো করে শুনলে দেখা যাবে ওনারা এই মন্ত্রগুলই উচ্চারণ করছেন। এখন অবশ্য আগেকার মত করা হয় না। এর মধ্যে সব থেকে গুরুত্ব হচ্ছে গার্হপত্য অগ্নি। যার মঙ্গলের জন্য যজ্ঞ হচ্ছে তার যে গৃহকর্তা থাকবেন, তার যে উনুন আছে সেইখান থেকে এই গার্হপত্যের আগুন আনা হত। যখন যজ্ঞ হবে এই গার্হপত্যের অগ্নি সর্বক্ষণ জ্বালান থাকবে, আর এই অগ্নিই হচ্ছে প্রধান অগ্নি। যজ্ঞে যা কিছু দেওয়া হবে তার মধ্যে যেটা রন্ধন করা দ্রব্য থাকত তা এই গার্হপত্য অগ্নিতেই রন্ধন করা হত, বাড়ির উনুনে রান্না করা হত না। তারপরে যে অগ্নির বেশি গুরুত্ব তা হল, গার্হপত্য অগ্নির ঠিক পূর্ব দিকে আরেকটি আগুন রাখা হত তাকে বলা হয় আহ্বণীয়। এই অগ্নির মাধ্যমে আবাহন করা হয় বলে এর নাম আহুণীয় অগ্নি। যত রকমের আহুতি অর্পণ করা হত সব এই অগ্নিতেই অর্পণ করা হত। গার্হপত্যের ঠিক দক্ষিণ দিকে আরেকটি অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে, তাকে বলা হয় দক্ষিণা অগ্নি। যখন যজ্ঞ শেষ হয়ে যেত তখন এই অগ্নিকে দক্ষিণ দিকে নিয়ে আসা হত। এখনকার দিনে এইভাবে দক্ষিণা অগ্নি রাখা হয় না, তার বদলে যখন হোম করা হয় তখন অগ্নিকে প্রার্থনা করে বলা হয় – হে অগ্নি

তুমি এখন দক্ষিণা মুখি হও। আমরা আগে বলেছিলাম যে অগ্নির জন্ম সমুদ্রে বলে অগ্নির আরেক নাম, সমুদ্রকে যেহেতু ভারতের দক্ষিণে দিকে মনে করা হয়, আর আমাদের বেশির ভাগ ঋষিরাই পাঞ্জাব, দিল্লীর দিকের ছিলেন বলে তাদের কাছে সমুদ্র দক্ষিণ দিকেই হয়, তাই যজ্ঞের শেষে অগ্নিকে দক্ষিণ দিকে ঠেলে দিয়ে বলা হত তুমি তোমার নিজ বাসস্থানে চলে যাও।

যজ্ঞ যখন হত তখন দুই ধরণের যজ্ঞ হত, একটা হচ্ছে গৃহ্য আর দ্বিতীয় হচ্ছে শ্রৌত। গৃহ্য যজ্ঞ পরিবারের মধ্যে অর্থাৎ বাড়িতে করা হত। আর শ্রৌত যজ্ঞ সর্ব সাধারণকে নিয়ে সবার সামনে করা হত। গৃহ্য যজ্ঞে পুরোহিতের প্রয়োজন নেই। গৃহস্বামী নিজেই এই যজ্ঞ করে নিতে পারেন। কিন্তু গৃহস্বামী যদি ইচ্ছে করেন তাহলে পুরোহিতকে দিয়েও যজ্ঞ করাতে পারেন – আমার সময় নেই, একজন পুরোহিতকে দক্ষিণা দিয়ে রেখে দিলাম। কিন্তু শ্রৌত যজ্ঞে পুরোহিত বাধ্যতামূলক।

গৃহ্য যজ্ঞের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যত ধরণের জাতকর্ম বা ব্যক্তিগত সংস্কারগুলো করা হত সেগুলো সবই গৃহ্য যজ্ঞের মধ্যেই পড়ে, এ ছাড়া পূজাদি, আচমন, শুদ্ধিকরণ যত আছে সবই এই গৃহ্য যজ্ঞের অন্তর্গত। কিছু কিছু গৃহ্যযজ্ঞ আছে যেগুলো প্রাত্যহিক, যেমন পঞ্চ মহাযজ্ঞ, যার কাজই হচ্ছে গৃহকর্তাকে শুদ্ধ করে। রোজ শাস্ত্র অধ্যয়ন, রোজ পশুদের কিছু খাওয়ান, রোজ দেবতাদের পূজা করা এই ধরণের সব কাজই পঞ্চ মহাযজ্ঞের মধ্যে পড়ছে। আর শেষে আসছে সাত রকমের পাকজন্য। আগেকার দিনে রান্না করা যজ্ঞ হত, এই যজ্ঞ সাত রকমে করা হত। বর্তমানে এগুলো আর হয় না, কিন্তু এগুলো সবই গৃহ্য যজ্ঞের মধ্যে ধরা হত। এখন তার বদলে গৃহদেবতা, কারুর নারায়ণ শিলা আছে, কারুর বাড়িতে শিবলিঙ্গ আছে, এই সব গৃহদেবতার পূজাতেই গৃহ্য যজ্ঞ দাঁড়িয়ে আছে। এর সাথে সাথে এখন যেটা করা হয় জপ করা, আচমনাদি করা, কুল দেবতার পূজা করা, অতিথি সেবা ইত্যাদি। এখন হিন্দুদের পরিবারে যা যা করা হয় এইগুলো সবই শঙ্করাচার্য প্রচলিত করে গেছেন।

শ্রৌত যজ্ঞও দুই রকমে করা হয় – একটা হচ্ছে হবি যজ্ঞ আর দ্বিতীয় হচ্ছে সোম যজ্ঞ। হবি যজ্ঞে বিভিন্ন রকমের শস্য, আনাজ, যেমন গম, যব, দুধ, ঘি এই সব মিশিয়ে তৈরী করা হত, এইটাকেই বলা হয় পুরোডাসা। সোম যজ্ঞে সোম রস অর্পণ করা হত।

আমরা যতগুলি যজ্ঞের আলোচনা করলাম সংস্কার থেকে শুরু করে যত যজ্ঞের কথা বলা হল এই সমস্ত যজ্ঞকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয় – ১) নিত্য, ২) নৈমিত্তিক, ৩) কাম্য ও ৪) প্রায়শ্চিত্ত। এগুলো আমরা এর আগে আলাদা ভাবে আলোচনা করেছি। নিত্য কর্ম প্রত্যেক দিন করতেই হবে, বলা হয় অকরণে প্রত্যবায়, যদি না করা হয় তাহলে পাপ লাগবে। যারা আধ্যাত্মিক হতে চান তাদের আবার কাম্য করণে প্রত্যবায়, অর্থাৎ কাম্য কর্ম করলে পাপ হবে। নৈমিত্তিক কর্ম হচ্ছে কোন একটা বিশেষ দিনে করা হয়। নৈমিত্তিক কর্মও অবশ্যই করতে হবে। নৈমিত্তিক কর্ম হচ্ছে যেমন সন্তান হয়েছে এখন অন্নপ্রাশন দেওয়া, এছাড়া জাতকর্ম যা আছে সব হচ্ছে নৈমিত্তিক কর্ম। না জেনে, না বুঝে বা বাধ্য হয়ে যে দোষগুলো করা হয় সেই দোষ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য প্রায়শ্চিত্ত কর্ম করা হয়।

কয়েকটি উল্লেখনীয় যজ্ঞের মধ্যে হচ্ছে **অগ্নিহোত্র**। সকালে ও বিকালে এই যজ্ঞ দিনে দুবার করা হয়। পরের দিকে এইটাই কুলদেবতার পূজাতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। প্রাচীন কালে বাড়িতে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আগুনকে সংরক্ষিত করে সেই অগ্নিতে দুধ দিয়ে আহুতি দেওয়া হত। অনেক জায়গায় নিজেরা না করে একজন পুরোহিত ঠিক করা থাকত সে এসে পূজা করে যেত। অগ্নিহোত্র যজ্ঞের কাজ হল পবিত্র করা আর অগ্নিহোত্র নিত্যকর্মের মধ্যে পড়ছে। এর পর আসছে **দশপৌর্ণমাস** যজ্ঞ – অমাবস্যা আর পূর্ণিমা এই দুটো তিথিতে বিশেষ যজ্ঞ করা হত তাকে বলা হয় দশপৌর্ণমাস যজ্ঞ। তারপর **অগ্রায়ণ** যজ্ঞ – বছরে যখন নতুন ফসল উঠে আসে, বিশেষ করে চাল, গম, যব ইত্যাদি, সেই অন্ন দিয়ে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হয়। এখন এই যজ্ঞের নাম হচ্ছে নবান্ন। তারপরে হচছে চাতুর্মাস্য যজ্ঞ – বছরে চারটে মাসের শেষে বিশেষ

করে কোন ঋতু আসছে যেমন বসন্ত, শীত ও বর্ষার শুরুতে এই যজ্ঞ করা হত। যখন যজ্ঞ শুরু হত তখন সেটা চার মাস ধরে চলত। তারপর আছে **প্রবজ্ঞ** যজ্ঞ – প্রবজ্ঞ যজ্ঞ আগেকার দিনেই করা হত, এই যজ্ঞ অশ্বিনীদ্বয় দেবতাদের উদ্দেশ্যে আর ছাগলের দুধ দিয়ে আহুতি দেওয়া হত। তারপরে **বাজপেয়** যজ্ঞ – যখন কোন রাজা বড় একটা যদ্ধ জয় করে আসত তখন সেই রাজা এই বাজপেয় যজ্ঞ করতেন। এই রকম আরেকটি যজ্ঞের নাম হচ্ছে **রাজসূয়** যজ্ঞ – কোন রাজার চারিদিকে খুব নামডাক হয়েছে, এখন সেই রাজা দেখাতে চাইছেন আমি একজন বিরাট রাজা হয়েছি তখন এটা দেখাবার জন্য রাজসূয় যজ্ঞ করতেন। তিনি যখন একবার রাজসূয় যজ্ঞ করে নিতেন তখন সেই রাজা যত দিন বেঁচে থাকবে ততদিন অন্য কোন রাজা এই রাজসূয় যজ্ঞ করতে পারবে না। দুর্যোধন এই যজ্ঞ করেছিলেন। তারপরে হচ্ছে অশ্বমেধ যজ্ঞ – কোন রাজা একটা বিশেষ নিজের রাজ্য থেকে লোকজন দিয়ে ঘোড়াকে ছেড়ে দিতেন, এখন এই ঘোড়া যদি ঘোড়া এইভাবে ঘুরে ঘুরে সফল হয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে আসত তখন সেই রাজাকে বলা হত চক্রবর্তী। অশ্বমেধ যজ্ঞ যে শুধু রাজ্য জয় করার জন্যই করা হত তা নয়, কারণ শ্রীরামচন্দ্র সমস্ত রাজ্যকে জয় করে নিয়েছেন, এখন তিন বছর পরে তিনি আবার যদি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন তখন তিনি কি জয় করবেন, সব তো জয় করাই আছে। আসলে অশ্বমেধে অনেক কিছু শর্ত থাকত, এত এত দান করতে হবে, এই এই জিনিষের ব্যবস্থা করতে হবে, যার ফলে অশ্বমেধ যজ্ঞ ছিল বিপুল ব্যয় সাপেক্ষ। রাজা যেসব ছোট ছোট রাজ্য জয় করত তাদের কাছে থেকে যজ্ঞের খরচের জন্য দান নিতেন। কিন্তু তারা কত দেবে তাদেরও তো অত সম্পদ নেই। সেইজন্য বলা হত যদি কেউ একশ বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করে নিতে পারে সে ইন্দ্রত্ব পদ লাভ করবে। এই কারণে ইন্দ্রও ভয়ে সব সময় তটস্থ হয়ে থাকত যাতে কেউ একশ বার অশ্বমেধ যজ্ঞ না করতে পারে। মহাভারতে ভগীরথের কাহিনী আমাদের সবার জানা আছে, সগর রাজা নিরানব্বই বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করে নিয়েছিল, একশবার করার সময় ইন্দ্র যজ্ঞের ঘোড়াকে কপিল মুনির আশ্রমে গিয়ে লুকিয়ে রাখলেন। তারপরে আসছে **সর্বমেধ** যজ্ঞ – এই যজ্ঞ যিনি করছেন তিনি তাঁর যা কিছু সব কিছু দান করে দিতেন। বিশ্বাস ছিল যে এই সর্বমেধ যজ্ঞ করলে অনেক কিছুর উপরে সে জয় পেয়ে যায়। রাজা হর্ষবর্ধণ, যিনি খুব বিখ্যাত হিন্দু রাজা ছিলেন, তিনি এই যজ্ঞ করতেন, আর সেই যজ্ঞে হর্ষবর্ধণ সব কিছুই দান করে দিতেন।

বেদের একটি মন্ত্র আসছে যেখানে বলা হচ্ছে God the most loving, ***ত্বং হি নঃ পিতা বসো ত্বং মাতা শতক্রতো বভুবিথ। অধা তে সুম্নমীমহে।।***(ঋ-৮/৯৮-১১)। এটা কোন সাধারণ কবির কাল্পনিক উদ্‌গার নয়, যিনি বলছেন তিনি একজন বেদের ঋষি। হে শ্রেষ্ঠ, হে ইন্দ্র, হে শতক্রতো তুমিই হচ্ছ আমার পিতা, তুমিই আমার মা। ইন্দ্রকে যখনই মাতা বলে সম্বোধন করা হচ্ছে তখনই বুঝতে হবে এখানে ইন্দ্র হচ্ছে সেই পরম আধ্যাত্মিক শক্তি, ইন্দ্র কোন সাধারণ দেবতা নয়। সাধারণত ভগবানকে কোথাও পিতা রূপে চিন্তন করা হয় আবার কখন মাতা রূপেও কল্পনা করা হয়। খ্রীশ্চানদের মধ্যে যিশু ভগবানকে পিতা রূপেই সাধনা দেখতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরকে মাতা রূপে দেখছেন। কিন্তু একই সাধকের ক্ষেত্রে ভগবান পিতা ও মাতা উভয় রূপেই কল্পনা করা খুবই বিরল, যদিও অসম্ভবের কোন কিছু নেই, কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় না। যেমন কালিদাস লিখছেন – আমি প্রণাম করছি জগতের মা পার্বতীকে আর পরমেশ্বর শিবকে। কিন্তু এখানে পার্বতী আর শিব দুজনকে আলাদা এক সত্তা রূপে দেখা হয়েছে। বেদের এই মন্ত্রে একমাত্র ইন্দ্রকেই বলছেন পিতা আবার সেই ইন্দ্রকেই বলছেন মাতা। আমরা এখানে ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ইতিহাস অধ্যয়ন করছি। ভারতে পরবর্তি কালে যে যে ভাবগুলোকে আধ্যাত্মিক পিপাসু সাধকরা অবলম্বন করে সাধনার পথে এগিয়ে গিয়েছেন, সেই ভাবগুলো বেদে আগে থাকতেই কিভাবে ছিল সেইগুলোকে আমরা দেখতে পাই।

স্বামী ভূতেশানন্দজীকে এক গৃহী শিষ্য প্রণাম করে বিদায় নেওয়ার সময় বলছেন ‘আসি মা’। পাশে অন্য একজন মহারাজ দাঁড়িয়েছিলেন তিনি স্বামী ভূতেশানন্দকে ভক্তের এই মাতৃ সম্বোধন শুনে ফিক্

করে হেসে ফেলেছেন। ভূতেশানন্দজী তখন বলছেন 'এইভাবে হাসতে নেই, কার কত রকম ভাব আছে আমরা কি করে জানব'। এখানেও বেদের এই ভাব পাচ্ছি, ভূতেশানন্দজীকে কেউ বাবা বলছেন আবার কেউ মা বলে সম্বোধন করছেন। ইসলাম ধর্মে আল্লাকে মাতৃরূপে কখনই পূজা করা হয় না, কিছু দিন আগে ভারতে মুসলমানরা ফতোয়া দিল যে তারা 'বন্দে মাতরম্' গান গাইতে পারবে না কারণ তারা মাকে শ্রদ্ধা করে কিন্তু পূজা করে না। কিন্তু খ্রীশ্চান ধর্মে অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায় থেকে কিছু চিন্তা ভাবনা ঢুকেছিল, তার ফলে জেহবাকে তারা পিতা বলে সব সময় অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে এসেছে কিন্তু মাদার মেরী মাতা রূপে খ্রীশ্চান ধর্মে একটা বিরাট স্থান পেয়ে গেছেন, সেইজন্য অনেক খ্রীশ্চান মাদার মেরীকে পূজাও করে। তবে মাদার মেরীকে যে পূজা করছে স্বর্গের ভগবান বা পিতার সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে বলে নয়, মাদার মেরী হচ্ছেন ভগবান যিশুর জন্মদাত্রী। কিন্তু বেদে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভগবানকে একই সাথে পিতা ও মাতা রূপে প্রার্থনা করা হচ্ছে। কথামৃতেও আছে যেখানে ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন – একজন গিয়ে দেখে মাকালী গলার পৈতে, সে তখন ভাবছে মাকালীর গলায় পৈতে কেন? তারপরে বলছেন – বাপু তুমিই মাকালীকে ঠিক ঠিক চিনেছ, আমিতো এখনও বুঝতে পারলাম না মাকালী পুরুষ না নারী। এগুলো হচ্ছে খুবই উচ্চ ভাবের অবস্থা।

আগে যেমন ভগবানকে বাবা-মা বলা হচ্ছে, আরেকটি মন্ত্রে দেখতে পাই ভগবানের সাথে সম্পর্ক নিয়ে। এর আগের মন্ত্র ছিল ইন্দ্রকে নিয়ে, এই মন্ত্রটি অগ্নিদেবতাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে। ***অগ্নিং মন্যে পিতরম্ অগ্নিম্ আপিম্ অগ্নিং ভ্রাতরং সদমিৎ সখায়ম্। অগ্নের্ অনীকং বৃহতঃ সপর্যং দিবে শুক্রং যজতং সূর্যস্য।।***(ঋ-১০/৭-৩)। এখানে অগ্নিদেবতাকে বলা হচ্ছে – হে অগ্নি, তুমি আমার বাবা, তুমি আমার আত্মীয়, তুমি আমার ভাই, তুমি আমার বন্ধু। পরের দিকে এই ধরণের একটি ভাব খুব জনপ্রিয় হয়েছিল – *ত্বমেব মাতা পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব*। এই মন্ত্রে যে শুধু ভগবানের সঙ্গে আত্মীয়ের সম্পর্ককে বলা হচ্ছে তা নয়, এত কিছু সম্পর্কের কথা বলার পর অগ্নিদেবতাকে বলা হচ্ছে – হে অগ্নি সূর্যের যে তেজ সেটাও তুমি। বেদে এইখানে আমরা একটা বড় রকমের রূপান্তর দেখতে পাই। প্রথমে অগ্নিকে বলা হচ্ছে তুমি আমার বাবা, তুমি আমার ভাই, তুমি আমার বন্ধু, শুধু তাই নয় সূর্যের যে তেজ সেটাও তুমি। এখানে দেখা যাচ্ছে ভগবানকে ধারণা করা হচ্ছে যে তিনিই সব কিছুতে ছেয়ে রয়েছেন, একাধারে তিনি হচ্ছে আমার আত্মিয় আবার অন্য দিকে তিনিই এই সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র সব কিছু। অর্থাৎ যে অগ্নিকে প্রজ্বলিত করে হোম করে আহুতি দেওয়া হচ্ছে অগ্নি ততটুকুই নন। আমাদের অনেকে ধারণা যে বেদ মানেই হচ্ছে এতে শুধু যজ্ঞের কথাই বলা হয়েছে, তা নয়, এই ধরণের অনেক উচ্চ ভাবের কথাও আমরা বেদে পাচ্ছি। যখন যজ্ঞ হত তখন এই ধরণের স্তুতি গুলো করতেন, এখন এই স্তুতি গুলোতে কি ছিল খুঁজলে আমরা এই ধরণের উচ্চ ধারণাগুলোকে দেখতে পাই।

এর পরে সরস্বতী দেবীর একটি প্রার্থনা দেখতে পাই, যদিও বেদে দেবীর স্থান খুব অল্প, তা সত্ত্বেও যেটুকু পাওয়া যায় তাতেই অনেক কিছু তত্ত্ব বেড়িয়ে আসে। এখানে সরস্বতী দেবীর প্রার্থনা করে বলা হচ্ছে – ***যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো মযোভূর্ যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্যাণি। যো রত্নধা বসুবিদ্ যঃ সুদত্রঃ সরস্বতী তম্ ইহ ধাতবে কঃ।।*** বলা হয় এই প্রার্থনাটা নিয়মিত করলে খুব ভালো ফল পাওয়া যায়। হে মা সরস্বতী, তোমার যে বক্ষঃস্থল, সেটা হচ্ছে এই জগতের যা কিছু সুখ সম্পদ দায়ী তার উৎস স্থল। যেমন একটি শিশুর শরীর স্বাস্থ্য, মনের ক্ষমতার বৃদ্ধি, তার শারীরিক বৃদ্ধি নির্ভর করে আছে তার মায়ের অপর্যাপ্ত মাতৃদুগ্ধের উপর ঠিক তেমনি এই জগতের যত সুখ, সম্পদ, আনন্দের আছে সব মা সরস্বতীর উপর নির্ভর করে আছে। *যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্যাণি* – জগতের যা কিছু শুভ, যা কিছু ভালো, কল্যাণ, মঙ্গলকারী তা তোমার পোষণ দ্বারাই আসে। বেদে এই ধারণাটা এসে গিয়েছিল যে ভালো মন্দ যা কিছু আছে সবই ভগবানের। কিন্তু মানুষকে প্রথমে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে দেখতে হয়। শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখতে দেখতে এমন একটা অবস্থায় চলে যাবে যখন সে রাবণের মধ্যেও ঈশ্বরকে দেখতে

পারবে। কিন্তু প্রথমেই যদি রাবণদের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখতে যাই তাহলে বুঝতে হবে তার ভাবনা চিন্তার মধ্যে গোলমাল আছে। যিনি ভগবান তিনি শ্রীরামচন্দ্র আর রাবণের পারে। কেউ যদি বলে শ্রীরামেও তিনি রাবণেও তিনি তখন কোন সন্দেহ নেই যে এটি অনেক উচ্চ বাক্য এবং উচ্চ অবস্থা। কিন্তু রাবণের মধ্যে ভগবানকে দেখার আগে শুধু শ্রীরামের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখা শুরু করতে হবে।

অনেকেই আছেন যারা প্রায়ই বলেন আমার কাছে ভালো মন্দ বলে কিছু নেই, কিন্তু তার আগে ভালোটাকে ভালো বলে ঠিক ঠিক বুঝতে হবে। ভালোকে ভালো বলে ধারণা করার বুদ্ধিই এখনো আমাদের হয়নি। অনেকে প্রায়ই বলেন যে আমি খুব স্পষ্টবাদী, তখন প্রশ্ন করতে হয় তিনি কি নিজের বেলায় শুধু স্পষ্টবাদী, না অপরের স্পষ্টবাদীটাও সহ্য করেন? আসলে স্পষ্টবাদীতার আড়ালে এরা অপরের প্রতি নিজেদের অসংস্কৃত আচরণ ও অসংস্কৃত মনোভাবেরই পরিচয় দিচ্ছে। স্পষ্টবাদী হতে হলে আগে ভালো ব্যাপারে স্পষ্টবাদী হওয়া দরকার, তারপরে খারাপের ব্যাপারে স্পষ্টবাদী হতে হয়। মানুষ খারাপ জিনিষের ব্যাপারে স্পষ্টবাদী হয় ভালো জিনিষের ব্যাপারে স্পষ্টবাদী হয় না। আবার অপরের খারাপের ব্যাপারে আর নিজের ভালোর ব্যাপারে মানুষ স্পষ্টবাদী হয় আর অপরের ভালো জিনিষের ব্যাপারে আর নিজের খারাপ জিনিষের ব্যাপারে অস্পষ্টবাদী হয়। এই হচ্ছে স্পষ্টবাদীতার স্বরূপ।

যখনই দেখা যাবে কারুর বিদ্যার প্রতি আগ্রহ নেই, যখনই দেখা যাবে তার মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা নেই, যখনই দেখা যাবে অপরের প্রতি শোভন আচরণে ঘাটতি রয়েছে, যখনই দেখা যাবে কারুর মধ্যে আসুরিক বৃত্তি, রাক্ষুসি বৃত্তি প্রবল হয়েছে তখন বুঝতে হবে মা সরস্বতীর কৃপা তার থেকে সরে গেছে। তার এখন উচিত বেশি করে সরস্বতীর আরাধনা করা, সরস্বতীর কাছে হাতজোড় করে বলবে – *যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো ময়োভূর্ যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্যাণি। যো রত্নধা বসুবিদ্ যঃ সুদত্রঃ সরস্বতী তম্ ইহ ধাতবে কঃ।।* হে মা সরস্বতী জগতের যা কিছু ভালো সব তোমার বুক থেকে পুষ্টি পাচ্ছে, তোমার যদি স্তন থেকে যদি পিযুষধারা না নির্গত হয় তাহলে জগতের সব ভালো জিনিষ আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাবে। অনাবৃষ্টি হলে যেমন চাষবাশ হয় না, গাছপালা সব শুকিয়ে যায়, ঠিক তেমন, মাগো, তোমার যদি কৃপা না থাকে জগতের যা কিছু ভালো, মানুষে যা মঙ্গলদায়ক সব ক্রমশ শুকিয়ে যেতে থাকবে। *যো রত্নধা বসুবিদ্ যঃ সুদত্রঃ সরস্বতী তম্ ইহ ধাতবে কঃ* – যা কিছু রত্ন, এখানে রত্ন বলতে অনেক কিছুকেই বোঝাচ্ছে, রত্ন বলতে হীরা মাণিক্যকে বোঝায় আবার মানুষের যে যত ভালো গুণ তাকেও বোঝাচ্ছে, আর বসুবিদ্ হচ্ছে টাকা, পয়সা ইত্যাদি, অর্থাৎ যা কিছু সম্পদ আছে যারা দ্বারা মানুষ সমস্ত দিক দিয়ে ঐশ্বর্যবান হয়, এই সব কিছু মা, তোমার কৃপাতেই হয়। তোমার হৃদয় থেকেই সব কিছু নির্গত হচ্ছে, তুমি আমাদের কৃপা কর। এখানে ভগবানকে মাতৃরূপে প্রার্থনা করা হচ্ছে।

আমরা এতক্ষণ দেখলাম ভগবানকে কোথাও বাবার মত পূজা করা হচ্ছে, কোথাও বাবা ও মা একসাথে ভেবে, আবার কোথাও বন্ধুর মত, সখার মত, তারপরে দেখলাম মায়ের মত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে। এখন আমরা দেখছি ভগবানকে শিশুর মত, বালকের মত পূজা করা হচ্ছে, যেটা পরের দিকে আমরা পাচ্ছি শ্রীকৃষ্ণকে নাড়ুগোপাল রূপে পূজাতে। ***অথং বেনশ্চয়োদয়ৎ পৃশ্নিগর্ভা জ্যোতির্জরায়ু রজসো বিমানে। ইমম্ অপাং সংগমে সূর্যস্য শিশুং ন বিপ্রা মতিভী রিদ্ধন্তি।।*** (ঋ-১০/১২৩-১)। বেদের যাঁরা ঋষি ছিলেন তাঁদের অনেক নামে অভিহিত করা হয়, তার মধ্যে একটা নাম হচ্ছে কবি, আরেকটি নাম এখানে যেটা বলা হচ্ছে বিপ্র, আবার কখন মনীষি বলা এই মন্ত্রেও ভগবানের স্তুতি করা হচ্ছে, এখানে স্তুতি করা হচ্ছে যেন ভগবানকে আদর করা হচ্ছে, যত্নের সাথে আদর করে তাঁর শরীরে যেন আলতো করে হাত বুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিভাবে করা হচ্ছে? যেমন এক শিশুকে মা যেমন ভাবে আদর করে ঠিক সেই ভাবে আমি আমার কবিতা দিয়ে ভগবানকে আদর করছি। এই ধরণের অনেক মন্ত্র আছে যেখানে ভগবানকে নব্যোজাত শিশুর মত কল্পনা করে শিশুর প্রতি যেমনটি করা হয় এখানেও ঠিক সেইভাবে ভগবানের সাথে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এখানে একটি মন্ত্রে ইন্দ্রকে প্রেমিক রূপে প্রার্থনা করা হচ্ছে, গোপি ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল বেদেই কিন্তু আমরা সেই ভাবের প্রতিধ্বণি পাচ্ছি। ***পরি ত্বা গির্বণো গির ইমা ভবন্তু বিশ্বতঃ। বৃদ্ধায়ুম্ অনু বৃদ্ধয়ো জুষ্টা ভবন্তু জুষ্টয়ঃ।।*** (ঋ-১০/১/১২)। গির কথার অর্থ হচ্ছে শব্দ, গীতাতে আছে *গিরামস্যেকক্ষরম্*, এখানে বলছেন – হে ইন্দ্র, স্তুতি শুনতে তোমার খুব ভালো লাগে, আমি যে তোমার স্তুতি করছি, আমিও তো সুন্দর স্তুতি করতে পারি। একটা কাহিনী আছে, এক মহিলা এক কোম্পানির বস্। তিনি তাঁর কোম্পানিতে চাকুরির জন্য একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। এখন অনেকেই চাকুরির প্রার্থি হয়ে এসেছে। চাকরিতে পরীক্ষা একটাই, যে একটা মিষ্টি মজার কথা বলবে, কথাটা মিথ্যা হবে কিন্তু কথা খুব সুন্দর করে বলতে হবে আর সেটা আমার শুনতে এত ভালো লাগবে যে আমি গল্পটা মাঝ পথে বন্ধ করতে বলব না। তারপর একজন করে আসছে আর একটা বাক্য শুনেই তিনি বিদায় দিয়ে দিচ্ছেন। এখন যাকে নিয়ে কাহিনী সেই প্রার্থি এসেছে। সে এসেই দুনিয়ার যত মিথ্যে কথা বলতে শুরু করেছে, যে মহিলা বস্ শুনছিলেন তিনি বলছেন 'আমি জানি তুমি যা বলছ সব মিথ্যে কথা বলচ কিন্তু শুনতে ভালো লাগছে। মহিলা ওকেই চাকরিটা দিলেন, তারপরেই মূল কাহিনীটা শুরু হচ্ছে। বলা উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের সবাই মিষ্টি মজার কথা শুনতে ভালোবাসি, জানি সবই মিথ্যে কথা, বিশেষ করে যখন নিজের প্রশংসা কেউ করতে থাকে। এই মন্ত্রেও ঋষি বলছেন – হে ইন্দ্র, আমি জানি আমার কথা শুনতে তোমার খুব ভালো লাগে, তা ঠিক আছে - *গির ইমা ভবন্তু বিশ্বতঃ* – আমি যে প্রার্থনা করছি, এই কথাগুলো যেন তোমাকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে নেয়। অর্থাৎ মূল ভাবটা এই যে, যেমন এক প্রেমিক প্রেমিকাকে নিজের মধ্যে আলিঙ্গন বদ্ধ করে নেয়, ঠিক তেমনি আমার কথাগুলো যেন তোমাকে চারিদিক থেকে জড়িয়ে নেয়। আর, *বৃদ্ধায়ুম্ অনু বৃদ্ধয়ো জুষ্টা ভবন্তু জুষ্টয়ঃ* – জুষ্টা শব্দের অর্থ হচ্ছে জুড়ে যাওয়া বা ভালোবাসাতে এক হয়ে যাওয়া। বলছেন আমি যে তোমার স্তুতি করছি এটা যেন তোমাকে চারিদিক দিয়ে আলিঙ্গন করে নেয়, আর তোমাকে আমি যেন অনেক উঁচু করে, মহান করে দেখি। বলা হয় যে যাকে ভালোবাসে সে তাকে বড় করে দেখে। আমার এই শব্দগুলি যেন তোমার বুকে গিয়ে খুব ভালোবাসায় ডুবে যায়, আর তুমি যেন আমার এই শব্দগুলিকে খুবই ভালোবাসো। *জুষ্টা ভবন্তু জুষ্টয়ঃ* – এই কথাকে অনেকে মনে করেন যে যদি দেবতা আমার এই গান বা কবিতাকে পছন্দ করেন তাহলে অন্যান্য লোকেরাও এই গানের কদর করবে। যেমন ঠাকুর যে গানগুলো নিজে গাইতেন বা শুনতে পছন্দ করতেন সেই গানগুলো ভক্তদেরও খুব প্রিয় হয়ে গেছে। আজকাল তো বই পাওয়া যাচ্ছে – কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত। এই মন্ত্রটিও হচ্ছে একটি ভালোবাসার সঙ্গীত, বিশেষ করে আজকের দিনে যেসব ভক্তিগীতি আছে এটিও বৈদিক যুগের একটি ভক্তিগীতি বলতে পারা যায়।

বেদ – ৪ঠা এপ্রিল ২০১০

বেদের পুরো যা কিছু ছিল সব যজ্ঞকে নিয়েই আবর্তিত হত। একদিকে যেমন যেমন যজ্ঞ চলছিল তার সাথে সাথে অন্য দিকে, বর্তমান যুগে মন্দিরে বিগ্রহাদির সম্মুখে আমরা যেভাবে ও যে ধরণের স্তব করি, প্রার্থনা করি, এই জিনিষটাও বিবর্তিত হচ্ছিল। অনেক ধর্ম আছে যেগুলি ধর্ম অনুষ্ঠান সর্বস্ব যেমন তন্ত্র, জুরাসথ্রুস্টরা, আবার অন্য দিকে খ্রীশ্চান ধর্ম, ইসলাম ধর্ম হচ্ছে প্রার্থনা সর্বস্ব। বেদে যজ্ঞ যেমন চলার চলছিল কিন্তু অন্য দিকে যজ্ঞের সাথে সাথে যজ্ঞ সম্বন্ধীয় অনেক ধরণের প্রার্থনা হতে শুরু হয়ে গেল। প্রথমের দিকে যজ্ঞের সঙ্গে মন্ত্রের একটা যোগসূত্র থাকত। আরেকটা যেটা ছিল যজ্ঞ যখন চলত তখন সামগান সাথে সাথে চলতে থাকত। কিন্তু পরের দিকে একটা প্রথা চালু হয়ে গেল, এত দিন ধরে যজ্ঞের সময় যেসব মন্ত্র দিয়ে যজ্ঞ করা হত সেই মন্ত্রের শুরুতে ওঁ লাগিয়ে দিয়ে খুব সুন্দর করে স্তব করতে থাকলেন, ওঁ যুক্ত হওয়ার পর যজ্ঞের এই সব মন্ত্রগুলি একটা আলাদা আধ্যাত্মিক মাত্রা পেয়ে গেল। যেমন গায়ত্রীমন্ত্র, প্রথমে গায়ত্রীমন্ত্রকে যজ্ঞের মন্ত্র রূপেই ব্যবহার করা হত, পরে গায়ত্রীমন্তের প্রথমে ওঁ লাগিয়ে একটা সুন্দর প্রার্থনা হয়ে গেল। যজ্ঞের মন্ত্রগুলি আসলে যে দেবতাকে আহুতি দেওয়া হচ্ছে তাঁর স্তুতি করা হত। এর পরে এই স্তুতির আগে একটা ওঁ দিয়ে সেই স্তুতিকে আবৃত্তি করতেন। এই জিনিষটাকে এনারা বলতে শুরু করলেন শাস্ত্র। যদিও পরের দিকে শাস্ত্রের অনেক রকম ব্যাখ্যা হয়েছে, কিন্তু মূল যেটাকে শাস্ত্র বলা শুরু করা হয়েছিল বেদের এই ধরণের আবৃত্তি গুলিকে। তাহলে শাস্ত্রের প্রথম সংগা পাই – যজ্ঞের যে স্তুতি গুলির প্রথমে ওঁ লাগিয়ে দিয়ে সুন্দর করে সুর করে আবৃত্তি করা।

এরপর আরেকটা জিনিষ আস্তে আস্তে খুব গভীর ভাবে মানুষের মধ্যে ধারণা হতে থাকল, যেটা আরণ্যকে গিয়ে পূর্ণতা পেয়েছিল, সেটা হচ্ছে মানসিক যজ্ঞ করা। বৈদিক চিন্তাধারায় এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তন। বেদের ঋষি বা ব্রাহ্মণদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। যেমন একজন ব্রাহ্মণ রোজ অগ্নিহোত্র কর্ম করছে। কোন কারণে এখন হঠাৎ তাকে যেতে হয়ে দূর দেশে। এখন সেই ব্রাহ্মণের মন আকুপাকু করবে, দূর দেশে গিয়ে আর যাতায়াতের পথে আমি কি করে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করব। এইখান থেকেই শুরু হল মানসিক ভাবে অর্থাৎ মনে মনে যজ্ঞ করা। এই ধরণের আপৎকালীন অবস্থায় সেই ব্রাহ্মণ কোন এক নির্জন জায়গায় বসে চিন্তা করছে আমি আগুন জ্বালালাম, এইবার আমি মন্ত্রোচ্চারণ করে আহুতি দিচ্ছি। যজ্ঞের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে অগ্নিতে বেলপাতা নিয়ে ঢালা আর তার সাথে সাতে মন্ত্রোচ্চারণ করা, যেমন আমরা ঠাকুরের নামে আহুতি দেওয়ার সময় বলি – ওঁ ঐং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় স্বাহা। এখানে গুরুত্ব হচ্ছে আগুনে বেলপাতা দেওয়া আর তার সাথে আরও গুরুত্ব হচ্ছে মন্ত্র বলা। যজ্ঞ ব্যাপারটাই দাঁড়িয়ে আছে action and words এর উপর, মানে ক্রিয়া আর শব্দের উপরে। কিন্তু যখন মানসিক যজ্ঞের ধারণা শুরু হয়ে গিয়েছিল, সেই ব্রাহ্মণ এখন সময়ে বাড়ি ফিরতে পারবে না, সে বসে গেল মানসিক যজ্ঞ করবার জন্য তখন অগ্নি আর মন্ত্রের থেকে গুরুত্ব এসে গেল চিন্তার প্রক্রিয়াতে। ক্রিয়া আর শব্দের মধ্যে যে সব থেকে বিবর্তন এসেছে তা হচ্ছে চিন্তা। যজ্ঞ ও প্রার্থনার মধ্যে সব থেকে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে যজ্ঞে ক্রিয়া আর শব্দ অবশ্যম্ভাবি, কিন্তু প্রার্থনার ক্ষেত্রে তিনটেই বাধ্যতামূলক – ক্রিয়া, শব্দ আর চিন্তা। সেইজন্য পরের দিকে যত প্রার্থনা এসেছে সেখানে মনসা বাচা কর্মণা এই ধরণের উল্লেখ আসে।

মানসিক যজ্ঞ যখন শুরু হওয়ার সাথে সাথে একটা নতুন ধর্ম আসতে আরম্ভ করল। বৈদিক ধর্ম আর নতুন যে ধর্ম আসতে শুরু করে দিল এই দুই ধর্মের মধ্যে একটা প্রধান পার্থক্য হচ্ছে, বৈদিক ধর্ম ছিল যজ্ঞ আর তার আনুষাঙ্গিক নিয়ম বিধি আর নতুন ধর্মে এসে গেল মানসিক প্রক্রিয়া বা চিন্তা এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, এইখান থেকে আধ্যাত্মিকতা শুরু হয়ে গেল। আমরা একে জ্ঞানযোগও বলতে পারি, জ্ঞানযোগে বাইরের আর কোন আচার আচরণ থাকে না। জ্ঞানযোগ যখন শুরু হয়ে গেল, জ্ঞানযজ্ঞ যখন আরম্ভ হয়ে গেল তখন কোথাও তার একটা ঈশ্বরবোধ এসে গেছে। এখন যারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করছে আবার

যারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করছে না কিন্তু রোজ গঙ্গায় স্নান করছে, এখানে ধর্মের দিক থেকে এদের কোথাও কোন পার্থক্য নেই। দুই জনেই ধার্মিক আচরণ করছে, একজন শাস্ত্ররূপী গঙ্গায় ডুব দিচ্ছে আরেকজন গঙ্গারূপী নদীতে ডুব মারছে। যন্ত্রের মত ধর্মের আচরণ করে যাচ্ছে কিন্তু আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে এগুলো তাদের হৃদয়কে স্পর্শ করেনা। এতে কোন দোষ নেই, এইভাবে লেগে থাকতে থাকতে কোন না কোন সময়ে মনের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা জেগে উঠবে। সমুদ্রে এত ঝিনুক আর এত বালি থাকে কিন্তু সবই মুক্তা হয় না। যখন একটা বালির কণা যাবে তখন মুক্তা হয়। যদি সেই ঝিনুকটাকে যদি ওখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় তখন যাও একটা সুযোগ ছিল সেটাও নষ্ট হয়ে যাবে। যতক্ষণ এই শাস্ত্ররূপী গঙ্গাতে আমরা ডুবে থাকছি ততক্ষণ আমাদের সুযোগ থেকে যাচ্ছে, এটাও যদি ছেড়ে দিই তাহলে এই সুযোগটাও চলে যাবে। এখন আমরা যা কিছু করছি, পূজা, জপ, প্রার্থনা, শাস্ত্র পাঠ আমাদের কাছে এগুলো হল সব কর্ম আর শব্দের জাল, তাই এর মর্মার্থ আমাদের চিন্তাতে কোন রেখাপাত করছে না।

যেদিন চিন্তার জগতে এসে এগুলো ধাক্কা মারবে সেদিন থেকে ধর্ম আর ধর্ম থাকবে না, সেদিন ধর্মটাই আধ্যাত্মিকতায় উত্তরণ হবে। এইটাই ধর্ম আর আধ্যাত্মিকতার পার্থক্য। মানুষ যখন আধ্যাত্মিকতাতে চলে আসে তখন তার পুরো জীবনটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে সরে প্রার্থনা কেন্দ্রিক হয়ে যায়, আর জ্ঞানযোগ যেটা সেটাও প্রার্থনারই একটা দিক মাত্র, তখন আত্মার প্রতিই প্রার্থনা হতে থাকে। কিন্তু আগে যে কর্ম ও শব্দ চিন্তাকে স্পর্শ করতে পারছিল না, প্রার্থনাতে এসে চিন্তাকে স্পর্শ করছে। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত তাঁদের কবিতার দ্বারা মাকালীকে প্রার্থনা করে যে গান গেয়েছিলেন সেগুলি যদি একবার চিন্তার মধ্যে আসে যে মাকালীকে যা যা বলা হচ্ছে এগুলি কি সত্যি? তখন সে পাগল হয়ে যাবে। আমাদের কানের কাছে যতই আধ্যাত্মিক কথা হাজার বার বলা হোক না কেন আমাদের চিন্তাকে কখনই স্পর্শ করে না। কিন্তু যেদিন চিন্তার মধ্যে অনুরণিত হবে সেদিন সব দিক থেকেই এক অন্য মানুষ হয়ে যাবে। এইখান থেকেই আধ্যাত্মিকতার যাত্রা শুরু হয়।

ঠাকুর কথামৃতে খুব সুন্দর একটা গল্পাকারে এই জিনিষটাকে বলেছেন। এক পণ্ডিত মশাই রাজাকে ভাগবত শোনাতে যেতেন। রোজ ভাগবত পাঠ করার পর পণ্ডিত মশাই রাজাকে জিজ্ঞেস করতেন ‘কি রাজা মশাই বুঝেছেন’? রাজা মশাই বলতেন ‘আগে আপনি বুঝুন’। পণ্ডিত মশাই খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছেন, আমাকে কেন বলছে আগে আপনি বুঝুন। এই নিয়ে সে রাতদিন চিন্তা করতে থাকল। একদিন হঠাৎ পণ্ডিত মশাইর চোখ খুলে গেল, সে দেখছে ভাগবতে যা বলছে সবই তো সত্য। সে রাজা মশাইর কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এদিকে অনেক দিন পণ্ডিত আসছে না দেখে রাজা মশাই পণ্ডিতের কাছে লোক পাঠিয়েছেন। রাজার লোককে তখন পণ্ডিত মশাই বলছেন ‘তুমি গিয়ে রাজা মশাইকে বলে দাও আমি এবার বুঝেছি’। আধ্যাত্মিকতাতে আমি নিজেকে ঈশ্বরের মধ্যে আছি আর ঈশ্বর আমার মধ্যে আছেন এই ভাবনাটা তাকে ঘিরে ফেলতে থাকে। এর পর থেকেই আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হয়। আমি ঈশ্বরের মধ্যে আর ঈশ্বর আমার মধ্যে এই বোধ যতক্ষণ ঠিক ঠিক না হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের ঢাক বাজাতে হবে, ঘন্টা নাড়তে হবে, গঙ্গায় স্নান করতে হবে, শাস্ত্র পাঠ করতে হবে, আরতি করতে হবে। আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে অন্তর্জগতের ব্যাপার বহির্জগতের ব্যাপারে সাথে তার কোন সম্পর্কই নেই।

এই আধ্যাত্মিক ভাবটা যাতে সাধারণ ভক্তদের মধ্যে আসে সেইজন্য বড় বড় সাধুরা যা কিছুই করবে তার সব ফল ঈশ্বরকে অর্পণ করার কথা বলেন। যখনই অর্পণ করার কথা বলা হয় এবং যখন ঈশ্বরকে অর্পণ করা হয় তখন সেইটাই হয়ে যায় যজ্ঞ। স্থূল যজ্ঞে অগ্নিতে দেবতার নামে আহুতি দেওয়া হয়, কিন্তু এনারা দেখলেন এই জিনিষটাই যদি মনে ভেতরে অন্তর্জগতে করা হয় তখন তার একই ফল হবে। মনসা বাচা কর্মণা – এই তিনটে জিনিষকেই তুমি ঈশ্বরকে অর্পণ করে দাও। বেদের সময় থেকে শাস্ত্রের ধারণা হতে শুরু করল, শাস্ত্র মানে যজ্ঞের স্তুতি গুলির প্রথমে ওঁ দিয়ে সেটাকেই আলাদা ভাবে প্রার্থনা করে স্তব করতে আরম্ভ করল। এর ফলে ধীরে ধীরে বাইরে অগ্নি প্রজ্বলিত করে যে যজ্ঞ করা হত

আর মনে মনে যে যজ্ঞ করা হত এই দুটোই কমতে থাকল। তখন এই প্রার্থনাই নিজস্ব স্বকীয়তায় খুব দ্রুত প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকল। যখন সন্ন্যাস দেওয়া হয় তখন একটা বিশেষ যজ্ঞ করা হয়, এর নাম হচ্ছে বিরজা হোম, রজ বলতে ধুলোও বোঝায় আবার শরীর মনের সমস্ত রকমের মলিনতা বা আবর্জনকেও বোঝায়, বিরজা মানে হল জন্ম জন্মান্তরের যত আবর্জনা শরীর মনের মধ্যে লেগে আছে এটাকে এই যজ্ঞের মাধ্যমে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। সন্ন্যাস গ্রহণের দিনই এই বিরজা হোম করে সন্ন্যাস দেওয়া হয়। এখন যারা সন্ন্যাস পেলেন তাদেরকে বলে দেওয়া হয় নিত্য বিরজা হোম করতে। কিন্তু প্রত্যেক দিন বিরজা হোম করা অসম্ভব, প্রত্যেক দিন অত আনুষাঙ্গিক জিনিষ জোগাড় করা আর সময়ও প্রচুর লাগে। তাই মনে মনে রোজ বিরজা হোম করার কথা বলা হয়, কারণ সন্ন্যাসীদের বলা হয়, তোমাকে কর্মের খাতিরে বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে আসতে হচ্ছে, সমাজে অনেক জায়গাতে তোমাকে যেতে হচ্ছে আর এই ভাবে তুমি অনেক আবর্জনা নতুন করে রোজ জুটিয়ে নিচ্ছ। এখন যখন রোজ বিরজা হোম মনে মনে করা হচ্ছে, ধীরে ধীরে এমন একটা অবস্থা আসবে যখন সে আধ্যাত্মিকতাতে এত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, আর তখন বাইরে যজ্ঞ হচ্ছে কি হচ্ছে না এই ব্যাপারটা মাথা থেকে সরে যাবে। মানুষ যখন এই ভাবে অন্তর জগতে প্রবেশ করতে শুরু করে দেয় তখন এই বাইরের জগৎটাও সেই ভাবে খসে যেতে থাকে। ঠাকুর খুব সুন্দর উপমা দিয়ে বলছেন – নারকলের জল যখন শুকিয়ে যায় তখন নারকলের মালা আর শাঁস আলাদা হয়ে যায়, নারকলকে নাড়লে ঢপর ঢপর আওয়াজ করে। আধ্যাত্মিক পুরুষের সত্যিকারের এই রকমই হয়, এই জগতের সাথে তার আর কোন ধরণের সম্পর্ক থাকে না। যে ক্ষুদ্র আমিটা শরীর মনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেটা শরীর মন থেকে পুরো আলাদা হয়ে যায়।

অনেকে মনে করেন যার ঈশ্বর দর্শন হয়ে গেছে তার তো সবই হয়ে গেল, এখন প্রারব্ধ বশতঃ যতটুকু চলার চলবে। কিন্তু যার জ্ঞান হয়ে গেল তার আবার প্রারব্ধ কিসের। জ্ঞান হয়ে যাওয়া আর তারপরের যে প্রারব্ধ এর মধ্যেকার পার্থক্যগুলো এত সূক্ষ্ম যে সাধারণ বুদ্ধিতে একেবারেই ধরা যায় না, কিন্তু এই সূক্ষ্ম প্রভেদ গুলো না ধরতে পারলে অনেক কিছুতে গোলমাল হয়ে যাবে। ঠাকুর বলছেন – একজন বলছিলে আমার মামার গোয়ালে অনেক ঘোড়া আছে। এখন গোয়ালে ঘোড়াতো থাকতেও পারে। কিন্তু ঠাকুরের কথাতে এত সূক্ষ্ম একটা তথ্য লুকিয়ে আছে ধরা খুব মুশকিল। আসলে কি হয়, যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়ে গেছে, যাঁর জ্ঞান লাভ হয়ে গেছে, তাঁর যে শরীর আছে সেই শরীরের একটা গতি আছে, এখন সেই গতিতে তার শরীর এখন চলতে থাকবে। কিন্তু প্রারব্ধ বলতে আমরা যেটা বুঝি, একটা কিছুতে নিজেকে একাত্ম ভাবা, আমার এই কষ্ট হচ্ছে, আমার এইটা ভালো লাগছে, জ্ঞান লাভ হয়ে গেলে এই আমি বোধটা একেবারে আলাদা হয়ে যায়। তখন যে সুখ-দুঃখ আসে সেটা প্রারব্ধ বশতঃ আসে না, আমি অমুক অমুক জন্মে এই এই করেছি তার জন্য এই সুখ এই দুঃখ আসছে, এটা তখন এভাবে আসে না, সেই সময়ে তার যেমন যেমন সঙ্গ হচ্ছে সেই অনুসারেই এই সুখ-দুঃখ আসবে। যখন শরীর মন থেকে আত্মাকে আলাদা বোধ হয়ে যাবে তখন জগতের কোন কিছুই তাকে স্পর্শ করবে না। প্রারব্ধ বশতঃ চলে শরীর মন ইন্দ্রিয়, কিন্তু তার এখন শরীর, মন, ইন্দ্রিয়ের বোধই নেই। যেমন একটা বস্ত্র, তার নিজস্ব একটা প্রারব্ধ আছে, সেটা নিজের মত একটা সময়ে ছিঁড়ে যাবে, তাই বলে কি আমার কিছু হচ্ছে? কিন্তু একটা বাচ্চা ছেলের জামা যদি ছিঁড়ে যায় তাহলে সে কেঁদে কেটে বাড়ি মাথায় করে দেবে। কিন্তু একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের জামা যদি ছিড়ে যায় তার মন খারাপ হবে কিন্তু বাচ্চার মত হতাশ হয়ে সে আমার সব শেষ হয়ে গেল বলে মাথায় হাত দিয়ে হতাশ হয়ে পড়বে না।

বেদে যখন এই আত্মজ্ঞানের ধারণাটা দৃঢ় হতে শুরু করল, তখন তারা বুঝতে পারলেন এই যজ্ঞের সাথে আত্মজ্ঞানের কোন সম্পর্কই নেই। যিনি আত্মজ্ঞানী তিনি ইচ্ছে করলে যজ্ঞ করতে পারেন, কিন্তু তিনি ভালো ভাবেই জানেন যে আত্মজ্ঞানের জন্য যজ্ঞের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। আত্মজ্ঞানের জন্য যেটা সব থেকে প্রয়োজনীয় তা হচ্ছে জ্ঞান, অর্থাৎ আমি কে, এই জ্ঞান। যে ঋষিরা এত যজ্ঞ করতেন তাঁরা যখন

প্রার্থনার মাধ্যমে নিজেদেরকে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত করতে শুরু করলেন তখন তাঁরা দেখলেন এই প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে তাঁদের এক অন্য ধরণের জীবন হয়ে যাচ্ছে, তখন থেকে তাঁরা ধীরে ধীরে যজ্ঞের আধিক্যকে কমাতে থাকলেন। ঠাকুর বলছেন – যে মিছরির শরবত খেয়েছে তার আর চিটে গুড়ের পানা ভালো লাগেনা। গ্রাম দেশের গরীব লোকেরা পান্তা ভাতে চিনি মিশিয়ে খায় আর ওটাকেই মনে করে পায়েস। যখন বেলুড় মঠে এসে সে যখন পায়েস খাবে তখন বুঝতে পারবে যে এটাই আসল পায়েস। এই পায়েস খাবার পর পান্তা ভাতে চিনি দিয়ে পায়েস আর সে খেতে চাইবে না। একবার যখন প্রার্থনার জীবনের আস্বাদ পেয়ে যাবে, আত্মজ্ঞানের আস্বাদ যে পেয়ে যাওয়ার পর যজ্ঞ সর্বস্ব জীবনের দিকে সে আর আকৃষ্ট হবে না। একবার এই আস্বাদ পেয়ে গেলে সে পুরোপুরি প্রার্থনার জীবনে, আত্মজ্ঞানের পথে নিজেকে নিবিষ্ট করে দেবে। এইখানে এসে তাদের যে প্রথম প্রার্থনা শুরু হলে সেটা আত্মার প্রতি, আত্মজ্ঞানের জন্য প্রার্থনা, এই প্রার্থনা গুলি হচ্ছে উঁচু দরের প্রার্থনা, এর আগের প্রার্থনা গুলো ছিল আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা। জাগতিক প্রার্থনা থেকে তারা চলে এলেন অন্তরমুখী প্রার্থনাতে। যখন যজ্ঞের সময় ওঁ ঐং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় রামকৃষ্ণায় স্বাহা বলে যে আহুতি দেওয়া হচ্ছে এটাও একটা প্রার্থনা কিন্তু এটা এখন আমাদের কাছে একটা মামুলি আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা। দীক্ষা নেওয়ার পর আমরা জপ করছি ওঁ নমঃ শিবায়, এটাও একটা মামুলি প্রার্থনাই হয়ে যাচ্ছে কারণ এই মুহূর্তে এই প্রার্থনা কখনই আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করছে না। হৃদয়ের স্পর্শ নিয়ে যদি এত বছর জপ করার পর আমরা সবাই মহাযোগী হয়ে যেতাম, কিন্তু তা হচ্ছি না। কারণ এই প্রার্থনা আমাদের অন্তর থেকে হচ্ছে না, বহির্মুখী মন যন্ত্রের মত জপ করে যাচ্ছে। কিন্তু জপ করতে করতে যখন এইটাই অন্তর থেকে হতে শুরু করবে তখন আমাদের জীবন চিরতরের জন্য আধ্যাত্মিকতার খাতে বইতে আরম্ভ করবে। বহির্মুখী মনে প্রার্থনা করা আর আচার আচরণ সর্বস্ব প্রার্থনার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। এখন কেউ ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের চিরহরণ কাহিনী, যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বস্ত্র নিয়ে চলে যাচ্ছেন, উচ্চঃস্বরে পাঠ করছে, সেই সময় যদি হিন্দু ধর্মের পরম্পরা যারা কিছুই জানে না, তারা যদি কেউ জিজ্ঞেস করে – এখানে কি পড়া হচ্ছে? শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে স্নানের সময় মেয়েদের কাপড় নিয়ে পালিয়ে গেল তার কাহিনী পড়া হচ্ছে। সে তো শুনে আঁতকে উঠবে। এই রকম রাসলীলা হিন্দু ধর্মের বাইরের কেউ শুনলেই আঁতকে উঠবে। অথচ যারা সত্যিকারের ভক্ত তারা কত ভক্তি সহকারে ভাগবত পাঠ শুরু করার আগে ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় বলে আবৃত্তি করে শুনছে। তাদের মনে কোন ধরণের কুভাব আসে না, এইটাই তাদের কাছে একটা প্রার্থনা। অথচ বাইরের লোকেদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের এই কাজগুলো অত্যন্ত গর্হিত কর্ম। যখন এইটাই আমরা আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা করতে যাব তখনও এই একই ভাব আসবে। বলা হয় যারা আধ্যাত্মিক স্তরে অনেক উঁচুতে উঠে গেছেন শ্রীকৃষ্ণের এই জিনিষগুলো তাদের জন্য, সাধারণ মানুষের জন্য এগুলো নয়।

ঠাকুর ছোটবেলায় পাঠশালা থেকে পালিয়ে গিয়ে আমবাগানে বন্ধুদের সাথে যাত্রা করতেন, এই কাহিনী গুলোকে যখন সুন্দর পদ্যের আকারে লিপিবদ্ধ করে ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায় বলে পাঠ শুরু করা হয় তখন এইটাই হয়ে যাবে প্রার্থনা। কিন্তু গতানুগতিক ভাবে যন্ত্রের মত পাঠ করলে কোন বিশেষ ফল হয় না, যখন এইটাই অন্তর থেকে করা হবে তখনই তা আধ্যাত্মিকতার সোপান অতিক্রমে সাহায্য করবে। আমরা এখানে বেদের প্রার্থনা আলোচনা করছি। বেদের প্রথম প্রার্থনা আসছে নিজের প্রকৃত স্বরূপ আত্মাকে নিয়ে, এই জায়গা থেকেই উপনিষদের আবির্ভাব হল। সমগ্র উপনিষদ, যত কটা উপনিষদ আছে, তার সবটাই মূলত নিজের যে আত্মা, তার প্রতি প্রার্থনা, একেই আমরা অন্য ভাবে বলি জ্ঞানযোগ। ভক্ত প্রার্থনা করার সময় বলে, হে প্রভু তুমিই সব, আমি অকিঞ্চন, আত্মার ক্ষেত্রেও এইটাই বলা হয় – হে আত্মা, তোমা ছাড়া আর কিছু নেই, তুমিই সত্য বাকি সব মিথ্যা, আমার মনটাকে যেন পুরোপুরি তোমাতে লাগাতে পারি। জ্ঞানযোগ আর ভক্তিযোগে কোন তফাৎ নেই। যারা মুর্খ তারাই তফাৎ দেখে। সেইজন্য দেখা যায় বৈদিক প্রার্থনাই ঔপনিষদিক তত্ত্ব ও চিন্তায় রূপান্তরিত হয়েছে।

প্রত্যেক ধর্মই দুটো নিয়মে চলে। দুটো নিয়মে চলে মানে একটা Open System আরেকটি Closed System। System যখন closed হয়ে যাবে, যেমন পার্সিদের ক্ষেত্রে, জুদাইদের ক্ষেত্রে হয়েছে, সেই ধর্মের গতি থেমে যায়। আর যদি Open System থাকে, তখন এই হিন্দুদের মত বেদ থেকে উপনিষদে উত্তরণ হবে। বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান থেকে অন্তরমুখী আচার অনুষ্ঠানে উত্তরণ ঘটবে। আবার অন্তরমুখী আচার অনুষ্ঠান থেকে অন্তরমুখী প্রার্থনাতে উত্তরণ, অন্তরমুখী প্রার্থনা থেকে উপনিষদের তত্ত্ব ও দর্শনে উত্তরণ ঘটে। এইটাই হচ্ছে আধ্যাত্মিক চিন্তার স্বাভাবিক বিবর্তন। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা মনে করেন উপনিষদ হচ্ছে বেদের ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়ের ক্ষোভের উদ্‌গার। যারাই আধ্যাত্মিকতার এই স্বাভাবিক বিবর্তনকে বোঝেন তাদের কাছে এগুলো কোন সমস্যা হয় না আর এই ধরণের বোকার মত মন্তব্য করে না। নিউ টেস্টামেন্টের অনেক অধ্যায় পড়লে মনে হবে যেন উপনিষদ পড়ছি, ঠিক সেই রকম কোরানের যখন প্রথম অধ্যায় পড়ব মনে হবে যেন উপনিষদ পড়ছি, আবার বুদ্ধের উপদেশ গুলো যখন পড়বে তখন মনে হবে উপনিষদই পড়ছি। যে মুহূর্তে জীবনের সব রকম কর্ম, চিন্তা ভাবনা, প্রার্থনা অন্তরমুখী হয়ে ভেতরে চলে যাবে তখন জীবনটাই উপনিষদ হয়ে যাবে। এইটাই হচ্ছে স্বাভাবিক পরিণতি, ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়ের কোন বিদ্রোহের পরিণতি উপনিষদ নয়। ভারত হচ্ছে প্রচণ্ড Orthodox এখানে একমাত্র বিবর্তনের মাধ্যমে যে উত্তরণ হয় তাকেই গ্রহণ করা হয়, এখানে কোন ধরণের বিদ্রোহের মাধ্যমে নতুন কোন পরিবর্তনকে গ্রহণ করা হয় না।

ধর্ম আর আধ্যাত্মিকতার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? ধর্মে মানুষ ঈশ্বরকে ধরার চেষ্টা করে, আধ্যাত্মিকতা যখন আসে তখন সে মনে করে যে আমি ঈশ্বরের মধ্যে আছি আর ঈশ্বর আমার মধ্যে আছেন, এখানে তার উপলব্ধি হয়ে যায়নি, কিন্তু সে এটা অনুভব করছে। যারা ঢাকঢোল পেটাচ্ছে, কালী পূজায় পাঠাবলি দিয়ে পাঠার মাংস খুব করে চিবিয়ে যে আনন্দ পায় সেটা অন্য ধরণের আনন্দ। আর যারা অনুভব করছে আমি ঈশ্বরের মধ্যে আছি আর ঈশ্বর আমার মধ্যেই আছেন তাদের আনন্দ একেবার অন্য ধরণের।

এখন যে ঢাকঢোল পেটাচ্ছে সে ভালো, না যে ধ্যান করছে সে ভালো? এখানে ভালো মন্দের প্রশ্ন আসছে না। প্রশ্ন হচ্ছে আসলে লোকটা কি ধরণের, তার স্বভাবে যে ধর্মাচরণ প্রবল তার পক্ষে ঢাকঢোল পেটানোটাই ভালো, কিন্তু তার স্বভাবে যদি আধ্যাত্মিকতা থাকে তাহলে এই ঢাকঢোল পেটান, কালী পূজায় এত বলি, এত পুষ্পাঞ্জলী দিতে হবে এইসব ব্যাপারে তার কোন মাথা ব্যাথাই থাকবে না। যার স্বভাবে আধ্যাত্মিকতা আছে তার এই সব ধর্মীয় আচরণে কোন ধরণের আপত্তি থাকে না। ঠাকুর বলছেন – একঘেঁয়েমি আমার ভালো লাগেনা। যিনি চোখ বন্ধ করে ধ্যান করছেন এটা যেমন তার একটা সাধনা, আবার অন্যদিকে যে ঢাকঢোল শোনাটাও একটা সাধনা, যে পেটাচ্ছে সেটাও তার একটা সাধনা। বেলুড় মঠকে স্বামীজী আধ্যাত্মিকতার যত রকমের ভাব থাকতে পারে তার সমস্ত ভাবের সমণ্বয়ের কেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। কিন্তু এখানেও কত সময় ঢাক ঢোল পেটানো হচ্ছে, কত রকমের ধর্মীয় আচার আচরণ পালন করা হচ্ছে। এইটাই হওয়া উচিৎ, উপনিষদের কোথাও বলা নেই যে তুমি কোন ধরণের ধর্মীয় আচরণকে পালন করবে না বা প্রশ্রয় দেবে না। আধ্যাত্মিক পুরুষরা কখন ফুল দিয়ে পূজা করবে না, ঘন্টা নাড়বে না, পাঁচ রকমের ভোগ দেবে না, যারা অধম আচার্য তারাই এই ধরণের কথা বলেন। উত্তম আচার্য কক্ষণই এইগুলো করতে নিষেধ করবেন না, উপরন্তু তাঁরা বলবেন, তুমি যদি এইগুলোই করতে থেকে যাও তাহলে তোমার আর আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে না। ঠাকুর বলছেন – তুমি মন্দিরে ঠাকুর দর্শন করতে যাচ্ছ, কিন্তু পথে কাঙালিদের পয়সা আর খাওয়া বিলি করতেই থেকে গেলে তোমার আর ঠাকুর দেখা হবে না। যারা সমাজ কল্যাণমূলক কর্মেই থেকে যায়, নারী কল্যাণ সমিতি চালানোই যাদের একমাত্র কাজ, অনাথদের সেবা করাই একমাত্র উদ্দেশ্য তাদের একবার অন্ততঃ ভাবা উচিৎ আমার মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বর দর্শন। এগুলো কি সন্ন্যাসীর কর্ম? আদপেই নয়। সন্ন্যাসীর একটাই কাজ আত্মজ্ঞান

লাভ। বিধবার চোখের জল মোছা, অনাথের সেবা করা এগুলো সে করবে মানুষকে অনুপ্রাণিত করার জন্য। এগুলো তার লক্ষ্য নয় এগুলো হচ্ছে by products। যারা ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক লোক তাদের এই সব কাজে কোন আপত্তি থাকে না, কিন্তু তারা ভালো মতই জানে যে এই কাজ দিয়ে আমার আসল কাজটি হবে না। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা এই ব্যাপারটা খুব ভালোভাবেই জানেন। যারা এখনও আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য প্রস্তুত হয়নি, যাদের মধ্যে এখনও কামনা-বাসনা গিজ্‌গিজ্‌ করছে তাদের জন্য এই কাজগুলো নিঃস্বার্থ ভাবে করা খুব দরকার। এই কাজগুলোও যদি সে না করে তাহলে তার দ্বারা ধর্মও হবে না, আধ্যাত্মিকতার তো কোন প্রশ্নই নেই।

হাজার হাজার বছর ধরে ভারত আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য তৈরী করে গেছে, এই আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের মধ্যে ঢাক বাজানওটা দরকার। যারা এখনও সাধারণ অবস্থাতে পড়ে আছে, ধর্মীয় আচরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে ধর্ম ভাবকে জাগ্রত করবার জন্যই এই সবের আয়োজনের ব্যবস্থা আমাদের মুনি ঋষিরা করে গেছেন। কিন্তু এইটাকেই সারা জীবন যদি ধরে রেখে বুড়ো বয়সেও ঢাকের সাথে নৃত্য করে তাহলে কিন্তু বুঝতে হবে এর অনেক গোলমাল আছে। বেদের যে উপনিষদে উত্তরণ, যারা দিন রাত, বছরে হাজারটা যজ্ঞ করত তারা কিভাবে উপনিষদের দর্শনে পৌঁছালেন এইটাই হচ্ছে ভারতের আধ্যাত্মিকতার ঐতিহ্য। এই উত্তরণের সেতু হচ্ছে প্রার্থনা। বেদের যে মন্ত্রগুলিকে যজ্ঞের জন্য ব্যবহার করা হত, সেইখান থেকে আস্তে আস্তে সরে এসে তাঁরা উপনিষদের দর্শনে জোর দিলেন।

এরপর বেদের কিছু মন্ত্র নিয়ে আমরা আলোচনা করে বুঝতে চেষ্টা করব বেদ ঠিক বোঝাতে চাইছে, পরবর্তি কালে যে বিভিন্ন ভাবগুলো আমরা পুরান, তন্ত্রে ও অন্যান্য শাস্ত্রে পাচ্ছি সেই সমস্ত ভাবগুলো আগেই বেদে কিভাবে ছিল সেটা এই মন্ত্রগুলি আলোচনার মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি। এর আগে আমরা মা সরস্বতি দেবীর কাছে প্রার্থনা করছে – মা, শিশু যেমন মাতৃস্তন থেকে দুগ্ধ পান করে পুষ্টি লাভ করে ঠিক তেমনি জগতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তোমার বুক থেকেই বেরোচ্ছে।

জগতের যে একত্ব ভাব এটাই হচ্ছে ঈশ্বরের ভাব। বলছেন – ***বেনস্‌ তৎ পশ্যন্‌ নিহিতং গুহা সদ্‌ যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীডম্‌। তস্মিন্নিদং সং চ বি চৈতি সর্বং স হ ওতঃ প্রোতশ্চ বিভূঃ প্রজাসু।।*** (য- ভশ-৩২/৮)। এই মন্ত্রের বৈশিষ্ট্য দুটো শব্দের মধ্যে দিয়ে বোঝান হয়েছে, তৎ আর সৎ, যেটা পরের দিকে বিখ্যাত মন্ত্র ওঁ তৎ সৎ পাই সেইটাই যজুর্বেদে এসে গেছে। তৎ হচ্ছে ভগবানের একটি নাম, যা ভগবানকে ইঙ্গিত করছে। যেমন ইন্দ্র একজন দেবতার নাম, সেই রকম তৎ নামটা খুব উচ্চ অর্থে বলা হচ্ছে। খুব উচ্চ অর্থে বলা হচ্ছে কারণ ভগবানকে কখন কোন কিছু দিয়ে চিহ্নিত করা যায় না। তৎ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে সেই, বা তিনি। আর সৎ এর অর্থ হচ্ছে যিনি আছেন। ঋষি অবাক হয়ে যেন দেখছেন এই সৃষ্টির যা কিছু এই তৎ আর সৎ এর মধ্যে গিয়ে সব এক। কিরকম এক? যেমন পাখির বাসাতে যখন পাখি প্রবেশ করে যায় তখন পাখি আর পাখির বাসা এক হয়ে যায়। এখানে বলতে চাইছেন, এই জগতে আমি, আপনি, সে সবাই আলাদা আলাদা, কারুর সাথে যেন কোন মিল নেই, কিন্তু যখন ভগবানকে আশ্রয় রূপে দেখা হয়, নীড় রূপে দেখা হয় তখন সমগ্র জগৎ এক হয়ে যায়। যখন আমি একজন, আপনি একজন, সে একজন এইভাবে যখন দেখা হয় তখন আমরা সবাই আলাদা আলাদা, কিন্তু আমাদের সবাইকে যদি এক সাধারণ শ্রেণি হিসাবে ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ক্লাশের ছাত্র হিসাবে এক। কিন্তু আমরা গীতা ক্লাশের থেকে আলাদা। এইটাকেই যদি আরেকটু বিস্তার করে বলি আমরা বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তখন গীতা ক্লাশ আর ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ক্লাশের ছাত্র সব এক হয়ে যাবে। কিন্তু আরও অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এইভাবে হয়ে হয়ে আমাদের সবাইকে মানুষ হিসাবে ধরা হলে বলা হবে আমরা মনুষ্য জাতি হিসাবে এক। তখন সারা বিশ্বের সব মানুষ এই মনুষ্য জাতির মধ্যে এসে এক হয়ে গেল। যখন বলা হবে পশু জাতি তখন আমরা মনুষ্য জাতির মধ্যে আর পশু জাতির মধ্যে আলাদা দেখব। কিন্তু যখন বলা হবে সজীব, সজীব হিসাবে সব এক, তখন মানুষ, পশু, বৃক্ষ, কীট, পতঙ্গ, এ্যমিবা, ব্যাকটেরিয়া যা কিছু

সজীব বস্তু আছে সব এক হয়ে গেল। আমি আর একটা এ্যমিবার পরিচয় সজীব প্রাণি হিসাবে এক গোত্রের হয়ে গেলাম। সজীব ছাড়া নির্জীব পদার্থও আছে, তখন আবার আলাদা, কিন্তু পদার্থ রূপে সজীব আর নির্জীব সব এক হয়ে যাবে। আরও যখন উচ্চ অবস্থায় চলে যাবে তখন দেখবে ঈশ্বরের সঙ্গে সব কিছু ওতপ্রতো হয়ে রয়েছে, সেই চৈতন্যেরই সব কিছুকে প্রকাশ করছে। তখন এই চৈতন্য ছাড়া আর কিছুই নেই, এখানে এসে সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছ। এইখানে এসে বোঝা যায় যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সব এক, এক বই দুই নাই। সমগ্র জগতের একত্বকে একমাত্র ঈশ্বরের মাধ্যমেই উপলব্ধি করা সম্ভব। ঈশ্বর ব্যতিরেকে এই একত্বকে ধরা যায় না। আমরা যখন অনুভব করব ঈশ্বরের মধ্যে আমরা সবাই এক তখনই এই একত্বকে ঠিক ঠিক অনুভব করা যাবে, ঈশ্বর ছাড়া এই একত্বকে অনুভব করা যায় না। এই একত্বকে ধরে রাখার জন্য ধর্ম হচ্ছে খুব সুসঙ্গতিপূর্ণ শক্তি। যার জন্য দেখা যায় এক ধর্মের লোকেরা প্রচণ্ড ভাবে এক থাকে – ইসলাম ধর্ম হচ্ছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, মুসলমানরা মুসলমানদের জন্য জান দিয়ে দেবে কিন্তু অন্য ধর্মের লোকদের সহ্য করবে না। একদিকে এরা নিজেদের মধ্যে একত্বকে মানছে কিন্তু অন্যদেরকে সহ্য করতে পারছে না, কারণ এরা ঈশ্বরের নামে এক হচ্ছে না, এক হচ্ছে ধর্মের নামে। সেইজন্য বলা হয় ঈশ্বর ছাড়া একত্বকে ঠিক ঠিক অনুভব হয় না, তখন সব ধর্মের লোককেই মনে হবে নিজের অঙ্গ। এখানে বলছেন পুরো বিশ্বটা যেন একটা পাখির বাসা, সেই পাখির বাসার আমরা সবাই পাখি।

বেদের কয়েকটি মন্ত্রকে বেছে নিয়ে আমরা বোঝার চেষ্টা করছি বেদে ঈশ্বরকে কত বিভিন্ন ভাবে দেখা হত। এখন যে মন্ত্রটি নিয়ে আলোচনা করতে যাওয়া হচ্ছে, এতে একটা শব্দ আসে জারম্, জার শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে অবৈধ ভালোবাসা। একটা মেয়ে একটা ছেলেকে ভালোবাসছে কিন্তু সেই ভালোবাসার মধ্যে বৈধতা নেই। নারদ ভক্তিসূত্রে বলছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপিদের যে ভালোবাসা, এই ভালোবাসা ছিল পূর্ণ দিব্য ভালোবাসা, এই দিব্য ভাব যদি না থাকত তাহলে এই ভালোবাসাই হত – যথা জারানাম্, একটা ছেলে মেয়ের জাগতিক ভালোবাসা হয়ে যেত। বেদের মন্ত্রের মধ্যে যখন জার শব্দটা এসেছে তখন কিন্তু বুঝে নিতে হবে যে বেদে এই জার শব্দটা দিব্য ভালোবাসার অর্থেই করা হয়েছে। কিন্তু সময়ের গতিতে শব্দের অর্থ গুলো পাল্টে যেতে থাকে। বলছেন – ***দোহেন গাম্ উপ শিক্ষা সখায়ং প্রবোধয় জরিতর্ জারম্ ইন্দ্রম্। কোশে ন পূর্ণং বসুনা ন্যষ্টম্ আ চ্যাবয় মঘদেয়ায় শূরম্।।***(ঋ-১০/৪২-২)। এখানে ইন্দ্রকে একজন ঋষি প্রার্থনা করছেন।

বেদে গাভীর কথা অনেকবার এসেছে, আসলে প্রথম থেকেই আমাদের সমাজ কৃষিপ্রধান। কৃষিপ্রধান সমাজে গরুর বিরাট মাহাত্ম থাকে। গরু নিজের গোশালায় ফিরে আসে নিজের দুগ্ধকে দোহন করাবার জন্য। ঋষি বলছেন তুমি তোমার ভগবানকে নিদ্রা থেকে জাগাও। কোন ভগবানকে জাগাতে বলছেন? যিনি প্রিয়তম, নিজের প্রেমিককে যেমন ঘুম থেকে তোলা হয় ঠিক তেমনি ভালোবাসার জন ভগবানকে জাগাতে বলা হচ্ছে। এখানে জাগান কথার অর্থ হচ্ছে তাঁকে আমাদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ কর। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে যাতে তার ধন ধান্য আসে, কিন্তু ঈশ্বরকে তুলনা করা হচ্ছে প্রেমিকের সাথে। প্রবোধয় জরিতর্ জারম্ ইন্দ্রম্, ইন্দ্র হচ্ছে জার, যাঁকে আমি ভালোবাসছি, আমার প্রেমিক ইন্দ্রকে জাগাতে বলা হচ্ছে যাতে তার দৃষ্টি আমার দিকে পড়ে। এইটাই পড়ে গোপি প্রেমে ধরা পড়ছে। যেখানে বৃন্দাবনের মেয়েরা শ্রীকৃষ্ণকে পতি রূপে ভালোবাসছেন, যে ভালোবাসা আস্তে আস্তে শৃঙ্গার রসে আপ্লুত হয়ে গেছে। ঠাকুরও এই মধুর ভাব নিয়ে সাধনা করেছিলেন। এই মন্ত্রে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে এই মধুর ভাবের বীজ বেদেই নিহিত ছিল। এখানে ইন্দ্রকে জার বলে সম্বোধন করা হচ্ছে, জার হচ্ছে প্রেমিক। ভারতে যত রকমের ধর্মের ভাব আছে তার সব বীজ বেদেই পাওয়া যায়। ভগবানকে নিজের প্রেমিকা রূপে ভালোবাসা, এখানে ভগবানকে যিনি ভালোবাসছেন তিনি কোন মহিলা নন, তিনি একজন ঋষি।

ইন্দ্র, অগ্নি ছাড়াও সোম দেবতার প্রতি কিছু মন্ত্র আছে। এখানেও অনেক ধরণের ভালোবাসার সম্পর্কের উল্লেখ আছে। যেমন এক জায়গায় আছে like the Youth among Maidens, সুন্দরী

কুমারী মেয়েদের মধ্যে যুবকের যে সম্পর্ক তার কথা পাওয়া যায়। আবার পতিব্রতা নারীর পতির প্রতি যে ভালোবাসা তারও বর্ণনা বেদে পাওয়া যায়। যেমন একটি মন্ত্রে অগ্নিকে পতিব্রতা নারীর সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে, ঋষি এখানে স্বামী। বলছেন – ***দেবো ন যঃ পৃথিবীং বিশ্বধায়া উপক্ষেতি হিতমিত্রো ন রাজা।। পুরঃ সদঃ শ্যর্মসদো বীরা অনবদ্যা পতিজুষ্টেব নারী।।*** (ঋ-১/৭৩-৩)। বলছেন – যেমন একজন পতিব্রতা নারীর কোন দোষ থাকে না, সেই নারী হচ্ছে তার পতির অত্যন্ত প্রিয়া। ঠিক তেমন অগ্নি দেবতা হচ্ছেন ঋষির অত্যন্ত প্রিয় স্ত্রী। এইটাই হচ্ছে মধুর ভাব, মধুর ভাব হচ্ছে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের, এখানে কবির একটা কল্পনা। কবি যখন উপমা দিতে শুরু করেন তখন তিনি অন্য কোন কিছুরই তোয়াক্কা করেন না। এইটাই যখন পরে অন্যরা পড়ছেন বা শুনছেন তখন তারা এর বিভিন্ন অর্থ বার করেন। এখানে ঋষি তাঁর ইষ্ট দেবতাকে যে ভালোবাসছেন, সেই ভালোবাসা কি রকমের? বলছেন, যেমন একজন পুরুষ পতিব্রতা নারীকে ভালোবাসে। এখন এর ভেতরে অর্থ খুঁজতে যাওয়াটা বৃথা, কারণ এর আলাদা আর কোন অর্থ হতে পারেনা। এটা শুধু মাত্র একটা উপমা নেওয়া হয়েছে। বেদের ঋষিদের ভগবানের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কত রকমের হত এইটাই এখানে দেখার।

ঠিক তেমন ভগবানকে আবার বন্ধুর মত দেখছেন। এখানে ভগবান হচ্ছেন ইন্দ্র, ইন্দ্রের প্রতি যে সখ্য ভাব সেইটাই ঋষি এই মন্ত্রে প্রকাশ করছেন – ***মাকির্ ন এনা সখ্যা বি যৌষুস্ তব চেন্দ্র বিমদস্য চ ঋষেঃ। বিদ্মা হি তে প্রমতিং দেব জাভি- বদ্ অস্মে তে সন্তু সখ্যা শিবানি।।*** (ঋ-১০/২৩-৭) আমার আর তোমার মধ্যে যে বন্ধুত্ব এটা যেন কোন দিন ভেঙ্গে না যায়, বিদ্ম ঋষি প্রার্থনা করছেন এই বিদ্ম ঋষি আর ইন্দ্রের মধ্যে যে বন্ধুত্ব এটা যেন কোন দিন না চলে যায়। এই মন্ত্রগুলির তাৎপর্য হচ্ছে, এই মন্ত্র যদি কেউ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সহকারে জপ করে তাহলে তার সাথে যার বন্ধুত্ব আছে সেই বন্ধত্ব কোন দিন চলে যাবে না।

তেমনি অনেক মন্ত্রে ভগবানকে আবার অতিথি হিসাবে দেখা হয়। এর মধ্যে একটা হচ্ছে The Guest of Every Home, অগ্নির একটা নামই হচ্ছে অতিথি। কঠোপনিষদেও ভগবানকে অতিথি নামে উল্লেখ করা হচ্ছে। এই মন্ত্রে বলছেন - ***বিশোবিশো বো অতিথি বাজয়ন্তঃ পুরুপ্রিয়ম্। অগ্নি বো দুর্য বচঃ স্তুষে শূষস্য মন্মভিঃ।।***(ঋ-৮/৭৪-২)। অগ্নিকে স্তুতি করা হচ্ছে। ভগবান হচ্ছেন সব কিছুর মালিক, কিন্তু যারা অতি সাধারণ লোক তার এই ভাবকে ধারণা করতে পারেনা। এখানে অগ্নিকে অতিথি রূপে সম্বোধন করা হচ্ছে। অতিথি যে ভগবান এই ভাবটাই পরে হিন্দুদের মনের ভেতরে একেবারে গেঁথে গেছে। পরে এই ভাবটা থেকেই জন্ম নিল অতিথি নারায়ণ। ভগবানের অনেক রূপে, আমরা তাঁকে কিভাবে ভজনা করব, ভগবানের একটি রূপ হচ্ছে অগ্নি। প্রত্যেক গৃহে অগ্নির আরাধনা করা হয়, যেন অগ্নিকে প্রতি গৃহে অগ্নিকে আবাহন করে নিয়ে আসা হয়, এই ভাবে অগ্নিকে প্রতি ঘরে অতিথি রূপে দেখা হয়। ভগবানকে অতিথি রূপে দেখা হচ্ছে, এইখান থেকে প্রতি ঘরে যে অতিথির আগমন হয় তাকে ভগবান রূপে দেখা হতে লাগল। ভগবান অতিথি রূপে এসেছেন তাই অতিথিই ভগবান। সাধারণ মানুষ আধ্যাত্মিকতার উচ্চ ভাবকে ধারণা করতে পারেনা। সেইজন্য ঋষিরা সহজ করে বলে দিলেন, অতিথি তোমার বাড়িতে আসছে তাকে দেবতা রূপে পূজা করবে।

আরেকটি বিখ্যাত মন্ত্রে বলা হচ্ছে - ***বয়ং ধা তে ত্বে ইদ্বিন্দ্র বিপ্রা অপি ষ্মসি। নহি ত্বদন্যঃ পুরুহুত কশ্চন মঘবন্নস্তি মর্ডিতা।।*** (ঋ-৮/৬৬-১৩)। সত্যি কথা বলছি, মন থেকে বলছি, হে প্রভু আমরা তোমার। ভক্তিতে ভক্ত বলে – হে প্রভু তুমি আমার, হে প্রভু আমি তোমার, এটা হচ্ছে প্রকৃত প্রার্থনা। এইটাই যখন ঠিক ঠিক বোধ হয়ে যায়, আমি তোমার তুমি আমার তখনই এইটা আধ্যাত্মিক রূপান্তর হয়ে যায়। এখানেও বলছেন – আমরা তোমার কিন্তু আমরা তোমার উপর নির্ভর করে আছি। যেমন একটা বাচ্চা শিশু মায়ের নির্ভর করে থাকে ঠিক তেমনি আমরা তোমার উপর নির্ভর করি। *নহি ত্বদন্যঃ পুরুহুত কশ্চন মঘবন্নস্তি মর্ডিতা* – তুমি ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই যে আমাদের উপর কৃপা করবেন। এই মন্ত্রটির কয়েকটি দিক আছে। একটি হচ্ছে ইন্দ্রকে প্রার্থনা করা হচ্ছে তুমি আমাদের না দেখলে কে দেখবে। আবার

ইন্দ্রকে ঈশ্বরের ভাব নিয়ে যখন বলছে তখন বলা হচ্ছে – হে প্রভু তোমা ছাড়া আমাদের কে আর আছে, আমরা তো তোমার। ঠাকুর বলছেন – ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন, ঈশ্বর যদি আমাদের না দেখেন তাহলে কি বামুন পাড়ার লোকেরা এসে আমাদের দেখবে। এই ভাবটাকেই প্রস্ফুটিত করছে এখানে। তবে ভক্তের যেমন যেমন ভাবের পরিবর্তন হতে থাকে তেমন তেমন এই ভাব গুলো পাল্টাতে থাকে। তারপরে বলছেন আমি যে তোমার তুমি যে আমার। সিনেমার নায়ক নায়িকারা যেমন ধরণের গান করে আমি যে তোমার তুমি যে আমার, কিন্তু একটু স্বার্থের খোটাখুটি শুরু হলে তখন তুমি যে কোথায় আমি যে কোথায় গিয়ে শেষ হবে। উর্দুতে খুব সুন্দর একটা শায়ের আছে – যো কভি জান কে কসম খাতে থে, উহ অব জানাজেমে জানে কে কসম খতম হ্যায়। যে কখন তোমার প্রাণের দিব্যি খেত সেই এখন বলছে তুমি মরলে আমি তোমার শবযাত্রায় যাব। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে যখন আমি যে তোমার তুমি যে আমার এই সম্পর্ক হয় তখন সেই সম্পর্কের সাথে এর কোন ধরণের মিল নেই, এখানে কোন রকমের ছাড়াছাড়ি প্রশ্ন আসে না। যে কোন ব্যাপারে, যখন আমরা গান করছি, ছবি আঁকছি, কোন লেখালেখি করছি এই সমস্ত কাজে যদি আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ না থাকে এই জিনিষ বেশি দিন চলবে না। ইতিহাসের যে কোন বিষয়ের দিকে তাকালেই এই ব্যাপারটা ভালো বোঝা যায়। যেমন মেঘদূত, মেঘদূত হচ্ছে এক অতুলনীয় শিল্পকলা, কিন্তু এর পুরোটাই আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়াতে সৃষ্টি হয়েছে, মানুষ তার নিজের সীমাবদ্ধ গণ্ডিকে একটা অবস্থায় অতিক্রম না করলে এই জিনিষ রচনা করতে পারেনা। লায়লা-মজনুর কাহিনীতেও খুব গভীর আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ রয়েছে। সেইজন্য ইসলামিক পরম্পরাতে লায়লা-মজনুর কাহিনীকে প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে গ্রহণ করা হয়, এটা কোন মামুলি প্রেমের কাহিনী হলে এইভাবে নিত না। ঠিক তেমনি যে কোন জাগতিক সম্পর্ক, ছাত্র-শিক্ষক, বন্ধু বন্ধুতে, মা আর সন্তান, বাবা আর ছেলে, ছেলের সাথে বাবার, স্বামী-স্ত্রী, প্রেমিক প্রেমিকা, যে কোন ধরণের সম্পর্কের কথাই ভাবা হোক না কেন, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার তন্ত্রি দিয়ে যদি এই সম্পর্ককে না বাঁধা হয় আজ হোক কাল হোক সেই সম্পর্ক ভাঙ্গবেই ভাঙ্গবে, কেউ আটকাতে পারবে না। মা আর সন্তানের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতাকে নিয়ে আসা খুব সহজ হয়, অন্যান্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে ততটা সহজ হয় না, কিন্তু আধ্যাত্মিকতা না থাকলে সম্পর্ক ধরে রাখা যায় না। আধ্যাত্মিকতার স্পর্শে জাগতিক জিনিষগুলো খসে যায়। জাগতিক জিনিষ গুলো যখন খসে যায় তখন সব ধরণের প্রত্যাশা, চাওয়া-পাওয়া সরে যায়। আধ্যাত্মিকতায় আত্মা আত্মাকে ভালোবাসে, আত্মা আত্মাকে চাইছে, এই ভাব যদি না থাকে যখনই কোন জাগতিক চাপ আসবে সম্পর্ক ভেঙ্গে চৌচিড় হয়ে খান্‌খান্‌ হয়ে যাবে।

ভগবানের প্রতি ভালোবাসা যখন জাগতিক স্তরে থাকে, হে ভগবান আমাকে এটা দাও, হে ভগবান আমাকে সেটা দাও, ততক্ষণ আধ্যাত্মিকতা বাইরে পড়ে থাকে, ভেতরে আসতে পারে না। এমন অনেক ভক্তকে দেখা যায় যখনই তাদের কোন বিপদ বা দুঃখ এসেছে তারা প্রথমেই ঠাকুরকে গালাগাল দিতে আরম্ভ করে – হে ঠাকুর, তুমি থাকতে আমার এই অবস্থা হল। কিন্তু ভক্তরা বোঝার চেষ্টা করে না যে পুরো গোলমালটা সে নিজেই সৃষ্টি করেছে। এখন একটা ছেলে পড়াশুনা কিছুই করে না আর দু বেলা ঠাকুরকে প্রণাম করে বলছে – হে ঠাকুর আমি যেন পরীক্ষায় পাশ করে যাই। তারপর সে ফেল করে গেল, এখন সে যদি বলে ঠাকুর তুমি থাকতে আমি ফেল করলাম? ঈশ্বরের ভালোবাসার ক্ষেত্রে যখন একেবারেই কোন ধরণের দেওয়া নেওয়া থাকবে না, পুরোটাই আধ্যাত্মিকতায় নিমগ্ন হয়ে যায়, তখন তার যদি চোখে জলও আসে আবার যদি মুখে হাসিও আসে, কোন ক্ষেত্রেই ঈশ্বরকে সে দায়ী করবে না, ঈশ্বরের সম্পর্কের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না, আর তখনই বলতে পারবে *বয়ং ধা তে ত্বে ইদ্‌বিন্দ্র বিপ্রা অপি স্মসি* – হে প্রভু আমি তোমার আর তুমি আমার।

ঠিক এই ভাবটাকে নিয়েই আরেকটি মন্ত্র হচ্ছে – ***ত্বয়েদং ইন্দ্র যুজা বয়ং প্রতি ব্রুবীমহি স্পৃধঃ, ত্বম অস্মাকং তব স্মসি।।*** (ঋ-৮/১২-৩২)। এখানে ইন্দ্রকেই প্রার্থনা করা হচ্ছে। হে প্রভু, তুমি যখন আমার পেছনে আছ, তোমার শক্তিতে যখন আমি শক্তিমান হয়ে আছি, আমার প্রতি যারা বিরূপ, আমার ব্যাপারে যারা

নেতিবাচক চিন্তা করে, যারা আমাকে ছোট করার চেষ্টা করছে, তাদের সবারই মুখ যেন আমি বন্ধ করে দিতে পারি। হে প্রভু, তুমি আমাদের আর আমরা তোমার। *ত্বম অস্মাকং তব স্মাসি*, এটি বেদের খুব শক্তিশালী মন্ত্র, যারাই এই চারটি শব্দকে জপ করবে তাদের খুব কাজে লাগবে। এটি হচ্ছে বেদ মন্ত্র, ঋষিরা এগুলোর দ্রষ্টা। ভগবানের নামে এই প্রার্থনা করতে হয়, গায়ত্রীর মন্ত্রের মতই এর ক্ষমতা। এই মন্ত্র যার প্রতিই করবেন তাহলে দেখা যাবে তাদের বন্ধুত্ব গাঢ় হয়ে যাবে। তবে এই প্রার্থনা ভগবানের প্রতিই করা উচিত। বেদের এই মন্ত্রগুলো দিয়ে অনেক সময় বিভিন্ন কাজে লাগান হত। কারুর ছেলে যদি অবাধ্য হয়ে যায় তখন ছেলের মাথায় হাত রেখে যদি এই মন্ত্র যদি উচ্চারণ করা হয় তাহলে ছেলের অবাধ্যপনা বন্ধ হয়ে ভালো হয়ে যাবে। ঠাকুর বলছেন – যার ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ হয় সবাই তার বশে এসে যায়। এই বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঠাকুর মাস্টারমশায়ের দিকে তাকিয়ে বলছেন – নিজের স্ত্রী পর্যন্ত। বেদের এই মন্ত্রগুলো ঋষিরা চিন্তা ভাবনা করে রচনা করেননি, তাঁরা ধ্যানের গভীরে গিয়ে এই মন্ত্রগুলির ক্ষমতা দেখতে পেয়েছিলেন। ভগবানের শক্তি যদি এসে যায় তখন তার এত ক্ষমতা এসে যায় যে বলছেন, আমরা যেন দুশমনদের সব দাপাদাপি বন্ধ করে দিতে পারি।

এর পরের মন্ত্রটিও খুব সুন্দর – Had I been Thou –আমি যদি তুমি হোতাম। অগ্নির প্রতি এই মন্ত্রটি শ্রেষ্ঠ মন্ত্রের মধ্যে একটি। ***যদ্ অগ্নে স্যাম্ অহং ত্বং ত্বং বা ঘা স্যা অহম্। স্যষ্টে সত্যা ইহাশিষঃ।।*** (ঋ-৮/৪৪-২৩)। হে অগ্নি, আমি যদি তুমি হোতাম আর তুমি যদি আমি হতে। এইখানে যেটা দেখা বিষয় তা হচ্ছে ভগবানের সাথে কি গভীর সম্পর্ক। আমি যদি তোমার জায়গায় হোতাম আর তুমি যদি আমার জায়গায় থাকতে তাহলে তোমার প্রত্যেকটি প্রার্থনা আমার কাছে এসে পুষ্টি পেয়ে যেত। অর্থাৎ ঋষি বলতে চাইছেন আমি যদি ভগবান হোতাম আর তুমি যদি ভক্ত হতে, তখন তুমি যা কিছু আমার কাছে প্রার্থনা করতে আমি তোমার সব প্রার্থন পূর্ণ করে দিতাম। কিন্তু আমি ভক্ত আর তুমি ভগবান তাই তুমি আমার প্রার্থনাটা পূর্ণ কর।

একটা কবিতা আছে সেখানে বলা হচ্ছে – হে ভগবান, তুমি এই সংসার সৃষ্টি করে অনেক গোলমাল পাকিয়ে দিয়েছ। সেই কারণে এই গোলমালটাকে ঠিক করতে তোমাকে অবতার হয়ে এই সংসারে বার বার আসতে হয়। কিন্তু যেহেতু গোলমালটা তুমিই পাকিয়েছ তাই এই জগৎ তোমাকে অত সহজে ছেড়ে দেয় না, তোমাকে আচ্ছা করে শিক্ষা দেয়। কখন তোমাকে কচ্ছপ হতে হয়েছে, কখন শূকর হতে হয়েছে, কখন মাছ, কখন অর্দ্ধ মানব হতে হয়েছে। আর যিশু হয়ে তোমাকে ক্রুশ বিদ্ধ হতে হয়েছে, বুদ্ধ হয়ে তোমাকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে হয়েছিল, রাম হয়ে তোমাকে পত্নিহারা হয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে আর কৃষ্ণ হয়ে তোমাকে অন্ধকার কারাগারে জন্ম নিতে হয়েছিল। তুমি কি জান কেন তোমাকে বারে বারে এত দুঃখ-কষ্টের যাতনা সহ্য করতে হয়েছিল? কারণ তুমি এই সৃষ্টিটাতে এত গোলমাল করে রেখেছ যে এই জগৎ যখনই তোমাকে তার হাতের মুঠোয় পায় সে আচ্ছা করে তোমাকে ধোলাই দেয়। কিন্তু দেখ, সৃষ্টির সময় তুমি এত বড় গোলমাল করে অন্যায় করলে তাও আমরা কিন্তু তোমায় পূজা করি, সেইজন্য তুমিও বাপু আমার ছোটখাটো ভুলভালের দিকে নজর দিও না। আমি যেমন তোমার ভুলভাল গুলোকে ক্ষমা করে তোমাকেই পূজা করছি, তুমিও আমার ছোটখাটো ভুলভাল গুলিকে ক্ষমা করে দিও।

এর পরের মন্ত্রটিও খুব সুন্দর কিন্তু এখানে একেবারে অন্য ভাবে ঈশ্বরকে প্রার্থনা করা হচ্ছে – ***মহে চন ত্বাম্ অদ্রিবঃ পরা শুল্কায় দেয়াম্। ন সহস্রায় নযুতায় বজ্রিবো ন শতায় শতামঘ।।*** (ঋ-৮/১-৫)। এটি ইন্দ্রের উদ্দেশ্য প্রার্থনা করা হচ্ছে, শতামঘ হচ্ছে ইন্দ্রের একটি নাম। হে ইন্দ্র, যদি কেউ আমাকে প্রচুর টাকা দেয়, তাও কিন্তু আমি তোমাকে বিক্রি করে দেব না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যত ধন রত্ন আছে তার সবটাই যদি কেউ আমাকে দিয়ে দেয় তবুও আমি তোমাকে কারুর কাছে দিয়ে দেব না। হে প্রভু, তুমি হচ্ছ অনন্ত ধনরত্নের যে ভাণ্ডার তার মালিক। তোমাকে আমি কোন ভাবেই ছাড়ছি না। ঋষিরা এই ধরণের

প্রার্থনা করতেন বলে এত হাজার বছর পরেও বেদের ধর্ম এখনও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। কারণ এই মন্ত্রগুলির দুটো দিক আছে, একটা হচ্ছে এর কাব্যিক মূল্য অন্য দিকে এর আধ্যাত্মিক মূল্য। আরও যেটা বড় কথা তা হচ্ছে, এই মন্ত্রগুলির একটা আলাদা অতিন্দ্রিয় শক্তি আছে। এখন যদি কেউ দেখে তার কিছু একটা ক্ষতি হতে যাচ্ছে, একটা জিনিষ আমার হাত থেকে বেরিয়ে যেতে বসছে তখন সে যদি এই মন্ত্রটি ঠিক ঠিক ভাবে পাঠ করতে থাকে তাহলে যেটা ক্ষতি হতে যাচ্ছিল সেটা বন্ধ হয়ে যাবে।

ঈশ্বরকে যে কোন মূল্য দিয়ে নিয়ে আসতে হয়, এখন যে নিয়ে এলো সে কিন্তু তখন তাঁকে যে কোন মূল্যের বিনিময়েও ছাড়বে না। একটা বৈদিক কাহিনীতে আছে একজন লোক সোমযাগ করবেন, সোমযাগ করতে সোম পাতার দরকার। এখন সে সোম পাতা কেনবার জন্য একটা দোকানে গেছে। দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করছে সোম রাজা আছেন? দোকানদার বলছে – হ্যাঁ আছে। আমাকে দেবেন? তুমি কত দেবে? সে একটা দাম বলেছে। তখন দোকানদার বলছে – সোমরাজা ততো ভূয়াৎ, অর্থাৎ তুমি যে দাম দবে সোম রাজার দাম তার থেকে বেশি। লোকটির মন খারাপ হয়ে গেছে। তখন সে অন্য দোকানে গেছে। সেই দোকানদারও বলছে সোমরাজা ততো ভূয়াৎ। ঘুরে ঘুরে সব দোকানে খোঁজ নেওয়া হয়ে গেছে আর সবাই এক কথাই বলছে সোম রাজা ততো ভূয়াৎ। তখন সে শেষ দোকানে গিয়ে বলছে – আমার যা জমি, বাড়ি, গরু আছে সব দিয়ে দিচ্ছি। সেই দোকানদারও বলছে সোমরাজা ততো ভূয়াৎ - মানে তুমি যা দাম দিচ্ছ সোমরাজার দাম তার থেকেও বেশি। তখন লোকটি আর থাকতে পারল না, সে দোকানদারের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলছে – নিকুচি করেছে তোমার সোমরাজা ততো ভূয়াৎ, এই নিলাম তোমার সোমরাজাকে। বলেই সে দোকানদারের হাত থেকে সোম পাতা কেড়ে নিল। এই কাহিনীটির তাৎপর্য হচ্ছে, প্রথমে মানুষ ভগবানের জন্য এটা দিতে চায়, এইটা করেতে চায়, ভগবানকে দেবার জন্য অনেক কিছু ভাবে। কিন্তু একটা অবস্থা আসে যেখানে মানুষ ভগবানকে সর্বস্ব দিয়ে দিতে চাইছে। কিন্তু তখনও ভগবান ধরা দেন না। তখন ভক্তের মধ্যে একটা তীব্র জোর আসে, আমি ভগবানকে নেবই নেব, দেখা দেবে না মানে, ভগবানের উপর ডাকাতি করার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে, ভগবানকে টেনে নিয়ে আসে। এইভাবে যখন ভগবানকে নিয়ে নিল তারপরে আর কোন অবস্থাতে সে ভগবানকে ছাড়বে না, সে পৃথিবীর সর্বস্ব ধন রত্নের বিনিময়েও ভগবানকে ছাড়বে না। যারা খুব আধ্যাত্মিক পুরুষ তাদের যদি কোন বিধর্মীরা এসে বলে তুমি তোমার ধর্ম ছেড়ে দাও, সে বলবে তুমি আমার গলা কেটে দিতে পার কিন্তু আমি কোন ভাবেই আমার ধর্মকে ছাড়ব না। মুঘল আমল থেকে আজ পর্যন্ত কত লক্ষ হিন্দুদের এই ভাবে গলা কেটে দিয়েছে। হিন্দুদের যে এই মানসিক শক্তি কোত্থেকে এসেছে? বেদের এই সব মন্ত্র থেকে। কোন অবস্থাতেই আমার যে ভগবান, আমার যে ধর্ম তাকে কিছুতেই ত্যাগ করে দেব না।

এই ধরণের মন্ত্র যেমন বেদে আছে, আবার জ্ঞান লাভের জন্য প্রার্থনাও বেদে অনেক আছে। আমরা আগে দেখলাম সাধারণত ইন্দ্রকে পিতা রূপে প্রার্থনা করা হচ্ছে হে ইন্দ্র তুমি আমাকে রক্ষা কর, তোমার শক্তিতে যেন আমরা শক্তিমান হয়ে উঠি। এইটাও যেমন আছে আবার জ্ঞানের জন্যও ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে, যেমন এখানে বলছেন – ***ইন্দ্র ক্রতুং ন আ ভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা। শিক্ষা ণো অস্মিন্ পুরুহূত যামনি জীবা জ্যোতির্ অশীমহি।।*** (ঋ-৭/৩২-২৬)। হে ইন্দ্র, পিতা যেমন পুত্রদের শিক্ষা দেন, উপদেশ দেন, ঠিক তেমনি পিতার মত তুমি আমাদের পথ দেখাও, আর সুপথে নিয়ে চল। এখানে কখন বলছে না যে মৃত্যুর পরে আমি যেন জ্যোতির মার্গে গমন করি। অন্যান্য ধর্ম থেকে হিন্দু ধর্মের বিশেষত্ব হচ্ছে জীবন্মুক্তি। গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলছেন – *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ। নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।।*(৫/১৯)। জীবন্ত অবস্থায় আমাকে যা পাবার এইখানেই আমি পেতে পারি, আমাকে মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হবে না। অন্য কোন ধর্মেতো নেইই, এমনকি বৌদ্ধ ধর্মেও এই ধারণা নেই। বৌদ্ধ ধর্মে নির্বাণের কথা বলছে, জ্ঞানীর মৃত্যু যখন এসে গেল তখন তাঁর সব কিছু থেমে গেল। ইসলাম ও খ্রীশ্চান ধর্মে মৃত্যুর পর আপনাকে কবরে শুয়ে থাকতে হবে, যখন

Judgment Day আসবে তখন আপনি স্বর্গে যাবেন না নরকে যাবেন তার বিচার হবে। সব ধর্মেই আধ্যাত্মিক পূর্ণতার লক্ষ্য মৃত্যুর পরই নির্ধারিত হবে। হিন্দু ধর্মে এই কথা কখনই বলে না। বেদের প্রথমে যে ধর্ম ছিল তার উদ্দেশ্য ছিল স্বর্গে যাওয়া, বৈদিক ধর্মও মৃত্যুর পরের কথাতেই বিশ্বাস করত। কিন্তু বেদান্তে যা কিনা যথার্থ হিন্দু ধর্ম, তার লক্ষ্য হচ্ছে জীবন্মুক্তি। *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো* – এইখানেই আমাকে সব কিছু পেতে হবে। এবং *কামক্রোদ্ভবং বেগং* – কাম আর ক্রোধের বেগকে এইখানেই থামিয়ে দিতে হবে, এই হচ্ছে জীবন্মুক্তি।

হিন্দু ধর্মে লক্ষ্য কখনই স্বর্গ প্রাপ্তি নয়, নির্বাণও নয়, একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে জীবন্মুক্তি। মরে যাওয়ার পর আমাদের কি হচ্ছে কে জানতে পারছে, বেঁচে থাকতে থাকতেই যদি জীবনকে কাজে না লাগাতে পার তাহলে এই জীবনের কি প্রয়োজন রইল। জীবন্মুক্তি হচ্ছে এই জীবিত অবস্থাতেই আধ্যাত্মিকতার চরম লক্ষ্যকে উপলব্ধি করা। বেঁচে থাকতেই যদি উপলব্ধি না হয় মরে গেলে কি হবে আমাদের কি হবে কে বলতে পারবে। বেদের এই মন্ত্রেই আমরা এই জীবন্মুক্তির ধারণাকে স্পষ্ট ভাবে পাচ্ছি – *জীবা জ্যোতির্ অশীমহি* – বেদের সময় আলোর কি কোন অভাব ছিল? বলছেন আমি যেন বেঁচে থাকতে থাকতে জীবনের আলোতে উদ্ভাসিত হতে পারি। বেদের ঋষি কখনই প্রার্থনা করছেন না যে হে ভগবান আমি যেন মৃত্যুর পর স্বর্গে যেতে পারি। এই জীবন থাকতেই যদি আমি জীবনের লক্ষ্য পূরণ করতে না পারলাম তাহলে আমার বেঁচে থেকে লাভটা কি।

বেদ – ১০ই এপ্রিল ২০১০

সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ এই চারটের সব কিছুকে নিয়েই বেদ, কিন্তু বেদের মূল হচ্ছে শুধু এর মন্ত্রের অংশটুকু। বেদের ধর্ম, বেদের দর্শন, বেদের দেবতা যাবতীয় যা কিছু আলোচনা হয়েছে সবটাই বেদের মন্ত্রকে নিয়ে।

মন্ত্রের পরে বেদের যে দুটো ভাগ আসছে তা হচ্ছে ব্রাহ্মণ আর আরণ্যক, পরের দিকে যেভাবে মন্ত্র অংশ প্রসার পেয়েছে, বেদের এই দুটো অংশ সেই ভাবে প্রসার লাভ করেনি। মন্ত্র অংশের মূল দর্শনটা চলে এল উপনিষদে। পরবর্তি কালে উপনিষদই বেশি প্রসার পেতে থাকল, আর এখনও উপনিষদ উত্তোরত্তর তার প্রভাব বিস্তার করেই চলেছে। উপনিষদের মন্ত্রগুলো ছাড়া মন্ত্রের বাকি অংশটা ব্যবহার হতে থাকল পূজা অর্চনাতে। ব্রাহ্মণ আর আরণ্যকের প্রভাব যদিও খুব কমে গেছে কিন্তু এখনও পূজার বিভিন্ন উপাচারে এর কিছু কিছু মন্ত্র প্রয়োজনে ব্যবহার হতে লাগল এবং এর ব্যবহার এখনও হয়ে চলেছে। অবশ্য যারা বেদ পাঠ করেন তারা কিন্তু বেদ পুরোটাই পাঠ করেন।

যে কোন জিনিষই যখন নিজের স্বাভাবিক গতিতে দাঁড়িয়ে গিয়ে মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে, তখন মানুষ সেই জিনিষটাকে নিয়ে অনেক রকম চিন্তা ভাবনা করে এবং তাকে ব্যাখ্যা করতে চায়, তার শ্রেণীবিন্যাস করতে চায়, কিন্তু তাদের সব চিন্তা, ভাবনা, ব্যাখ্যা দাঁড়িয়ে যাওয়া জিনিষটার সব কিছুর সঙ্গে খাপে খাপে মিলবে না। বেদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছিল। বেদের যখন ব্যাখ্যা হতে থাকল তখন তার কত রকমের ব্যাখ্যা বেরিয়ে এসেছে। বেদকে যাঁরা প্রাথমিক ভাবে দাঁড় করিয়েছিলেন তাঁরা তখন কখনই ভাবেননি যে বেদকে নিয়ে ভবিষ্যতে এত কিছু হতে পারে, কারণ বেদ নিজের মত তার স্বাভাবিক নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে।

আজকে আমরা বেদের যে ব্রাহ্মণকে পাচ্ছি একেও আগেকার পণ্ডিতরা অনেক ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন। এর মধ্যে ভট্ট ভাস্বর বলে একজন খুব নামকরা পণ্ডিত বললেন – বেদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যজ্ঞ, যজ্ঞ করতে মন্ত্রের দরকার, এই মন্ত্র আর যজ্ঞকে যা ব্যাখ্যা করছে তার নাম হচ্ছে ব্রাহ্মণ। যেমন সংহিতাতে শুধু মাত্র সেই মন্ত্রগুলোই রয়েছে যেটা দিয়ে যজ্ঞ করা হবে। কিন্তু মন্ত্রগুলোর ব্যাখ্যা তাতে করা হয়নি। আবার আরেকজন বিখ্যাত পণ্ডিত রাজশেখর বললেন – ব্রাহ্মণ হচ্ছে বিধি ও নিষেধ, একটা যজ্ঞ করতে গেলে কিভাবে করতে হবে ব্রাহ্মণ অংশে তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু যখন আমরা বেদ পড়তে যাব তখন আমাদের পক্ষে ধরা খুব মুশকিল কোন জায়গায় মন্ত্র শেষ হচ্ছে আর কোন জায়গা থেকে ব্রাহ্মণ শুরু হচ্ছে। তবে মন্ত্র আর ব্রাহ্মণের মধ্যে সব থেকে যেটা বড় পার্থক্য তা হচ্ছে, মন্ত্র অংশে যত মন্ত্র আছে তার বেশির ভাগটাই পদ্যের আকারে ছন্দোবদ্ধ ভাবে তৈরী করা হয়েছে, আর ব্রাহ্মণের যত মন্ত্র আছে সেটা বেশির ভাগই গদ্যাকারে রয়েছে। এই পার্থক্য ছাড়া এর বিষয় বস্তুকে দেখে বোঝার উপায় নেই কোনটা মন্ত্র অংশের আর কোনটা ব্রাহ্মণ অংশের। মন্ত্র আর ব্রাহ্মণকে আলাদা করে দেখার ব্যাখ্যা একটাই আছে, তা হচ্ছে বেদের ঋষিরা যেটা বলে দিয়েছেন এবং পরম্পরাতে যেটাকে সংহিতা বা মন্ত্র বলছে সেটা বেদের মন্ত্র অংশ আর বেদের যেটাকে ব্রাহ্মণ বলে দিয়েছেন সেটা ব্রাহ্মণ অংশ, এ ছাড়া আমাদের আর কোন ব্যখ্যার রাস্থা নেই। কিন্তু চুলচেড়া বিচার করে দুটোর মধ্যে কি পার্থক্য আছে ধরা খুব মুশকিল।

ব্রাহ্মণে প্রধান যেটা বৈশিষ্ট্য তা হচ্ছে ব্রাহ্মণ হচ্ছে যজ্ঞের নিয়মাবলি আর তার আচার, অনুষ্ঠানের প্রণালীর বিজ্ঞান। ঋষিরা যেমন যেমন ধ্যান করেছেন, ধ্যানের গভীরে যা যা পেয়েছেন তা ওনারা শিষ্যদের বলে চলে গেছেন। এইভাবে বেদের কলেবর বৃদ্ধি পেতে থেকে গেছে। বেদের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়া মানে আরও অনেক যজ্ঞের উদ্ভব হল, এখন ঐ যজ্ঞগুলি কিভাবে হবে তার বর্ণনা যেখানে দেওয়া হচ্ছিল তারও কলেবর বাড়তে থাকল। যার ফলে ব্রাহ্মণের আকারও বৃদ্ধি পেতে শুরু করল।

ব্রাহ্মণে যে শুধু যজ্ঞের নিয়ম কানুনের সম্বন্ধেই বলা আছে তা নয়, যজ্ঞের নিয়মাবলী ছাড়া ব্রাহ্মণে অনেক পৌরানিক কাহিনীও পাওয়া যাবে। এর মধ্যে হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী আছে, বিভিন্ন রাজার কাহিনী আছে, কিছু কিছু ঋষিদের জীবন কাহিনী আছে, বশিষ্ট মুনিকে নিয়ে কাহিনী আছে। বেদের এই পৌরানিক কাহিনীগুলিই পরে বিভিন্ন পুরানে গিয়ে আরও বিস্তার লাভ করে গেছে। পুরান পুরোপুরি নিজেকে এই পৌরানিক কাহিনীর মধ্যেই নিয়োজিত করে দিল। ব্রাহ্মণের এই পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে কিছু আঞ্চলিক কাহিনী ও ঘটনাও যুক্ত হয়েছিল। পৌরানিক কাহিনীগুলো মূলতঃ কাল্পনিক হত, যখন ভগবান বিষ্ণুকে নিয়ে কোন কাহিনী রচনা করছেন, ইন্দ্রকে নিয়ে কাহিনী বলছে তখন এগুলো সব হয়ে যাবে পৌরানিক। কিন্তু যখনই রাজা রামচন্দ্রকে নিয়ে, কিংবা যুধিষ্ঠির বা অর্জুনকে নিয়ে কোন কাহিনী রচনা করছে তখন সেটা আর পৌরানিক কাহিনী থাকবে না, সেটা তখন হয়ে গেল লোকগাথা বা লোককাহিনী। যদিও এগুলো খুবই সূক্ষ্ম তফাৎ কিন্তু শাস্ত্র অধ্যয়ণের ক্ষেত্রে এই তফাৎ গুলোর ব্যাপারে ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার। বেদের মধ্যেই পাওয়া যাবে পৌরানিক আবার বেদের মধ্যেই পাওয়া যাবে লোককাহিনী। এর মধ্যেই পাওয়া যাবে ইতিহাসের বর্ণনা আবার এর মধ্যেই এমন অনেক কাহিনী যা সম্পূর্ণ পৌরাণিক।

এগুলো ছাড়া তখনকার দিনে যে ধরণের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করা হত, তার কথা ব্রাহ্মণে উল্লেখ করা হয়েছে। আর সেগুলো কেন করা হত, এই ধরণের ধর্মীয় আচার পালনের পেছনে কি কি যুক্তি থাকতে পারে তার বিবরণ তার বর্ণনাও সাথে সাথে ব্রাহ্মণে করা হয়েছে। বেদের গুরুত্বের কথা উল্লেখের সাথে সাথে আমরা পাচ্ছি সমাজে ও পরিবারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের কি কি কর্তব্য, পরের দিকে যেটা বর্ণাশ্রম ধর্মে প্রাধান্য পেয়েছিল। এই জিনিষগুলো সংহিতার অংশে পাওয়া যাবে না। তখনকার দিনে কিছু কিছু সামাজিক প্রথার বিবরণ ব্রাহ্মণে দেওয়া আছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বর্ণনা, কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্যও ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়।

ফলে বেদের মূল হচ্ছে এতে ঋচা থাকবে, মন্ত্র থাকবে আর বিভিন্ন যজ্ঞের বর্ণনা থাকবে, ব্রাহ্মণে এই জিনিষগুলো থেকে কিছুটা সরে এসেছিল অথচ বেদের সব কিছুই ছিল বলে একে পুরোপুরি আলাদা করে দেওয়া হল। শুধু তাই নয়, পরের দিকে কিছু ব্রাহ্মণকে বেদের কোন একটা ব্রাহ্মণ অংশকে দিয়ে বলে দেওয়া হল আপনারা এই ব্রাহ্মণ অংশকে পরম্পরা ভাবে সামলে রাখুন। বেদের একটা সংজ্ঞা দেওয়া হয় – মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ হচ্ছে বেদ। এই সংজ্ঞাতে বোঝা যায় যে এনারা মন্ত্র বা সংহিতাতে যা আছে তার বাইরে যা কিছু বেদে আছে তার সবটাকে মিলে ব্রাহ্মণ বলে ধরে নিয়েছিলেন। তার ফলে সেই ব্রাহ্মণের মধ্যে আরণ্যক উপনিষদ সবই এসে যাচ্ছে। কিন্তু পরের দিকে অনেক পণ্ডিত উপনিষদকে ব্রাহ্মণ বলে মানতে চাইলেন না, শুধু ব্রাহ্মণ অংশকেই ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।

ব্রাহ্মণে সচরাচর যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে – বিধি আর অর্থবাদ। বিধি হচ্ছে একটা জিনিষকে কিভাবে করা হবে আর অর্থবাদ হচ্ছে প্রশংসা, যে জিনিষটা করতে যাচ্ছে সেটা করলে মানুষ কি কি পাবে তার প্রশংসার কথা বর্ণনা করা। যেমন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, একজন লোক আছে যার কোন সন্তান হচ্ছে না, সে চাইছে তার একটি সন্তান হোক। এখন তাকে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার জন্য বলা হল। পুত্রেষ্টি যজ্ঞে যে মন্ত্রগুলো পাঠ করা হবে তার উল্লেখ আমরা বেদের মন্ত্র অংশে পেয়ে যাব, কিন্তু ব্রাহ্মণ বলে দেবে পুত্রেষ্টি যজ্ঞটা কিভাবে করা হবে – তার কয়টি অগ্নি থাকবে আর সেই অগ্নিকে কি ভাবে স্থাপন করতে হবে, তার কি মন্ত্র হবে, তার জন্য কোন্ কোন্ ব্রাহ্মণ আসবে ইত্যাদি। আর তার সঙ্গে যজ্ঞ চলাকালীন স্তুতি করা হবে, যেমন একটা কাহিনী বলতে থাকবে অমুক লোকের সন্তান হচ্ছিল না, সে এই যজ্ঞ করার পর তার সন্তান লাভ হয়েছিল। পুত্রেষ্টি যজ্ঞে কি কি স্তুতি করা হবে সেটাও ব্রাহ্মণে বলা আছে। এই জিনিষগুলোই ব্রাহ্মণে বিশদ ভাবে বলা হয়েছে।

আমরা আগেও বলেছি যে বেদের অনেক সংহিতা হারিয়ে গেছে আর ঐ সংহিতার সঙ্গে যুক্ত যে ব্রাহ্মণ গুলো ছিল সেগুলিও হারিয়ে গেছে। এখনও পর্যন্ত যে কটি ব্রাহ্মণ পাওয়া গেছে তার মধ্যে উল্লেখনীয় হচ্ছে ঐতেরেয় ব্রাহ্মণ, কৌশিতকী/সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ, তাণ্ড্য মহা ব্রাহ্মণ, সদ্বিংশ ব্রাহ্মণ, জৈমিনি ব্রাহ্মণ, ছান্দগ্যো ব্রাহ্মণ, সংবিধানা ব্রাহ্মণ, দেবতাধ্যানা ব্রাহ্মণ, বংশ ব্রাহ্মণ, সংহিতোপনিষৎ ব্রাহ্মণ, শাত্যায়না ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। শুক্ল যজুর্বেদে একটা খুব নামকরা ব্রাহ্মণ আছে যার নাম হচ্ছে শতপথ ব্রাহ্মণ। এখন পর্যন্ত যত গুলো ব্রাহ্মণ পাওয়া গেছে তার মধ্যে শতপথ ব্রাহ্মণ হচ্ছে সব থেকে বিখ্যাত ব্রাহ্মণ।

আমরা দেখেছি মন্ত্র অংশে প্রথম দিকে যেসব মন্ত্র ছিল তার বেশির ভাগই ছিল যজ্ঞের জন্য, আর এই যজ্ঞ সবই ছিল বাহ্যক ও বহির্মুখি সাধনার অঙ্গ। কিন্তু দিনে দিনে মানুষের চিন্তা ভাবনার পরিবর্তনের সাথে সাথে যজ্ঞ, যা বাহ্যিক ও বহির্মুখি সাধনা ছিল, বিবর্তিত হতে হতে ধর্মীয় আদর্শটা অন্তর্মুখীনতার দিকে সরে এসে মানসিক প্রক্রিয়াতে চলে যেতে শুরু হল। ব্রাহ্মণ অংশে এসে এই ধর্মীয় ভাবের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসে গেল। পরিবর্তনের মধ্যে থেকে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি ধর্মীয় সাধনার প্রক্রিয়ার জন্ম নিল তা হচ্ছে জপ। আজকে যে জপের কথা আমরা এত শুনছি সেটা বেদের ব্রাহ্মণ অংশেই এসে গিয়েছিল, আর জপের মাহাত্মকে অনেক উঁচুতে স্থান দেওয়া হয়েছিল।

সবারই এক ধরণের অনুষ্ঠান পছন্দ হতে পারে না। বিভিন্ন মানুষের মানসিক গঠণ অনুযায়ী একেক ধরণের অনুষ্ঠানকে পছন্দ করে, দুর্গাপূজার সময় খুব ঢাকঢোল বাজিয়ে পূজা করাকে অনেকের পছন্দ আবার এই ধরণের হৈচৈকে অনেকে পছন্দ করে না, মানুষ সেটাকেই পছন্দ করে যেটা তার মন চাইছে। সেইজন্য বলা হয় সব জিনিষ সবার জন্য নয়। এই কারণে বেদের সময় যেটা জাঁকজমকের ব্যাপার ছিল সেগুলো সবার জন্য ছিল না। এই ধরণের জাঁকজমকের বাইরে যে একটা শান্ত বিমুর্ত ভাব রয়েছে সেই ভাবকে যারা চাইছে তাদের জন্য বেদকে কিছু করতে হবে। সবাই যে স্থুল জিনিষটাকেই নেবে তা নয়, স্থুলের পেছনে যে বিমুর্ত রূপ, তার যে সার রয়েছে সেটাকেও অনেকে চাইছে, যেমন সরস্বতি পূজাতে খুব ঢাকঢোল বাজিয়ে পূজা করা হচ্ছে, এটা হচ্ছে অত্যন্ত অশোধিত অবস্থার রূপ, কিন্তু মা সরস্বতির যে বিমুর্ত রূপ তা হচ্ছে তিনি বিদ্যার দেবী। এখন কেউ মনে মনে ঠিক করল যে আমি এই বিদ্যার যে দেবী তাঁর আরাধনা করব যেখানে মুর্তির কোন ব্যাপার থাকবে না। যখনই এই ধরণের চিন্তা তার মনে এল তখনই তার জীবনটা অন্তর্মুখীনতার মধ্যে নিমগ্ন হতে শুরু করল।

ঠিক এই জিনিষটাই বেদের ক্ষেত্রেও হয়েছিল। বেদে প্রথম থেকে যাগ যজ্ঞই ছিল, কিন্তু কিছু কিছু মানুষের মনের মধ্যে নানা ধরণের প্রশ্ন উঁকি দিতে শুরু করল, সাথে সাথে তাদের মন ভেতরের দিকে যাত্রা করল। বেদে অনেক ধরণের প্রার্থনা ছিল, এখানে এসে দেখা গেল অনেক প্রার্থনার শুরুতে ওঁ লাগিয়ে দেওয়া হল। তারপরে তারা দেখলেন এখন আমি যদি এত যজ্ঞ যাগ না করি, যদি একমাত্র প্রার্থনাই করে যাই তাহলেও আমার প্রার্থনার ফল আমি পেয়ে যাব। ঠিক তাই হল, এখন যদি আমরা দেখি শুধু ভগবানের নাম করে বা শুধু জপ করেই সব কিছু পেয়ে যাই তাহলে এত সময় সাপেক্ষ, ব্যয় সাপেক্ষ, শ্রম সাপেক্ষ, অর্থ সাপেক্ষ এত কঠিণ যজ্ঞ করার কি প্রয়োজন আছে। ঋষিরাও সতিই তাই দেখলেন, প্রার্থনাতেই সব কিছু সমাধান হয়ে যাচ্ছে, তাই এনারা প্রার্থনার প্রক্রিয়াতে আরও বেশি বেশি করে সময় জোর দিতে আরম্ভ করলেন। প্রার্থনার ব্যাপারটাকে নিয়ে আসার পর তাঁরা দেখলেন যে এই যে আমি প্রার্থনা করছি এটা তো শুধু একটা মন্ত্র, যেমন গায়ত্রীমন্ত্র, এই গায়ত্রীমন্ত্র দিয়ে গায়ত্রী যজ্ঞ হতে পারে, আবার এই গায়ত্রীমন্ত্রই একটা প্রার্থনা হতে পারে। কিন্তু দেখছে এই গায়ত্রীমন্ত্রকে শুধু মন্ত্র হিসাবে জপ করতে শুরু করে আমি যদি সব ফল পেয়ে যাই, তখন আমি এত যজ্ঞ কেন করতে যাব, এত খোল করতাল নিয়ে কেনই বা কির্তন করতে যাব। এইভাবেই জপ ব্যাপারটা হিন্দুদের মনের মধ্যে গভীর ভাবে রেখাপাত করে জপ বেশি মাহাত্ম্য পেয়ে গেল।

উপনিষদে এসে আমরা দেখতে পাই মানুষ আরও গভীর ভাবে অন্তর্মুখীনতার দিকে ঝুঁকে গেল। অন্তর্মুখি সাধনায় মনের কার্যের পরিধি অনেক বিস্তার হয়ে যায়। কিন্তু সাধারণ মানুষ মনের গতিবিধিকে আধ্যাত্মিক সাধনায় ব্যবহার করার কৌশল ঠিক ভাবে আয়ত্ত না করার জন্য একটা সমস্যা থেকে যায়। এই সমস্যা প্রত্যেক ধর্মেই দেখা যায়। একটা খুব সহজ উপায় যদিও বা কেউ বলে দেয় কিন্তু তাতে সমস্যা চলে যাবে না। ঠাকুর অনেকবার বলেছেন যে, ভক্ত তিন রকমের হয়, সাত্ত্বিক ভক্ত, রাজসিক ভক্ত ও তামসিক ভক্ত। তামসিক ভক্তিতে ডাকাত পড়ার ভাব। সব ধর্মেই কিছু লোক থাকবেই যারা চাইবে খুব করে পাঠা বলি হবে, ঢাকঢোল বাজান হবে। আমাদের ঋষিরা দেখলেন একই ধরণের আধ্যাত্মিক সাধনা সবার জন্য চলবে না। কিছু লোকের দাঁত পড়ে গেলে এই ধরণের জাঁকজমকের দিকে আর যেতে চায় না, কিন্তু আবার কিছু লোক আছে যারা ছোটবেলা থেকেই জাঁকজমকের প্রতি আকর্ষণ কম থাকে। কিছু লোকের আকর্ষণ নেই কিন্তু তাই বলে সবারই আকর্ষণ চলে গেছে তা নয়। হিন্দু ধর্মের এটাই বিশেষত্ব। সময়ের কষ্টিপাথরে বিচার করে দেখলে একই সাধনা সবার জন্য নির্দিষ্ট করলে চলবে না। সেইজন্য আমরা দেখি প্রথমে যজ্ঞের খুব রমরমা, যজ্ঞ থেকে ধীরে ধীরে প্রার্থনা এল, তারপর প্রার্থনা থেকে এসেছে জপ, জপ থেকে ধ্যান। কিন্তু পরে দেখলেন এইভাবে হবে না। তখন তাঁরা আবার যজ্ঞে ফিরে গেলেন কিন্তু যজ্ঞ যাগটা পূজাতে পাল্টে গেল। ইদানিং কালে আমরা যে দুর্গা পূজা, কালী পূজা দেখছি এগুলো হচ্ছে যজ্ঞেরই নতুন সংস্করণ। আবার যারা জপ করার তারা জপ করছে, আবার একই লোক সব রকমই করছে। ঠাকুর বলছেন – আমি একঘেঁয়ে হব কেন।

আমরা যে বেদের তথ্য গুলো পাচ্ছি তাতে এটা বোঝা যাচ্ছে যে ঋষিরা এই জিনিষগুলোকে নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করেছিলেন। সেখান থেকে তাঁরা কিছু একটা নতুন পদ্ধতি নিয়ে এলেন কিন্তু তাই বলে তাঁরা পুরনো পদ্ধতিগুলোকে বাতিল করে দিলেন না, কারণ দেখলেন কিছু লোকের জন্য পুরনো পদ্ধতি গুলোও দরকার। আসলে যজ্ঞাদি করত কোন কিছু পাওয়ার জন্য। এখন একজন দেখলেন আমি লাখ টাকা খরচ করে অনেক দিন ধরে যজ্ঞ করলাম কিন্তু তার বদলে আমি ঘরে বসে চুপচাপ এক মাস, দুই মাস ধরে জপ করি তাতে আমার একই ফল হবে। তখন সে কেন আর যজ্ঞ করতে যাবে। যজ্ঞের গুরুত্বটা কমে গেল কিন্তু মানুষের মনের চাহিদার বৈচিত্র্যতা থেকে গেল, সেইজন্য যজ্ঞটাও থেকে গেল কিন্তু অন্য একটা রূপে থেকে গেল।

ব্রাহ্মণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তপস্যা। প্রজাপতি যখন সৃষ্টি করলেন তখন তিনি তপস্যা করলেন। বেদের মন্ত্র অংশে যখন সৃষ্টির কথা আসছে তখন বলা হয়েছিল সৃষ্টিটা যজ্ঞ থেকে এসেছে। কিন্তু যখন ব্রাহ্মণে ঢুকে পড়ল তখন দেখতে পাই তপস্যা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে। সংহিতা অংশে আমরা সৃষ্টির কথা নাসদীয়সূক্তম্ আর পুরুষসূক্তমে পেয়েছি। পুরুষসূক্তমে দেখা যাচ্ছে সেই যে ভগবান, যাঁকে বেদে পুরুষ বলা হচ্ছে, সেই পুরুষকে যজ্ঞের পশু করে বলি দেওয়া হচ্ছে। সেইখানে পুরো সৃষ্টিটাই হচ্ছে একটা যজ্ঞ। সেই যজ্ঞে পুরুষকে যে বলি দেওয়া হল, এখন সেই পুরুষের যে বিভিন্ন অঙ্গ, তার থেকে এই জগতের বিভিন্ন জিনিষের সৃষ্টি হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ অংশে এসে সৃষ্টির এই ধারণাটা পাল্টে গেল। এখানে দেখতে পাই সৃষ্টি প্রজাপতি করছেন। কিভাবে? *স তপোতপ্যত স তপস তপ্ত্বা*। এখানে এসে দেখছি প্রজাপতি তপস্যা করছেন সৃষ্টির জন্য। আগে যে ধারণাটা ছিল যজ্ঞ থেকে সব কিছু পাওয়া যাবে। সৃষ্টিটাও হচ্ছে একটা যজ্ঞ। যাবতীয় যা কিছু হচ্ছে সবই যজ্ঞ, আমি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি সেটাও যজ্ঞ। আমি যা কিছু পেতে চাই যজ্ঞের দ্বারাই সব পেয়ে যাব, মন্ত্র শক্তিতেই সব পেয়ে যাব। বেদের ব্রাহ্মণ অংশে এসে এই ধারণাটা পাল্টাতে শুরু করল, এই পরিবর্তনটাই উপনিষদের রূপ নিয়ে নিল, সেই রূপটা হচ্ছে, যজ্ঞের বদলে তপস্যা এসে গেল।

তপঃ হচ্ছে তাপ, যখন আমি ঠিক করে নিলাম আমি একটা জিনিষকে করতে থাকব, এখন এই কাজটা একাগ্র ভাবে করতে থাকলে আমার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক একটা তাপ সৃষ্টি হতে

থাকবে। এই তাপ থেকেই যেটা পাওয়ার জন্য কার্য করছিলাম সেটার প্রাপ্তি হয়ে যাবে। উপনিষদে যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই যজ্ঞকে নিন্দা করেছে আর অন্য দিকে তপস্যার প্রশংসা করে গেছে। আবার বাল্মীকি রামায়ণে যখন যাব তখন দেখতো পাবো সেখানে কথায় কথায় তপস্যার কথা বলছে। যজ্ঞ থেকে তপস্যাতে স্থানান্তর বেদের ব্রাহ্মণ থেকেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। এর পরবর্তি কালে যত শাস্ত্র এসেছে, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত, সব শাস্ত্রেই তপস্যাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যজ্ঞের গুরুত্ব এখানে অনেক কমে গেছে।

যজ্ঞ যখন করা হয় তখন অনেক মন্ত্র দরকার, কিন্তু তপস্যার ক্ষেত্রে একটি কি দুটি মন্ত্রই যথেষ্ট। তপস্য হচ্ছে পুরোপুরি এক ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপার, কিন্তু যখন যজ্ঞ হয় তখন সেখানে অনেকে মিলে অংশ গ্রহণ করে। তাই যজ্ঞ হচ্ছে সামগ্রিক ব্যাপার আর তপস্যা যে যার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু যজ্ঞ যে একেবারেই চলে গেল তা নয়, বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে যজ্ঞ এখন চলে আসছে। আবার যখন সন্ন্যাস দেওয়া হয় তখন অগ্নি প্রজ্বলিত করে সেখানে আহুতি দেওয়া হয়। যজ্ঞ অনেক ভাবেই থেকে গেছে কিন্তু আগের মত কথায় কথায় একটা যে কোন ব্যাপারে যে যজ্ঞ করা হত, সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। এইভাবেই তপস্যা আর স্বাধ্যায়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেল। আগে যেমন সবাই মিলে মন্ত্রোচ্চরাণ করত, কিন্তু পরের দিকে স্বাধ্যায়ের ব্যাপার যখন এসে গেল তখন যে যার নিজের মত গুরুর কাছে মন্ত্রোচ্চারণ শিখে নিয়ে আলাদা নিজস্ব ভাবে অনুশীলন করতে থাকল। সংহিতা অংশে কেউ আলাদা ভাবে ধর্মীয় জীবন যাপন করতে চাইলেও পারত না। তখন যজ্ঞ হোক বা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হোক সেখানে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে অংশ গ্রহণ করতে হবে। এখন কিন্তু একা একা করা যায়। তপস্যার সাথে সাথে আরেকটি জিনিষ আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ হিসাবে এসে গেল, তা হচ্ছে আত্মবিচার – কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল এই বিচার শুরু হল।

ব্রাহ্মণ অংশে আমরা আরেকটি জিনিষ পাই, মানুষ কি কি ভালো কাজ করল আর কি কি খারাপ কাজ করল সেটা দাঁড়িপাল্লা দিয়ে মাপা হয়। এই জিনিষটাই কিছুটা আমরা খ্রীষ্টান ধর্মে Day of Judgment এ পাই। মানুষ যখন মরে গেল তখন তার ভালো মন্দ কাজের হিসেব করা হয়। বরুণ দেবতাকে একবার পাতাল ও নরকাদি লোকে পাঠান হল দেখার জন্য সেখানে কি আছে আর কি হয়। সেখান থেকে দেখে এসে বরুণ দেবতা বর্ণনা দিচ্ছেন – যারা বৃক্ষাদিকে কাটে তাদের মৃত্যুর পর এই গাছেরাই এদেরকে টুকরো টুকরো করে কাটে। এই ধারণাটাই পরে আমাদের কর্মবাদে চলে এল, সেখানে বলা হচ্ছে তুমি যাকে কষ্ট দিয়েছ সেই আবার তাকে পরের জন্ম কষ্ট দেবে। এখন একটা কুকুরকে আমি ঢিল মারছি, আগামী জন্মে আমি কুকুর হয়ে জন্মাব আর সে মানুষ হয়ে আমাকে ঢিল মারবে। আর এই জন্মে আমি মশাও মেরেছি আবার কুকুরও মেরেছি এখন পরের জন্মে আমি কি হব? শুধু তাই নয়, মানুষ কত মাছ মেরে খেয়েছে, আর মানুষের পেট কত ছাগলের কবরস্থান হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এখন আগামী জন্মে তাকে কোন যোনিতে নিয়ে যাওয়া হবে এই নিয়েতে রীতিমত টানা হেঁচড়া চলবে। এগুলো হচ্ছে খুব জটিল আর সমস্যার ব্যাপার। প্রথমে এনারা খুব সহজ একটা নিয়ম বলে দিলেন, তুমি যদি গাছ কাট এই গাছ আগামী জন্মে তোমাকে কাটবে। খুব সহজ কথা, এখনও সাধারণ লোকেরা কর্মবাদের তত্ত্ব বলতে গিয়ে এইটাই বলবে। কিন্তু এটা আসলে কোন তত্ত্বই নয়। জেলেরা সারা জীবনে হাজার হাজার মাছ ধরে চালান করছে। তাহলে এই তত্ত্ব অনুসারে আগামী জন্মে জেলে হবে মাছ আর মাছ হবে মানুষ। এখন প্রত্যেকটা মাছ মানুষ হতে সময় লাগবে, আর মাছেদের মধ্যে তীব্র লড়াই শুরু হয়ে যাবে কে আগে ঐ জেলে ব্যাটাকে ধরবে। একজন সন্ন্যাসী অনেক আগের আগের প্রত্যেকটা জন্মে কোন একটা নারীর সঙ্গে ছিল, যে জন্মে মশা ছিল তখন তার সাথে একটা মেয়ে মশাও ছিল, যখন কুকুর ছিল তখন একটা মেয়ে কুকুরও ছিল। কিন্তু এখন সন্ন্যাসীর পথে এই সংস্কার তো ঘুরে ঘুরে আসবে। তাহলে তো এই জিনিষগুলো চলতেই থাকবে কোন দিন শেষই হবে না, মুক্তির ব্যাপার বলে তো কিছুই থাকছে না। এই কথা গুলো যে

অত্যন্ত বোকা বোকা এটাকে এনারা পরে ধরতে পেরেছিলেন। পতঞ্জলি যোগসূত্রে এই ব্যাপারটা পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে যাবে। সেখানে বলা হচ্ছে আমি কি করলাম সেটার কোন মূল্য নেই, ঘটনার প্রাসঙ্গিকতার কোন দাম নেই। আমার ভেতরে যে সংস্কারটা থেকে গেলে সেটাই হচ্ছে প্রধান। আমি একজনকে গালাগালি দিলাম, এখন এই গালাগালি দিতে গিয়ে আমার মধ্যে যে হিংসা ভাবের উদয় হল এইটাই আমার ভেতরে একটা দাগ থেকে যাবে, এই দাগটাই সংস্কার রূপে থেকে যাবে। কোন একটা জন্মে গিয়ে যখন সুযোগ পাবে তখন এই হিংসার সংস্কারটা বেরিয়ে আসবে।

ব্রাহ্মণে তারা প্রথমে বলে দিলেন মানুষের কর্মকে দাঁড়িপাল্লা দিয়ে হিসেব করা হয়। সেখান থেকে এসে গেল চিত্রগুপ্তের খাতা রাখা। তুমি কি কি ভালো কাজ করেছ কি কি খারাপ কাজ করেছ সব চিত্রগুপ্তের খাতায় লেখা আছে, যেটা যমরাজের কাছে মৃত্যুর পর বিচার হবে। সেইজন্য প্রথমে বলা হয়েছিল তুমি পূণ্য কর যাতে যমরাজার শাস্তি থেকে বাঁচতে পার। কিন্তু পরের দিকে এনারা দেখলেন – না এই ভাবে চলবে না। ব্রাহ্মণ অংশেই আবার আমরা দেখতে পাই অসতো মা সদ্‌গময়র মত ধারণা – আমাকে অসত থেকে সৎ এর দিকে নিয়ে যাও। আমি যদি কারুর প্রতি অসৎ কর্ম করে থাকি তাহলে নরকে গিয়ে সে আমার প্রতি অসৎ কর্ম করবে এই ধারণাটা থেকে এনারা সরে এলেন।

এইটাই হচ্ছে হিন্দু ধর্মের সাথে অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পার্থক্য। হিন্দু ধর্ম হচ্ছে অত্যন্ত উন্মুক্ত। উন্মুক্ত ধর্ম হওয়াতে যখনই দেখেন কোন তত্ত্ব বা ধারণাতে কিছু গোলমাল আছে তখনই তারা সেটকে সংশোধন করে নেন। কিভাবে সংশোধন করেন? ধারণাটাকে কোন পরিবর্তন করে নয়, হিন্দু ধর্ম কখনই বলবে না যে তুমি যদি খারাপ কাজ কর তুমি শান্তি পাবে, বা কখনই বলবে না যে তুমি ভক্তি বা মুক্তি পেয়ে যাবে। কিন্তু আগে যেটা বলেছিল যে প্রত্যেকটা খারাপ কাজের জন্য একটা একটা করে বদলা নেওয়া হবে, এই ধারণাটাকে তারা পাল্টে দিলেন। তার বদলে নতুন তত্ত্ব এনে বললেন, ঐটাই তোমার সংস্কার রূপে থেকে যাবে, যখনই ঠিক ঠিক সুযোগ পায়ে যাবে এই সংস্কারটাই তাকে আবার খারাপ কাজের দিকে ঠেলে দেবে। এইভাবে একটা পুরনো ধ্যান ধারণা কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে একটা নতুন দর্শনের জন্ম নিল আমরা দেখলাম। আমরা এখানে আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে নিয়ে আলোচনা করছি, এই আলোচনাতে এইগুলো জানা আমাদের খুবই আবশ্যক, কিভাবে একটা ধারণা থেকে আরেকটা ধারণা উঠে এল।

আমরা এর আগে বেদের একটা মন্ত্র আলোচনা করেছিলাম যেখানে বিশ্বদেবাকে বলা হচ্ছে আমি যে মুহুর্তে মাতৃগর্ভে এলাম সেই মুহুর্তে তোমার সঙ্গে আমার যোগ হয়ে গেল। এখানে দেখান হয়েছে যে হিন্দুদের মধ্যেও এই ধারণা ছিল যে শূন্য থেকে আমার জন্ম হয়েছ। বৈজ্ঞানিকরাও এই কথা বলছেন যে তোমার জন্ম হবার আগে তুমি ছিলে না। তোমার বাবা আর মার সংযোগ হয়েছে, একটা ঘটনাচক্রে তোমার জন্ম হয়েছে। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যত বস্তু আছে সব জড়, কিন্তু বিজ্ঞানে প্রাণের কি ব্যাখ্যা করছে? বলছে accidental combination of molecules, যে তত্ত্বটাতে বিজ্ঞান এখন পৌঁছেছে সেই তত্ত্বটা বেদও সাত আট হাজার বছর আগে বিশ্বাস করত, I am an accidental product, যে মুহুর্তে আমি মাতৃগর্ভে এলাম সেই মুহুর্তেই তোমার সাথে আমার যোগ হল, বলে প্রার্থনা করছে – হে বিশ্বদেব, তুমি আমায় রক্ষা কর। এইখানে যে ঋষি এই মন্ত্রটা বলছেন তাঁর যে চিন্তাধারা নিয়ে এই তত্ত্বটা বলছেন তখন তার আগে এই নিয়ে আর কোন তত্ত্ব ছিল না। যেমন মুর্খ মানুষরা ভাবে মৃত্যুর পরে কিছু নেই, দেহটা পুড়িয়ে দেওয়ার পর সব শেষ হয়ে গেল। ঠিক তেমনি আমার মাতৃগর্ভে আসার আগে কোন অস্তিত্ব ছিল না, এই ধারণাটাই চিরদিন লোকেরা করে এসেছে এবং এখনও অনেকেই এইটিকে ধারণা করে আছে। এই ধারণাকে ইঙ্গিত করে গীতাতে ভগবান বলছেন – *অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধানান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।।*(২/২৮)। আমি জন্মের আগে ছিলাম না, শূন্যে ছিলাম, মরে যাব শূন্যে চলে যাব, মাঝখানে এই কয়টি বছরের জন্য এখানে এসেছি তার জন্য এত লাফালাফির কি দরকার। এটা গীতার মত নয়, মহাভারতের সময় অনেকের এই মত ছিল, তাদের কথা বলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন – তুমি যদি এই

মতকেও বিশ্বাস কর তাহলেও তো তোমার শোক করার কিছু নেই। মানুষ যদি সত্যিই বিশ্বাস করত যে মৃত্যুর পরেও আমি থাকব আর জন্মের আগেও আমি ছিলাম তাহলে তো কখনই খারাপ কাজ করত না।

বিদেশে একটা ধারণা আছে বাচ্চারা যখন জিজ্ঞেস করে মা আমি কোথা থেকে এলাম? তখন তার মা বাচ্চাকে বলে তোমাকে সারস পাখি তুলে নিয়ে এসে আমাদের বাড়িতে রেখে গেছে। পাশ্চাত্যে এটা একটা খুব বিখ্যাত ধারণা। ওখানকার বাচ্চারা জানে যে আমাকে সারস পাখি দিয়ে গেছে। পরে যখন বিজ্ঞানের উন্নতি হল তখন বলা হল যে এইসব আজগুবি গপ্পো যেন বাচ্চাদের না বলা হয়। একটা ছোট বাচ্চা যদি মাকে জিজ্ঞেস করে – মা আমি কোথা থেকে এলাম? মা বললেন 'তুমি ভগবানের বাড়ি থেকে এসেছ'। 'ভগবানের বাড়ি কোথায়?' 'অনেক উপরে'। 'তাহলে আমি কিভাবে এলাম'? 'ভগবান তোমাকে আমার পেটে দিলেন'। 'কিভাবে দিলেন'? বেশি প্রশ্ন করলে মা বিরক্ত হয়ে বলবেন 'এখন ঘুমিয়ে পড় বাকিটা কালকে বলব'। বিভিন্ন ধর্মে, সমাজে জন্মের ব্যাপারে এই ধরণের বিভিন্ন ধারণা প্রচলিত হয়ে রয়েছে। আমাদের হিন্দুদের তেমনি জন্মের ব্যাপারে অনেক রকমের ধারণার মধ্যে একটি ধারণা যে আমরা জন্মের আগেও ছিলাম আবার মৃত্যুর পরেও থাকব। তাই বলে যে এই ধারণাকে সবাই বিশ্বাস করে তা নয়। আমরা যদি ঠিক ঠিক বিশ্বাস করি যে, আজকে আমি যা হয়েছি সেটা আমার পূর্ব জন্মের জন্য, এই জন্মে আমি যা যা করছি সেটাই ঠিক করে দেবে আগামী জন্ম আমার কি হবে, তাহলে আমার জীবনটাই পাল্টে যাবে। তখন তো একটা মিনিটও আমি বাজে ভাবে নষ্ট হতে দেব না। কিন্তু আমরা বেশির ভাগই মনে করি এই তো জীবনের কটা দিন, এখন সে যে করেই হোক চুরি করেই হোক, কাউকে ঠকিয়েই হোক আর মিথ্যে কথা বলেই হোক আনন্দ স্ফুর্তিতে কাটিয়ে দিলেই হল। উচ্চ আদর্শে নিজেকে সব সময় প্রতিষ্ঠিত রাখা খুবই কঠিণ হয়ে যাবে। আমি কে, আমি কোথা থেকে এলাম, আমি কোথায় যাব, আমার বাবা মা কে? এই প্রশ্নগুলো হচ্ছে আধ্যাত্মিক দর্শনের চরমতম প্রশ্ন। এগুলোকেই বিভিন্ন ঋষি বিভিন্ন ভাবে দেখেছেন। সাধারণ মানুষ এগুলোকে নিয়ে কখন চিন্তা ভাবনাই করেনা। এগুলো চিন্তা করতে যে পরিমাণ বুদ্ধির দরকার, তার ছিটেফোটাও আমাদের মত সাধারণ লোকের নেই। এইতো এতটুকু বুদ্ধি তাও আবার বেশি নাড়াচাড়া করলে খরচ হয়ে যাবে। জল যেমন বেশি ঢালাঢালি করলে জল কমে যায় আমাদের বুদ্ধিও সেই রকম। আমরা যদি কখন চুপচাপ বসে চিন্তা করি আমি কে? আমি কোথা থেকে এলাম? আমি কোথায় যাব? দুই মিনিট পরেই আমাদের মস্তিষ্ক আর চিন্তা করতে পারবে না, সব থেমে যাবে।

প্রকৃত জ্ঞান, প্রকৃত দৃঢ় প্রত্যয় আসে আমি যেটা নিজে খেটে, পরিশ্রম করে জেনেছি, আমি যেটা নিজে অর্জন করেছি সেটাই একমাত্র আমার থাকে, সেইজন্য পৈত্রিক সম্পত্ত কেউ ধরে রাখতে পারেনা। কিন্তু যেটা আমি নিজে পরিশ্রম করে অর্জন করেছি সেটা কিছুতেই হাত থেকে বেরিয়ে যেতে দেব না। একই ব্যাপার শিক্ষা, জ্ঞান, ধ্যান ধারণার ক্ষেত্রে হয়, যেটাকে আমি খেটে খেটে মাথা কুটে বার করেছি সেটাতেই আমি দক্ষ হব। কিন্তু যেটা শুনে শুনে এসেছে সেটা থাকবে না, কিছু দিন পরেই বেরিয়ে যাবে, কিছুতেই থাকবে না। আমাদের কাছে পুরো ধর্ম, দর্শন হচ্ছে শুনে শুনে। সেইজন্য ভেতরে সব ফাঁকা।

এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ঋষির বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের ধারণা। পরের দিকে তাঁরা বুঝলেন যে পুরো তত্ত্বটাই ভ্রান্ত। তাঁরা দেখলেন আমি যে কর্মগুলো করছি তাহলে এগুলো যাবে কোথায়। এইখান থেকে তাদের মধ্যে কর্ম ফলের ধারণার জন্ম নিল, সেখান থেকে তাঁরা বললেন – যে ভালো কাজ করবে, যজ্ঞাদি করবে সে স্বর্গে যাবে। কিন্তু যারা খারাপ কাজ করছে তার কোথায় যাবে? এইখান থেকে তাদের নরকের ধারণার জন্ম হল। আবার এইখানেই তাদের ধারণা আটকে থাকল না। তুমি ভালো কাজ করে স্বর্গে গেলে, সেখানে গিয়ে অনেক সুখ ভোগ করল, এটা তাদের মনের মত উত্তর হচ্ছে না। তারপর এনাদের মধ্যে পুনর্জন্মবাদের ধারণা এল। একজন মানুষ, হয়তো সে by chanceয়েই এসেছে, কিন্তু সে যজ্ঞাদি করে স্বর্গে গেল বা খারাপ কাজ করে নরকে গেল, তারপর তার কি হবে? এবারে জন্ম আর মৃত্যুর খেলা শুরু হয়ে গেল। আর মৃত্যুর পরে স্বর্গ কিংবা নরক বা নিম্ন যোনি। এই জন্ম আর মৃত্যুর চক্র চলতেই থাকল।

স্বর্গেও জন্ম হচ্ছে মৃত্যু হচ্ছে। এখন মনে করুন আমরা অনেকে স্বর্গে আছি সেখানে দেখলাম একজন নতুন মানুষ এসে গেছে, কিভাবে এল? ভালো কাজ করেছে তাই স্বর্গে এসেছে। আবার দেখছি আমাদের একজনকে আর স্বর্গে দেখা যাচ্ছে না, স্বর্গ থেকে ভ্যানিশ হয়ে গেছে, মানে তার ভালো কাজের কোটা শেষ হয়ে গেছে তাই স্বর্গ থেকে তাকে বিদায় নিতে হয়েছে। যেমন পৃথিবী লোকে মৃত্যু হচ্ছে স্বর্গ লোকেও একই ভাবে মৃত্যু হচ্ছে। স্বর্গের জন্ম-মৃত্যুর খেলা কে দেখেছে? এগুলো আদপে কেউই দেখেনি। এগুলো হচ্ছে ঋষিদের কাল্পনিক চিন্তার পরিণাম। মহাভারতে তাই আমরা দেখতে পাই যেখানে বড় বড় ঋষিরা তাঁদের থেকে আর বড় বড় ঋষিদের জিজ্ঞেস করছেন – প্রভু স্বর্গে কি হয়? তখন ওনারা এগুলো বলছেন। এগুলো কতটা কবির কল্পনা আর কতটা বাস্তব আমরা কেউই বলতে পারব না। কিন্তু এটাই হচ্ছে হিন্দু ধর্মের পরম্পরার যা কিছু।

আবার পরের দিকে ঋষিরা বলছেন, যাঁরা খুব উচ্চ ঋষি তাঁরা একমাত্র দেখতে পারেন মৃত্যুর সময় তার স্থুল শরীর থেকে সূক্ষ্ম শরীর বেরিয়ে যাচ্ছে। যেমন ঠাকুর, তাঁর ভাইপো অক্ষয় যখন মারা যায় তখন ঠাকুর দেখছেন যেমন খাপ থেকে তরোয়াল বেরিয়ে এসেছে সেই রকম সূক্ষ্ম শরীর এই স্থুল দেহ থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু ঠাকুর কোথাও পুনর্জন্মাদি নিয়ে বেশি কিছু বলছেন না। স্বামীজী এত বক্তৃতা দিলেন কোথাও কিন্তু পুনর্জন্ম নিয়ে বলছেন না। কিন্তু আমাদের মত সাধারণ লোকরা যখন কথামৃত পড়ছে, স্বামীজীর রচনাবলী পড়ছে তখন দেখছি কোথাও এনারা পুনর্জন্মের ব্যাপারে বেশি কোন কথা বলছেন না, আবার পুনর্জন্ম হয়না এটাও বলছেন না। সাধারণ লোক যখন পুনর্জন্মের ব্যাপারে কিছু রচনা করতে গেলে এইটাকেই উল্লেখ করবে, কিন্তু তাদের তো অনুভূতি নেই, তারা তো আর খাপ থেকে তরোয়াল বেরিয়ে আসতে দেখছে না। তাহলে সে কি করে লিখবে? তখন তাকে কল্পনার আশ্রয় নিয়েই লিখতে হবে। ঠাকুর যেটা বলছেন যে মৃত্যুর পর আত্মা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে আসে, এখন ঠাকুর হিন্দু সমাজে বড় হয়েছেন, সেখান থেকে শুনে সেই বিশ্বাস থেকে বলছেন, না তিনি সত্যি দেখে বলছেন এই ব্যাপারে আমরা কিছুই জানিনা। কিন্তু ঠাকুর নিজে দেখেছেন এর উল্লেখ আমরা পাচ্ছি। এখন অনুভূতিহীন কোন সাধারণ লোক এই ব্যাপারে যদি নতুন কিছু রচনা করতে যায়, ঠাকুরের এই অনুভূতিকে অবলম্বন করে সহজেই লিখে দিতে পারে, কিন্তু যদিও এটা তথ্যগত ভাবে ঠিক হবে কিন্তু এইটাই যখন বিস্তার করে বলতে যাবে তখন পুরোটাই ভ্রান্ত একটা তত্ত্বে দাঁড়িয়ে যাবে। আমরা কোন ঋষির মুখে শুনিনি যে তিনি বলছেন স্বর্গটা এই রকম, নরকটা এই রকম। তাঁরা বলেন মৃত্যুর পরে একটা কিছু থেকে যায়। এখন যারা নিম্ন আধারের সাহিত্যিক বা কবি তারা ঐটাকে আধার করে চট জল্‌দি একটা উপন্যাস লিখে দেবে অথবা একটা বড় কবিতা রচনা করে দেবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন উপনিষদ পড়লেন তখন তিনি সেখানে কিছু কিছু তত্ত্ব পেলেন, সেই তত্ত্বগুলির উপরে ভিত্তি করে তিনি সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করে দিলেন। তাই বলে কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপনিষদের তত্ত্বগুলি উপলব্ধি করেছিলেন? এখন পর্যন্ত কেউ বলেননি যে তিনি উপনিষদের তত্ত্বগুলিকে উপলব্ধি করেছিলেন। ঋষিরা উপনিষদে যে তত্ত্বগুলি দিয়ে গেছেন সেগুলো আবার ওনারা ব্যাখ্যা করে যাননি। ব্যাখ্যা করাটা পরবর্তি প্রজন্মের কবি, সাহিত্যিকরা নিয়ে নিলেন, বড় বড় ঋষিদের তত্ত্বের সারটাকে গ্রহণ করে এনারা বিভিন্ন কবিতা রচনা করলেন, কিন্তু তাঁরা ঋষিদের মত উপলব্ধিবান ছিলেন না, ফলে এই ধরণের গোলমাল তৈরী হয়েছিল।

স্বর্গ নরকের ক্ষেত্রে উচ্চ ঋষিরা দেখলেন মানুষ দিন রাত বড্ড বেশি স্বর্গ আর নরক করে যাচ্ছে, এটা খুব বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে, মূল আদর্শ থেকে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছিল। মূল আদর্শ হচ্ছে আমাদের সত্যকে জানতে হবে, এগুলো সবই অনিত্য, এই অনিত্য থেকে নিত্যে যেতে হবে, নিত্য বলে একটা কিছু আছে। তাহলে কোনটা সৎ আর কোনটা অসৎ? তখন তারা অসৎ থেকে সৎ এর দিকে দৃষ্টি ফেরাবার জন্য বললেন এই জগৎটা হচ্ছে অনিত্য আর ঈশ্বরই হচ্ছেন সত্য। ভারতীয় চিন্তাধারা সব সময় বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে, কখন স্বর্গ নরকের ধারণাকে সামনে এনে আবার কখন সৎ আর অসৎ, বস্তু অবস্তুর

ধারণাকে সামনে এনে সর্বক্ষণ আধ্যাত্মিক চিন্তার জগতে ঠেলে দিচ্ছে। ভারতের চিন্তা জগতের বিবর্তনটা বেদের ব্রাহ্মণ অংশ থেকেই বেশি করে হতে শুরু করে। ব্রাহ্মণের এই ভাব গুলিই আরণ্যকে এসে আরো বিস্তার লাভ করল, আরণ্যক থেকে যখন উপনিষদে এসে একটা স্থিতিশীল দর্শনে প্রতিষ্ঠিত হল। উপনিষদে এসে বৈদিক যুগের যে ভাব ধারণা গুলো ছিল সেগুলো পুরোপুরি ভাবে থেমে গেল।

আমরা বেদের কয়েকটি বিশেষ মন্ত্র নিয়ে আলোচনা করছিলাম। ব্রহ্মচর্যের উপরে খুব বিখ্যাত কয়েকটি মন্ত্র আছে। তারমধ্যে Brahmacharya precedes Knowledge of Brahman এর উপরে একটি বিখ্যাত মন্ত্র আছে। ব্রহ্মচারী এই শব্দটাকে অল্প কথায় বিশ্লেষণ করা খুবই কঠিন। যিনি ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করছেন তিনিই ব্রহ্মচারী, অনেকে মনে করে সংযমী জীবন যে যাপন করছেন, যার খাওয়া পড়া, শোওয়া, কথা বলা সবটাই সংযমিত তিনি ব্রহ্মচারী। আবার যিনি বিয়ে থা না করে সংযমে থাকেন তাকেও ব্রহ্মচারী বলা হয়। হিন্দু ধর্মে ব্রহ্মচর্যের উপরে সব থেকে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। অনেক ভক্ত এসে জিজ্ঞেস করেন 'মহারাজ, সব কিছু ত্যাগ না করলে কি আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করা যায় না'? তখন বাধ্য হয়েই বলতে হয় 'না, কখনই প্রবেশ করা যায় না'। কিন্তু মানুষ এই ধরণের রূঢ় বাস্তব কথা শুনতে চায় না। অথচ আমাদের হিন্দু শাস্ত্রের কোথাও পাওয়া যাবে না যেখানে বলা হচ্ছে ভোগ থেকে যোগ হয়। ভোগ থেকে যোগের কথা প্রথম শোনালেন রজনীশ। এখন অবশ্য লোকে ভুলেও গেছে রজনীশ বলে একজন কেউ ছিল। বেদ এই ব্যাপারে কি বলছে? ***পূর্বো জাতো ব্রহ্মণো ব্রহ্মচারী, ধর্ম বসানস্ তপসোদতিষ্ঠত। তস্মাজ্ জাতং ব্রাহ্মণং ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠং, দেবাশ্চ সর্বে অমৃতেন সাকম্।।*** (অথ-১১/৫-৫) বলছেন, ব্রহ্মচারী ব্রহ্মণের পূর্বে, মানে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের আগে জন্ম নেয়। যে কোন মানুষের আধ্যাত্মিক জ্ঞান চেষ্টা করলেই হবে না, কেউ যদি হঠাৎ বসে চিন্তা করে আমি কে, আমি কোথা থেকে এলাম, আমি কোথায় যাব, সে পারবে না চিন্তা করতে, একটু পরেই মন তার ছিটকে যাবে। প্রথমে তাকে সব দিক থেকে ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, ইন্দ্রিয়ের উপরে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকতে হবে। তারপর ব্রহ্মচারীকে জামা কাপড় পড়তে হবে। কি জামা কাপড় পড়বে ব্রহ্মচারী? বলছেন *ধর্ম বসানস্*, ধর্মের বস্ত্র, ভারতে ধর্মের কাপড় দুই ধরণের – একটা সাদা কাপড় আরেকটি গেরুয়া কাপড়। এই দুটো রঙ হচ্ছে ধর্মের চিহ্ন। আর বলা হচ্ছে *তপসোদতিষ্ঠত*, তপস্যার কথা বলা হচ্ছে। এই তিনটে জিনিষ যখন তার এসে গেল তার তখন ব্রহ্মচর্য এল। ব্রহ্মচর্য যখন এসে গেল তখন সে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। ধর্মে যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল তখন সে তপস্যার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। তপস্যার আগে চারটে স্তরের কথা বলা হচ্ছে – প্রথম ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, তারও আগে তাকে ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, ব্রহ্মচর্যে তিনটে স্তরের কথা বলা হয়েছে।

ব্রহ্মচর্য যে কেউই পালন করতে পারে। যারা খুব বড় বিজ্ঞানী, আইনস্টাইনের মত, তাঁরাও ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এনারা বিজ্ঞানের একটা কিছুতে এত বেশি একাগ্র হয়ে থাকেন তাঁদের আর ভোগবৃত্তি থাকেনা। জর্জ হুভার বলে একজন বড় বিশ্ব বিখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ছিলেন। উনি বিয়ে থা করলেন না, আর চিরকাল টাকা পয়সার ব্যাপের প্রচণ্ড উদাসীন ছিলেন। ওনার ইনস্টিট্যুট থেকে ওনাকে যে চেক পাঠান হত, সেটা ভাঙ্গাতে উনি প্রায়ই ভুলে যেতেন। পরে অফিস থেকে বলা হত, স্যার আপনি চেকটা না ভাঙ্গানোর জন্য ব্যাঙ্কের হিসেব মিলছে না। একবার ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আপনি বিয়ে থা করলেন না কেন। তাতে উনি খুব সুন্দর কটি কথা বলেছিলেন – আমারও ইচ্ছে ছিল বিয়ে করি, কিন্তু যখন ভোর চারটের সময় উঠে গাছগুলোকে গিয়ে জিজ্ঞেস করি বাবা কেমন আছ, আমি তখন ভাবতাম আমার বউ এলে এই নিয়ে আমাকে কি ভাববে, সেইজন্যে আর বিয়ে করলুম না। তার বিশাল বাগান ছিল আর সেখানে নানান রকমের গাছ, প্রত্যেকটির গাছের যত্ন নিজের হাতে তিনি করতেন। গাছের ব্যাপারে কিছু বলতে গেলে বিশ্বে তাঁর কথাই ছিল শেষ কথা। ভোর চারটের সময় উঠেই প্রত্যেকটি গাছকে তিনি জিজ্ঞেস করতেন বাবা কেমন আছ। তিনি তখন বলছে, আমি ভেবে দেখলাম আমার জীবনের সময়গুলো

ভোগের দিকে দেব, না আমার এই প্রাণের শিশুদের দিকে দেব, এই ভেবে ঠিক করলাম না থাক আর কাউকে জীবনের সাথে জড়িয়ে লাভ নেই, তাহলে এদের প্রতি আমি সময়ই দিতে পারব না। উদ্ভিদের ব্যাপারে তাঁর এত আবিষ্কার আছে যার জন্য আমেরিকার অর্থনীতিকে পুরো পাল্টে গিয়েছিল। জর্জ হুভারকে বলা যেতে পারে তিনি পুরোপুরি ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু তাই বলে তিনি ধার্মিক লোক ছিলেন না। ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেই সে ধার্মিক হয়ে যাবে না। যে ধার্মিক নয় সে কখন তপস্যা করতে পারবে না। যে তপস্যা করছে না সে কোন দিন আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করতে পারবে না। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে এই হচ্ছে চারটি স্তর – ১) ব্রহ্মচর্য, ২) ধর্ম, ৩) তপস্যা এবং চতুর্থ ৪) আধ্যাত্মিক জ্ঞান।

ব্রহ্মচারীকে নিয়ে এই রকম বেশ কয়েকটি মন্ত্র আছে, এখানে একটি মন্ত্রে ব্রহ্মচারী বলতে বৈদিক জ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে – ***ব্রহ্মচর্যেণ তপসা রাজা রাষ্ট্রং বি রক্ষতি। আচার্যো ব্রহ্মচর্যেণ ব্রহ্মচারিণম্ ইচ্ছতে।। ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্.....। ব্রহ্মচর্যেণ তপসা দেবা মৃত্যুম্ অপাধ্নত। ইন্দ্রো হ ব্রহ্মচর্যেণ দেবভ্য খর্ আভরত্।।*** (অথ – ১১/৫-১৭-১৯)। এখানে ব্রহ্মচারী বলতে বোঝাচ্ছে যার বেদের জ্ঞান আছে, বেদের শক্তি আছে। রাজা যখন তার সাম্রাজ্যকে রক্ষা করে সেটা ব্রহ্মচর্যের শক্তিতেই করে। গুরু বা আচার্য সব সময়েই ইচ্ছে করেন তার একটি ভালো শিষ্য হোক। সে যখন শিষ্যকে পাচ্ছে সেটাও এই ব্রহ্মচর্যের শক্তিতেই পাচ্ছেন। গুরুর যদি ব্রহ্মচর্যের শক্তি না থাকে তাহলে তার শিষ্য হবে না, সেইজন্য ঠাকুর বলছেন অমুক গুরুর ইত্যাদি চেলা। *ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্* একটা মেয়ে যখন ভালো স্বামী পায় সেটাও সে তার ব্রহ্মচর্যের শক্তিতেই পায়। যে মেয়ের মধ্যে ব্রহ্মচর্যের শক্তি থাকবে তখন তার দিকেই সবাই আকৃষ্ট হবে।

এখানে ব্রহ্মচর্য বলতে কিন্তু কখনই নারীপুরুষের সম্পর্ক থেকে অনেক দূরে থাকার ব্যাপারকেই বোঝাচ্ছে না, ব্রহ্মচর্য তার থেকেও অনেক উচ্চস্তরের ব্যাপার, এই জিনিষটাকে কিন্তু আমাদের সব সময় মাথায় রাখতে হবে। ব্রহ্মচর্য হচ্ছে পুরো সংযমের শক্তি, আর এই শক্তিকে ঠিক ঠিক ভাবে ব্যবহার করাই হচ্ছে প্রকৃত ব্রহ্মচর্য। এখন একটি মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, কিন্তু সে চাইছে তার বিয়ে হোক, তাহলে সে যদি ব্রহ্মচর্যের অনুশীলন করতে থাকে, এটিও একটি বড় তপস্যা, বৈদিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে, এইটাই ব্রহ্মচর্যের অনুশীলন হবে, অনুশীলন করে করে মেয়েটির ব্যক্তিত্বে এক আকর্ষণী শক্তি চলে আসবে, সেই শক্তির ফলে কিছু দিনের মধ্যেই মেয়েটির শরীর মন এত সুন্দর হয়ে যাবে তার চেহারার মধ্যে একটা লাবণ্য ও শ্রী ভাব চলে আসবে আর তাতেই সবাইকে সে আকর্ষণ করতে থাকবে।

ব্রহ্মচর্যেণ তপসা দেবা মৃত্যুম্ অপাধ্নত – দেবতারা মৃত্যুকে বিতাড়িত করে দিলেন এই ব্রহ্মচর্যের শক্তিতে। দেবতারা মৃত্যুকে জয় করলেন মানে তাঁরা অমৃত পেয়েছিলেন বলে, অমৃত প্রাপ্তিতে যে শক্তির দরকার সেটা দেবতারা তাদের ব্রহ্মচর্যের শক্তিতেই পেয়েছিলেন। *ইন্দ্রো হ ব্রহ্মচর্যেণ দেবভ্য খর্ আভরত্* - স্বর্গে যে ইন্দ্রের এত ঐশ্বর্য, এই ঐশ্বর্য ব্রহ্মচর্যের শক্তিতেই হয়েছে। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সাথে যখন সংযমের যোগ হয়ে যাবে তখন বিশ্বের যা কিছু আছে যখন সে যা চাইবে তাই পেয়ে যাবে। এই মন্ত্রটি অথর্ব বেদেই এসে গেছে। অথর্ব বেদেই দেখা যায় যজ্ঞ থেকে আস্তে আস্তে ত্যাগ সংযমের দিকে সরে এসে ব্রহ্মচর্যের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। দেবতার যা কিছু শক্তি, রাজার যা কিছু শক্তি সব এই ব্রহ্মচর্যের জন্যই।

এরপরে ভগবানের বর্ণনা করে একটি সুন্দর মন্ত্র আসছে – The Poet of the Poets। ***গণানং ত্বা গণপতিং হবামহে কবিং কবীনাম্ উপমশ্রবস্তমম্। জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পত আ নঃ শৃণ্বন্নুতিভিঃ সীদ সাদনম্।।*** (ঋ-২/২৩-১)। যত গণেরা আছেন, গণ মানে নেতা, লীডার, যত গণ আছেন ভগবান তাদেরও নেতা। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ যাঁরা আছেন হে ভগবান, আপনি তাঁদেরও শ্রেষ্ঠ। তিনি কবিদেরও কবি, এখান কবি

মানে ‘আমার আছে হাত আমি খাই ভাত’ ‘ওগো মৌমাছি তুমি ফুলের মধু পান করো না’ এই ধরণের কবিতা লিখে যারা কবি উপাধি পেয়েছে তাদের কথা এখানে বলা হচ্ছে না। একটা মানুষ যখন ঈশ্বরের স্তরে চলে যান তাঁকেই তখন কবি বলা হয়। সেইজন্য ভগবানেরও একটা নাম হচ্ছে কবি, আর ঋষিরা যাঁরা খুব উচ্চ অবস্থাতে পৌঁছে গিয়েছেন তাঁদেরকেও কবি সম্বোধনে ভূষিত করা হয়ে থাকে। এখানে সেই কবিদের কথাই বলা হচ্ছে, ভগবান তিনি সমস্ত কবি, ঋষিদেরও কবি।

2nd half

তারপরের একটি মন্ত্রে বলা হচ্ছে কবে আমার পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে। বলা হচ্ছে যেদিন ব্রহ্মকে জানা যাবে, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ যখন হবে তখনই একমাত্র পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে। যতক্ষণ ব্রহ্মকে না জানছে ততক্ষণ তার অপূর্ণতাই থেকে যাবে। বলছেন – ***ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্, যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ। যস্তন্ন বেদ কিম্ ঋচা অরিষ্যতি, য ইত্ তদ্ বিদুস্ ত ইমে সমাসতে।।*** (ঋ-১/১৬৪-৩৯)। এত দিন আমরা বেদে পরমেশ্বরকে, যিনি সর্বোচ্চ সত্তা তাঁকে ইন্দ্র, বরুণাদি দেবতাদের রূপে দেখেছি, অথর্ব বেদে এসে আমরা লক্ষ্য করছি সেই পরমেশ্বরকে অক্ষর বলা শুরু হয়ে গেছে। গীতাতে অক্ষর শব্দ অনেকবার আসবে। অক্ষর শব্দের মূলতঃ দুটি অর্থ করা হয়, একটা অর্থ হচ্ছে ন ক্ষরতি, যার কখন নাশ হয় না, এর বিপরীতে ক্ষর শব্দের অর্থ একটু একটু করে ক্ষয় হয়ে যাওয়া। কিন্তু অক্ষরে কোন সময়েই ক্ষয় হয় না, যেমনটি আছে তেমনটিই চিরকাল থাকবে। আবার ওঁ কেও অক্ষর বলা হয়। এখানে *ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্* বলতে বৈদিক মন্ত্রে যে অক্ষর আছে তাকে বোঝাচ্ছে, তাই এখানে অক্ষরের দুটো অর্থই হতে পারে। বেদের যে ঋচা গুলো এগুলো হচ্ছে অক্ষর, এগুলোর কখন অন্য জাগতিক সাধারণ অক্ষরের মত নাশ হয় না, বেদের মন্ত্রের অক্ষর গুলো হচ্ছে দিব্য। আর অন্য অর্থে বলা যায় এই অক্ষর গুলিই হচ্ছে সেই দিব্য পুরুষ যাঁর কথা ঋক বেদে বলা হয়েছে। এই যে অক্ষর, বেদ উপনিষিদে যে সর্বোচ্চ স্থানের কথা বলা হয়, সেইখানেই এই অক্ষর আছেন। *যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ* – এই লাইনটাকে অনেক ভাবে অনুবাদ করা যেতে পারে, যত দেবতারা আছেন তাঁদের নিবাস সেই অক্ষরেই। আবার যিনি পরমাত্মা, তাঁরই অঙ্গ রূপে এই দেবতারা অবস্থান করেন। আমরা এখানে এসে তিনটে অবস্থার ভেতর পরিবর্তন পাচ্ছি – একটা হচ্ছে ইন্দ্রাদি দেবতারা হচ্ছে প্রকৃতির দেবতা, যেমন মেঘ হচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে – এর দেবতা হলেন ইন্দ্র, ইন্দ্রাদি দেবতাদের যেন কোন এক বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যেমন ইন্দ্রকে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তখন দেবতাদের যেন মানবীয় রূপ কিন্তু সাধারণ মানুষের থেকে তারা অনেক জ্যোতিষ্মান। দ্বিতীয় যেটা পরিবর্তন আসছে সেটা হল, ইন্দ্র হচ্ছেন সেই সত্য, সেই অনন্তেরই মুখ।

পরিশেষে তৃতীয় স্তরে দেখাচ্ছে ইন্দ্র হচ্ছেন সেই পরম সত্য, সেই অনন্তরেই একটি অংশ। পরবর্তি কালে হিন্দুদের যে ধর্ম শাস্ত্রগুলি এসেছে যেমন পুরানাদি, তাতে বেদের এই তৃতীয় অবস্থাটাকেই দেখান হয়েছে - *যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ* –বলছেন যিনি পরম পিতা পরমেশ্বর তার মধ্যেই এই দেবতারা বাস করেন।

যস্তন্ন বেদ কিম্ ঋচা অরিষ্যতি, য ইত্ তদ্ বিদুস্ ত ইমে সমাসতে – এখানে খুব মজার কথা বলা হচ্ছে, সারা বেদ আমার ঝাড়া মুখস্ত আছে, কিন্তু তাতে আমার কি হবে। যদি তুমি না জানতে পার যে, সেই যে পরমাত্মা যাঁকে এখান অক্ষর নামে অভিহিত করা হচ্ছে, সেই অক্ষরেই সব দেবতার বাস। জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই অক্ষরকে জানা, সেইটাই এখানে বলা হচ্ছে, তুমি যদি বেদের সব কিছু জেনেও যায় কিন্তু এই মূল কথাটা যদি না জান তাহলে এত জেনে তোমার লাভটা কি হল। কে পূর্ণ? যে সেই অক্ষরকে, সেই পরমাত্মা কে জেনেছে। এই জগতের যা কিছু আছে, এমনকি এই দেবতাদেরও তিনি পারে, আর তার মধ্যেই সব দেবতারা বাস করেন।

আগে শুধু যজ্ঞের সময় প্রার্থনা করা হত, যজ্ঞের সময় মন্ত্রোচ্চারণ করে আহুতি দেওয়া হত, পরের দিকে এসে এগুলোর গুরুত্ব আস্তে আস্তে কমে যেতে থাকে, অন্য দিকে সত্যকে জানার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হল। কি সত্য? সেই অক্ষর, তিনিই হচ্ছেন পরম গতি, পরম লক্ষ্য। তৈত্তেরীয় উপনিষদে আছে যেখানে বলা হচ্ছে – তুমি যদি সব মন্ত্র মুখস্ত বলে দিতে পার তাতে তোমার কিছু হবে না, তোমাকে অর্থ বুঝতে হবে, অর্থ মানে এই মন্ত্র তোমাকে কি বলতে চাইছে, কিসের ইঙ্গিত করছে। এখানে মূল কথা হচ্ছে শুধু শব্দ জানলে হবে না, জানতে হবে শব্দ কার কথা বলছে, জ্ঞানের মহিমার কথাই বলা হচ্ছে। এই মন্ত্রে ঈশোপনিষদের বক্তব্যের কিছু ইঙ্গিত আছে, ছান্দোগ্য উপনিষদেও এই কথা আসবে। আবার এই মন্ত্রে যে কথাটা বলা হচ্ছে এটাই ঠাকুর আবার অন্য ভাবে বলছেন – শুধু জপ করলে কি হবে, কোলকাতায় বেশ্যারাও লক্ষ লক্ষ জপ করছে। ঠাকুরের জপ করা মানে বেদ মন্ত্র মুখস্ত করে পাঠ করা হচ্ছে। এত জপ করলেও কিছু হয় না কেন? কারণ মূল জিনিষটা আমরা না জেনেই জপ করে যাচ্ছি। কিন্তু আমি তো বলতে পারি – আমি জানি শ্রীরামকৃষ্ণতেই সব। কিন্তু এই জানাটা জানা নয়, কারণ এটা আমি টিয়া পাখির মত আওড়ে যাচ্ছি কেবল। তাহলে কি আমরা জপ করা ছেড়ে দেব? কখনই ছাড়তে বলছে না। কিছু না করার থেকে জপ করা ভালো, মন্দের ভালো।

কিন্তু মন্ত্রের সারমর্ম জানতে হবে, সারমর্ম হচ্ছে অক্ষর। বেদের সময়ই আমরা এই উত্তরণ পাচ্ছি, সত্যের স্বরূপ। যদি এই সত্যের স্বরূপকে না বুঝতে পারা যায় তাহলে কিছুই হবে না। ব্রাহ্মণরা কত মন্ত্র পাঠ, কত পূজা করছে কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে তারা এগোচ্ছে না, কারণ তত্ত্বটাকে কিছুতেই ধরতে পারছে না। যার ফলে এদের কাছে মন্ত্রগুলি তত্ত্বের বদলে তথ্য রূপে হাজির হচ্ছে।

এরপরে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বিভিন্ন স্তরের কথা বলা হচ্ছে। ভগবানকে কিভাবে উপলব্ধি করা যাবে, কি করে আত্মার সাক্ষাৎ করা যায়। বলছেন – ***ব্রতেন দীক্ষাম্ আপ্নোতি দোক্ষয়াপ্নোতি দক্ষিণাম্। দক্ষিণা শ্রদ্ধাম্ আপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্যম্ আপ্নোতি।।*** (যজু – ১৯-৩০)। *ব্রতেন দীক্ষাম্ আপ্নোতি* – যে কোন একটা ব্রত নেওয়া, ব্রহ্মচর্য ব্রত, দাম্পত্য ব্রত, সন্ন্যাস ব্রত যে কোন একটা ব্রত নেওয়া। যখন মানুষ কোন ব্রত নিয়ে নেয় তখন আসে দীক্ষা। দীক্ষা হচ্ছে আমি যার কাছে যে জিনিষটা চাইছি সেটা তার কাছ থেকেই পাওয়া যাবে এই বিশ্বাস নিয়ে গেলে তিনি প্রাথমিক ভাবে একটা, যেমন ধরুন, একজন এসে বলল আমি প্রেসিডেন্ট মহারাজের কাছে দীক্ষা নেব, তার আগে সে মনে মনে ব্রত নিয়েছে যে আমি আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করব। একটা ছেলে একটা মেয়েকে গিয়ে বলছে আমি গৃহস্থ ধর্মে দীক্ষা নেব, সে তার আগে একটা ব্রত নিয়েছে। এই ব্যাপার গুলো অর্থাৎ জাগতিক যত ধরণের সম্পর্ক হতে পারে, আমাদের হিন্দু সমাজে প্রাচীন কাল থেকেই সমস্ত ধরণের সম্পর্ককে খুব আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিতে দেখা হত। প্রথমেই একটা ব্রত নিতে হবে, আমি আপনার কাছে এটা চাই আমি আপনার কাছে আমার মাথা নত করলাম। তখন তিনি আমাকে কৃপা বর্ষণ করবেন। কৃপা করাটাই হচ্ছে দীক্ষা দেওয়া। তাই প্রথমে প্রার্থনা জানাতে হবে, প্রার্থনা করা হচ্ছে ব্রত করা, দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন ব্রত নিয়ে নেওয়া হল তখন হবে দীক্ষা। দীক্ষার পর আসবে দক্ষিণা। আগেকার দিনে দক্ষিণা ছিল কৃপা করা। যখন গুরুর কৃপা পেয়ে গেল, মানে দক্ষিণা পেলাম, এখন এই দক্ষিণা উল্টো হয়, দীক্ষার পর বলা হয় গুরু দক্ষিণা দেওয়া হয়েছে কিনা, মানে গুরুকে দক্ষিণা দেওয়া। কিন্তু দক্ষিণা গুরু থেকে শিষ্যে আসে, এই দক্ষিণাকেই বলা হচ্ছে গুরু কৃপা করলেন। মূল কথা হচ্ছে – তিনি কৃপা করেন, যখন দীক্ষা হল মানে তাঁর কৃপা হল। কৃপা যখন আসে তখন *শ্রদ্ধাম আপ্নোতি*, শ্রদ্ধা আসে। অর্থাৎ তিনি কৃপা না করলে একটা জিনিষের প্রতি, তা আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি কিংবা কোন শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা আসবে না। তারপর বলা হচ্ছে – *শ্রদ্ধয়া সত্যম্ আপ্নোতি*, শ্রদ্ধা যখন সেই জিনিষটার প্রতি এসে গেল, তখন সেই জিনিষটার সারকে অর্থাৎ সত্যকে জানার জন্য আপনি প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

উপনিষদে আছে, শিষ্য গুরুর কাছে প্রশ্ন নিয়ে গেছে, গুরু বলছেন আগে এখানে বসে এক বছর তপস্যা কর। শিষ্য তপস্যার ব্রত নিল, তখন গুরু দক্ষিণা দিলেন, মানে কৃপা করলেন, বা দীক্ষা দিয়ে

আশীর্বাদ করলেন – *কল্যাণমেমস্তু*, তোমার কল্যাণ হোক। গুরু যখন কৃপা করে দিল, এরপরেই শিষ্যের শ্রদ্ধা আসবে। শ্রদ্ধা যখন এসে গেল তখন শিষ্যের মধ্যে সত্যের উন্মোচন হতে শুরু করবে। কঠোপনিষদে এই শ্রদ্ধার কথা খুব সুন্দর করে বলা আছে। নচিকেতা দেখছে তার বাবা যজ্ঞে যেখানে সব কিছু দান করা উচিৎ সেখানে তিনি যত জীর্ণ, বুড়ো গরু দান করছেন। এই দেখে নচিকেতার মনে খুব কষ্ট হল, তার মনে এখন শ্রদ্ধার উদয় হল। শ্রদ্ধা এসে গেল মানে, এবার সত্যও এসে যাবে। যতক্ষণ শ্রদ্ধা না আসে ততক্ষণ সত্য নিজেকে প্রকাশ করবে না।

এখানে আরেকটি মন্ত্রে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা বলা হচ্ছে – ***বেদাহম্ এতং পুরুষং মহান্তম্, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তম এব বিদিত্যাতি মৃত্যুং এতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়।।*** (যজু-৩১/১৮)। মহান পুরুষকে, যিনি সেই আদি পুরুষ, আমি তাঁকে জেনেছি। তিনি কি রকম? তিনি *আদিত্যবর্ণং*, সূর্যের আলোর মত। সব সময় *তমসঃ পরস্তাৎ*, তিনি সমস্ত রকমের অন্ধকারের পারে। এই পৃথিবীতে সূর্যের আলো আসছে বলে দিন হচ্ছে আবার সূর্যের আলো যখন আসেনা তখন এখানে অন্ধকার নেমে আসে। কিন্তু কেউ যদি সূর্যের বাসিন্দা হয়, তখন সে দিন রাতের পারে চলে যায়। যার অন্ধকার বোধ আছে তারই আলো বোধ আছে, যার জ্ঞান বোধ আছে তারই অজ্ঞান বোধ আছে। আমরা পৃথিবীর বাসিন্দা আমাদের রাত বা অন্ধকার বোধ আছে আবার দিন বা আলো বোধও আছে। কিন্তু যে সূর্যে থাকবে তার কি হবে? আলোটাই তার স্বাভাবিক, সে জানেই না অন্ধকার কাকে বলে – এইটাই হচ্ছে *তমসঃ পরস্তাৎ*। *তমসঃ পরস্তাৎ* মানে এই নয় যে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আলোতে এসেছে। সে জানে না অন্ধকার কাকে বলে, সেই আলোতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। অর্থাৎ সে চিরকাল সমস্ত অজ্ঞানতার পারে অবস্থান করছে। সেইজন্য যখনই ভগবানের বর্ণনা করা হয় তখন বলা হয় তমসঃ পরস্তাৎ। আর *তম এব বিদিত্যাত মৃত্যুং এতি* – এই যে জন্ম-মৃত্যুর সংসার, এর পারে যাবার একটাই পথ তাঁকে জানা, ভগবানকে জানতে হবে। যতদিন ভগবানকে না জানা যাবে তত দিন তার এই জন্ম-মৃত্যুর সংসার চলতেই থাকবে।

এই ভাবে বেদে আমরা অনেক ধারণা পাই – তার মধ্যে একটি হচ্ছে আমরা যেন হঠাৎ এক ঘটনা চক্রে জন্ম নিলাম, জন্ম থেকে আমার কর্ম প্রবাহ চলতে থাকে, তারপরে আসছে জন্ম-মৃত্যুর চক্র। এরপরে এই ধারণার জন্ম হল যে এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থাকবে আবার এর থেকে বেরোনর একটাই উপায়, তা হল ঈশ্বরকে জানা। তিনি কি রকম? *আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ*। তাঁকে জানলে এই সংসার চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। *নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়* – এ ছাড়া শান্তি পাওয়ার আর কোন উপায় নেই বা এই যে জন্ম-মৃত্যুর চক্র চলছে এটাকে জানার অন্য কোন পথ নেই। আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা জানিই না যে জন্মের পর মৃত্যু হয় আর মৃত্যুর পর জন্ম হয়। যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করা হয়েছে সবচেয়ে আশ্চর্য কি? যুধিষ্ঠির তার উত্তরে বলছেন – এইটাই আশ্চর্য যে এত লোক মরে যাচ্ছে কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ বিশ্বাস করে না যে তাকেও একদিন মরে যেতে হবে। তুমি আবার জন্মাবে কিনা ছেড়ে দাও, তোমার যে মৃত্যু হবে এই বিশ্বাসই তোমার নেই। আমার অস্তিত্ব বলতে আমি কি বুঝি, এই প্রশ্ন নিয়ে যখন গভীরে যাব তখন আমাদের মাথায় আসে যে আমাকে এটা থেকে বেরোতে হবে। তখন আমি বলব এর থেকে বেরোবার কি পথ? বেরোবার একটাই পথ সেই আদিত্য বর্ণং পুরুষকে জানতে হবে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এর বাইরে আর কোন পথ নেই।

আরেকটি মন্ত্রে বলছেন – ***ইন্দ্রং মিত্রং বরুণম্ অগ্নিম্ আহুর্ অথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানম্ আহুঃ।।***(ঋ-১/১৬৪-৪৬)। যে অক্ষরের কথা বলা হয়েছিল, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি ইত্যাদি সেই অনন্তরেই এগুলি হচ্ছে নানা রূপ ও নাম। এখানে যে গরুত্মানের কথা বলা হয়েছে এটি একটি পাখি, যাকে পরের দিকে এসে গরুড়ের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। *একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি* – বিপ্র মানে যাঁরা ঋষি তাঁরা সেই একই সত্তাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করছেন। তাঁকেই *অগ্নিম্* তাঁকেই *যমঃ* তাঁকেই *মাতরিশ্বা* নামে ডাকছে, এরাই সেই, সেই একেরই বিভিন্ন নাম ও রূপ। এই

বায়ুকেই, যেটা বাতাস রূপে চলছে তাকে বায়ু বলা হচ্ছে, বায়ুর যে সামগ্রিক রূপ তাকেও বায়ু বলছে, এই বায়ুই আবার প্রকৃতিরও দেবতা, বায়ুই আবার সেই অনন্তের সাথে এক হয়ে আছে। এই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে বেদ রচিত হয়েছে যার ফলে যারা সাধারণ লোক বেদ অধ্যয়ন করতে গেলে মাথা গুলিয়ে ফেলে, কোন কিছুই ধারণা করতে পারে না। যেমন এখানে বায়ু বলতে কি বোঝাচ্ছে? বায়ু প্রকৃতিরই একটা রূপ, বায়ু প্রকৃতিরই একটা আলাদা শক্তি আবার এই বায়ুই হচ্ছে সেই অনন্তেরই একটা মুখ আর শেষে বায়ুই সেই অনন্ত। বিভিন্ন মন্ত্রে বিভিন্ন ভাবে এই ভাবটাকেই প্রস্ফুটিত করা হয়েছে। ভাষ্য সহকারে বেদ অধ্যয়ন না করলে পুরো গোলমাল হয়ে যেতে বাধ্য। সেই অনন্ত বহু হয়েছেন এই ধারণাটাকেই বিভিন্ন ভাবে বলা হয়েছে। আবার অন্য ধরণের ধারণাও বেদে এসেছে যেখান পরম সত্তাকে তৎ এই শব্দ দিয়ে বোঝান হচ্ছে। এখানে সেইটাই বলা হচ্ছে – ***তদ্ এবাগ্নিস্ তদ্ আদিত্যস্, তদ্ বায়ুস্ তদ্ উ চন্দ্রমা। তদ্ এব শুক্র তদ্ ব্রহ্ম, তাহআপঃ স প্রজাপতিঃ।।*** (যজু- ৩২-১)। এখানে ভগবান বলা হচ্ছে না, তৎ বলা হচ্ছে। হরি ওঁ তৎ সৎ বলা হয় এইখানে যে তৎ শব্দ দিয়ে ভগবানকে বলা হচ্ছে। সেই তৎ যিনি, তিনিই সৎ, তিনিই একমাত্র আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। বলছেন সেই অগ্নি, সেই আদিত্য, সেই চন্দ্রমা, সেইই শুক্র, সেইই ব্রহ্মণ, সেইই আপঃ, সেইই প্রজাপতি। এত গুলো দেবতার নাম করে বলা হচ্ছে, সেই যে পরম সত্তা তিনিই সব হয়েছেন।

বেদ – ১১ই এপ্রিল ২০১০

এক দিক থেকে আরণ্যক হচ্ছে ব্রাহ্মণ থেকে উপনিষদে দুটি যুগের পরিবর্তনের সংযোগ স্থল। মন্ত্র অংশ হচ্ছে পুরো বিভিন্ন যজ্ঞের মন্ত্রের, দার্শনিক চিন্তা ভাবনা আর কিছু আচরণ বিধির সমাবেশ। ব্রাহ্মণ অংশে বলা হয়েছে একটা যজ্ঞ কিভাবে করা হবে, তার সাথে কিছু কিছু কাল্পনিক কাহিনী। উপনিষদে এসে একেবারে পুরো অদ্বৈত তত্ত্ব নিয়েই বলা হয়েছে। একমাত্র অবতার পুরুষ ছাড়া সবারই চিন্তার জগতে বিবর্তন হয়ে থাকে। এমনকি যিনি অবতার, তত্ত্বের দিকে তাঁর কিছুই পাল্টাবে না কিন্তু তিনি যে তথ্য গুলো দেবেন সেই ব্যাপারে তাঁর মত অনেক পাল্টাবে। যেমন তিনি হয়তো জাগতিক বিজ্ঞানের ব্যাপারে কিছু একটা ভাবছেন কিন্তু পরে দেখা যাচ্ছে সেটা অন্য রকমের হয়ে যাচ্ছে। স্বামীজী যখন লণ্ডনে গেলেন, সেখানে গিয়ে তিনি একটা ভাষণে বলছেন – এখানে আসার আগে ইংরেজ জাতীর ব্যাপারে আমরা অনেক বিতৃষ্ণা ছিল, কিন্তু এখানে এসে আমার সেই ধারণাটা পাল্টে গেছে। এই ধরণের মত পাল্টাতে পারে। কিন্তু তত্ত্বের ব্যাপারে কোন কিছুই পাল্টাবে না। এখন যারা বেদ রচনা করেছিলেন তাঁরা তো সবাই অবতার পুরুষ ছিলেন না। একটা সমাজ ও দেশের যে চিন্তার মূল কেন্দ্র স্থল সেখানে বিবর্তন হয়ে থাকে, একই চিন্তা ভাবনা সব সময় থাকে না, একটা সময়ে এসে তার পরিবর্তন হয়ে থাকে। যদি ঠিক ঠিক বিচার করে বলা যায় তাহলে মন্ত্র আর উপনিষদকেই বেদ বলে ধরা হবে, যদিও মীমাংসকরা মন্ত্র আর ব্রাহ্মণকে বেদ বলছে। মূলতঃ শেষ পর্যন্ত সংহিতা আর উপনিষদই অস্তিত্ব নিয়ে টিকে আছে। বেদের ব্রাহ্মণ আর আরণ্যককে বলা যেতে পারে যোগ সূত্র।

যজ্ঞের প্রভাব যত কমতে থাকল বেদের ব্রাহ্মণ অংশের প্রভাবও তত কমতে থাকল কিন্তু ব্রাহ্মণের অনেক কিছু হিন্দু ধর্মের পরবর্তি কালের বিভিন্ন শাস্ত্রে জায়গা করে নিয়েছে। আরণ্যকের ক্ষেত্রে কি হল, যারা এত দিন ধরে যজ্ঞযাগ করে এসেছেন বা করিয়ে এসেছেন তারা দেখলেন যেমন যেমন তাদের বয়স বাড়তে থাকল তেমন তেমন তাদের গৃহস্থের কর্ম করার ক্ষমতাও কমতে থেকেছে। অন্য দিকে তাদের মনটা আরও অন্তর্মুখী হয়ে যাচ্ছিল। অন্তর্মুখীনতা তাদেরকে নির্জনতার দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। তারা যে লোকালয়ে থাকতেন, সেখান থেকে তারা আস্তে আস্তে সরে এসে লোকালয়ের বাইরে একটা কুঠিয়ার মত করে থাকতে আরম্ভ করলেন। আবার অনেকে কোন তীর্থস্থানে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করলেন। সন্ন্যাসী হতেন না কিন্তু নির্জনে গিয়ে একান্তে নিজের অন্তর জগতে ডুবে থাকতেন। এখন একজন বড় ঋষি হয়তো ছিলেন তিনি তাঁর নিজের বাসস্থান ছেড়ে অন্য কোথাও নির্জনে একটা কুঠিয়াতে চলে যেতেন। এখন তাঁর যে অন্তরঙ্গ শিষ্যরা ছিল, তারাও তাঁর পেছনে পেছনে কুঠিয়াতে চলে যেত। কিন্তু তাঁরা আগের মত ব্যস্ত জীবন আর কাটাতেন না।

এতদিন তাঁরা যে গ্রামে বা লোকালয়ে থেকে যজ্ঞ গুলো করতেন, লোকালয়ের বাইরে এসে সেই যজ্ঞ গুলো তখন আর করা সম্ভব হত না। কিন্তু তাঁরা সেই যজ্ঞ গুলোই করতেন যে যজ্ঞ গুলি লোকালয়ে থাকাকালীন করতেন, কিন্তু এখানে যজ্ঞ গুলো ধ্যানের প্রক্রিয়ায় করা হত। ধ্যানমূলক যজ্ঞের সব থেকে বড় নমুনা হল পুরুষসূক্তম্, যেখান পুরুষকে যজ্ঞের পশু করে বলি দেওয়া হচ্ছে। এটা হচ্ছে একটা মনের চিন্তন, সত্যি সত্যি যে পুরুষকে পশু বানান হচ্ছে, আর বলি দেওয়া হচ্ছে তাতো নয়। অশ্বমেধ যজ্ঞ যখন চিন্তনের মাধ্যমে করা হত তখন বলা হত – সকালে ঘুম থেকে উঠে তুমি সূর্যের দিকে তাকাও, সেই যে রক্তিম সূর্য পূর্ব দিগন্ত থেকে উঠছে সেটাকে মনে করবে অশ্বমেধ যজ্ঞের যে ঘোড়া হবে তার মস্তক। একজন মা, তার একটিই মাত্র সন্তান। সন্তান মারা গেছে। এখন সেই সন্তান হারা মাকে কিভাবে সান্ত্বনা দেওয়া হবে? হয়তো তাকে বলা হবে তোমার সন্তান ভগবানের কাছে আছে, নয়তো বলবে এই গ্রামের যত সন্তান আছে তাদের সবাইকে আপনি নিজের সন্তান মনে করুন। এখন এই চিন্তার প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা বিরাট বড় রূপান্তর এসে গেল। একজন বিধবার একটিই সন্তান, সে মারা গেলে ঐ মা কিভাবে মনে শান্তি পাবে? তার ভেতরের ভালোবাসা তো মরে যায়নি। এখন যদি তাকে বলে দেওয়া হয় এই গ্রামের যত সন্তান সব তোমারই সন্তান,

এখন সে যাকে দেখছে তাকেই আদর করে শান্তি পাচ্ছে। এই যে চিন্তার স্থানান্তিকরণ হচ্ছে, একটা জায়গা থেকে তুলে আরেকটা জায়গায় দিয়ে দিল, ঠিক তেমনি, ব্রাহ্মণরা জীবনের একটা সময় নানা যজ্ঞ করেছে, হেন যজ্ঞ নেই যে তারা করেননি। ব্রাহ্মণের বয়স হয়ে গেছে, তার শারীরিক ক্ষমতা কমে গেছে, এত যজ্ঞ আর করতে পারছে না। অথবা একটা সময়ে এসে সে বুঝে গেছে যে আমার আর যজ্ঞের কোন প্রয়োজন নেই। কারণ সে বুঝে গেছে আমি যদি ধ্যান করি বা প্রার্থনা করি, যজ্ঞ করে যে ফল পেতাম, এতেও সেই একই ফল পাচ্ছি। ব্রাহ্মণ অংশে এসে আমরা দেখতে পেয়েছি এই রূপান্তরটা ইতিমধ্যে এসে গিয়েছিল। যেমন গায়ত্রী যজ্ঞ, গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে যদি আমি যদি সব কিছু পেয়ে যাই তাহলে আমি কেন অত ঢাকঢোল পিটিয়ে গায়ত্রী যজ্ঞ করতে যাব। ঠিক তেমনি যদি আমার জপ ধ্যান করে সব হয়ে যায় তাহলে আমি অত বড় যজ্ঞ করতে যাব কেন।

কিন্তু পুরনো সংস্কার যেতে চায় না। ঠাকুর খুব সুন্দর একটা উপমা দিচ্ছেন – একটা ধোপা মরে রাজার বাড়িতে রাজকুমার হয়ে জন্ম নিল। এখন সে বন্ধুদের সাথে খেলা করতে গেছে, কি আর সে খেলবে, আগের জন্মে সারা জীবন তো কাপড় কেচে এসেছে, তাই বন্ধুদের বলছে 'আমি উপুর হয়ে শুই আর তোরা আমার পিঠে হুস্ হুস্ করে কাপড় কাচ'। এখন যিনি সারা জীবন যজ্ঞযাগ করে এসেছেন আর করিয়ে এসেছেন, এখন তিনি বৃদ্ধ বয়সে বলছেন আমি এখন বাণপ্রস্থে চললাম। এখনও সে সন্ন্যাস নেয়নি, কিন্তু ভেতরে যজ্ঞযাগের সংস্কার গিজ্‌গিজ্ করছে, শরীর মন যজ্ঞযাগ করার জন্য ছটফট করছে। একজন সারা জীবন রাজনীতি করে এসেছেন, পরে সন্ন্যাসী হয়ে সে সবাইকে ধর্ম উপদেশ না দিয়ে রাজনৈতিক কথাবার্তাই তার মুখ থেকে বেরোচ্ছে। তখন ঋষিরা বিধান দিলেন – তুমি যে এতদিন ধরে যজ্ঞযাগ করে এসেছ সেটা আর করতে পারছ না ঠিক আছে, তুমি যজ্ঞযাগকে এই ভাবে এখন চিন্তন কর। যেটা external objective reality ছিল এখন সেই জিনিষটাকেই নিয়ে আসা হচ্ছে চিন্তনের জগতে। তারপর তাঁকে বলে দেওয়া হল তোমার মনটাকে এখন ঐখানে নিবদ্ধ রাখ। এর পরের ধাপ হচ্ছে তোমার মনকে আস্তে আস্তে মূল যে সার রয়েছে সেটাতে নিয়ে যাও। যেমন তোমার সন্তানকে তুমি খুব ভালোবাসতে, এখন সেই সন্তান মারা গেছে, তোমার শোককে জয় করার জন্য পাড়ার যত সন্তান আছে সবাইকে তোমার সন্তান বলে মনে কর, এটা হচ্ছে প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে, আসলে তোমার ভেতরে ভালোবাসা আছে, সেই ভালোবাসাটাই হচ্ছে সার, সে তুমি নিজের ছেলেকে ভালোবাসো আর পাড়ার ছেলেকে ভালোবাস, এই ভালোবাসাটার উপরে মনকে নিবদ্ধ কর। এই ভালোবাসার উপরে ধ্যান করে করে তুমি সেই সচ্চিদানন্দেই পৌঁছে যাবে, যিনি সমস্ত ভালোবাসা, সমস্ত শান্তি, সমস্ত আনন্দের উৎস। সেই সচ্চিদানন্দে পৌঁছে গেলে দেখে যিনি আত্মা তিনিই ব্রহ্ম। দুটো ধাপের কথা বলা হচ্ছে – প্রথমে external objective reality কে চিন্তন জগতে নিয়ে আসতে হবে, দ্বিতীয় ধাপে সেই objective reality র যে সার, সেটাকে বার করে তার উপরে ধ্যান করতে হবে, তারপর সেই যে সচ্চিদানন্দ, যিনি হচ্ছে সব কিছুর সার তাঁর উপরে পুরোপুরি ছেড়ে দিচ্ছে, বাহ্যিক সত্তার আবরণ তার সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেল। সংহিতা থেকে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ থেকে আরণ্যক আর আরণ্যক থেকে উপনিষদে গিয়ে এই উত্তরণটাই হয়েছে। তাই প্রথমে হচ্ছে সব যজ্ঞযাগ, যজ্ঞের ব্যাখ্যাদি, তারপর সেখান থেকে বাহ্যিক আচরণ সরে গিয়ে আগে যেটা করা হচ্ছিল তার উপর চিন্তন ও ধ্যানে চলে এল, শেষে সেটাও সরে গিয়ে শুধু মূল জিনিষটা থেকে গেল, আর এইখান থেকে উপনিষদের জন্ম হল।

আরণ্যকের পেছনে দুটো তত্ত্ব পাওয়া যায়। একটা মত আছে – যারা ব্রহ্মচারী ছিলেন তাঁরা বেদ মুখস্ত করতেন, গৃহস্থরা ব্রাহ্মণের উপর জোর দিতেন, যাঁরা বাণপ্রস্থি তাঁরা জঙ্গলে গিয়ে আরণ্যকের অনুশীলন করতেন। আর যাঁরা সন্ন্যাস নিয়ে নিতেন তাঁরা উপনিষদ অধ্যয়ন করতেন। এগুলো হচ্ছে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের উদ্ভট্ মত। কিন্তু এই মতটা সঠিক নয়। আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদে পাই – একজন ব্রাহ্মণকে তার ছেলে জিজ্ঞেস করছে তখন পিতা বলছেন আত্মার ব্যাপারে আমার পরিষ্কার ধারণা নেই, তবে শুনেছি

অমুক দেশে এক রাজা আছেন তিনি এই ব্যাপারে জানেন। রাজার কাছে গেছে, রাজা ব্রাহ্মণ পুত্রকে দেখে বলছেন – তুমি আত্মার ব্যাপারে শিক্ষা লাভের জন্য এসে খুব ভালো করেছে, কারণ এই বিদ্যা ব্রাহ্মণদের কাছে কখন ছিল না, এটা বরাবরই ক্ষত্রিয়দের কাছেই ছিল। কাহিনী যাই হোক না কেন, মূল কথা হচ্ছে সন্ন্যাসী হলেই যে উপনিষদের জ্ঞান থাকবে তা কখনই নয়। সেইজন্য এই ধরণের মতকে বেশি গুরুত্ব দিতে নেই, কিন্তু যেহেতু আমরা বেদের ব্যাপারে জানতে চাইছি তাই বলে বেদের চারটি অংশের ব্যাপারে এই ধরণের একটা সিদ্ধান্ত চালু আছে এটা জানিয়ে দেওয়া হল – যারা বাণপ্রস্থি তারা আরণ্যক পড়ত আর যারা সন্ন্যাসী তাঁরা উপনিষদ পড়তেন। কিন্তু বেদের বিভিন্ন ঘটনার সাথে এই ধরণের সিদ্ধান্তের কোন সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না। কিন্তু আরেকটি গ্রহণযোগ্য মত আছে যেখানে বলা হচ্ছে – যারা সমাজে থাকতেন তারা সংহিতা আর ব্রাহ্মণকে অনুশীলন করতেন, যারা সমাজ থেকে সরে গিয়ে নির্জন অরণ্যের দিকে চলে যেতেন তারা ধ্যানশীল জীবন যাপন করতেন, ঐখান থেকেই আরণ্যকের জন্ম হয়। কারণ আরণ্যকে আমরা যজ্ঞ বা যজ্ঞ সম্পর্কিত কোন কিছুর কথার উল্লেখ পাইনা, কিন্তু মূল যেটা পাওয়া যায় তা হল, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অতিন্দ্রীয়তার যে বিষয়গুলি ছিল তার উপর ধ্যানের কথা। অতিন্দ্রিয় হচ্ছে যে জিনিষগুলিকে আমাদের দশটি ইন্দ্রিয় দিয়ে বোঝা যায় না। আরণ্যকে ইন্দ্রিয়াতীত সত্তার উপরে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আরণ্যকে এসে দেখতে পাই অতিন্দ্রীয়তার থেকেও তপস্যার উপরে অনেক জোর দেওয়া হয়েছে। আরণ্যকে এসে তপস্যা প্রচণ্ড বেড়ে গেছে। তপসা, তপঃ এই শব্দগুলো বেদের সংহিতাতে, ব্রাহ্মণেও এসেছে, কিন্তু যখন আরণ্যক এসে গেল তপস্যার গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেল। আর উপনিষদে তো তপস্যার বাইরে কিছুই নেই।

আরণ্যকে একটা ঘটনার কথা বলা হচ্ছে – কয়েকজন সাধারণ ঋষি একজন খুব বড় ঋষির কাছে এসেছেন, এসে বলছেন – আমরা আপনার কাছে শিক্ষা নিতে এসেছেই, আপনি আমাদের কিছু শিক্ষা দিন। ঋষিরা যখন একে একে বড় ঋষিকে প্রশ্ন করছেন তখন তিনি তাদের কোন উত্তরই দিলেন না। ঋষি তাদের তপস্যা করতে বলে দিলেন। তারপর তারা অনেক দিন তপস্যা করে চিত্তশুদ্ধি করে যখন ঋষির কাছে এসেছেন তখন তিনি উত্তর দিলেন। আরণ্যকে আরেকটি জিনিষের খুব গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছিল, সামাজিক নৈতিকতা। বেদের প্রথম দিকে সমাজে নৈতিকতা খুব একটা দৃঢ় ছিল না। আসলে বেদ বিরাট, এখানে অনেক কিছুই আমরা পেয় যাব, কিন্তু একেকটা অংশে একটা বিশেষ জিনিষের প্রতি জোর দিয়েছে, তখন মনে হবে যেন বেদ এইটাই বলতে চাইছে। যেমন আরণ্যকে যখন আসছে তখন সত্যের প্রতি জোরটা অনেক বৃদ্ধি পেয়ে গেছে, তাই বলে সংহিতা, ব্রাহ্মণে সত্যকে মানছে না, তা নয়, পুরোপুরি মানা হচ্ছে, কিন্তু তখন বলা হয়েছিল তুমি যজ্ঞযাগ কর তোমার সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে এসে যজ্ঞযাগের থেকে সরে এসে সত্যের উপরে বেশি করে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

তখনও কিন্তু কিছু কিছু মূল্যবোধের কথা বলা হচ্ছিল, যেমন যে কারুর টাকা পয়সা আত্মসাৎ করে নিচ্ছে তারা কিভাবে নরকে গিয়ে পড়ছে, আবার যারা দুশ্চরিত্র তাদের কিভাবে পতন হচ্ছে। কিন্তু এই জিনিষগুলি থেকে আস্তে আস্তে সরে এসে নজর দেওয়া হল আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিকাশে। গীতাতে এই ধারণাটাকে খুব সুন্দর ভাবে তুলে ধরা হয়েছে – *যথৈধাংসি সমিদ্ধোর্গ্নি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা* (৪।৩৭) – বিরাট কাঠের স্তুপ আছে সেখানে একটু আগুন লাগিয়ে দিলে পুরো জিনিষটাই ভস্মিভূত হয়ে যাবে। ঠিক তেমনি কর্ম, সে ভালো হোক আর মন্দ হোক, জ্ঞানাগ্নিতে সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। জ্ঞানাগ্নি একটাই, সত্যকে জানা, নিজের আত্মস্বরূপকে জানা, আমি কে, এই জ্ঞান। আমি যে সেই আত্মা, এই জ্ঞান হলেই সব কর্মরাশি ভস্মিভূত হয়ে যায়। কিন্তু হিন্দু ধর্ম ছাড়া অন্যান্য ধর্মে বিভিন্ন খারাপ কর্মের জন্য প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হয়। তুমি এই পাপ করেছ, তোমাকে এই যজ্ঞ করতে হবে, এই পাপ করেছ তুমি এই প্রায়শ্চিত্ত কর।

কিন্তু যখন আরণ্যকে আর উপনিষদে প্রবেশ করছে, আর যত দর্শন আছে যেগুলো উপনিষদের দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত, যেমন গীতা, যেমন স্বামীজী, স্বামীজীর সমগ্র জীবন উপনিষদের দর্শনের উপর দাঁড়িয়ে আছে, স্বামীজী বলছেন – পাপ বলে কিছু নেই ভ্রান্তি হতে পারে, মানুষ পাপ করে না, মানুষ ভুল করে, মানুষ দোষ করে না, মানুষ ভুল করে। এইটাই হচ্ছে উপনিষদের মূল ভাব, এটা পৌরানিক ভাব নয়। বৈদিক ধারণায় প্রায়শ্চিত্ত কর্মের কথা বলা হয়েছে। স্মৃতি, তন্ত্র শাস্ত্রেও এই প্রায়শ্চিত্ত কর্মকে অনেকবার বলবে। কিন্তু একজন জ্ঞানীর কাছে প্রায়শ্চিত্ত কর্মের কোন প্রশ্নই নেই। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অগ্নি সমস্ত কর্মকে ভস্মিভূত করে দেয় এই ধারণা প্রথম আসতে শুরু করেছে আরণ্যকে। আরণ্যক থেকে যখন উপনিষদে প্রবেশ করছে তখন সেখানে আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নেই।

যাঁরা দর্শনের চিন্তাবিদ্, যাঁরা সাহিত্যের দর্শন, সঙ্গীতের দর্শন, কলার দর্শন লেখেন আরা যারা দর্শনের দর্শন লেখেন, তাঁদের কাছে একটা বিরাট প্রশ্ন – মানুষ কেন অমরত্বের সন্ধান করে? হয়তো পরবর্তি কালে যারা নিউরো বিজ্ঞানী আছেন তারা আবিষ্কার করবেন আমাদের মস্তিষ্কে যে সেল গুলো আছে সেগুলো এমন ভাবে সাজান আছে যার জন্য মানুষ সর্বদা অমরত্বের সন্ধান করে চলেছে। প্রত্যেক মানুষই চাইছে অমর হয়ে যেতে। অমর হতে চাওয়া আর অমরত্বের ধারণা এই দুটো কিন্তু পুরো আলাদা। খ্রীষ্টান ধর্মে eternal heaven এর ধারণা আছে, ইসলামে জন্নৎ এর ধারণা আছে। বৈদিক যুগে এই একই ধরণের ধারণা হিন্দুদের মধ্যেও ছিল, ঠিক ঠিক যজ্ঞ করলে তুমি স্বর্গে যাবে। এখন যে কোন হিন্দুকে বা মুসলমানকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় স্বর্গ কি, বা জন্নৎকে কে জানে, আর কে স্বর্গে যাচ্ছে? এই ব্যাপারে বেশির ভাগ হিন্দুরাই অজ্ঞ আর মুসলমানরা অন্ধকারে।

আসলে আমাদের স্থুল দেহের মধ্যে আরেকটি শরীর আছে সেটাকে বলা হচ্ছে সূক্ষ্ম শরীর। এই স্থুল দেহটার যখন নাশ হয়ে যায় তখন সূক্ষ্ম শরীরটা স্থুল দেহ থেকে বেরিয়ে এসে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। যখন সে সুযোগ পায় তখন সে বাইরের জড় বস্তু দিয়ে আরেকটা স্থুল শরীর বানিয়ে নেয়। যখন স্বর্গলোকে যায় তখন স্বর্গলোকের যে বস্তু আছে তাই দিয়ে সে তার শরীর বানিয়ে নেয়। পৃথিবী লোকে গেলে পৃথিবীর বস্তু দিয়ে বানিয়ে নেয়, পাতাল লোকে গেলে সেখানকার বস্তু দিয়ে বানিয়ে নে। তাই এই চোখ, কান, নাক, হাত, পা, মাথা দিয়ে যে শরীর এটা আসলে কিছুই নয়, এটা একটা মুখোশের মত। তাই দুঃখ-কষ্ট, পাপ-পূণ্য যা আছে এই সূক্ষ্ম শরীরের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। যিশুকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে – এই অন্ধটি কার পাপে অন্ধ হয়েছে, নিজের পাপে না অন্যের পাপে? এই প্রশ্ন হিন্দুদের মনেও উদয় হয়, একজন লোক দেখতে সুন্দর আরেকজন কুৎসিৎ, একজন বুদ্ধিমান আরেকজন বোকা, কেন এই ধরণের বৈপরিত্য হচ্ছে? স্থুল শরীরের মাধ্যমে সব জমা হচ্ছে, স্থুল শরীরের এতে কিছু হচ্ছে না, আসলে যত কর্ম, চিন্তা ভাবনা হচ্ছে এগুলো সূক্ষ্ম শরীরকে প্রভাবিত করছে। এটা ঠিক কম্প্যুটারের সফট্ওয়ার আর হার্ডওয়ারের মত, হার্ডওয়ার, যেটা ভেতরে আছে সেটাই আসল, সফট্ওয়ার কিছু নয়। কিন্তু সফট্ওয়ারে যদি কোন ভাইরাস ঢুকে যায় সেটা হার্ডওয়ারকেও নষ্ট করে দেবে। একটা কম্প্যুটারকে এই ভাবেই একে অপরকে নষ্ট করে দিচ্ছে। এই স্থুল শরীর সব সময় সূক্ষ্ম শরীরকে ভাইরাস দিয়ে যাচ্ছে, সূক্ষ্ম শরীরের যখন ক্ষতি হচ্ছে তখন আবার স্থুল শরীরেও তার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। তারপর একটা সময়ে এই স্থুল শরীরটা নষ্ট হয়ে যাবে, আর সূক্ষ্ম শরীরটা বেরিয়ে যাবে। বেরিয়ে গিয়ে সূক্ষ্ম শরীর তার উপযুক্ত আরেকটা শরীরের খোঁজ করতে থাকবে।

এখন হয়তো এই ভাবে সূক্ষ্ম শরীর পৌঁছে গেল নরকে, সেখানে গিয়ে সেখানকার যা বস্তু আছে সেইখান থেকে সে শরীর তৈরী উপাদান দিয়ে আরেকটা স্থুল শরীর বানিয়ে নিল। তারপর সেখানেও একদিন সেই স্থুল শরীর পড়ে গেল, সেখান থেকে হয়তো সে চলে গেল স্বর্গে, সেখানেও গিয়ে একই ভাবে আরেকটা শরীর বানিয়ে নিল। এইভাবে সূক্ষ্ম শরীরটা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তা, এইভাবে কত দিন ঘুরে বেড়াবে? বলছে, যত দিন এই সৃষ্টি চলতে থাকবে।

প্রথমের দিকে অমরত্বকে যখন খুঁজতে লাগল তখন তারা শরীরের দিকে তাকিয়ে অমরত্বকে খুঁজছিল। দেখলেন স্বর্গেই শরীরের অমরত্বকে পাওয়া যাবে। কিন্তু পরে দেখলেন যুক্তিতে এই ধারণাটা দাঁড়াতে পারেছে না। তারা বুঝলেন দুটো ভালো কাজ করলে আর কয়েকটা যজ্ঞ করে তুমি স্বর্গে গিয়ে অমর হয়ে যাবে, এটা কখনই সম্ভব নয়। সেখান থেকেও নেমে আসতে হচ্ছে, তাহলে তো আর অমরত্ব থাকল না। সেখান থেকে সরে এসে অর্থাৎ এই স্থূল শরীরের অমরত্বের অনুসন্ধানকে ছেড়ে দিয়ে তাঁরা আত্মার অমরত্বের অনুসন্ধানে ব্যাপ্ত হলেন। ভারতীয় ধর্মের সাথে অন্যান্য ধর্মের এইটাই হচ্ছে প্রধান পার্থক্য। ভারতীয় ধর্ম বলতে হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ সব ধর্মকেই বোঝাচ্ছে। এরা যে অমরত্বের কথা বলছে সেই অমরত্ব হচ্ছে আত্মার কিন্তু জুহুদি, পার্সি, খ্রীশ্চান ও ইসলামরা যে অমরত্বের কথা বলে সেটা হচ্ছে এই স্থূল শরীরের। সেইজন্য এরা কবরে শরীরটাকে খুব যত্ন করে রেখে দেয়। কারণ যখন Judgment Day আসবে সেই দিন এই শরীরটা কবর থেকে উঠে আসবে, তাদের সেই আত্মাটা এসে সেই শরীরের জুড়বে। বিচারের পর যারা স্বর্গে যাবে, সেখানে তাদের মধ্যে যারা পুরুষ তাদের তিরিশ বত্রিশ বছর হবে আর মেয়েদের পঁচিশ বছর বয়স হবে। এগুলো ভুল না ঠিক আমরা জানি না, আমাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে কোন্ শাস্ত্র কি বলছে সেটা জানা। কিন্তু যেহেতু আমরা যুক্তিকে নিয়ে চলি, আমরা যদি যুক্তি দিয়ে কাঁটাছেঁড়া করি, তাহলে এই ধরণের মতবাদের কোন মূল্যই আমাদের কাছে থাকবে না। স্বামীজী এই জিনিষগুলিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিউটনের Laws of Motions এর থিয়োরি দিয়ে বলছেন তুমি যতটা শক্তি প্রয়োগ করবে ততটাই থাকবে। আবার অন্য দিকে ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই নিয়ম কানুন চলে না। আমাদের দেখেছি বেদ এই জিনিষগুলিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করেছে।

আমরা বেদে প্রথমে পাই, অন্যান্য ধর্মের মত বেদও এই স্থূল শরীরের অমরত্বের কথা বলছে, কিন্তু পরেই ওনারা বুঝলেন যে এই তত্ত্ব যুক্তিতে দাঁড়াচ্ছে না। তখন তাঁরা স্থূল শরীরের অমরত্বের চিন্তা থেকে সরে আত্মার অবিনশ্বরত্বের তত্ত্বকে আবিষ্কার করে তার অনুসন্ধানেই পুরো প্রচেষ্টা চালাতে লাগলেন। বেদ বললেও, হিন্দুদের সব শাখাই আত্মার অমরত্বের ভাবনাকে পুরোপুরি গ্রহণ করেনি, আত্মা যে শুদ্ধ, চৈতন্য এই ভাবনাকে গ্রহণ করেনি। আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য অবিনাশী এই ভাবের বেশির ভাগটাই অদ্বৈত বেদান্ত গ্রহণ করেছে, আর বাকিরা অন্য ভাবে গ্রহণ করেছে। তাবে যারা যাই নিয়ে থাকুক সবাই এইটাকে মেনে নিলেন যে স্থূল শরীরের অমরত্ব কোন মতেই সম্ভব নয়, আত্মাই অমর। কিন্তু অন্যান্য ধর্মে স্থূল শরীরের অমরত্বে এখনো বিশ্বাস করে আছে।

আরণ্যক থেকেই বৈরাগ্যের ধারণাটা আসতে শুরু করেছে। যাঁরা ঋষি ছিলেন, তাঁরা বয়সের একটা সন্ধিক্ষণে এসে আস্তে আস্তে জঙ্গলের দিকে যেতে শুরু করলেন, এইখান থেকেই আরণ্যকের ধারণা গুলো আসতে শুরু করল। ঋষিদের কাছে তখন এই শরীর মনটা আবর্জনার মত মনে হত, কারণ এই শরীর মনেতেই যত কামনা বাসনা জন্মাচ্ছে আর সেই বাসনা নানা কর্মের মধ্যে তাঁকে বেঁধে ফেলছে। এই শরীর মনকে পরিষ্কার করার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে ত্যাগ ও বৈরাগ্য। মন্ত্র অংশে বলা হয়েছিল তুমি যজ্ঞ কর, যজ্ঞ তোমাকে পবিত্র করবে কিন্তু এখন সেই যজ্ঞ থেকে সরে এসে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের উপর জোর দেওয়া হল। পরের দিকে যত শাস্ত্র রচিত হয়েছে, বিশেষ করে গত দুশ তিনশ বছর ধরে হিন্দু ধর্মে যেসব চিন্তা ও ধারণাগুলো সামনে এসেছে, তার মধ্যে যজ্ঞ ও ত্যাগ-বৈরাগ্য এই দুটো ভাবনাই সব ক্ষেত্রে কাজ করছে। তুমি পূজা কর, অর্চনা কর, যজ্ঞ কর তুমি শুদ্ধ হয়ে যাবে আবার এটাও বলা হচ্ছে তুমি বৈরাগ্য অনুশীলন কর, বৈরাগ্য মানে বিরজা হোক করে সন্ন্যাস নেওয়া, সংসার ছেড়ে কোন আশ্রমে গিয়ে তপস্যা করা ইত্যাদির ধারণা। এই যে এখন কুম্ভ স্নান চলছে, সবাই কুম্ভে গিয়ে ডুব মারতে চাইছে, এটাও এক ধরণের যজ্ঞ, যে কোন পূজা, উপাচারই হচ্ছে যজ্ঞের পরিমার্জিত রূপ। যজ্ঞ আস্তে আস্তে প্রার্থনার দিকে রূপান্তরিত হয়েছে। কুম্ভে কেন ডুব মারতে গেছে? বিশ্বাস আছে যে কুম্ভে ডুব মারতে পারলে আমি শুদ্ধ হয়ে যাব। কিন্তু সাধারণ ভাবে হিন্দু ধর্মের প্রত্যেক প্রায়শ্চিত্ত কর্মে বৈরাগ্যের অনুশীলনের উপরে জোর দেওয়া হয়।

সেইজন্য বেদের আরণ্যকে এসে এই বলে প্রেরণা দেওয়া হত যে, তোমার এই জীবনে যা পাবার পেয়ে গেছ, এই জগতে যা হওয়ার হয়ে গেছে, তোমার বয়স হয়ে গেছে, শারীরিক ক্ষমতা কমে গেছে, এখন তুমি কাশী, বৃন্দাবন, হরিদ্বারে গিয়ে ঈশ্বর চিন্তন কর আর তোমার শেষ দিনের জন্য অপেক্ষা করতে থাক। সমস্যা যেটা ছিল তা হচ্ছে এইটার জন্য সবাই মানসিক ভাবে প্রস্তুত থাকে না। বয়স হয়ে গেছে তখনও বলছে আমি বৈরাগ্য চাইনা, ত্যাগ করতে চাইনা। এই ধরণের কত বৃদ্ধ বৃদ্ধা রয়েছেন যাদের কেউ নেই, অনেক দূরের কোন ভাইপো এসে বলল চল তোমাকে বৃন্দাবন ঘুরিয়ে নিয়ে আসে। সেখানে নিয়ে কোথাও একটা জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বলল, তুমি এখানে বস আমি এক্ষুণি আসছি, এই বলে বৃদ্ধকে ছেড়ে দিয়ে চলে আসত। এখনও বৃন্দাবন কাশীতে এইসব বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের নিয়ে প্রচুর সমস্যা হয়, তবে এখন লোকেরা অনেক পড়াশুনা জানে বলে খোঁজ খবর করে ফিরে আসত। কিন্তু আগেকার দিনের লোকেদের অত পড়াশুনা ছিল না আর যানবাহন এখনকার মত উন্নত হয়নি, তাই তারা অকুল পাথারে ভেসে বেড়াতেন। কাশীর সেবাশ্রমের কাজই শুরু হয়েছিল এই ধরণের বিধবাদের রাস্থা থেকে তুলে এনে থাকা খাওয়া আর চিকিৎসার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। কাশী, বৃন্দাবনে স্বামীজী বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের অবস্থা দেখার পর এদের নিয়ে খুব গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করেছিলেন, তিনিও চেয়েছিলেন এই ধরণেরর অবস্থার পরবর্তন আনতে। তারপর তিনি ভারতে ফিরে আসার পর স্বামীজীর শিষ্যরা রাস্থা থেকে বিধবাদের তুলে নিয়ে এসে তাদের সেবা করতে শুরু করলেন, সেই থেকে কাশী সেবাশ্রমের কাজ শুরু হয়েছিল।

আরণ্যকের এই ধারণাটার মূল উৎস হচ্ছে এই চিন্তা থেকেই – তোমার এখন বয়স হয়ে গেছে, জীবনে যা সুখ ভোগ করার হয়ে গেছে, এখন তুমি অন্য দিকে মন দাও, মানে উচ্চ চিন্তনে নিজেকে ব্যস্ত রাখ। কিন্তু যে লোক সারাটা জীবন ভোগের পথে দৌড়াদৌড়ি করেছে, ভোগের সংস্কার অত সহজে কি করে যাবে, ত্যাগের দিকে তার এক পয়সা মন নেই, এখন তাকে অরণ্যে পাঠিয়ে দিলে সে তো পাগল হয়ে যাবে। এক স্বামী-স্ত্রীর খুব ইচ্ছে ছিল তাদের এক ছেলে বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী হোক। বাবা-মা এসে ছেলেকে দিল্লী আশ্রমে দিয়ে গেছে। কয়েক দিন থাকার পরই সেই কোন ফাঁকে সুযোগ পেয়ে পালিয়ে বাড়ি চলে গেছে। তারপর বাবা-মা কিছু দিন ধরে অনেক বুঝিয়ে টুঝিয়ে আবার মঠে রেখে গেছে। এবারে একদিন দুপুর বেলা গেট বন্ধ, কিন্তু পাঁচিল টপকে পালিয়ে গেছে। তারপর ওখানকার অধ্যক্ষ ছেলেটির বাবা-মাকে ডেকে ভালো ভাবে বলে দিলেন যে আপনাদের ছেলে এখন প্রস্তুত নয়, ওকে জোর করে এই সব করতে যাবেন না।

আমাদের শাস্ত্র বলছে শুদ্ধতা, পবিত্রতাকে অর্জন করার শ্রেষ্ঠ পথ হচ্ছে বৈরাগ্য, কিন্তু মানুষ বৈরাগ্যের কথা, ত্যাগের কথা শুনলে আঁতকে ওঠে, কারণ বৈরাগ্য অত সহজে হয় না, মনের মধ্যে কামনা বাসনা এত গিজ্‌গিজ্‌ করছে যে বৈরাগ্যে নেওয়া তো অনেক দূরের কথা, বৈরাগ্যের কথা শুনতেও চাইবে না। ঠাকুর বলতেন – যদি একবার কোন দোষ করে থাক তাহলে শুধু একটি বার বলে দাও আমি আর করব না, ব্যাস্‌ ওতেই শুদ্ধ হয়ে গেল। এইটাই হচ্ছে প্রকৃত বৈরাগ্য। আমার একটা জিনিষের প্রতি প্রচণ্ড দুর্বলতা আছে, আমি ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে বললাম আমি কাল থেকে আর এটা করব না। সেই মুহূর্তে সব কিছু মাফ হয়ে গেল। এটা কথামৃতেরই কথা। মানুষ যত ভুল করে, অন্যায় করে সবই কামনা বাসনা থেকেই করে, কামনা বাসনা প্রতিহত হলেই ক্রোধ আসে। মানুষ যত পাপ কর্ম করে এই দুটো কারণেই করে। এখন যে মনে মনে ঠিক করে নিল – অনেক হয়েছে আর নয়, ঠাকুর অনেক অন্যায় করেছি, আর নয়। তার মানে মনের মধ্যে যে কামনার জন্য সে অন্যায় করেছিল সেই কামনাকে সে বৈরাগ্য দিয়ে দিল। বৈরাগ্য এসে গেলে আর কোন অন্যায় কাজ, পাপ কাজ করতে হবে না, এই জন্যই বলা হয় যে পবিত্রতা অর্জনের একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে বৈরাগ্য। যার বৈরাগ্য এসে গেছে তাকে আর কোন কিছু স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু মানুষ পারেনা।

আবার আরেক ধরণের ভক্ত আছে, তারা পাপ করছে কিন্তু ছাড়তেও পারছে না, এদিকে অপরাধ বোধটাও আছে, তখন এরাই কুম্ভে গিয়ে ডুব মারতে যায়। এত দিন যা পাপ করেছি সব কুম্ভে গিয়ে পরিষ্কার করে এলাম। তারপরে আবার পাপ কাজে জড়িয়ে পরে। যারা একবার বলে দিয়েছে আমি আর পাপ কাজ করব না সে একেবারে শুদ্ধ হয়ে গেল, আর যারা বলছে এতদিন যা পাপ কাজ করেছি কুম্ভে স্নান করে সেগুলো পরিষ্কার হয়ে গেছে, এখন আবার নতুন করে করা যাবে। যারা বৈরাগ্যকে বরণ করতে পারে না তারাই কুম্ভে যাবে, উপোস করবে, মন্দিরে পূজা দেবে, এগুলো করা মানে যা করেছি সেগুলিকে পরিষ্কার করে দিয়ে আবার নতুন খাতা খোলার ব্যবস্থা করে নেওয়া।

ঐতেরিয় আরণ্যক খুব নামকরা, বৃহদারণ্যক উপনিষদের নামই হচ্ছে বৃহৎ আরণ্যক, এছাড়াও প্রচুর আরণ্যক এখনও পাওয়া যায়, তবে পড়ার যদি সুযোগ পাওয়া যায় তাহলে এই আরণ্যক দুটি অধ্যয়ন করলে অনেক কিছুই জানা যেতে পারে।

আরণ্যকের পরে আসছে উপনিষদ। আর উপনিষদ যেটা বলছে তাকে সংক্ষেপে এক কথায় বলতে গেলে বলা যায় তা হল – এই জগতে যেটা সত্য, যেটা নিত্য তাকেই স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে। এতদিন এনারা যেটাকে দেখে এসেছিলেন, যাকে সংহিতা, ব্রাহ্মণ ইত্যাদিতে পরিষ্কার ব্যাখ্যা করে বলতে পারছিল না, কখন যাকে পুরুষ, কখন বিরাট বলে উল্লেখ করা হচ্ছিল, যে সত্যকে বিভিন্ন দেবতাদের মধ্যে অনুসন্ধান করছিলেন, তাঁকেই যখন উপনিষদে এসে গেলেন, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। ব্রহ্ম হচ্ছেন নিত্য, সেই সত্য যে সত্যের বাইরে আর কিছু নেই। নিত্য হচ্ছে সেটাই যার কোন ধরণের রূপান্তর হয় না, সেখানে কোন পরিবর্তন নেই। যা কিছুরই পরিবর্তন হচ্ছে সেটাই অনিত্য। আমাদের যে স্থূল শরীর এর অনবরত পরিবর্তন হচ্ছে, মন অহরহ বিভিন্ন রকমের রূপ নিচ্ছে, তাই শরীর মন হচ্ছে অনিত্য, আত্মাই একমাত্র নিত্য, এর কোন পরিবর্তন হয় না। আমাদের ভেতরে আত্মাই আছেন যিনি নিত্য, যাঁর কখন পরিবর্তন হয় না। ঠিক তেমনি বহির্জগতে ব্রহ্ম যিনি তাঁর কখন পরিবর্তন হয় না। সেইজন্য জীবাত্মা আর পরমাত্মা এই দুটি শব্দকে ব্যবহার করা হয়।

আবার ধ্যানের গভীরে গিয়ে উপলব্ধিতে ধরা পরে যে যিনি জীবাত্মা তিনিই পরমাত্মা, যিনিই পরমাত্মা তিনিই সমস্ত জীবের মধ্যে জীবাত্মা রূপে বিরাজ করছেন। উপনিষদ এই জিনিষের উপরেই সমস্ত জোর দিয়ে বলছে আত্মাই ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি, অহং মানে এই শরীর, মন রূপী আমি নয়, আত্মা রূপী আমির কথাই বলা হচ্ছে। শরীর রূপে, মন রূপে, বুদ্ধি রূপে কেউ কখন ব্রহ্ম হতে পারবে না। শরীর, মন ও বুদ্ধি রূপে কখনই উচ্চ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না, সাধারণ জিনিষ যেমন হয়, শরীর, মন, বুদ্ধির সঙ্গে একাত্ম আমিটাও সাধারণ জিনিষ। যখন কেউ নিজেকে আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করে দেবে তখন সে বলতে পারবে অহং ব্রহ্মাস্মি। যত চৈতন্যের বিস্তার হবে ততই সে মহৎ হতে থাকবে। উপনিষদে এই জিনিষ গুলিকেই বিভিন্ন ভাবে বলা হয়েছে।

এখানেই আমাদের বেদের যাবতীয় আলোচনা শেষ হয়ে গেল। এর পরে আসছে বেদান্ত। বেদ বলতে মোটামুটি মন্ত্র আর ব্রাহ্মণকেই বোঝায়, আর উপনিষদকেই বেদান্ত বলা হয়, বেদের অন্ত। যদিও বেদের অন্ত বলতে উপনিষদকে বোঝাচ্ছে, কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করা হয় – The Vedantins do not see Upanishads as the end of the Vedas, but as the final aim of the Vedas. অর্থাৎ বেদের অন্তে এসেছে বলেই উপনিষদকে বেদান্ত বলা হচ্ছে তা নয়, বেদান্তের গূঢ় অর্থ হচ্ছে বেদ যে চরম লক্ষের দিকে সবাইকে নিয়ে আসছে সেটাই বেদান্তের উদ্দেশ্য। বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মাই ব্রহ্ম, এইটাই সমগ্র বেদের বক্তব্য, পুরো বেদ যেখানে গিয়ে উপক্ষয়ঃ, মানে নিজেকে নিঃশেষে খালি করতে করতে ধীরে ধীরে একটা দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বেদের যে এই চারটি ভাগ মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক আর উপনিষদ, এতেই বোঝা যায় যে উপনিষদ হচ্ছে লক্ষ্য, সেই কারণে উপনিষদকে বলা হচ্ছে বেদান্ত। আর

যদি আক্ষরিক অর্থে বেদান্তের ব্যাখ্যা করতে হয় তাহলে বলা যায় বেদের শেষে উপনিষদ এসেছে বলে উপনিষদকে বেদান্ত বলা হচ্ছে।

তারপরে বেদের খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বেদাঙ্গ। প্রথম বেদাঙ্গ হচ্ছে শিক্ষা, দ্বিতীয় কল্প, তৃতীয় ব্যাকরণ, চতুর্থ নিরুক্ত, পঞ্চম ছন্দ এবং শেষে ষষ্ঠ জ্যোতিষ।

আমরা শিক্ষা বলতে এখন যা বুঝি এখানে সেই শিক্ষার কথা বলা হচ্ছে না। বেদের শিক্ষা মানে মন্ত্রের সঠিক উচ্চারণের বিজ্ঞান ও কৌশল। উচ্চারণের ব্যপারটা বেদে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বেদে উচ্চারণকে কেন এত গুরুত্ব দেওয়া হয় এই নিয়ে আমরা আগেও আলোচনা করেছি। স্বামীজী বলছেন একটা জিনিষকে যদি ঠিক ঠিক উচ্চারণ করা যায় তখন ঐ জিনিষটা তৈরী হয়ে যাবে। স্বামীজীর কথা শুনে শিষ্য শরৎ চক্রবর্তী বলছেন – আমি যদি এই ঘটিকে ঘটি ঘটি বলি তাহলে ঘটি তৈরী হয়ে যাবে? স্বামীজী বলছেন হ্যাঁ হবে যদি তুমি তার ঠিক ঠিক উচ্চারণ করতে পার। বেদের সময়ে যাঁরা ছিলেন তাঁরা এই কারণে শিক্ষাকে খুব গুরুত্ব দিতেন। মন্ত্রের ঠিক ঠিক উচ্চারণ যদি হয় তবেই মন্ত্রের শক্তি কাজ করবে। এই যে এত লোক মন্ত্র জপ করে যাচ্ছে কিছুই হচ্ছে না, তার কারণ মন্ত্রের যে উচ্চারণ হওয়ার কথা ঠিক সেই উচ্চারণটা যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ মন্ত্রের শক্তি কাজ করবে না। এখন উচ্চারণ কিভাবে ঠিক হয়? বলছেন উচ্চারণ চার রকমের হয় – একটা হয় মুখ থেকে, একটা হয় গলা থেকে, একটা হয় পেটের নীচ থেকে আরেকটা হয় নাভি থেকে। দীক্ষার সময় গুরু মন্ত্রের উচ্চারণ কিভাবে করতে হবে বলতে গিয়ে বলে দেন ঠোঁট নড়বে না, জিহ্বা নড়বে না। কিন্তু আমাদের প্রায় সবারই হয় ঠোঁট নড়বে নয়তো জিভটা নড়ার জন্য ছটফট করতে থাকে। যখন মন ঠিক ঠিক শান্ত হয়ে যায় তখন ঠোঁট জিভ নড়া বন্ধ হয়ে যায় তখন গলার কাছে স্বরনাড়িটা নড়তে থাকে। এইটা নড়ে বলে জপের গতি ধীরে হয়, যেই এই নড়াটা বন্ধ হয়ে যাবে জপের গতিও সঙ্গে সঙ্গে হাজার গুণ বেড়ে যাবে। আগে একশ আট বার জপ করতে যেখানে আগে দু-তিন মিনিট লাগছে এখন সেই একশ আট বার জপ করতে কয়েক সেকেণ্ড লাগবে, তখন লক্ষ লক্ষ জপ হতে শুরু করবে। এরপরই আসে পূর্ণ নীরবতা। এই নিস্তব্দতার অবস্থায় যখন চলে তখন মন্ত্রের ঠিক ঠিক উচ্চারণ কি বুঝতে পারে। যখনই ওঁ নমঃ শিবায় ঠিক ঠিক উচ্চারণ হবে তখনই শিবের দর্শন হয়ে যাবে। ঠোঁট নড়া, জিভ নড়া থেকেই আমরা বেরোতে পারছি না। অনেক দিন ধরে দু-তিন ঘন্টা টানা জপ ধ্যান করলে এগুলো বোঝা যায়। শিক্ষা হচ্ছে একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ শাখা যেখানে মন্ত্রের ঠিক ঠিক উচ্চারণকে শেখান হত।

একবার ত্বস্টা দেবতা ইন্দ্রের উপরে খুব রেগে গিয়েছিলেন, ঠিক করলেন ইন্দ্রকে বধ করতে হবে। তখন সে একটা যজ্ঞ করবে বলে ঠিক করল। যজ্ঞের সময় আচমন করে মন্ত্র উচ্চারণ করা হবে – *ইন্দ্রসতুর বরদ্ধস্ব*, যার অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রের যে শত্রু তার বৃদ্ধি হোক, মানে ইন্দ্রকে যে মারবে তার শক্তি, বল সব বৃদ্ধি হোক। এখন মন্ত্রের মধ্যে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিন রকমের স্বর ওঠানামা করে, মন্ত্রও সেইভাবে উচ্চারণ করা হয়। এখানে ত্বস্টা যেখানে উদাত্ত হওয়ার কথা ছিল সেখান উদাত্ত না করে স্বরিত করে দিল, আর তাতেই শব্দের অর্থ পাল্টে গেল। যেখানে অর্থ হওয়ার কথা ছিল ইন্দ্রের শত্রুর বৃদ্ধি হোক, সেটা না হয়ে অর্থ হয়ে গেল ইন্দ্রের শক্তি বৃদ্ধি হোক। তার ফলে যে বিরাট যজ্ঞ হল তার ফল উল্টো হয়ে ত্বস্টাই মারা গেল। প্রাচীন ফোনেটিক যে বই আছে সেই বইগুলোকে বলা হয় প্রাতিশিক্ষা। চারটে বেদের যে বিভিন্ন শাখা আছে তার জন্য আলাদা আলাদা প্রাতিশিক্ষাও ছিল। এখন আর এই বই পাওয়া যায় না। আর শিক্ষার এই ব্যাপারকেও আজ আর বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

বেদাঙ্গের ব্যাকরণ হচ্ছে বৈদিক গ্রামার। পরের দিকে পাণিনির ব্যাকরণ আসার পরে বৈদিক গ্রামারের গুরুত্বও চলে গেছে এখন আর এই বৈদিক গ্রামারও চোখে পড়ে না। তবে পাণিনির ব্যাকরণই এখন বৈদিক গ্রামারের কাজ করে দিচ্ছে।

তারপর আসছে ছন্দ। একটা কবিতা যখন লেখা হয় কিংবা গান যখন লেখা হচ্ছে তার শব্দ ও অক্ষর কতকগুলি বিশেষ নিয়মে সাজান হয়ে থাকে সেটাকেই ছন্দ বলছে। কিন্তু পরের দিকে সাম বেদে যে সাম গান হত সেই সাম গান থেকে সাতটা সুরের সৃষ্টি হল। এই সাতটা সুরকে নিয়েই পরে গন্ধর্ব বিদ্যার আবির্ভাব হয়ে সেইভাবে ছন্দ এগিয়ে গেল। বেদ বেদাঙ্গের এই বিদ্যাগুলো মুস্টিমেয় কয়েকজনের কাছেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরের দিকে সাধারণ লোকের জন্য সহজ করে এই জিনিষ গুলিকেই তৈরী করা হয়েছিল। যেমন বৈদিক ব্যাকরণ পাণিনির ব্যাকরণে চলে এসেছিল। বৈদিক যুগে যে ছন্দ বিদ্যা ছিল সেই ছন্দও তেমনি পরে রূপান্তরিত হয়ে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে চলে এসেছে। বৈদিক যুগের ছন্দকে আজকে যুগে আর দেখা যায় না, এখন যে ছন্দ আছে তার সাথে বৈদিক যুগের ছন্দের সাথে কোন মিল নেই। আপ্তের একটি বৈদিক অভিধান আছে সেখানে কত রকমের ছন্দ আছে তার একটা বিরাট তালিকা দেওয়া আছে কিন্তু এই সব ছন্দ এই যুগের, বৈদিক যুগে ছন্দ ছিল একটা আলাদা শিল্প কলা, এখন এর পুরোটাই হারিয়ে গেছে।

বেদের প্রধান কর্ম ছিল যজ্ঞ যাগ, এখন যজ্ঞ করতে গেলে একটা বিশেষ সময় বা তিথির মধ্যে করতে হবে, এই এই নক্ষত্র থাকতে হবে। এই জিনিষটাকে ঠিক করার জন্য বৈদিক যুগে জ্যোতিষ শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল। একটা যজ্ঞ ব্রাহ্ম মুহুর্তে করতে হবে, এখন ব্রাহ্ম মুহুর্তের সময়টাকে হিসাব করতে হবে, এই সময়কে নির্ধারণ করার জন্য একটি আলাদা বিজ্ঞান তৈরী হয়ে বেদের একটা নতুন শাখা তৈরী হল, তাদের যে শাস্ত্র হল সেটাকেই জ্যোতিষ শাস্ত্র বলা হয়। বৈদিক যুগের একমাত্র জ্যোতিষ শাস্ত্রই এখনও একই ভাবে চলে আসছে। আমাদের এখনও যে জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসরণ করে কুষ্টি, ঠিকুজি বানান হয় এটা সেই বৈদিক যুগের জ্যোতিষ শাস্ত্রকেই ভিত্তি করে করা হয়। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার যে বৈদিক যুগে যা যা তিথি নক্ষত্রের হিসেব যে পদ্ধতিতে দিয়ে গেছেন এখনও এটাকেই সঠিক পদ্ধতি মেনে নিয়ে এখনকার জ্যোতিষ বিজ্ঞানীরা সব হিসেব করে যাচ্ছেন।

আর্যভট্ট আজ পর্যন্ত যত সূর্য গ্রহণ চন্দ্র গ্রহণ হয়েছে ভবিষ্যতে যত গ্রহণ হবে সব হিসেব করে বলে গেছেন। তখনকার দিনে কোন দূরবীন যন্ত্র ছিল না, কিন্তু ওনারা এইগুলো কিভাবে হিসাব করেছিলেন ভাবলেও আশ্চর্য হয়ে যেত হয়, শুধু তাই নয় একেবারে নিখুঁত হিসাব। তাছাড়া সূর্যের গতির সাথে পৃথিবীর গতির তুলনা, চাঁদের গতির সাথে পৃথিবীর গতির তুলনা একেবারে নিখুঁত ভাবে করে গেছেন, কোন বছরে কোন তারিখে কি কি গ্রহণ হবে।

তারপরে আসছে কল্প – কল্প হচ্ছে যজ্ঞের বিভিন্ন নিয়ম কানুন আর সংস্কারের বর্ণনা, সংস্কার হচ্ছে জাতকর্ম কিভাবে করান হবে, যেমন বিবাহ কিভাবে করান হবে। এখন এত এত মন্ত্র, নিয়ম কত মনে রাখবে তাই এইগুলোকে সংক্ষিপ্ত আকারে ম্যানুয়াল করে রাখা হত, এটাকেই বলা হচ্ছে কল্প। এখন এই কল্পের আবার কয়েকটি বিভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। তারমধ্যে কিছুকে বলা হয় গৃহ্যসূত্র, আর কিছুকে বলা হত স্মার্তসূত্র ও শ্রৌতসূত্র। মনুস্মৃতিতে এগুলো আরো বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হবে। কতকগুলি কল্পসূত্র খুব উল্লেখযোগ্য, তারমধ্যে আপস্তাম্বের কল্পসূত্র খুব বিখ্যাত কল্পসূত্র। এছাড়া অশ্বালয়মের কল্পসূত্র, সাংখ্যায়নের কল্পসূত্র, গোভিলা, কাত্যায়ন, হিরণ্যাকেশি, বোধয়ণ, ভরদ্বাজাদির কল্পসূত্রও খুব নামকরা। কল্পসূত্র বেদের খুব বিশাল ও অত্যন্ত সুন্দর ও খুব বিখ্যাত কাজ। কিন্তু বেদাঙ্গের অন্যান্য জিনিষের মতও এই কল্পসূত্রও পরে পরিবর্তিত হয়ে স্মৃতিশাস্ত্রে চলে এসেছে। কল্পসূত্রের বৈদিক যুগের বইগুলো এখনও আছে কিন্তু ব্যবহার হয় না, কিন্তু এই কল্পসূত্রই স্মৃতিশাস্ত্র রূপে এখনও ব্যবহৃত হয়ে চলেছে।

বেদাঙ্গের সব শেষে আসছে নিরুক্ত। নিরুক্ত হচ্ছে বেদের শব্দ প্রকরণের বিজ্ঞান। সহজ করে বললে বলা যায় যে নিরুক্ত হচ্ছে বেদের অভিধান। যাস্ক ঋষিই একমাত্র ঋষি যিনি বেদের এই অভিধানকে

সঙ্কলন করেছিলেন, তাও বেদ রচিত হবার পারায় দু-হাজার বছর পর। এর আগে শেষ যে বেদের অভিধান আমরা পাই তা হচ্ছে নিঘন্টু। যাস্কের নিরুক্তকে নিঘন্টুরেই ব্যাখ্যা বলা যেতে পারে।

আমরা বেদের কয়েকটি বিশেষ মন্ত্রগুলি নিয়ে আলোচনা করছি, এই মন্ত্রগুলিতে দেখান হচ্ছে বেদের পরের দিকে হিন্দু ধর্মে যে ধরণের আধ্যাত্মিক দর্শনের ভাবনা চিন্তাগুলি এসেছিল সেগুলো আগে থাকতেই বেদে কিভাবে এসে গিয়েছিল, এই ভাবনাগুলোই পরে আস্তে আস্তে আরও ব্যাপৃত করা হয়েছে। এখানে সেই রকম অথর্ব বেদ থেকে একটি মন্ত্র আসছে যেখানে বলা হচ্ছে One in Many – ***তাবাংস্তে মঘবন্ মহিমোপো তে তন্বঃ শতম্। উপো তে বধ্বে বদ্ধানি যদি বাসি ন্যর্বুদম্।।***(অথ- ১৩/৪)। বলছেন, হে ইন্দ্র, তুমি একাই শত শত সহস্র কোটি কোটির মধ্যে আছ, আবার এই সহস্র কোটি তোমার মধ্যেই আছে।

ঈশোপনিষদের একটি মন্ত্র আছে, সেখানে আত্মার নিরাকারের অবস্থাকে বর্ণনা করা হচ্ছে - ***স পর্যগাচ্ ছুক্রম্ অব্রণম্ অস্নাবিরং শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্। কবির্ মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্ যাথাতথ্যতোহর্থান্ ব্যদ্ধাচ্ ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।।*** (যজু/XL-8)। এখানে বলা হচ্ছে যিনি আত্মা তিনি কি রূপে আছেন – তিনি জ্যোতিস্বরূপ, অশরীরি, unwounded, পেশীহীন, স্নায়ু বিহীন, আত্মা পবিত্র ও অপাপবিদ্ধ। আত্মার আরেকটি নাম হচ্ছে কবি, মনীষি, পরিভু – মানে সর্বব্যাপী। উপনিষদ আলোচনার সময় এই মন্ত্র আরও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হবে।

আরেকটি মন্ত্রে বলা হচ্ছে ঈশ্বর সমুদ্রেও আছেন আবার তিনি সমুদ্রের প্রত্যেকটি জলকণার মধ্যেও বিরাজ করছেন। অর্থাৎ প্রভু আর বিভু, দুটোই তিনি। কিভাবে হচ্ছে? ***উতেয়ং ভূমির্ বরুণস্য রাজ্ঞ, উতাসো দ্যৌর্ বৃহতী দূরেয়ন্তা। উতো সমুদ্রৌ বরুণস্য কুক্ষী, উতাস্মিন্নল্প উদকে নিলীনঃ।।*** (অথ-৪/১৬-৩)। এই পৃথিবীর মালিক হচ্ছে ভগবান, যিনি রাজা, এই যে আকাশ, তারও রাজা হচ্ছে ভগবান, এই সমুদ্রগুলি হচ্ছে তাঁর জঙ্ঘা। এই ভাবে তিনি সমস্ত পৃথিবী, আকাশকে ছেয়ে রয়েছেন, আর সমুদ্র হচ্ছে তাঁর ছোট্ট একটি অংশ। *উতাস্মিন্নল্প উদকে নিলীনঃ* – সমুদ্রের ক্ষুদ্র জলকণার মধ্যেও তিনি বিরাজিত। একদিকে তিনি এত বিশাল যে সমস্ত পৃথিবী, আকাশ সব কিছুতে ছেয়ে রয়েছেন, আর এই যে বিশাল সমুদ্র, সে হচ্ছে তাঁর শরীরের একটা ছোট্ট অঙ্গ জঙ্ঘা। ঈশ্বরের বিশালত্বের কাছে সমুদ্র যেন কিছুই নয়, অথচ ছোট্ট যে জলের বিন্দু তাতেও তিনি রয়েছেন। এইটাই হচ্ছে প্রভু আর বিভুর তাৎপর্য, তিনিই ঐ বিশাল আবার তিনিই এই ক্ষুদ্রের মধ্যে। আসলে বলতে চাইছেন – ভগবান হচ্ছে চৈতন্যস্বরূপ, চৈতন্যের কোন বিভাজন করা যায় না। যেটা খণ্ডে আছে সেটাই ব্রহ্মাণ্ডে আছে। আমরা সচরাচর ভগবান বলতে যা বুঝি, বৈকুন্ঠে বিষ্ণু বসে আছেন লক্ষ্মী দেবীকে নিয়, সেইখান থেকে তিনি রাজ করছে। এখানে কিন্তু ভগবান সম্বন্ধে তা বলা হচ্ছে ন। বেদের সময়েই ঈশ্বরের প্রভু ও বিভুর তত্ত্ব এসে গিয়েছিল। তিনি সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আছেন, তিনি শুধু রাজা নন, তিনিই সেটা, অথচ তিনি একটি ছোট্ট জলবিন্দুতেও আছেন।

এই মন্ত্রটিও খুব সুন্দর ও নামকরা মন্ত্র, সম্ভব হলে সবাই এই মন্ত্রকে মুখস্ত করে রাখতে পারেন। অনেক জায়গাতে এই মন্ত্রকে ঈশ্বর বিষয়ক কিছু বর্ণনা করার সময় উল্লেখ করা হয় ***ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমান্ অসি, ত্বং কুমার উত বা কুমারী। ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বংচসি, ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।।*** (অথ – ১০/৮।২৭)। তুমি হচ্ছ নারী, তুমিই আবার পুরুষ, তুমিই কুমার মানে যুবক আবার তুমিই কুমারী মানে যুবতী, তুমি হচ্ছ বৃদ্ধ, যার শরীর জীর্ণ হয়ে গিয়ে লাঠি ভর দিয়ে হেঁটে চলেছ, আর এই পৃথিবীতে যত মুখ আছে সবই তুমি। এই মন্ত্রে খুব সুন্দর ভাবে সর্বব্যাপী যিনি, সেই ঈশ্বরের বর্ণনা করা হচ্ছে – পুরুষ, নারী, যুবক, যুবতী, দণ্ডধারী বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যাবতীয় যা কিছু আছে সবই তিনি।

সর্বব্যাপী ঈশ্বরের বর্ণনার পাশাপাশি অথর্ব বেদেরই আরেকটি মন্ত্রে আমরা আত্মার বর্ণনা পাই, পরের দিকে এই ভাবটাই উপনিষদ নিয়ে নিচ্ছে – ***অকামো ধীরো অমৃতঃ স্বয়ম্ভু, রসেন তৃপ্তো ন কুতশ্চনোনঃ। তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যোর্ আত্মানং ধীরম্ অজরং যুবানম্।*** (অথ-১০/৮-৪৪)। অকামো,

ধীরঃ, অমৃতঃ, স্বয়ম্ভূ এই উপমাগুলি উপনিষদে পরে বারে বারে আসবে। আত্মার কোন কামনা নেই, তাই বলা হচ্ছে অকামো, আত্মা হচ্ছে ধীর, কখন ছটফট করছে না, আত্মার মৃত্যুও নেই জন্মও নেই, তাই আত্মাকে বলা হচ্ছে অমৃতঃ, আত্মা হচ্ছেন স্বয়ম্ভূ, অর্থাৎ তিনি কারুর দ্বারা জাত হন না। এখানে বলা হচ্ছে *রসেন তৃপ্তো কুতশ্চনোনঃ*, এই ভাবটাকেই পরে অনেক জায়গায় *রসো বৈ সঃ* বলা হয়েছে, আত্মা হচ্ছেন রসস্বরূপ। আত্মার এই রসস্বরূপের উপর অনেক বিরাট বিরাট বর্ণনা আছে। আবার আনন্দস্বরূপকেই রসস্বরূপ বলা হয়। *তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যোর্*, আত্মার এই রূপকে যে জেনে যায় তার আর মৃত্যুর ভয় থাকে না। এই আত্মা কেমন? *আত্মানং ধীরম্ অজরং যুবানম্* - আত্মা হচ্ছেন অজর, ধীর আর চিরযুবক। যার কখন বার্ধক্য আসে না তাকে চিরযুবক বলা হয়, আত্মার কখন বার্ধক্য আসে না তাই আত্মা চিরযুবক। এই ভাবটাই গীতাতে পরে আরও পরিষ্কার করে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন। বেদের পরে হিন্দু ধর্মে যত শাস্ত্র সৃষ্টি হয়েছে আত্মার এই একেকটা গুণকে নিয়েই আরও অনেক বিস্তার করে বলা হয়েছে।

যিনি ভগবান তিনি হচ্ছেন Destroyer of Darkness and Evil, বলছেন – ***আ বিবাধ্যা পরিরাপস্ তমাংসি চ জ্যোতিষ্মন্তং রথম্ ঋতস্য তিষ্ঠসি। বৃহস্পতে ভীমম্ অমিত্রদম্ভনং রক্ষোহণং গোত্রমিদং স্বর্বিদম্।।*** *(ঋ-২/২৩-৩)।* যদিও ব্রহ্মণস্পতি এই মন্ত্রের দেবতা, কিন্তু মূলতঃ এই প্রার্থনটা সূর্যের প্রতি করা হচ্ছে। বলছেন, অজ্ঞানকে সরিয়ে দিয়ে তুমি কি কর? তুমি সেই আলোকজ্জ্বল রথের উপরে উপবেশন কর। মূল কথা হল অজ্ঞান চলে গেলে পুরোটাই আলোকময় হয়ে যায়। ঈশ্বর যেখানে প্রকাশিত হন সেখানে অন্ধকার চলে যায়, এইটাকেই বলছেন – হে ভগবান যখন তুমি চল সেখানে থেকে অন্ধকার যেন পুরো সরে যায় আর আলো যেন বেরিয়ে আসে। ভগবানের প্রতি প্রার্থনা করা হচ্ছে অজ্ঞানতাকে দূর করে জ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত করার জন্য।

বিশ্বানি দেব সবিতর্ দুরিতানি পরা সুব। যদ্ ভদ্রং তন্ন আ সুব।। (ঋ-৫/৮২-৫)। যার সব সময় মনে হয় জীবনের তার সব কিছুই খারাপ চলছে, ভালো কিছুই হচ্ছে না, সব অশুভই আর অশুভ, কিছুই ভালো লাগছে না, সে যদি এই মন্ত্রটি রোজ পাঠ করে তাহলে কিছু দিনের মধ্যেই মনের এই ভালো না লাগার ভাবটা কেটে যাবে। হে সবিতা, হে ঈশ্বর যা কিছু বাজে সব সরিয়ে দাও, *যদ্ ভদ্রং তন্ন আ সুব* – যা কিছু শুভ, যা কিছু ভালো সেটা যেন আমার প্রতি আসে। সন্ন্যাস মন্ত্রেও এই মন্ত্রটা আসে। ভদ্র শব্দের অর্থ হচ্ছে শুভ, কল্যাণদায়ক।

বেদ হচ্ছে মন্ত্রের বিশাল খনি, কত রকমের মন্ত্র আর কত ভাবে ঈশ্বরীয় ভাবের বর্ণনা করা হয়েছে ভাবা যায় না, পরের দিকে যে কোন ধর্মে ঈশ্বর সম্বন্ধে যত ভাব এসেছে সব ভাবই কোন না কোন ভাবে বেদে আগে থাকতেই এসে গিয়েছিল। এর পরে ঈশ্বরকে দেবী রূপে যিনি দশটি হাত নিয়ে এগিয়ে আসছেন, এইটাই পরে আমরা দুর্গা রূপে পাচ্ছি - ***ইয়ং যা নীচ্যর্কিণী রূপা রোহিণ্য কৃতা। চিত্রেব প্রত্যদর্শায়ত্য ৭ স্তর্ দশসু বাহুষু।।***(ঋ-৮/১০১-১২)। আমরা দশভূজাকে যে রূপে বুঝি ঠিক সেইভাবে এটি দুর্গার স্তুতি নয়, কিন্তু এই ভাবটাই বেদে আগেই এসে গেছে। আমরা এখন যে ভাবে মাতৃপূজা বা মাতৃবন্দনার স্তুতি পাই সেগুলো বেদে এই ভাবেই উল্লেখ করা হয়েছিল।

এই রকমেরই আরেকটি মাতৃবন্দনা – ***উচ্ছন্তি ইয়া কৃণোষি মং হনা মহি প্রখ্যৈ দেবি স্বর্ দৃশে। তস্যাস্তে রত্নভাজ ঈমহে বয়ং স্যাম মাতুর্ ন সূনবঃ।।*** (ঋ-৭/৮১-৪)। এই মন্ত্রের দেবী হচ্ছেন ঊষা, হে দেবী তুমি উদয় হলে এই অন্ধকারটা সরে যায় আর আমরা পরিষ্কার আকাশকে আর পৃথিবীকে অবলোকন করতে পারি। আর *স্যাম মাতুর্ ন সূনবঃ* – সন্তান যেমন মায়ের কাছে নিশ্চিন্তে থাকে আমরাও যেন ঠিক সেই রকম তোমার কাছে থাকতে পারি। এই রকম ঈশ্বরকে মাতৃরূপে বন্দনাও আমরা বেদে পাচ্ছি। সমস্যা হয়, যখন আমরা বেদ পড়ি তখন পড়তে পড়তে এই ধরণের যখন স্তুতি আসে তখন দেখি এই স্তুতি ঊষা দেবীকে বা বাক্ দেবীর প্রতি করা হচ্ছে তখন মনে হয় যে এটাতো ঊষা বা বাক্ দেবীকে স্তুতি করা হচ্ছে,

মাতৃভাব তখন মনে আসে না। কিন্তু এই যে ভাব, ঊষা দেবীকে মাতৃরূপে বন্দনা করা হচ্ছে, এই ভাবই পরে বিশেষ করে ইদানিং যুগে যে মাতৃভাবের এত জনপ্রিয়তা, এটা বেদে অনেক আগেই ছিল।

হংসঃ শুচিপদ্ বসুরন্তরিক্ষসদ্ ঘোতা বেদিপদ্ অতিথির্ দুরোণসৎ। নৃষদ্ বরসদ্ ঋতসদ্ ব্যোমসদ্ অজ্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্।। (ঋ-৪/৪০-৫)। এই মন্ত্রের দেবতা হচ্ছে সূর্য। এটিও একটি খুব সুন্দর মন্ত্র যেখানে সেই ঈশ্বরকে বর্ণনা করা হচ্ছে, তিনি হচ্ছেন হংসের মত, হংসের সাথে ঈশ্বরের বর্ণনা অনেক জায়গাতে করা হয়েছে। সূর্য হংসের উপরে আলোর মধ্যে বিরাজমান অর্থাৎ আলো তাঁকে যেন চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। এই ধরণের মন্ত্র আমরা কঠোপনিষদেও পাই, উপনিষদ আলোচনার সময় এর আর বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

এর পরের মন্ত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি মায়ার ধারণা বেদে কিভাবে এসেছে The Form Behind All Forms – ***রূপং রূপং প্রতিরূপ বভূব তদ্ অস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ।।*** (ঋ-৬/৪৭-১৮)। এই যে আমরা এত নানান রূপ দেখতে পাচ্ছি, এই এত রূপের মধ্যে একটি রূপ আছে যার কোন বিকার নেই। শত শত যত রূপ আছে তার একটাই ছাঁচ। প্রতিরূপ, যত রূপ হচ্ছে তার রূপ সেই একটাই, ঐ একটা রূপ থেকেই শত শত রূপ তৈরী হয়ে চলেছে। *তদ্ অস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়* – যে রূপ থেকে এত রূপ হচ্ছে সেই রূপটাকেই খোঁজার চেষ্টা করা উচিৎ। ঠাকুর বলছেন – একজনের একটা রঙ এর গামলা ছিল, যে যা রঙ চাইছে গামলার রঙ এ ছুপিয়ে দিলে সেই রঙ পেয়ে যাচ্ছে। একজন এসেছে কাপড়ে রঙ ছোপাতে, সে জিজ্ঞেস করছে তুমি কি রঙে রাঙাতে চাও? তখন সে বলছে তুমি যে রঙে রাঙ্গিয়েছ আমাকে সেই রঙ দাও। একটাই রঙের গামলা সেই গামলা থেকেই সব রঙ পেয়ে যাচ্ছে। সেই রকম একটাই রূপ আছে সেই রূপ থেকে এত শত শত হাজার হাজার রূপ বেরিয়ে আসছে। তখন বলছেন – দ্যাখো, এইটা যখন তুমি বুঝে নিলে একটা রূপ থেকে সব রূপ বেরোচ্ছে তখন তুমি সেই রূপটাকেই খোঁজার চেষ্টা কর। *ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে* – ইন্দ্র তাঁর মায়ার শক্তির সাহায্যে বিভিন্ন রূপ নিয়ে ঘুরে বেড়ান। এইটা স্বামীজীও উল্লেখ করেছেন যে মায়ার ধারণা বেদেই এসে গিয়েছিল। *যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ* – সেই ইন্দ্রই হচ্ছেন ভগবান কিন্তু তিনি সমস্ত দেবতাদের রূপ ধারণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মূল কথা হচ্ছে – সেই এক সত্তা এতগুলো রূপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমরা এর আগে পেয়েছিলাম *কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম* – কোন দেবতাকে আমরা আহুতি প্রদান করব। তখন বলছেন যে সেই ইন্দ্র, সব এক, কিন্তু নানা রূপে আমরা তাঁকে দেখছি।

তারপরের মন্ত্রটিও আমরা সন্ন্যাস মন্ত্রে পাই – ***ব্রহ্মা দেবানং পদবীঃ কবীনাম্ ঋষির্বিপ্রাণাং মহিষো মৃগাণাম্, শ্যেনো গৃধ্নাণাং স্বধিতির্বনানাং সোমঃ পবিত্রম্ অত্যেতি রেভন্।।*** (ঋ-৯/৯৬-৬)। এখানে আত্মার কি রূপ বলছেন। দেবতাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মা, শ্রেষ্ঠতম, কবিদের মধ্যে তিনি *পদবীঃ*, *পদবীঃ* হচ্ছে নেতা বা শ্রেষ্ঠ, কবিদের মধ্যে তিনি নেতা, ব্রাহ্মণদের মধ্যে তিনি ঋষি, বিপ্রর অর্থ ব্রাহ্মণ হলেও কবি, ঋষি, বিপ্র এই শব্দগুলি একই অর্থে বলা হয়, যখন বলা হচ্ছে *ঋষির্বিপ্রাণাং* তখন এর অর্থ এইটাই ব্রাহ্মণদের মধ্যে তিনি ঋষি। *মহিষো মৃগাণাম্*, যত পশু আছে তার মধ্যে তিনি মহিষ, মানে সব থেকে শক্তিশালী, *শ্যেনো গৃধ্নাণাং* – শ্যেন হচ্ছে বাজ পাখি, যত পাখি আছে তার মধ্যে তিনি বাজ পাখি। *স্বধিতিঃ বনানাং* – স্বধিত হচ্ছে ঘুন পোকা, কাঠের মধ্যে তিনি ঘুন পোকা, ঘুন যেমন সব কাঠকে কেটে দেয়। *সোমঃ পবিত্রম্* - যা কিছু পবিত্র আছে তার মধ্যে তিনি হচ্ছে সোম। একটা বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে যেটা শ্রেষ্ঠ সেটা তিনি, এই ভাবটাই আমরা পরে গীতার বিভূতি যোগে পাচ্ছি। বিভূতি যোগে শ্রীকৃষ্ণ যেটা বলছেন ঠিক এই একই ভাব আমরা ঋক বেদ আর সাম বেদে পাচ্ছি, যা কিছু শ্রেষ্ঠ সেটাই তিনি।

আমরা জানি যে বেদে শূদ্রের কোন অধিকার ছিল না, এমনকি বৈশ্য আর ক্ষত্রিয়দেরও বেদ অধ্যয়ণের অধিকার ছিল না। ব্রাহ্মণরাই শুধু বেদ পড়তে পারতেন, কিন্তু তাও কয়েকজন মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণরাই

বেদ পড়তেন। কিন্তু এই যে ভাবটা, যা কিছু শ্রেষ্ঠতম সেটা ভগবান, এখন এই ভাবটাকে সাধারণ মানুষ কিভাব পাবে? তাই ব্যাসদেব তাঁর সৃজনী শক্তি আর লেখনী শক্তির সমণ্বয়ে তৈরী করলেন গীতা শাস্ত্র, গীতার দশম অধ্যায় শুধু এই ভাবটাকেই বর্ণনা করে গেছেন। সেখানে একটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন – *ঋতুনাং কুসুমাকরঃ* – ঋতুর মধ্যে আমি বসন্তকাল, এখন বসন্তকাল চলছে, কোকিলও ডাকছে, কিন্তু গরমের আমাদের সবার প্রাণ ওষ্ঠাগত, এই ঋতুই নাকি ভগবান। এই তো আমাদের প্রকৃতির অবস্থা, প্রকৃতিকে আমরা যেভাবে যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করে চলেছি প্রকৃতিও তার বদলা নিয়ে চলেছে। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন – যে মেয়ে উপপতি করে সে যখন দেখে তার উপপতি বেগড়বাই করছে, তাকে অবহেলা করছে, তখন সে রাস্থায় নেমে তার গলায় গামছা দিয়ে টেনে বলে তোর জন্য আমি সব ছেড়েছি তুই আমাকে ছেড়ে যাবি! প্রকৃতিও আমাদের গলা ধরে টানছে।

যমরাজকে নিয়ে একটা মজার গল্প শোনা যাক। একটি লোক আত্মহত্যা করেছে, তাকে যমরাজার কাছে হাজির করা হয়েছে। আত্মহত্যা মহাপাপ, তার শাস্তি দীর্ঘ দিন নরক বাস। যমরাজ শুনেই তাকে নরকে পাঠাবার আদেশ দিয়েছেন। যমরাজার আদেশ শুনেই লোকটি বলছে ‘হে যমরাজ, আপনি আমাকে নরকে পাঠান আমার তাতে কোন আপত্তি নেই, অবশ্যই আপনি আমাকে নরকে পাঠান। কিন্তু হে যমরাজ, তার আগে আপনি একবার মর্তলোকে যান, গিয়ে সেখানে একটা বিয়ে করুন, তারপর আপনাকে যদি আত্মহত্যা না করতে হয় তাহলে আমাকে ডবল নরকে পাঠিয়ে দেবেন। আর যদি আপনি আত্মহত্যা করে নেন তাহলে কিন্তু আমাকে নরকে পাঠাতে পারবেন না। তা যমরাজ মর্তলোকে এসেছেন, এসেছেন কিন্তু পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে যে ধরণের কাজকর্ম করতে হয় উনি তো জানেন না, শুধু মারতে জানেন আর শাস্তি দিতেই জানেন। যমরাজ কোন রকমে একটা বৈদ্যের কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। উনিতো জানেন কাকে মারতে হবে আর কাকে মারতে হবে না। ইতিমধ্যে একটি বিয়েও করেছেন। বিয়ে করার কিছু দিন পরে তাঁর বউ তাঁকে খুব গালাগাল আর অত্যাচার করতে শুরু করেছে। কয়েক বছর বাদে একটা ছেলেও হয়েছে। এদিকে ছেলে বড় হয়েছে, তার পড়াশোনার খরচা, খাওয়া দাওয়ার খরচা সবই বেড়ে গেছে। অত পয়সা পাবে কোথায়? করে তো সামান্য বৈদ্যির কাজ, তাও তেমন পসার নেই। বউএর অত্যাচার গালাগালি দিন দিন বেড়েই চলেছে। শেষে যমরাজ আর সহ্য করতে না পেরে মনের জ্বালায় আত্মহত্যা করে বসেছেন। যমরাজ মরে তাঁর জায়গায় এসে সেই লোকটিকে বলছেন ‘হ্যাঁ বাবা, তুমি ঠিকই বলেছ, তোমাকে আর আমি নরকে পাঠাব না। এদিকে যমরাজ যে ছেলেকে জন্ম দিয়ে রেখে এসেছে তার কি হবে? বউতো দিনরাত ছেলেকে গালাগাল দিয়ে বলছে তোর বাপ একটা অপদার্থ, নিজে একটা অকর্মার ঢেঁকি, কিছু রোজগারপাতি করতে পারল না, আর অপগণ্ড তোকে রেখে নিজে আত্মহত্যা করে বসল, ভাবল না এই ছেলেকে নিয়ে আমার দিন কিভাবে চলবে।

একদিন ছেলেটি স্বপ্নে তার বাবা যমরাজকে দেখছে। স্বপ্নে ছেলেকে যমরাজ বলছেন ‘দ্যাখো আমি হচ্ছি যমরাজ, তোমার বাবা, তোমার মায়ের জ্বালায় আমাকে আত্মহত্যার পথে যেতে হয়েছে। তোমাকে আমি উপদেশ দিচ্ছি, তুমি বৈদ্যের কাজ শুরু কর। চিকিৎসা করতে গিয়ে যদি রোগীর শিয়রে আমাকে দেখ তাহলে তুমি তাকে আর ওষুধ দিতে যেওনা। কিন্তু যেখানে দেখবে আমি নেই, তুমি তাকে যে ওষুধই দেবে তাতেই সে সাথে সাথে সুস্থ হয়ে উঠে পড়বে’। বাবা যমরাজের কথা মত ছেলেতো বদ্যিগিরি করতে শুরু করেছে, আর তাতেই তার খুব নামডাক হতে শুরু হয়ে গেছে। এদিকে তার পসারও খুব বেড়ে গেছে আর প্রচুর পয়সাও আসছে।

সেই দেশের রাজার একমাত্র মেয়ের খুব মারাত্মক এক অসুখ করেছে। অনেক বড় বড় বৈদ্যর চিকিৎসাতেও ভালো হচ্ছে না। খুব নাম যশ হওয়াতে যমরাজার ছেলের রাজবাড়িতে ডাক পড়েছে। সে গিয়ে দেখছে রাজকন্যার শিয়রে তার বাপ যমরাজ দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে রাজা ঘোষণা করেছে – যে আমার মেয়েকে ভালো করে দেবে তার সাথেই আমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেব, অর্দ্ধেক রাজ্যও দেওয়া

হবে। ছেলে অনেক করে বাবা যমরাজকে ধরেছে 'বাবা, আপনি একে ছেড়ে দিন, একে ভালো করে দিলে আমার জীবনের আমূল পরিবর্তন হয়ে যাব'। বাবা বলছেন 'না, তুমি এর চিকিৎসা করতে যেওনা, এর সময় হয়ে গেছে'। যমরাজ কিছুতেই ছাড়বেন না। ছেলেও খুব করে বাবাকে অনুরোধ করে যাচ্ছে। বাবাও বারবার বলে যাচ্ছেন 'এর সময় হয়ে গেছে'। তখন ছেলে মনে মনে বলছে ঠিক আছে তোমাকে মজা দেখাচ্ছি, বলে বাইরে গিয়ে চেঁচাতে শুরু করেছে 'মা, তুমি অনেক দিন ধরে বাবাকে খুঁজছিলে, বাবা এখানে দাঁড়িয়ে আছে'। ছেলের গলার আওয়াজ যাও শোনা যমরাজও প্রাণপনে ছুটে পালিয়েছে। মায়ের নামে যেই শোনা আর যমরাজ থাকে ওখানে! গ্রীষ্মের গরম বাড়ির গিন্নীর মত। মানুষ দুটো গরমকে ভয় পায় একটা এই গ্রীষ্মের দাবদাহ আর ঘরের দাবদাহ। এই গরমের জন্যই ভারতের মানুষ মুক্তিকে কামনা করে।

আরেকটি মন্ত্রে সেই দিব্য শক্তিকে Dancer এর সাথে তুলনা করে স্তুতি করা হচ্ছে। সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যা চলছে এইটাকেই পরে আমরা ঈশ্বরের লীলাখেলা রূপে ভক্তিশাস্ত্রে উল্লেখ পাই, কিন্তু বেদেই এই ধারণা চলে এসেছে, এখানে ঈশ্বরের লীলাখেলাকেই একজন নর্তকীর নৃত্যরূপে দেখা হচ্ছে, যাকে ভাগবত পুরানে শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য বলছে।

নর্তকীর সাথে সাথে ভগবানকে ভয়ঙ্কর রূপেও বেদে কল্পনা করা হচ্ছে, যাঁকে দেখে সবাই ভয় পাচ্ছে। ভয়ঙ্কর রূপের মধ্যেও ভগবানকেই আবার রক্ষাকর্তা রূপে বলা হচ্ছে। এইসবের বাইরেও বেদে ঈশ্বরকে এক বিচিত্র রূপে ধারণা করা হচ্ছে – ***ত্রীণি পদা বি চক্রমে বিষ্ণুর্ গোপা অদাভ্যঃ। অতো ধর্মাণি ধারয়ন্।।*** (ঋ-১/২২-১৮)। ভগবান বিষ্ণু তিন পাদ দিয়ে যখন পুরো বিশ্বকে আচ্ছাদিত করে দিয়েছিলেন তার বর্ণনা করা হচ্ছে, কিন্তু পরের দিকে বামন অবতারে যেভাবে বিরাট কাহিনী আকারে বর্ণনা করা হয়েছে, এখানে কিন্তু অত বিরাট করে বর্ণনা করা হচ্ছে না। এখানে বলছেন *অতো ধর্মাণি ধারয়ন্* - এখানে যে বিষ্ণুর কথা বলা হচ্ছে ইনি কিন্তু ভগবান নন, ইনি একজন দেবতা, বলছেন ইনি যখন তিনটে পাদ বিস্তার করেছেন তখন তিনি ধর্মকে ধারণ করেছেন। এখানে যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে ভগবানের একটা বড় কাজ হচ্ছে ধর্মকে ধারণ করা, আর তিনি যা কিছু করেন তা ধর্ম অনুসারেই করেন। হিন্দু ধর্মে যখন ভক্তির খুব প্রচলন হতে শুরু করে তখন ঈশ্বরকে নিয়ে নানান ধরণের তত্ত্ব আসতে থাকল, যেমন ভগবান যাকে ইচ্ছে করবেন তাকে মুক্তি দেন, তাঁর ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে ইত্যাদি। কিন্তু বেদেই এই ভাবগুলি আগে থেকেই সুপ্তাকারে ছিল, যেমন এখানে বলা হচ্ছে তিনি ধর্মকে ধারণ করে আছেন, তিনি ধর্মকে কখন ভাঙ্গবেন না। তিনি যদি ধর্মকে উল্লঙ্ঘন করেন তাহলে সব কিছুই ভেঙ্গে যাবে। এইটাই ভক্তিশাস্ত্রে এসে পাল্টে যাচ্ছে, সেখানে বলা হয় ভক্তের উপর কৃপা করে তিনি অনেক কিছুই করতে পারেন। কিন্তু বেদ এই কথা বলছে না, বেদে ঈশ্বর হচ্ছেন ধর্ম ও ঋতমের ধারক, ঋতম্ হচ্ছে মহাজাগতিক নিয়ম, এই মহাজাগতিক নিয়মগুলির মাধ্যমেই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলছে, ঈশ্বর কখন এর মধ্যে হস্তক্ষেপ করেন না। তিনি সব কিছুই করবেন কিন্তু যাই করবেন এই ঋতম ধর্মের অনুসারেই করবেন। এই ঋতম ধর্মের অনুসারে চলার এই ধারণাটাকে বৌদ্ধ ধর্ম পুরোপুরি গ্রহণ করেছে। বৌদ্ধ ধর্ম যে ধর্মচক্রের কথা বলছে এটা বেদের এই ঋতম ধর্ম থেকেই এসেছে।

ঈশ্বরকে আবার The Forgiver of Sins বলে বেদে উল্লেখ করা হচ্ছে, ঋক বেদের এই মন্ত্রটিতে ইন্দ্রের প্রতি প্রার্থনা করে বলা হচ্ছে – ***মা ন একস্মিন্নাগসি মা দ্বয়োর্ উত ত্রিষু। বধীর্ মা শুর ভূরিষু।।*** (ঋ-৮/৪৫-৩৪)। হে প্রভু, আমি জীবনে অনেক ভুল কাজ করেছি, অনেক পাপ কাজ করেছি, এই দুষ্কর্মের জন্য তুমি আমাকে শেষ করে আমার সর্বনাশ করে দিওনা, আমি তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থি।

বেদ এত বিশাল আর গভীর যে সারা জীবন ধরে পড়ে গেলেও এক জন্মে বেদকে কেউ শেষ করতে পারবে বলে মনে হয় না। কিন্তু বেদের একটু ঝলক যাতে আমরা নিতে পারি তাই সামান্য কয়েকটি

মন্ত্রকে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। বেদ ধর্মকে কিভাবে দেখছে? এই মন্ত্রটি তাই বলছে বেদ ধর্ম বলতে কি বোঝাচ্ছে – ***সত্যং বৃহদ্ ঋতম্ উগ্রং দীক্ষা তপো ব্রহ্ম যজ্ঞঃ পৃথিবীং ধারয়ন্তি। সা নো ভূতস্য ভব্যস্য পত্ন্যরং (পত্নি উরুং) লোকং।।*** (অথ-১১/১-১)। সত্য, ঋতম্, দীক্ষা, তেজ, তপস্যা, যজ্ঞ এই জিনিষগুলি পৃথিবীকে ধারণ করে আছে, এইটাই ধর্ম। এই পৃথিবী যেন এই ধর্মের মাধ্যমে তাঁর বুকে আমাদের বসবাসের উপযোগী বাসস্থান তৈরী করে রাখেন।

এর পরে আমরা পাচ্ছি বিবাহের সময় প্রার্থনার মন্ত্র – ***গৃণামি তে সৌভাগত্বয় হস্তং, ময়া পত্যা জরদষ্টির্ যথাসঃ। ভগো অর্যমা সবিতা পুরংধির্, মহ্যং ত্বাদুর্ গার্হপত্যায় দেবাঃ।।*** (ঋ-১০/৮৫-৩৬)। বিয়ে হচ্ছে, স্বামী নববধুর হাত ধরে বলছে – আমি তোমার হাত ধরলাম যাতে আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত আর সমৃদ্ধ নিয়ে আসে, আর আমার শেষ দিন পর্যন্ত যেন তুমি আমার সাথে থাক। *ভগো অর্যমা সবিতা পুরংধির্, মহ্যং ত্বাদুর্ গার্হপত্যায় দেবাঃ* – ভগো মানে দেবতার নাম আবার আলোও হয়, ভগো, অর্যমা, সবিতা ইত্যাদি দেবতারা তোমাকে কন্যারূপে আমাকে দিয়েছেন যাতে আমি তোমাকে আমার গৃহের অধিশ্বরী করে রাখতে পারি। বেদের আরেকটি ভাব এখানে পাচ্ছি – যে কন্যাকে বিবাহ করা হচ্ছে সেই কন্যা হচ্ছে দেবতা প্রদত্ত। কন্যা শুধু বাপ-মার কন্যাই নয়, কন্যা হচ্ছে দেবতার জিনিষ সেটাকে দেওয়া হচ্ছে, সেইজন্য বলা হয় কন্যাদান। পুরুষকে দান করা হচ্ছে, পুরুষ তাই হাত ধরে বলে – আমৃত্যু তুমি আমার কাছে থেকে আমাকে সৌভাগ্য প্রদান করতে থাক, সেইজন্য মেয়েকে বিয়ের আগে বলে কুমারী, পরে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর বলা হয় সৌভাগ্যবতী। বয়ঃজেষ্ঠরা আশীর্বাদ করে বলে সৌভাগ্যবতী হও। হিন্দুধর্মের পরম্পরাতে মেয়েকে মা লক্ষ্মীর সঙ্গে তুলনা করা হয়। নারী যদি সৌভাগ্যবতী হয়ে যায় সেই নারী যার সঙ্গে থাকবে তার ভাগ্য স্বাভাবিক ভাবে খুলে যায়।

ঠিক এই রকম বিয়ের সময় কন্যাকে আশীর্বাদ করে বলা হচ্ছে – ***সম্রাজ্ঞী শ্বশুড়ে ভব, সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব। ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব, সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু।।*** (ঋ-১০/৮৫-৪৬)। তুমি তোমার শ্বশুড়ের কাছে সম্রাজ্ঞী হয়ে থাক, তুমি তোমার শাশুড়ির কাছে সম্রাজ্ঞী হয়ে থাক, তোমার ননদদের কাছে সম্রাজ্ঞী হয়ে থাক আর তোমার দেবরদের কাছে সম্রাজ্ঞী হয়ে থাক। ঋকবেদে কন্যাকে আশীর্বাদ করা হচ্ছে। এই যে প্রার্থনা করা হচ্ছে, যার বিয়ে হয়েছে, তার একটা সুদূর প্রসারী দিব্য ফল আছে। মামুলি কেউ যদি বলে দেয় – যাও, তুমি রানী হয়ে থাক, সে কিন্তু রানী হয়ে থাকবে না, কিন্তু এই বেদ মন্ত্র দিয়ে যখন কন্যাকে আশীর্বাদ করা হবে তখন তার একটা দিব্য প্রভাব পড়বে।

হিন্দু ধর্মে পরের দিকে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বেদে আমরা বিধবা বিবাহের প্রচলনের উল্লেখ পাই। ঋকবেদের একটি মন্ত্রে (ঋ-১০/১৮/৮-৯) বিধবা বিবাহকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এখানে একটি মেয়ে বিধবা হয়ে গেছে, কিভাবে হয়েছে বোঝা যায় না। কিন্তু যে স্বামী মারা গেছে তার ধনুকটা পাশেই রাখা আছে। তখন আরেকজন এসে মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিচ্ছে – ***উদীর্ষ্ব নার্যমি জীবলোকং, গতাসুম্ এতম্ উপ শোষ এহি। হস্তগ্রাভস্য দিবিষো স তবেদং, পত্যুর্ জনিত্বম্ অভি সং বভূথ।। ধনুর্ হস্তাদ্ আদদানো মৃতস্য-, হস্মে ক্ষত্রায় বর্চসে বলায়। অত্রৈব ত্বম্ ইহ বয়ং সুবীরা, বিশ্বাঃ স্পৃধো অভিমাতীর্ জয়েম্।।*** তুমি ওঠো, উঠে দাঁড়াও, তোমার অনাগত জীবনের দিকে তাকাও, তুমি এমন একজনের পাশে পড়ে আছ যার জীবনদীপ নিবে গেছে। তোমার যে স্বামী ছিল তার ধনুষটা আমি তুলে নিয়েছি, যাতে ওর যত শক্তি, বীর্য আমার মধ্যে চলে আসে, সেই শক্তি বীর্য দিয়ে আমি যেন তোমাকে খুশি রাখতে পারি। তুমি এসে আমার পাশে দাঁড়াও আর আমি যেন সবাইকে জয় করে নিতে পারি। মূল কথা হচ্ছে, একটি মেয়ে স্বামীর মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে, সেই শোক তাপ থেকে তার মনকে উজ্জীবিত করে নতুন জীবনের দিকে হাতছানি দিয় উৎসাহিত করা হচ্ছে।

বেদ এই ধরণের বহু মন্ত্র আছে, যা এক জীবনে অধ্যয়ন করলেও শেষ হবে না। আমরা গুটি কয়েক মন্ত্রকে বেছে নিয়ে আলোচনা করে বেদের কি ভাব, বেদ কি বলতে চাইছে তার একটা ঝলক শুধু পেলাম। এখানেই আমরা এত দিনের বেদের আলোচনা শেষ করলাম।

।। নাসদীয়সূক্তম্ ।।

আমরা এখন নাসদীয়সূক্তম্ সম্বন্ধে আলোচনা করব। নাসাদীয়সূক্তম্ আর পুরুষসূক্তম্‌কে যদি একবার ঠিক ঠিক ভাবে বুঝে নেওয়া যায় তাহলে ভারতের প্রাচীন দার্শনিকরা সৃষ্টির রহস্যকে কিভাব দেখতেন, সৃষ্টি তত্ত্বের আড়ালে কোন্ কোন্ দর্শনের কি কি ভূমিকা কাজ করছে, আর সেই দর্শনটাকে ভিত্তি করে পরবর্তি কালে আমাদের দেশে কিভাবে অন্যান্য দর্শনের জন্ম নিয়েছে, আমাদের ঋষিরা চিন্তার রাজ্যে কত উচ্চ স্তরে বিচরণ করতেন, এই জিনিষগুলি পরিষ্কার হয়ে যাবে। তবে আমাদের পক্ষে নাসাদীয়সূক্তম্ পুরোপুরি বুঝে নেওয়া খুবই কঠিণ হবে, তবে যতটা বোঝা যায় আর একটু ধারণা থাকলে হিন্দু ধর্মের মূল ব্যাপারটা পরে বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হবে না।

আদিম যুগ থেকে সৃষ্টির রহস্য সমস্ত চিন্তাবিদ মানুষকে আকৃষ্ট করে আসছে। আমি কোথা থেকে এলাম, আমার জন্ম কেন ও কিভাবে হল, এই জগৎ কোত্থেকে এসেছে, যখন থেকে মানুষের মধ্যে চিন্তা শক্তির উন্মেষ হয়েছে তখন থেকে এই ব্যাপার গুলো মানুষকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। যখন কেউ জ্ঞানের অনেক উচ্চস্তরে চলে যান সে দর্শনের ক্ষেত্রেই হোক বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই হোক সৃষ্টির ব্যাপারে তাকে ব্যাখ্যা করতেই হবে। কিছু দিন আগে আমেরিকার এক বিজ্ঞানী অনেক গবেষণা করে বললেন আমরা সবাই অন্য গ্রহ থেকে এসেছি। তিনি বলছেন পৃথিবীতে যেসব জড় পদার্থ রয়েছে তার থেকে কখনই প্রাণের উদ্ভব হতে পারেনা। পৃথিবীতে প্রাণীরা এসেছে অন্য কোন গ্রহ বা নক্ষত্র থেকে।

মূল কথা তুমি কে, আমি কে, আমরা কোথা থেকে এলাম, তুমি বিজ্ঞানী হও, তুমি দার্শনিক হও আর তুমি ধর্মের নেতা হও, এই প্রশ্নের উত্তর তোমাকে বলতে হবে। সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে আর সৃষ্টিটা কি এই প্রসঙ্গ ঠাকুর অবশ্য কখনই তোলেননি। স্বামীজী যখন লণ্ডনে ছিলেন তখন তাঁর খুব ইচ্ছে হয়েছিল, বেদ থেকে শুরু করে পুরানাদিতে সৃষ্টি নিয়ে যত ধরণের আলোচনা হয়েছে, সৃষ্টির ব্যাপারে যত রহস্য আছে সবটাকে মিলিয়ে একটা সাধারণ মতের উপরে দাঁড় করাবেন। সাধারণ ভাবে আমরা চোখের সামনে যে সৃষ্টি সমূহকে দেখছি সেই সৃষ্টি পরিষ্কার দুই রকমের হয়। শ্রীমা বলছেন – ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করেন তখন তিনি চিত্রকরের মত করেন না। শ্রীমায়ের কথাতে বোঝা যাচ্ছে যে ঈশ্বরের সৃষ্টি রচনা আর চিত্রকারের সৃষ্টি রচনার মধ্যে একটা প্রভেদ রয়েছে। যদি একটা ছোট্ট বটবৃক্ষের বীজ মাটিতে রোপণ করা হয় তাহলে আমরা জানব যে ঐ বীজ থেকে একটা বট গাছ বেড়োবে, কিন্তু বীজ থেকে বেড়িয়েই বট গাছ বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়ে যাবে না। আগে তার দুটো পাতা বেরোবে তারপর সেখান থেকে ধীরে ধীরে গাছটা ডালপালা ছড়িয়ে বড় হতে থাকবে, একটা দীর্ঘ সময় ধরে এই বেড়ে ওঠাটা চলতে থাকবে। আমরা নিশ্চিত ভাবে বলে দিতে পারি যে কোন বীজ থেকে এভাবেই একটা উদ্ভিদের সৃষ্টি হচ্ছে, আবার একটা বীজের মধ্যে সমগ্র বৃক্ষটা সুপ্ত হয়ে রয়েছে। এই বীজ মাটি থেকে রস পেয়ে অঙ্কুর বার করবে, তারপরে আলো বাতাস জল পেয়ে আস্তে আস্তে সে বড় হত থাকবে, তার ফল কবে হবে আদৌ হবে কিনা সেটা আমরা বলতে পারছি না, কিন্তু গাছটা এই ভাবেই বড় হতে থাকবে। শ্রীমা যেটা বলতে চাইছেন তা হল ভগবান যখন সৃষ্টি করেন তখন তিনি এইভাবেই করেন। কিন্তু চিত্রকর যখন কোন মানুষের ছবি আঁকেন তখন সে ইচ্ছে করলে আগে মাথাটা আঁকতে পারেন তারপর হয়তো শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আঁকলেন, এখন সে ইচ্ছে করলে আগে হাত পা এঁকে নিয়ে পরে মুণ্ডটা আঁকলেন। কিন্তু যখন বীজ থেকে গাছ হচ্ছে তখন গাছের ডালপালা বেরোবার আগেই ফুল বা ফল হবে না। চিত্রকর ইচ্ছে করলে গাছের ফুলটা আগেই এঁকে দিতে পারেন। চিত্রকরের অঙ্কন দেখে কেউ ধরতে পারবে না যে সে কোনটা আগে কোনটা পরে এঁকেছেন।

এই কারণে এই দুই ধরণের সৃষ্টির দুটো নাম দেওয়া হয়েছে – ডারউইনের যে বিবর্তনবাদ এসেছে এরই একটা নাম থেকে, এখানে একটা থেকে আরেকটা পর পর এগিয়ে চলে। একটা নির্দিষ্ট নিয়মে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি এগোবেই, কেউ এর এগোনকে আটকাতে চাইলেও আটকাতে পারবে না। দ্বিতীয় প্রকারের সৃষ্টি হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি। ভগবান ইচ্ছে করলেন মানুষ হোক, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সৃষ্টি হয়ে গেল, এইভাবে ঘোড়া হোক, ঘোড়া হয়ে গেল, হাতি হোক, হাতি হয়ে গেল। এই দুই ধরণের সৃষ্টির মধ্যে কোন মিল পাওয়া যাবে না। স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি হচ্ছে চিত্রকরের মত রচনা আর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি এগিয়ে চলে। শ্রীমা এইটাই বলছেন ভগবানের সৃষ্টি বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই হয়, পুরো জিনিষটাই অন্তর্নিহিত আছে সেটা আস্তে আস্তে খুলতে থাকে। খুলে কোথায় যাচ্ছে আমরা বলতে পারবো না, আর এ ব্যাপারে আমাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। কিন্তু যখন খ্রীশ্চান বা ইসলাম ধর্মে যাব সেখানে দেখতে পাব যে সেখানে সৃষ্টিটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হচ্ছে। ভগবান প্রথমে আদমকে মানুষ রূপে সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করে আদমকে বললেন এবার আমাকে ইভের সৃষ্টি করতে হবে, তোমার বুকের পাঁজরের হাড় থেকে ইভের সৃষ্টি হবে। নারীর সৃষ্টি কোথা থেকে এলো? খ্রীস্টানদের মতে পুরুষের বুকের পাঁজরের হাড় থেকে। তার মানে ভগবান যদি চাইতেন আমি আগে নারীর সৃষ্টি করব, স্বাভাবিক ভাবেই তিনি তা করতে পারতেন। কিন্তু বিবর্তনবাদে কখনই এই ভাবে সৃষ্টি হয় না।

এখন কোন্ পদ্ধতিটা ঠিক আর কোনটা ঠিক নয় এটা ঠিক করা আমাদের এই বুদ্ধি দিয়ে সম্ভব নয়। কিন্তু ভারতীয় পরম্পরাতে বিবর্তনবাদকে সৃষ্টির প্রক্রিয়া বলে মনে করে আসছে। শুধু তাই নয়, এর সাথে হিন্দুরা আরো বলেন, ভগবান কি রকম সৃষ্টি করেন – পূর্বমকল্পন্ অয়ম্, এর আগের আগের কল্পে সৃষ্টি যে রকমটি ছিল, এই কল্পেও ঠিক সে আগের মতই সৃষ্টি করেন। এর আগের আগে কল্পে গাঁদা গাছ যেভাবে বড় হয়েছিল, এই কল্পেও ঠিক সেইভাবেই গাঁদা গাছ বড় হবে। হিন্দুদের বেশির ভাগ শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থ স্বাভাবিক ভাবে বিবর্তনবাদকেই মেনে এসেছে, কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে ভারতে এই বিবর্তনবাদ বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। অন্য দিকে পাশ্চাত্য দর্শন এই বিবর্তনবাদকে জানতই না, কারণ তারা তাদের ধর্মীয় কারণে স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিতেই বিশ্বাস ছিল, তাই তারা বিবর্তনবাদকে নিতে পারল না।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ভগবান যখন কোন এক সময়ে সৃষ্টি করলেন তখন তাঁর নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য ছিল। এখন আমরা বুঝতে পারছি যে তাঁর কি উদ্দেশ্য জানতে পারা যায় না। কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছানর জন্য বিবর্তনের তত্ত্ব স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মানতে হবে। অথচ হিন্দুদের মতে একটা সময় বলতে হয় যে ভগবান বিশেষ কোন একটা সময়ে সৃষ্টি করেন না, তাঁর কোন উদ্দেশ্যই নেই এই সৃষ্টির ব্যাপারে।

নাসাদীয়সূক্তম্ স্বামীজীর খুব প্রিয় ছিল। কেন স্বামীজীর প্রিয় ছিল সেটা আমরা আলোচনা করতে করতে বুঝতে পারব।

যারা বেদ, পুরান, তন্ত্র, স্মৃতি বিভিন্ন শাস্ত্র ঠিক ঠিক ভাবে পড়েছেন তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় সৃষ্টি কিভাবে হল, তারা যদি সত্যিই নিজের মন থেকে উত্তর দিতে চান তাহলে তারাও সৃষ্টির ব্যাপারে হাত তুলে দেবেন। আমি জানিনা, এটাই হচ্ছে তার সঠিক উত্তর। এটা তার কিংবা আমাদের মনের কথা নয়, শাস্ত্রও বলতে চাইছে যে আমরা বলতে পারবো না সৃষ্টি কিভাবে হচ্ছে। যিনি অনন্ত তিনি সান্ত কি করে হচ্ছেন, যিনি অখণ্ড তিনিই আবার খণ্ড হচ্ছেন, এটা কি করে হয় আমরা কেউই জানিনা। যার জন্ম সবার প্রথমে হয়েছে তিনিই হচ্ছেন জেষ্ঠ্য, তিনি যাকে জন্ম দেন সে হয়ে যায় কনিষ্ঠ, তার থেকে যে জন্ম নিচ্ছে সে আরও কনিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে। ছেলে কখন বাবার জন্মের কথা বলতে পারবে না। বাবা ছেলের জন্ম দেখেছে তাই বাবা ছেলের জন্মের কথা বলতে পারে। তাই যে কোন ঋষি কি করে বলবেন সৃষ্টিটা কি করে হয়েছে। কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে সৃষ্টির রহস্যকে জানার যে প্রচণ্ড স্পৃহা সেটা চিরন্তন, আদিম কাল থেকে

মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে প্রশ্ন করে আসছে। সৃষ্টির এই অনুসন্ধিৎসুতার ক্ষুধাকে মেটাবার জন্য ঋষিরা সৃষ্টির ব্যাপারে কিছু উত্তর দেন। যখন তাঁরা উত্তর দেন তখন ওনারা দুটো দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে উত্তর দেন। একটা হচ্ছে যুক্তি বিচার দিয়ে উত্তর দেন আরেকটা উত্তর দেন পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে।

পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গিতে স্রষ্টা আর সৃষ্টির মাঝখানে বেশ কিছু উপাধি আরোপিত করা হয়। যেমন বলা হচ্ছে – ভগবান নারায়ণ ক্ষীরসাগরে শেষনাগের উপরে অনন্ত শয্যায় শুয়ে আছেন। শায়িত অবস্থায় তিনি চিন্তা করছেন, এক সময় তাঁর নাভি থেকে একটা পদ্ম প্রস্ফুটিত হল। সেই নাভি পদ্মের উপরে প্রথম জাত হলেন ব্রহ্মা। এই কাহিনীর মধ্যে যে শব্দগুলি বলা হয়েছে তার একেকটা শব্দের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। নারায়ণ মানে নরে যাঁর অয়ন, মানে যিনি জলে বাস করেন, এখানে জল হচ্ছে ক্ষীরসাগর। আবার নর হচ্ছে মানুষ, অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যাঁর বাস তিনিই নারায়ণ, এই দুটো অর্থই হয়। আবার তিনি সাপের উপরে শুয়ে আছেন, সাপের নাম হচ্ছে অশেষ নাগ। অশেষের অর্থ হচ্ছে অনন্ত, তিনি অনন্তের প্রভু। এগুলো সবই হচ্ছে উপাধি। শব্দ দিয়ে তাঁর একটা রূপ দেওয়া হচ্ছে, যখন এই রূপ দিয়ে দিল তখন সেই রূপের মাধ্যমে একটা আখ্যায়িকা তৈরী হয়ে গেল। সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করার এটাও একটা পথ। যখন গীতাতে ভগবান বলছেন *'সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোক্ষিশিরোমুখম্'* সব জায়গায় তাঁর মস্তক, সর্বত্র তাঁর চোখ, সব জায়গাতেই তাঁর হাত, পা ইত্যাদি, এটা হচ্ছে ব্যাখ্যা করার একটা পথ। যখন বলছেন তিনি সব জায়গাতেই আছেন আসলে বলতে চাইছেন তিনি একটা জায়গার মধ্যে আবদ্ধ নন। আমি যখন ঘরে নিজের চেয়ারে বসে থাকি তখন আমার সত্তা ঐটুকু ঘরের মধ্যেই শেষ। ভগবানও কি এই রকম শুধু বৈকুণ্ঠে বসে আছেন? অতি সাধারণ মনের অধিকারী মানুষ এই জিনিষটাকে বুঝতে চায়না যে ভগবান সর্বত্র বিরাজমান, তখন এই ধরণের মনকে কিছু একটা ধারণা করাবার জন্য বলা হল ভগবান তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য নিয়ে বৈকুণ্ঠে বসে আছেন, আর তাঁর ইচ্ছাতেই সমস্ত জগত চলেছে। আবার যাদের মন এর থেকে আরেকটু উঁচুতে উঠেছে তাদের জন্য বলা হবে ভগবানের হাত সর্বত্র, সর্বত্র তাঁর পা, সর্বব্যাপী তাঁর চোখ। এদের থেকেও যাদের মন আরো উন্নত তাদেরকে বলা হবে তিনি হচ্ছেন নির্গুণ নিরাকার। ঠাকুর উপমা দিয়ে বলছেন – প্রথমে মাকালীর সহস্র হাত দেখে, তারপরে দেখে দশটি হাত, তারপরে চারটে, পরে চারটে থেকে দুটো শেষে দেখে কিছুই নেই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল রঙের দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে জল নিয়ে দেখে জলের কোন রঙ নেই। যে মানুষের মন ঈশ্বর থেকে যত দূরে সেই মানুষের জন্য তত বেশি পৌরাণিক কাহিনীর উপস্থাপনা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ঈশ্বরের যত কাছে যাওয়া যাবে ততই নির্গুণ নিরাকারের দিকে মন চলে যাবে। এইভাবেই বিভিন্ন মানসিক স্বভাব ও প্রকৃতি অনুযায়ী ধর্মের তত্ত্বগুলিকে বিভিন্ন ভাবে শাস্ত্রে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

ভারতের তথা বিশ্বের প্রথম দর্শন হচ্ছে সাংখ্য দর্শন, সাংখ্য দর্শনকে তাই সব দর্শনের জনক বলা হয়। সাংখ্য থেকেই জন্ম নিল যোগদর্শন, তারপর এল ন্যায়, বৈশাষিক, কর্মকাণ্ড বা পূর্বমীমাংসা আর উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত। এই ছয়টি দর্শনের সব বীজ বেদে আগে থাকতেই আছে, বেদের বাইরে এরা নতুন কোন কিছু আবিষ্কার করেননি। সেই কোন মান্ধাতা আমল থেকে চলছে, তাই নতুন কেউ কিছু বলছে না। সাংখ্য সৃষ্টির যে তত্ত্বটাকে স্বীকার করে সেটি সব থেকে বেশি যুক্তিযুক্ত মনে হবে। পুরান যে সৃষ্টি তত্ত্বকে গ্রহণ করেছে সেটা পুরোটাই হচ্ছে পৌরাণিক। পরের দিকে বেদান্ত দুটো দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করল। বেদান্তের যাঁরা জ্ঞানমার্গী, বিশেষ করে শঙ্করাচার্য, স্বামীজী এনারা সাংখ্যের তত্ত্বটাকে গ্রহণ করেছেন। বেদান্তের আরেকটা মার্গ হচ্ছে ভক্তিমার্গী এনারা পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গীটাকেই বেশি প্রাধাণ্য দিয়ে সেটাকেই আঁকড়ে থাকলেন। সাংখ্যের তত্ত্বকে যে যুক্তিযুক্ত বলে মানা হয় তাতে কিন্তু মনে করা উচিৎ নয় যে এর একেবারে সবটাই যুক্তিযুক্ত, কেননা একটা জায়গাতে এসে বেশি চাপ দিলে সাংখ্য দর্শনের তত্ত্বেও ফাটল ধরে যাবে।

অন্য দিকে পদার্থ বিজ্ঞানীরা সৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে অনেক কথাই বলেন, কখন বলছেন বিগব্যাঙ, কখন বলছেন ব্ল্যাকহোল, কিন্তু তাঁরাও বলেন যে একটা জায়গায় গিয়ে তাঁদের এই সব থিয়োরিও কোন কাজ করেনা। সাংখ্য দর্শনেও এই একই জিনিষ হয়, একটা জায়গার পর আর প্রশ্ন করা যায় না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে গার্গি এই জিনিষটাই করতে গিয়েছিলেন। এই সৃষ্টির ব্যাপারে যাজ্ঞবল্ক্যকে গার্গি একের পর এক প্রশ্ন করে চলেছেন। একটা জায়গায় গিয়ে গার্গি যুক্তি দিয়ে প্রশ্ন করে তত্ত্বটাকে আরো টেনে নিয়ে যেতে চাইছিল, তখন যাজ্ঞবল্ক্য বললেন – গার্গি খুব সাবধাণ, না বুঝে যদি এই প্রশ্ন কর তাহলে তোমার মাথা ধর থেকে খসে যাবে। গার্গি সঙ্গে সঙ্গে থেমে গিয়েছিলেন। প্রশ্ন যখন করা হয় তখন একটা জায়গার পর আর প্রশ্ন করতে নেই। অবশ্য তারও আগে প্রশ্ন করার পাত্রতা থাকা চাই, আমি এই প্রশ্ন করার যোগ্য কিনা জেনে নেওয়া দরকার। কথামৃতে ঠাকুরকে এসে অনেকেই প্রশ্ন করছে ঠাকুর কাউকে উত্তর দিচ্ছেন আবার কাউকে পাশ কাটিয়ে দিচ্ছেন। একজন এসে বলছে ‘ঈশ্বর যদি থাকেন তাহলে কেউ এসে দেখিয়ে দিক’, ঠাকুর বলছেন ‘তার ভারি বয়ে গেছে তোমাকে দেখাতে’। এদের প্রশ্ন করার পাত্রতাই হয়নি, প্রশ্নের উত্তর যদি দেওয়াও হয় তাহলেও কিছু বুঝবে না, উল্টো বুঝে আরেক বিপত্তি হবে। যাদের সাধনা করে মনের শুদ্ধতা এখনও অর্জিত হয়নি তাদেরকে এসব কথা বলা হলেও কিছুই বুঝবে না।

যুক্তি বিচারের দ্বারা সৃষ্টির যে কথা বলা হচ্ছে আর পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে যে সৃষ্টির কথা বলা হয় এই দুটো দৃষ্টিভঙ্গীই কিন্তু প্রথম থেকেই বেদে বলা হয়ে গেছে। সৃষ্টির ব্যাপারে যে পৌরাণিক দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে বেদে সেটা পুরুষসূক্তমে পাচ্ছি। পুরুষসূক্তম্ পুরোটাই পৌরানিক ভাবে বর্ণিত হয়েছে। যিনি পুরুষ, পুরুষ মানে সেই ভগবান, সেই পুরুষকে গিয়ে দেবতারা বললেন আপনাকে সৃষ্টি করতে হবে। সেই পুরুষকেই দেবতারা যজ্ঞের পশু বানাল। সেই পশুকে যখন যজ্ঞে বলি দিচ্ছে তখন সেই যজ্ঞ থেকে পুরুষের একেকটি অঙ্গ থেকে বিভিন্ন সৃষ্টি হতে থাকল। এইটাই হচ্ছে পুরানের দৃষ্টিভঙ্গী। আবার যুক্তি বিচারের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে নাসদীয়সূক্তে। তাই নাসাদীয়সূক্তম্ আর পুরুষসূক্তে যে সৃষ্টিতত্ত্ব বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ রূপে আলাদা। নাসাদীয়সূক্তম্ হচ্ছে দার্শনিক তত্ত্বের আধারে আর পুরুষসূক্তম্ পৌরাণিক আধারে। পুরুষসূক্তমের সবটাই কবিতার আকারে বর্ণনা, যার মধ্যে সত্যের উপাদান অনেক কম পাওয়া যায়। একটা দুটো বাস্তব সত্যের উপাদান নিয়ে বাকিটা কাব্যিক ঢঙে সাজান হয়েছে। এখন যদি আমরা সত্যি সত্যি ধরে নিই যে ভগবানকে ধরে নিয়ে এসে বলি দিয়ে যজ্ঞে তাঁকে আহুতি দিচ্ছে তাহলে কিন্তু এর তাৎপর্য আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে। পুরুষসূক্তমের তাৎপর্য হচ্ছে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে সব ঈশ্বরের থেকেই বেরিয়েছে, ঈশ্বরের বাইরে কিছু নেই। এই তত্ত্বটাকে বলার জন্য এত বড় একটা রূপকাকারে ছবি আঁকা হয়েছে। কেন এটা করেছেন? আমাদের মত মুর্খদের জন্য। হাজার খানেক স্বর্গ আর লাখ খানেক নরক যদি না থাকে, ভয় যদি আমার নাইই থাকে তাহলে আমরা কিসের জন্য ধর্ম পালন করব। ঋষিরা দেখলেন এদের তো আধ্যাত্মিক তত্ত্ব দিলে নিতে পারবে না, আর পাপের ভয় যদি না থাকে তাহলে কেউ আর ভালো কাজের দিকে এগোবেই না। তাই আমাদের মত মূর্খদের জন্য ঋষিরা বিভিন্ন কাহিনীর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে সামনে নিয়ে এলেন। কিন্তু তাই বলে কি ধর্মটা মুর্খদের জন্যই করা হয়েছে, কখনই তা নয়, প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তিমূলক ধর্মের ব্যবস্থা এই জন্যই করা হয়েছে। ধর্ম যারা গৃহস্থ তাদের জন্যও আবার যিনি সন্ন্যাসী তাদের জন্যও, যারা স্থুল বুদ্ধি সম্পন্ন আবার যারা সূক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন উভয়ের জন্যই ধর্ম।

যারা সূক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন তাদের জন্য নাসাদীয়সূক্তম্ এবং স্থুল বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য পুরুষসূক্তম্। এইজন্য দেখা যায় সারা দেশে কেউই নাসাদীয়সূক্তম্ আবৃত্তি করে না, কিন্তু পুরুষসূক্তম্ সবাই পাঠ করছে। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের যখন শরীর চলে যায় তখন তাঁর দেহকে যখন স্নান করান হয় তখন পুরুষসূক্তম্ থেকে পাঠ করা হয়। নাসাদীয়সূক্তম্ বেশির ভাগ মানুষই বুঝতে পারেন না, কারণ এর মন্ত্র গুলি অত্যন্ত উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বে সমৃদ্ধ। এর অর্থগুলি এত জটিল আর এত অর্থ হতে পারে যার ফলে যত

পণ্ডিত এর অনুবাদ করেছেন কারুর সঙ্গে কারুরটা মেলে না। স্বামীজীও নাসদীয়সূক্তমের অনুবাদ করেছেন। নাসদীয়সূক্তমের মধ্যে এত গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব রয়েছে, তার ফলে যে কোন পণ্ডিত ইচ্ছে করলে শব্দের অর্থটা একটু এদিক ওদিক করে দিয়ে যে কোন একটা অন্য দর্শনকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন। শব্দের অর্থটা নিজের ইচ্ছে মত পাল্টানোর কথা বলা হচ্ছে না, সংস্কৃতের একটা অর্থের পাঁচ রকম অর্থ হতে পারে, এখন এই পাঁচটা অর্থকে পাঁচ ভাবে নিলে পাঁচটা আলাদা আলাদা দর্শন দাঁড়িয়ে যাবে।

স্বামীজী নিজেও সায়ানাচার্য শব্দগুলির যে অর্থ করেছেন তার থেকে সরে এসে অন্য অর্থ করেছেন। কেননা স্বামীজী মনে করেছেন নাসদীয়সূক্তমের ঠিক ঠিক ব্যখ্যা দিতে গেলে এই শব্দের এই অর্থটাকেই নিতে হবে, সৃষ্টির ব্যাখ্যা করতে হলে এই অর্থকেই গ্রহণ করতে হবে। যার জন্য স্বামীজী ইংরাজী অনুবাদ করার সময় নিজের মত অর্থ করেছেন। স্বামীজী তাঁর নিজস্ব যে ভাব নিয়ে ইংরাজী অনুবাদ করেছেন, এটাকেই যখন বাংলাতে অনুবাদ করা হয়েছে তখন তাঁর সেই ভাবটা সেখানে না থাকাতে পুরো অনুবাদটাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে গেছে। যেমন গীতাতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অনাসক্ত ভাবে কর্মের কথা বলেছেন, এখন এই অনাসক্তের ইংরাজী অনুবাদ হচ্ছে detached or unattached কিন্তু স্বামীজী এর অনুবাদ করলেন unselfish, unselfishness work, কিন্তু অনাসক্তের সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই। অথচ যখন গভীর ভাবে এর গূঢ়ার্থকে ভাবা হয় তখন দেখা যায় যে স্বামীজীর অনুবাদটাই সব দিক থেকে উপযুক্ত হয়েছে। আবার যখন এই unselfishness work কে বাংলায় অনুবাদ করে দিল তখন করল নিঃস্বার্থ কর্ম। এরপর যখন গীতা অধ্যয়ন করব তখন এইটাই পড়ব অনাসক্ত হও আর এইটারই স্বামীজীর অনুবাদ যখন পড়ব তখন পড়ব নিঃস্বার্থ হও। কিন্তু অনাসক্ত আর নিঃস্বার্থের মধ্যে কোন মিল নেই। কারণ স্বামীজী শুধু অনুবাদই করেননি তার সাথে সাথে তিনি এর একটা ব্যাখ্যা দিয়ে দিচ্ছেন। মানুষ অনাসক্তের কি বুঝতে পারবে, আমি অনাসক্ত হয়ে কিভাবে রান্না করব? তাই বলছেন তুমি নিঃস্বার্থ হয়ে রান্না কর। রান্না যখন করছ তখন তোমার জন্য যখন করছ তখন আরও দুজনের জন্য কর। মা যখন রান্না করে তখন তার নিজের জন্যই শুধু করে না, সবার জন্যই করে – এইটাই হচ্ছে প্রকৃত অনাসক্ত। প্রত্যেক মায়েরাই এইভাবে রান্না করেন, অনাসক্ত হয়ে করছেন, এইজন্য যে কোন সমাজে মায়েদের স্থান এত উর্দ্ধে দেওয়া হয়। অনাসক্ত হওয়া এই নয় যে কোন দিকে নজর দেবনা, কারুর খোঁজ খবর নেব না, সেইজন্য মানুষকে বলা হচ্ছে তুমি নিঃস্বার্থপর হও।

কিন্তু আজকের দিনে বেশির ভাগ মানুষ পুরোপুরি স্বার্থকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। পরিবার সৃষ্টি হয়েছিল সবাই পরস্পর মিলে মিশে সবার সুখ দুঃখের ভাগী হয়ে থাকার জন্য। পরিবার জীবনের মধ্যেই গড়ে ওঠে নিঃস্বার্থপরতা। কিন্তু এই নিঃস্বার্থপরতার ভাব থেকে মানুষ অনেক দূরে সরে এসে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ার জন্য পরিবারগুলি ছোট ছোট হয়ে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রে পরিণত হয়ে একটা অন্ধকারময় আত্মসর্বস্ব জীবনকে বেছে নিচ্ছে। আজকের দিনে গীতা তাই এত প্রাসঙ্গিক, কেননা এই স্বার্থপরতার অন্ধকারময় জীবন থেকে বাঁচার জন্যই প্রথমে তোমাকে নিঃস্বার্থ হতে হবে। এইটাই স্বামীজী তাঁর অনুবাদে বলতে চেয়েছেন। অনাসক্ত কর্মের কথা গীতাতে যা বলা হয়েছে আজকের দিনের পরিপ্রেক্ষিতে সেটাই বলা হচ্ছে যে তোমাকে কর্ম করতেই হবে, কর্ম ছাড়া এই দুনিয়াতে কেউ বাঁচতে পারবে না, তাই আগে তুমি নিজের স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ কর, তারপর যে কাজই করবে সেটা অপরের জন্য কর, তাতে তুমিও বাঁচবে অপরকেও বাঁচার সুযোগ করে দিতে পারবে। আর তা নাহলে দলাদলি, হানাহানি, ভাইয়ে ভাইয়ে খুনোখুনি চলতেই থাকবে। অনাসক্তের যে অনুবাদ স্বামীজী নিঃস্বার্থ করেছেন এটাই হচ্ছে উপযুক্ত অনুবাদ কিন্তু যে মুহূর্তে অনাসক্তের অর্থ নিঃস্বার্থ করে দেবে তখনই মনে হবে এই অনুবাদটা ঠিক হচ্ছে না। যেখানেই শাস্ত্রের কিছু শব্দকে স্বামীজী ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন তারপরে সেটাকেই যখন আবার বাংলাতে অনুবাদ করা হয়েছে তখন তার অর্থটা পুরো পাল্টে গেছে।

নাসদীয়সূক্তমের প্রথম মন্ত্র হচ্ছে - ***নাসদাসীন্ নো সদাসীৎ তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ। কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্।। (১)*** এর প্রথম শব্দ হচ্ছে 'নাসদ্', বেদের সূক্তে যেটা প্রথম শব্দ থাকে সেই শব্দটাকে দিয়েই সূক্তের নামকরণ করে দেওয়া হয়, ন অসদ্ দিয়ে শুরু হচ্ছে বলে এই সূক্তের নাম করা হল নাসাদীয়সূক্তম্। এখানে দুটি শব্দ আছে অসৎ আর সৎ, তখন অসৎও ছিল না সৎও ছিল না। কখনকার কথা বলা হচ্ছে? 'তদানীং' মানে তখন, সেই সময়।

অসৎ আর সৎ এই দুটো শব্দ হিন্দু ধর্মের যত শাস্ত্র আছে বিশেষ করে বেদ, উপনিষদ, গীতা, পুরানে বারে বারে আসবে। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে একটা শ্লোক আছে(১৩) যেখানে এই সৎ ও অসৎ শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে – *অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে*। এই দুটো শব্দ অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এমনকি দ্ব্যর্থবোধাত্মক অর্থেও ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থের বিভিন্নতার কারণেই বিভিন্ন দর্শনের জন্ম হয়েছে। সাধারণ ভাবে আমরা সৎ এর অর্থ করি যেটা আছে। কিন্তু একটা জিনিষ আছে কিসের ভিত্তিতে বলছি যে এটা আছে। আমরা যে বলছি – আমি আছি, আপনি আছেন, সে আছে, এই বাড়িটা আছে, গাছ আছে। এই যে আছে, তার প্রমাণ কি। একটা জিনিষ আছে কি নেই বিশ্বের যে কোন দর্শনের, আজকে যে দর্শন আছে, আগেকার যে দর্শন, সবার কাছেই এইটা একটা বিরাট সমস্যা। এটাকে বলে epistemology বা Theory of knowledge। আগে তোমাকে বলতে হবে যে জিনিষটাকে তুমি জানো বলছ, সেটাকে জানার উপায়টা কি। শুনলে মনে হবে কি সব অদ্ভূত কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু এই ব্যাপার গুলো যতক্ষণ না বোঝা যাচ্ছে ততক্ষণ শাস্ত্রের অর্থ বোঝাই যাবে না। এইগুলিকে অবহেলা করে করে আজ হিন্দুরা নিজেদের ধর্মকেই ভুলে গেছে। মুসলমানরা তাদের ধর্মকে খুব ভালো করে জানে, কেননা ইসলাম ধর্ম খুব পরিষ্কার আর সহজ – আল্লা আছেন, তিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, আমাদের কাজের সুযোগ দিয়েছেন, ভালো কাজ করলে স্বর্গে, খারাপ কাজ করলে নরকে যেতে হবে। কিন্তু হিন্দুদের কাছে তাদের হিন্দু ধর্মের কিছুই পরিষ্কার নয়।

আজকের দিনে যে কোন ধর্মকে ঠিক ঠিক বুঝতে হলে Theory of knowledge কে জানতেই হবে, আমার হাতে একটা চক রয়েছে, আমি জানব কি করে যে এটা একটি চক। আমি যে চক দেখছি অন্যেরাও যে এই একই চক দেখছে এর প্রমাণটা কি। এটাকে না বুঝলে একটা অবস্থাতে গিয়ে শাস্ত্র আসলে ঠিক কি বলতে চাইছে সেইটিকে সঠিক ভাবে বোঝার ক্ষেত্রে একটা বিরাট সমস্যা তৈরী হবে। শাস্ত্রের অর্থকে বিচার করার ক্ষেত্রে একটা অবস্থার পর আবার নৈয়ায়িকরা চলে আসেন, তখন আবার এর চুলচেরা তর্ক আর বিচার চলতে থাকে। তখন আবার তারা ধর্মের পথ থেকে সরে আসে। বেদান্ত, উপনিষদ যারা বুঝতে চাইছেন তাঁদেরকে এই Theory of knowledge কে যুক্তি সহকারে বুঝতে হবে, যদি না বোঝেন তাহলে শঙ্করাচার্যকে বুঝতেই পারবেন না, শঙ্করাচার্যকে যদি না বোঝেন তাহলে গীতা উপনিষদ কোন দিনই বুঝতে পারবেন না।

প্রথম যে প্রমাণ আমরা পাচ্ছি তা হচ্ছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রথম শর্ত হচ্ছে আমি যা দেখছি অপরেও যেন তাই দেখে যেটা আমি দেখছি। আমি এক রকম দেখছি আরেকজন অন্য রকম দেখছে তা কখনই হবে না। আবার কিছু জিনিষ আছে আমরা চোখে দেখছি না, যেমন ইলেক্ট্রনকে আজ পর্যন্ত কেউ দেখতে পায়নি, কিন্তু গবেষণার সাহায্যে পরীক্ষা করে তার যে অস্তিত্বকে জানা গেছে এটাও প্রত্যক্ষ প্রমাণের মধ্যে পড়ে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের পর আসছে অনুমান প্রমাণ। অনুমান প্রমাণ হচ্ছে, যেমন ধরুন খুব ঠাণ্ডা পড়েছে, আমি বাড়ি ফিরলাম কিন্তু খুব ঘেমে গেছি, তখন বাড়ির লোকদের কি মনে হবে? হয় আমি খুব দৌড়ে দৌড়ে এসেছি আর তা নাহলে আমার শরীর খারাপ হয়েছে। বাড়ি ফিরে আমি খুব হাসি মুখে কথা বলছি, তখন বাড়ির লোক ধরে নিল আমি দৌড়ে দৌড়ে এসে ঘামিয়ে গেছি। বাড়ির লোক বলল – তুমি দৌড়ে দৌড়ে কেন এলে? বাড়ির লোক কি করে জানল যে আমি দৌড়ে এসেছি। এটাই হল অনুমান প্রমাণ। অনুমান মানে বাংলার অনুমান নয়, আমি অনুমান করলাম বা আমার অনুমানে মনে হচ্ছে এই রকম

হতে পারে, এই অনুমানের কথা অনুমান প্রমাণে বলা হচ্ছে না। অনুমান হচ্ছে একটা পরিভাষা যার অর্থ হচ্ছে দৃঢ় ও সন্দেহাতীত জ্ঞান। আমি দুপুরে ঘুমিয়েছিলাম। ঘুম থেকে উঠে দেখলাম বাইরে মাঠটা ভেজা। আমি বুঝে গেলাম যে বৃষ্টি হয়েছে, এখানে যেটা জানলাম একেবারের দৃঢ় ভাবে জানি যে বৃষ্টিই হয়েছে। এখানে এসে নৈয়ায়িকরা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যায়, ন্যায় দুই রকমের হয় একটা Deductive Logic মানে কারণ দেখে কার্যকে জানা করা আরেকটি হচ্ছে Inductive Logic কার্যকে দেখে কারণকে বিশ্লেষণ করা। যখনই আমরা এটাকে Inductive Logic কে নিয়ে যাব তখন এটাই একটা পুরো একটা ফিলজফির কোর্স হয়ে যাবে, যার উপরে প্লেটো, এ্যরিস্টটলরা অনেক কাজ করেছেন। বেশির ভাব দার্শনিকরা তর্ক করার জন্য প্রশ্ন তোলেন যে – তুমি যে এটাকে অনুমান প্রমাণের জন্য ভিত্তি করেছ এর কোন দামই নেই। তখন এই নিয়েই অনেক তর্কাবিতর্ক হবে। আমাদের সেটা আলোচ্য নয়।

তারপরে আসছে শব্দ প্রমাণ। শব্দ প্রমাণ হচ্ছে শ্রুতি প্রমাণ, তার মানে আমাদের বেদে এটা আছে সেইজন্য এটাকে আমি সত্য বলে জানছি। এখন যারা খ্রীশ্চান বা মুসলমানরা কি মানবে শব্দ প্রমাণকে? তারা বলবে তোমার বেদে আছে তাতে আমার কি যায় আসে। আর যারা ঘোর ভৌতিকবাদী তারা শব্দ প্রমাণকে তো মানবেই না, অনুমান প্রমাণকেও উড়িয়ে দেয়। তুমি বড়লোক আমি সাধারণ লোক হয়ে জন্মেছি, তুমি সব সময় সুস্থ আর আমি রোগগ্রস্থ হয়ে জন্মেছি, এর আবার অনুমান কি, এর কারণ অন্য কোথাও হবে। যদি বলা হয় জেনেটিক কারণে এই রকম হয়েছে, তারা বলবে জেনেটিক্সেরও আবার কারণ থাকে নাকি। অনুমান-টনুমান আমরা বিশ্বাস করিনা, চোখের সামনে যা দেখব সেটাকেই মানব, আর কিছু বিশ্বাস করি না। এটাই হচ্ছে চার্বাকদর্শনের মত। এইভাবে বিভিন্ন দর্শনে জ্ঞানার্জনের বিভিন্ন পন্থার কথা বলা হয়েছে।

তারপরে আসছে অভাব প্রমাণ। একটা জিনিষ নেই, মানে যেটার অভাব আছে সেই বস্তুর অভাবই সেই বস্তুকে জানার একটা পদ্ধতি। এখানে যদি একটা বোতল থাকে তাহলে আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পারব যে এখানে একটা বোতল আছে। এখন যদি বলি এখানে দেখুন তো একটা গাধা আছে কিনা। দেখলাম গাধা নেই, এটা হয়ে গেল অভাব প্রমাণ। একটা জিনিষ নেই সেইটাও হচ্ছে জানার একটা পদ্ধতি। এই জিনিষটা আমাদের খুব সংশয় তৈরী করে, এখানে একটি বোতল নেই আরেকটি বোতল আছে তাহলে দুটোই তো প্রত্যক্ষ হয়ে গেল। তাহলে হঠাৎ অভাব কেন বলতে যাচ্ছেন। যারা অভাব প্রমাণ তৈরী করেছেন তাদের একটা যুক্তি আছে কেন অভাব প্রমাণকে একটা আলাদা জানার পদ্ধতি করা হচ্ছে। আর অভাব প্রমাণকে যদি সঠিক বলে না মানা হয় তাহলে বেদান্ত দর্শন পুরো ভেঙ্গে চৌচিড় হয়ে যাবে, বেদান্তের আর কোন অস্তিত্বই থাকবে না। অন্যান্য দর্শনের সাথে যখন বেদান্তের লড়াই হয় তখন প্রথমে এই অভাব প্রমাণ নিয়ে সবাই বেদান্তের উপরে আক্রমণ করে। আর যদি বলে দেওয়া হয় অভাবতো প্রত্যক্ষই, দেখতে পাচ্ছি যে একটা জিনিষ নেই এইটাই তো প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়ে গেল, তাহলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর অভাব প্রমাণের মধ্যে পার্থক্য কোথায় রইল। কিন্তু দুটোর মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। একটা জিনিষকে ওখানে দেখার কথা আমি ভাবছিলাম সেটাকে দেখতে পাচ্ছি এটা আমার মনের মধ্যে একটা ছাপ ফেলছে, আবার যদি না দেখতে পাই সেটাও আমার মনের মধ্যে সক্রিয় ছাপ ফেলছে যে, জিনিষটা নেই। অভাব প্রমাণ কখনই নেতিমূলক কিছু হচ্ছে না, যখনই এটাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণে ফেলে দেওয়া হয় তাহলে সেটা নেতিবাচকে হয়ে যাবে, অভাব প্রমাণে এটা স্পষ্ট রূপে জ্ঞান হচ্ছে।

এখন যদি বলে অন্ধকার মানেই তো আলোর অভাব, অন্ধকারকে কি কখন দেখা যায়? তখন এনারা বলবেন – তোমার কথাটা ঠিক, অন্ধকার হচ্ছে আলোর অভাব, কিন্তু এখানে এটা মিলবে না, এই মিলটা এক নয়। আমি অন্ধকারকে অন্ধকার বলতে পারি, কিন্তু 'তুমি অন্ধকার ছড়াচ্ছ' এই কথাট কোথাও শোনা যাবে না, এখানে আমরা বলি আলোটা নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। আলো নিবিয়ে দেওয়া আর অন্ধকার করা একই জিনিষ। তাই এখানে এই যুক্তি কোন দিক দিয়েই খাটবে না।

বেদান্ত অধ্যয়ন করার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, শব্দ প্রমাণ আর অভাব প্রমাণ অত্যন্ত জরুরি, অনুমান প্রমাণের অতটা গুরত্ব নেই। পূর্বমীমাংসা অভাব প্রমাণকে মানে না, আর বৌদ্ধ, জৈন, যোগ, সাংখ্য এরাতো মানবেই না, এরা বলবে অভাব আবার কি, সব প্রত্যক্ষ। এইখানেই বেদান্ত নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না যদি অভাব প্রমাণকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। বেদান্তের অনেক কিছু দাঁড়িয়ে আছে শুধু এই অভাব প্রমাণ কোন কিছুকে জানার একটা অকাট্য প্রমাণের জন্য। ইংরাজীতে একটা কথাকে খুব সুন্দর করে বলা হয় - He was conspicuous by his absence। conspicuous কথার অর্থ হচ্ছে দৃষ্টিগোচর হওয়া। একটা ক্লাশে একজন ছাত্র ইউনিফর্ম না পড়ে একটা চক্‌রাবক্‌রা জামা প্যান্ট পড়ে মাথায় টুপি লাগিয়ে ক্লাশে বসে আছে তখন ইংরাজীতে বলবে – The student become conspicuous by his dress ছাত্রের সাজপোশাক ক্লাশের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এখন সেই ছাত্রকে তার এই উদ্ভট পোষাকের জন্য শিক্ষক প্রচণ্ড তিরস্কার করেছেন, এমন ভাবে সবার সামনে বকলেন যে সেই ছাত্র এমন অপমানিত বোধ করল যে পরের দিন সে ক্লাশে অনুপস্থিত হয়ে গেল, তখন বলা হবে He was conspicuous by his absence. তাকে সবাই ক্লাশে আশা করেছিল কিন্তু সে ক্লাশে ছিল না, এটা হচ্ছে positive absence. এর ঠিক উল্টোটা হচ্ছে ভাব, মানে জিনিষটা আছে। প্রত্যক্ষ হচ্ছে ভাব আর অভাব হচ্ছে এর ঠিক বিপরীত। আবার প্রত্যক্ষ না হলেই সেটা কিন্তু অভাব প্রমাণ হয়ে যাবে না। এ ঘরে অনেক কিছু নেই হাতি নেই, ঘোড়া নেই, বাঘ নেই, ‘নেই’ এর এর একটা তালিকা বানালে বিশাল হয়ে যাবে, কিন্তু আমরা তা করছি না, একজনের আসার কথা ছিল সে এখানে নেই, তার অনুপস্থিতি আমাকে তার জ্ঞান লাভ করিয়ে দিচ্ছে, এইটাই হচ্ছে অভাব প্রমাণ।

সাধারণ অবস্থাতে সৎ যখন বলছি, মানে একটা জিনিষ আছে, তাকে ছটি প্রমাণের, মানে কোন কিছুকে জানার যে ছয়টি প্রক্রিয়া আছে তার যে কোন একটার দ্বারা সিদ্ধ হতে হবে। আর এই ছয়টি প্রমাণই হচ্ছে যে কোন কিছুর জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে অকাট্য প্রমাণ। এই ছয়টি প্রমাণকে বলে ষট্‌প্রমাণ। এই ষট্ প্রমাণ দিয়ে যে জিনিষটাকে জানা যায় সেইটা হচ্ছে সৎ, অর্থাৎ তার অস্তিত্ব আছে।

তাহলে সৎকে আমরা দেখলাম এবারে অসৎ হচ্ছে ঠিক এর বিপরীত। আমরা যখন চিন্তা করি, ঘুমাই, গল্প করি, খাওয়া দাওয়া করছি সব সময় আমাদের মনে নানা ধরণের ঢেউ উঠছে, স্বামীজী রাজযোগে যাকে বলছেন জলাশয়ে পাথর পড়ছে। মনের মধ্যে যে ঢেউ সৃষ্টি হচ্ছে এটাকেই বলছে জানা। আমরা যা কিছু জানছি এটা কিভাবে হচ্ছে? বাইরে থেকে কোন উত্তেজনা মনের মধ্যে গিয়ে ঢেউ তুলল, তখনই আমাদের কোন জিনিষের জ্ঞান হয়ে গেল, জানার ব্যাপারটা ভেতরে হয় আর আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উত্তেজনা বাইরে থেকে এসে চৈতন্যের সাথে জুড়ে গিয়ে আমাদের জ্ঞান হয় যে এটা আমরা জানলাম। আমি ক্লাশে লেকচার দিচ্ছি, ক্লাশের সবার কাছে আমি হচ্ছি এখানে একটা বাইরের উত্তেজনা। যেমন কাঁচের বোতলের বাইরে চুম্বক নড়ছে আর বোতলের ভেতরে লোহা নড়ছে, ঠিক তেমনি সবার ভেতরে বুদ্ধিতে যে চৈতন্য রয়েছে সেটা নড়ছে, এখন বুদ্ধিতে যে কম্পন হচ্ছে চৈতন্য সেই কম্পনের সাথে একাত্ম হয়ে পড়ছে। সেইজন্য আমরা কখনই বাইরের জগতকে জানতে পারিনা, আমার মনের ভেতরে যে বৃত্তি গুলি হচ্ছে সেটাকেই আমরা জানছি। এই তত্ত্বটাই আবার দুটো দর্শনের জন্ম দিচ্ছে – Subjectivism, অধ্যাত্মবাদ and Objectivism, বস্তুবাদ বা বিষয়বাদ। জিনিষটা কি বাইরে আছে না নেই, Subjectivism বলবে বাইরে কোথায় আছে, ওটা একটা উত্তেজনা, যা হবার তোমার ভেতরেই হচ্ছে, Objectivism আবার বলবে যা আছে বাইরেই আছে, বাইরে আছে বলেই তো তুমি জানতে পারছ, বাইরে যদি নাইই থাকত তাহলে তোমার জানার কোন প্রশ্নই আসত না। এই নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়। প্লেটো ছিলেন Subjectivist কিন্তু তাঁর শিষ্য অ্যারিস্টটল ছিলেন Objectivist.

এগুলো যদিও খুব জটিল মনে হবে, কিন্তু এই জিনিষ গুলি যদি পরিষ্কার না হয় আর এর পার্থক্যটা যদি না ধরা যায় তাহলে আমরা শাস্ত্রের তত্ত্বগুলি ধারণাই করতে পারব না। যেটা বলা হল তা

হচ্ছে আমাদের মনের ভেতরে খেলা চলছে। এই যে বাইরে টেবিল, গ্লাশ, মাইক সব আমার মনের মধ্যে খেলা করছে বৃত্তি রূপে। বৃত্তি হচ্ছে চিত্তের মধ্যে চৈতন্যের কম্পন হওয়া। যখন ভাব বৃত্তি তৈরী হয়, অর্থাৎ যে জিনিষটা আছে সেটা আমার চিত্তের মধ্যে এমন একটা বৃত্তি তৈরী করে দেয় যার ফলে মনে হবে এটা আছে, এইটাই হচ্ছে সৎবৃত্তি বা ভাববৃত্তি। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলছেন – *নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। উভয়োরপি দৃষ্টোন্তস্তনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।*।(২/১৬) অর্থাৎ সৎ থেকে কখন অভাবের সৃষ্টি হয় না, অভাবের থেকে কখন সৎ এর সৃষ্টি হয় না। এই শ্লোকটাকেই বিভিন্ন আচার্যরা বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেন। সৎ বৃত্তি আমাকে একটা বৃত্তি দিচ্ছে সেটা হচ্ছে এই জিনিষটার অস্তিত্ব আছে। অসৎ বৃত্তি হচ্ছে যেটা থেকে সেই বস্তুটার অস্তিত্বহীনতার বৃত্তি তৈরী করছে।

একজন নামকরা জার্মান থিয়োলজিয়ান টমাস এ্যকোইনিয়ার খুব বড় খ্রীশ্চান সাধু ছিলেন। তিনি যখন সেমিনারিতে ছিলেন, অর্থাৎ যেখানে খ্রীশ্চানারিদের পড়াশোনা করান হয়, সেই সময় তাঁর শরীরটা খুব স্থূলকায় ছিল। ওখানে সবাই আড়ালে তাঁকে ষাঁড় বলে ডাকত। যারা ধর্মের পথে থাকেন তাদের বেশির ভাগই এসব জিনিষ নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় না। কিন্তু টমাস এইসব ব্যাপারে খুব সিরিয়াস ছিলেন। একদিন তাঁর দুজন সহপাঠি মজা করে তাঁকে বলছেন – দ্যাখো দ্যাখো একটা ষাঁড় আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। এখন আমাদের কাউকে যদি এই কথা বলা হয় যে আকাশ দিয়ে একটা ষাঁড় উড়ে যাচ্ছে, আমরা নিশ্চয়ই কেউ জানলার কাছে দৌড়ে গিয়ে দেখতে যাবো না। কিন্তু টমাস সোজা দৌড়ে গিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। এই কাণ্ড দেখে ক্লাশের সবাই হো হো করে হাসতে শুরু করে দিয়েছে। উনি কিছু না বলে জানলার কাছ থেকে সরে এসে আস্তে আস্তে নিজের চেয়ারে ফিরে এলেন। তখন একজন তাঁকে বলছে ‘তোমার মাথাটা কি মোটা? এতটুকু বুদ্ধিও কি তোমার নেই যে আকাশ দিয়ে ষাঁড় উড়ে যেতে পারে কখন’। টমাস তখন উত্তর দিচ্ছে ‘আকাশ দিয়ে একটা ষাঁড় উড়ে যাচ্ছে এটা আমি বিশ্বাস করব কিন্তু একজন ভাবী খ্রীশ্চান সন্ন্যাসী কখন মিথ্যা কথা বলবে, এটা আমি কোন দিনই বিশ্বাস করতে পারব না’। এই কথাতে সবার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। যখনই কেউ বলবে আকাশে ফুল ফুটেছে, ডানাওয়ালা গাধা বা ঘোড়া উড়ে যাচ্ছে তখন আমাদের মনের মধ্যে ভাব বৃত্তি আসবে না, তার বদলে আসছে অভাব বৃত্তি। চৈতন্য ভাবটা আসছে কিন্তু সেই ভাবটা একটা নেতিমূলক ভাবের উদয় হয়ে বলে দিচ্ছে যে এই জিনিষটার কোন অস্তিত্বই নেই। যখন অভাব বৃত্তির চৈতন্য হচ্ছে তখন তাকে বলা হচ্ছে অসৎ। অসৎ হচ্ছে অভাব বৃত্তিযুক্ত চৈতন্য।

আমরা সৎ আর অসৎ এর পার্থক্যটা দেখলাম। কিন্তু এখন যদি এর অর্থ করে দিই সৎ মানে যেটা আছে আর অসৎ মানে যেটা নেই, তাহলে নাসদীয়সূক্তমের দর্শন পুরো মিথ্যা হয়ে একটা মামুলি কবিতায় পর্যবসিত হয়ে যাবে।

নাসাদীয়সূক্তম্ বলছে সৃষ্টি কিভাবে হল। সৃষ্টির আগে সৎ ছিল না আর অসৎও ছিল না, মানে দৃশ্য জগৎ বলে কিছু ছিল না, যেটাকে আমি আমার ইন্দ্রিয় দিয়ে, শব্দ দিয়ে, অনুমান দিয়ে জানতে পারি সেটা তখন ছিল না। তাহলে কি ছিল তখন? শূন্য ছিল কি? না, তখন শূন্যও ছিল না। কেন বলছেন তখন শূন্যও ছিল না? কারণ বলা হচ্ছে নো অসদ্ আসীদ্, অসৎও ছিল না, তার অর্থ অবৃত্তি, কিছু নেই সেইটাই নেই, নেই জিনিষটাই নেই। আকাশ কুসুম হচ্ছে অসৎ মানে কখনই আকাশ কুসুম নেই, বন্ধ্যা পুত্র হচ্ছে অসৎ। তাহলে কি ভগবান অসৎ, না, ভগবান কখনই আকাশ কুসুমের মত, বন্ধ্যা পুত্রের মত অসৎ হন না। তাহলে কি করে জানা যাবে ভগবানকে? শব্দ প্রমাণের দ্বারা ভগবানকে জানা যাচ্ছে। কেননা ভগবান প্রত্যক্ষ প্রমাণ হবে না, এই সাদা চোখ দিয়ে ভগবানকে দেখা যাবে না। ভগবানকে অনুমান প্রমাণ দিয়েও জানা যাবে না। যেহেতু ভগবানকে শব্দ প্রমাণ দিয়ে জানা যায় সেইজন্য তিনি অসৎ নন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে জানা যায় না, তাই তিনি সৎ নন। সেইজন্য বলা হচ্ছে সৎ ছিল না, কিন্তু শব্দ প্রমাণে ভগবান আছেন, যেহেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণ যতটা স্পষ্ট শব্দ প্রমাণ ঠিক একই ভাবে স্পষ্ট, তাই ভগবানকে অসৎ বলা যাবে না। অভাব প্রমাণের

মূল্যও এক রকম, কোন পার্থক্য নেই, কোন প্রমাণই দু-রকমের কথা বলবে না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে ভগবানকে ধরা যাচ্ছে না তাই তিনি অসৎ আবার শব্দ প্রমাণ দিয়ে তাঁকে ধরা যাচ্ছে তাই তিনি অসৎ নন, সেইজন্য তখন কি ছিল সৎ ছিল না, সৎ কেন ছিল না? কেননা তখন দৃষ্টি প্রমাণ অর্থাৎ দেখার মত কিছুই নেই, শুধু যে ভগবানই নেই তা নয়, কিছুই নেই, সৃষ্টিই নেই, সৃষ্টি হলে তবেই তো কিছু দেখবে, দেখারও কিছু নেই, যে দেখবে সেও নেই, বিষয়ও নেই বিষয়ীও নেই। তাহলে কি কিছুই নেই, তাহলে তো বলতে হবে যে শূন্য থেকে সৃষ্টি বেরিয়ে এলো। যদি বলা হয় ন সৎ আসীদ্, সৃষ্টির পূর্বে কিছুই ছিল না বললেই বলতে হবে সৃষ্টিটা শূন্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু শূন্য থেকে কি করে সৃষ্টি হবে, তখন পুরোটাই অভাব হয়ে গেল, অভাব থেকে কি করে সৃষ্টি হবে। ফিজিক্সেও এই নিয়ে সমস্যা আসে, বিগ ব্যাং এর আগে পদার্থ কোথায় ছিল? তারা বলবে matter was in energy form, এনার্জী ফর্ম কোথায় ছিল? একটা পয়েন্ট ফর্মে ছিল। তার আগে কি ছিল? ফিজিক্স বলছে আমরা জানিনা।

অসৎও ছিল না, নাসদীয়সূক্তমের এই ভাব থেকেই বেদান্তের নির্দ্বন্দ্ব অদ্বৈত তত্ত্ব বেরিয়ে আসছে। এই অসৎকে যদি আমরা অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করি তাহলে সেটা অন্য দর্শন হয়ে যাবে। কেন অসৎও ছিল না বলছে আমরা আগেই বলেছি যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে জানা যাবে না, যেহেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে জানা যাবে না তাই বলা হচ্ছে নো সদ্ আসীদ্। সৃষ্টি ছিল না তার মানে কি কিছু ছিল না? বৌদ্ধরা যেমন নির্বাণকে বলছে প্রদীপ জ্বলছে ফুঁ মেরে নিবিয়ে দেওয়া হল, তাহলে আলো কোথায় গেল? কোথায় যাবে, কোথাও যায়নি আলোর অভাব হয়ে গেছে। এখানে বৌদ্ধদের মতানুযায়ী অভাবও হবে না, বলা হচ্ছে কিছু ছিল না অথচ কিছু ছিল। তাহলে সৎ বলা হচ্ছে না কেন? যেহেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে জানা যাবে না, তাই বলা হল নাসদাসীন্ নো সদাসীত্। পরের দিকে এই গভীর তত্ত্বটা থেকেই বেদান্তের মূল তত্ত্বের জন্ম নিয়েছিল যেটা হচ্ছে দ্বৈতাদ্বৈতের পারে। আমাদের মন সব সময় দ্বৈত জগতের মধ্যেই থাকে, তাই দ্বৈতাদ্বৈতের পারে বলতে গেলে ঠিক কি বোঝায় আমরা ধারণা করতে পারিনা। সব থেকে সুন্দর উপমা সূর্য। সূর্যে দিন আছে, না রাত আছে? সূর্যে দিনও নেই রাতও নেই, দিন হলে রাতও হবে। সূর্য দিন ও রাতের অবস্থার পারে। যদি ধরে নেওয়া হয় সূর্যের তাপে মানুষের কিছু হবে না, সেই অবস্থায় কোন মানুষ যদি সূর্যে থাকে তখন সূর্যের মানুষকে পৃথিবীর মানুষ গিয়ে বলবে – বাঃ কি মজা এখানে সব সময় দিন। সূর্যের মানুষ অবাক হয়ে বলবে – দিনটা আবার কি জিনিষ? পৃথিবীর মানুষ বলছে – কেন এই যে সব সময় আলো থাকছে। সূর্যের মানুষ আরও অবাক হয়ে বলবে – আলো থাকাটা দিন কেন হবে, আলোর আবার বিপরীত কিছু আছে নাকি।

আরও সহজ ভাবে বোঝা যাবে – যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে তুমি পরীক্ষায় পাশ করেছ? আমি বললাম আমার এখনও পরীক্ষা হয়নি। সে আবার বলছে – আরে ছাড়ো না, পরীক্ষা হয়েছে কি হয়নি ছাড়ো, তুমি পাশ করেছ কিনা বল? আমি বলব – আপনি কি বোকার মত কথা বলছেন, পরীক্ষাই হয়নি তো পাশ ফেলের প্রশ্ন কোত্থেকে আসবে। সে বলছে – আরে ধুৎ, যারা পড়াশোনা করে তারা হয় পাশ করে না হয় ফেল করে, তোমার কোনটা হয়েছে, পাশ না ফেল? আমাদের মস্তিষ্কের একটা সীমাবদ্ধতা আছে, তার ফলে আমরা সব সময় দ্বৈত ভাবের বাইরে কিছু ভাবতেই পারিনা, জীবন-মৃত্যু, দিন-রাত্রি, সকাল-বিকেল, শীত-গ্রীষ্ম, ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পূণ্য। কিন্তু এগুলির পারেও একটা অবস্থা আছে। মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের খেলা হয়নি, আমি জিজ্ঞেস করলাম – কটি গোল হয়েছে? আরে খেলাই শুরু হয়নি। খেলা শুরু হয়ে গেছে এখনও গোল হয়নি, তখন যদি জিজ্ঞেস করে কটা গোল হয়েছে, তাহলে বলবে শূন্য শূন্য। কিন্তু খেলা শুরুই হয়নি, তখন কি বলা যাবে যে স্কোর শূন্য শূন্য? কখনই বলা যাবে না, অঙ্কে এটাকে বলে পাই সেট। পাই সেট হচ্ছে খালি কিন্তু শূন্য বলা যাবে না, পাই আর জিরো তে তফাৎ আছে। পাইয়ের নিয়মে বলে – শূন্যও নয় একও নয় এটা হল পাই। এটাই বলছে - নাসদাসীন্ নো সদাসীত্, তখন এই জিরো আর ওয়ানের খেলা ছিল না, তখন পাই ছিল। একটা কিছু ছিল। কি ছিল? শূন্যও ছিল না, একও

ছিল না। আমি বলব – আরে জিরো নেই এক নেই তাহলে কি আছে বলুন? নাসদীয় সূক্তে এইটাই আমাদের বুঝতে হবে।

অসদ্ শব্দটা হচ্ছে যেটা নেই, যেটা বোঝা যায় না। অসদ্ আবার দু-রকমের হয়, একটা হচ্ছে যেটা এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে দেখা যায় না কিন্তু অনুভূতি দিয়ে দেখা যাচ্ছে, বেদান্ত যাকে অপরোক্ষানুভূতি বলছে। দ্বিতীয় হচ্ছে যত কিছুই হোক না কেন ত্রিকালে যেটাকে কেউ কোন দিনই দেখতে পারবে না তাকে অসদ্ বলছে। দ্বিতীয় অসদ্‌কে পৃথক ভাবে বোঝার জন্য পরে এটাকে নতুন একটা নাম দিয়ে বললেন অলীক। অলীক শব্দের যথার্থ অর্থ হচ্ছে যা কোন কালে ছিল না আর কোন কালে হবেও না। যেমন বন্ধ্যা পুত্র, বন্ধ্যার কোন দিন পুত্র ছিল না আর কোন দিন হবেও না, যদি পুত্র হয়ে যায় তাহলে সে আর বন্ধ্যাই থাকবে না। এগুলো হল contradictory in terms, যদি বলেন গরম গরম বরফ নিয়ে এসো, কিংবা ঠাণ্ডা গরম জল নিয়ে এস, বরফ মানেই ঠাণ্ডা আর গরম জল মানেই গরম হতে হবে। এই জিনিষ গুলিকে বলা হয় অলীক।

দর্শনে অসৎ আর অলীক এই দুটো শব্দ একই রকম মনে হয়। এই কারণে শাস্ত্র বিশেষ করে বেদ পড়তে গেলে ভাষ্য সহকারে না পড়লে একটা শব্দের অর্থ অনেক রকমের মনে হবে, আর শব্দের যদি ঠিক অর্থ না করা হয় তাহলে পুরো দর্শনটাই পাল্টে যাবে। যেমন মায়াকে কখন বলবে অলীক, কখন বলবে অসৎ আবার কখন বলছে সৎ। যখন কেউ বলে এই জগতে একমাত্র মায়াই আছে, যা কিছু দেখছ সব মায়া, তাহলে মায়া শব্দের অর্থ সৎ হয়ে গেল, কেননা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা যেটা দেখা যাচ্ছে তাকে মায়া যখন বলা হচ্ছে, তাহলে মায়া সৎ। আবার যেহেতু মায়ার প্রকৃত অস্তিত্বই নেই সেই হেতু মায়া অসৎ। এই অসৎকে যখন এরা অলীক অর্থে নিয়ে নেয় তখন মায়া কখন ছিল না আর মায়া কখনই নেই, তার ফলে তারা বলছে জগৎ বলে কিছু নেই, বেদান্ত যেমন বলছে ত্রিকালমে জগৎ নহি হ্যায়। সেইজন্য শাস্ত্রে যখন এই ধরণের শব্দগুলিকে ব্যবহার করা হয় তখন এর অর্থ খুব জটিল হয়ে যায়, আর এই নিয়েই পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক চলতে থাকে। আবার ঈশ্বরকেও কখন কখন বলে দেবে সৎ আবার কখন বলে দেবে সৎ অসৎএর পার, অবশ্য কোন অবস্থাতেই ঈশ্বরকে অলীক কখন বলবে না। মায়াকে যেমন কখন বলছে সৎ আবার কখন বলছে অসৎ তেমনি মায়াকেও বলে দেয় সৎও নয় অসৎও নয়। যখন মায়াকে সৎ নয় অসৎ নয় বলছে তখন এই অসৎ বলতে বোঝাচ্ছে অলীককে। অর্থাৎ মায়া বলে যে কিছুই নেই তা নয় আবার তার চিরন্তন অস্তিত্ব নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে ভগবানকে সৎ দিয়ে বোঝাবে, যখন বলছে একমাত্র তিনিই আছেন তখন ভগবানকে সৎ দিয়ে বোঝান হচ্ছে। তার মানে ঈশ্বরই একমাত্র সৎ আর বাকি সব অসৎ। এখানে সৎ মানে যার একমাত্র সত্তা আছে বাকী কারুর সত্তা নেই। এইজন্য সৎ আর অসৎ এই দুটো শব্দ প্রচণ্ড জটিল। গীতাতেও কোথাও কোথাও মায়াকে বলে দিচ্ছে সৎ কখন অসৎ বলছে আবার কখন বলছে মায়া সৎ অসতের পার। যদি আমরা প্রথম থেকে একটা বাঁধা অর্থ না ধরে রাখি তাহলে গীতার অর্থ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হয়ে যাবে। এইখান থেকেই শাস্ত্র যে তত্ত্বটাকে দিতে চাইছে সেটাকে না ধরতে পারার জন্য অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়ে যায়। আমাদের মোটামুটি মনে রাখতে হবে সৎ মানে আছে অসৎ মানে নেই, এইটাকে মাথায় রেখে নাসদীয়সূক্তম্‌কে ঠিক কি বলতে চাইছে তা বোঝার চেষ্টা করব।

এইখানে প্রথম মন্ত্রে প্রথমেই বলছে সৎ ছিল না, এর অর্থ হচ্ছে জগৎ ছিল না। অসৎ ছিল না, এর মানে একেবারেই যে কিছু ছিল না তা নয়, কিছু একটা ছিল। সৃষ্টি ছিল না মানে দ্রষ্টা কেউ নেই তাহলে দৃশ্য কি করে থাকবে, কিন্তু কিছু যে একটা ছিল সেইটা আমরা কিভাবে জানছি? শব্দ প্রমাণের মাধ্যমে জানছি, অর্থাৎ বেদ এই কথা বলছে। ঈশ্বর সর্ব কালেই আছেন। কিন্তু আমরা কি করে জানব যে তিনি হাজার বছর আগে ছিলেন কি ছিলেন না? তিনি যে ছিলেন এটা আমরা জানছি বেদের মাধ্যমে, মানে শব্দ প্রমানের দ্বারা। যেমন ইতিহাসের ঘটনাগুলি ঐতিহাসিকদের গবেষণা আর অনুসন্ধানের পর যে সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তার মাধ্যমে জানছি, ঠিক তেমনি ঈশ্বরের সর্বকালের অস্তিত্বের কথা আমরা জানছি

যেখানে সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের আধ্যাত্মিক গবেষণা ও অনুসন্ধানের খবরাখবর সংগ্রহিত করা হয়েছে তার মাধ্যমে অর্থাৎ বেদের মাধ্যমে। ঈশ্বর যদি সর্বকালেই না থাকেন তাহলে এই জগৎটা হয়ে যাবে অভাব, শূন্য থেকে সৃষ্টি, যার কোন অর্থই হয় না।

ছান্দোগ্য উপনিষদেও আছে – *সদীদমগ্রে আসীদ্ সৌম্য,* হে সৌম্য, আগে শুধু মাত্র সৎ ছিল। এখানে নাসদীয়সূক্তে বলছে সৎও ছিল না অসৎও ছিল না, তাহলে তো দুটোর মধ্যে বিরোধ লেগে যাবে। উপনিষদের আরেক জায়গায় বলছে – *অসদ্বা ইদমগ্রে আসীদ্* - এখানে বলছে আগে অসৎ ছিল। উপনিষদে এক জায়গায় বলছে আগে অসৎ ছিল, আরেক জায়গায় বলবে আগে শুধু সৎ ছিল, কিন্তু বেদে বলছে আগে সৎ ছিল না অসৎও ছিল না, আবার এক জায়গায় গিয়ে বলছে সব কিছু সৎ থেকে সৃষ্টি হয়েছে, আবার এক জায়গায় বলছে সব কিছু অসৎ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে আমরা কোনটা নেব। কিন্তু বেদ উপনিষদ একই তত্ত্ব এক ভাবেই বলে গেছেন, কিন্তু বলছে অন্য ভাবে, সেখানেই তখন ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়। সৃষ্টির প্রথমে কি ছিল বলতে গিয়ে বলবে মায়া ছিল কিংবা ব্রহ্মণ্ ছিল কিংবা আত্মাই ছিল, এই ভাবে বলে নিয়ে তারপরে একটা সুসংবদ্ধ তত্ত্বকে দাঁড় করাবে।

নাসদীয়সূক্তের এইখানে সৎ মানে এই আর অসৎ মানে এই, এই ব্যাপারটাকে পরিষ্কার করার জন্য প্রথমে তাই সৎ ও অসৎ এর এত বিস্তৃত আলোচনা করা হল। এটা যদি পরিষ্কার না হয় তাহলে নাসাদীয়সূক্তম্ পড়তে গিয়ে আমরা এর তত্ত্বকে হারিয়ে ফেলব। যেমন কর্ম বলতে অনেক কিছু বোঝায়, কারুর মনে হবে কর্ম মানে কাজ করা, কারুর মনে হবে কর্মফল বা কপাল, আমার কর্মে ছিল বা আমার কপালে ছিল, আবার কর্ম বলতে বর্তমান কর্মফলকে বোঝায় আবার কর্ম বলতে যজ্ঞকে বোঝায়। ঠিক তেমনি আত্মা শব্দ অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়, আত্মা মানে হয় জীবাত্মা, আত্মা মানে হয় দেহাত্মা, আত্মা মানে ভেতরে যিনি চৈতন্য রয়েছেন, আবার আত্মা মানে হচ্ছে ব্রহ্ম, আত্মার অর্থ হচ্ছে বুদ্ধি, আত্মার অর্থ হচ্ছে প্রাণ। কোন্ জায়গায় আত্মার কোন্ অর্থ এটা আচার্যের কাছে অধ্যয়ন না করলে আত্মার অর্থ ভুলভাল করে পুরো দর্শনটাই তালগোল পাকিয়ে যাবে। সেই কারণে অনেকেই বিরক্ত হয়ে বলেন একই শব্দের এতগুলি অর্থ কেন করা হয়েছে। তার কারণ হচ্ছে তখনকার সময়ে শব্দের এত বৈচিত্র্যতা ছিল না, গুরু শিষ্যকে বলে দিচ্ছে, শিষ্য বুঝে নিচ্ছে এইভাবে পরম্পরা চলে এসেছে, কিন্তু ইতিমধ্যে নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়ে গেছে, কিন্তু নতুন শব্দকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সেই ধরণের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ না থাকাতে কেউ সাহস করে পুরনো শব্দের বদলে নতুন শব্দকে প্রয়োগ করতে পারেনি। এই কারণেই গীতা ও উপনিষদ বা যে কোন শাস্ত্র পড়তে গেলে ঠিক ঠিক আচার্যের কাছে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে আর ধরে ধরে পড়তে হয়। এত কঠিণ আর সাধন সাপেক্ষ বলে আমাদের দেশের লোকেরা বেদ পড়া ছেড়ে দিল।

যারা ধর্ম-কর্ম নিয়ে থাকে তাদের লোকেরা বলে বেশ আছে হরিনাম করছে আর বসে বসে খাচ্ছে। এখানে এসে বোঝা যায় ঠিক ঠিক ধর্মকে জানতে হলে কি প্রখর মেধা ও সূক্ষ্ম বুদ্ধির দরকার। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শঙ্করাচার্যের ভাষ্যের এক জায়গায় আছে, শঙ্করাচার্য নিজেই বর্ণনা করছে – বিরাট তর্ক চলছে, হঠাৎ পূর্বপক্ষ হাত তুলে বলবে 'ভাই, তোমরা যারা বেদান্তীরা আছ, তোমরা নিজেরাই দ্বিধাগ্রস্ত তার ওপরে আবার একটা শব্দের অনেক রকম অর্থ বার করে অপর পক্ষের মনেতেও সংশয় করে দিচ্ছ, সত্যি ভাই সেইজন্য তোমাদের বেদান্ত আর কেউ পড়ে না'। বিরোধী পক্ষের অভিযোগকে নিজেই উত্থাপন করে শঙ্করাচার্য তারপর তার পরিসমাপ্তি করছেন 'তুমি যা বলছ ঠিকই বলছ, বেদান্ত পড়তে গেলে তাই মনে হবে, কিন্তু বেদান্ত আসলে তা নয়, ঠিক ঠিক নিষ্ঠার সাথে গুরুর কাছে যখন শোনা হয় তখন গুরু এক কথায় সব পরিষ্কার করে দেন'। শাস্ত্রে আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে বোঝা অত্যন্ত কঠিণ, সূক্ষ্ম বুদ্ধি আর পবিত্রতা না হলে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কিছুই ধারণা করা যায় না। একটা খুব প্রচলিত ঘটনা আছে – লাটু মহারাজ লেখাপড়া করেননি, জাগতিক বিচারে মুর্খ বোকা মানুষ ছিলেন। ঠাকুরের শরীর যাবার পরে লাটু মহারাজের জীবনী যদি আমরা পড়ি তাহলে দেখতে পাব যে এই অশিক্ষিত সহজ সরল গ্রাম্য মানুষটির কি প্রচণ্ড সূক্ষ্ম

ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল। স্বামীজী বিদেশ থেকে ফিরে এসেছেন, সবাই বিদেশে স্বামীজীর সব কীর্তি কাহিনী শুনছেন, লাটু মহারাজও শুনছেন। হঠাৎ সবাইকে অবাক করে দিয়ে লাটু মহারাজ স্বামীজীকে বলছেন 'লোরেন ভাই, তুমি নতুন কি আর করেছ, তুমি তো গীতা উপনিষদের কথাতে দাগা বুলিয়েছ'। স্বামীজী সবাইকে বলছেন 'দ্যাখ্, লাটু ঠিক ঠিক জিনিষটাকে ধরেছে'। আমরাও তো স্বামীজীর কত রচনা পড়ছি কিন্তু আমরা ধরতে পারছি না, অথচ স্বামীজী যত কথা বলেছেন গীতা উপনিষদের বাইরে একটি কথাও বলেননি। কিন্তু লাটু মহারাজ খচ্ করে ধরে নিচ্ছেন, অথচ আপাত ভাবে গীতা উপনিষদ তিনি কখন পড়েননি। এইটাই হচ্ছে সূক্ষ্ম বুদ্ধি।

লাটু মহারাজ ঠাকুরের কাছে বর চেয়েছিলেন যে আমি যা খাই সেটা যেন হজম হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূল শরীর চলে যাবার পর বরাহনগর মঠে তখন পয়সা কড়ির খুব অভাব, কোন রকমে সব গুরুভাইদের দিন গুজরান হচ্ছে। এক গুরুভাই ঠাকুরের জন্য রোজ সকালে একটা ছোট বাটিতে নৈবেদ্য ভোগ দিতেন। রাত্রে সবার খাওয়ার পর ঐ পাত্রটাকে খুব সুন্দর করে মেজে ঘষে পরিষ্কার করে রাখা হত যাতে সকালে উঠেই ঠাকুরকে ঠিক সময়ে ভোগ নিবেদন করা যায়। লাটু মহারাজ রাতে উপোস করে সারা রাত ধরে মশগুল হয়ে জপ করে যাচ্ছেন। গভীর রাত্রে কোন এক সময়ে তাঁর জপ ভেঙ্গেছে, আর এমনই কপাল যে সেই সময় তাঁর প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে। কিন্তু অত রাত্রে কিছুই খাবার নেই। কি খাবেন? ওনার কাছে সব সময় ছোলা থাকত, সেখান থেকে একটু ছোলা নিলেন, একটু পেঁয়াজ কুচোলেন। তারপর ঠাকুরের ধোয়া মাজা পরিষ্কার বাটিতে করে সেদ্ধ করে খেলেন। খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন। বাটিটা নোংরাই থেকে গেছে। সকালবেলা বাবুরাম মহারাজ ঠাকুরকে নৈবেদ্য দিতে গিয়ে দেখে বাটিতে ছোলা পেঁয়াজ লেগে আছে। এই দেখে বাবুরাম মহারাজ লাটু মহারাজকে ঘুম থেকে তুলে প্রচণ্ড গালাগাল দিতে শুরু করল, শেষে বাপ-মা তুলেও গালাগাল দিতে লাগল। লাটু মহারাজ কিছুক্ষণ শোনার পর বলছেন 'বাবুরামদাদা, তোমার বাপ-মা আর আমার বাপ-মা কি আলাদা'? এই একটা কথায় বাবুরাম মহারাজ একেবারে চুপ্‌সে গেলেন। তোমারও বাপ-মা সেই ঠাকুর আর আমারও বাপ-মা সেই ঠাকুর। লাটু মহারাজের কি সূক্ষ্ম বুদ্ধি। তাই বলে কি বাবুরাম মহারাজের বুদ্ধি ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল, সূক্ষ্ম বুদ্ধি না থাকলে বাবুরাম মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে চুপ্‌সে যেতেন না, তিনিও বুঝে গেছেন লাটু মহারাজ কি বলতে চাইছেন। আচার্য শাস্ত্র বলতে শুরু করেছে আর শিষ্য ঝরঝর করে সব বুঝে নিচ্ছে এই ধরণের সূক্ষ্ম বুদ্ধি না থাকলে আধ্যাত্মিক উত্থান হয় না।

মুণ্ডোক্য উপনিষদে শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে উত্তম শিষ্য, মধ্যম শিষ্য ও অধম শিষ্যের বর্ণনা দিচ্ছেন – উত্তম শিষ্য একবার শুনলেই বুঝে নেয় আচার্য কি বলতে চাইছেন, মধ্যম শিষ্যকে বারবার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে নানা উপমা দিয়ে বোঝান হয় আর অধম শিষ্যকে যেটা বোঝান হয় সে তার উল্টোটাই বোঝে। স্বামীজী, রাজা মহারাজ এনারা ছিলেন উত্তম শিষ্য। উত্তম শিষ্যকে একবার বলে দিল 'তত্ত্বমসি' তুমিই সেই, সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝে নেবে এর অন্তর্নিহিত ভাব। স্বামীজীকে ঠাকুর কিছুই বলেননি, শুধু একটু ছুঁয়ে দিয়েছেন তাতেই স্বামীজীর বিরাট আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হয়ে গেল, স্পর্শেই তাঁর অদ্বৈত জ্ঞান হয়ে গেল। ঠাকুরতো আরো অনেককেই স্পর্শ করেছিলেন, কিন্তু আর কারুর তাহলে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হল না কেন? আমাদেরও তাই হয় না।

তবে উত্তম শিষ্য যদি নাই হতে পারি কিন্তু কম পক্ষে যাতে মধ্যম শিষ্যও হতে পারি তার চেষ্টা করতে হবে। কোন অবস্থাতেই উল্টোটা যেন না বুঝি। সেইজন্য তপস্যা সবাইকে করতে হবে, তপস্যা সাধন ভজন না হলে মন পবিত্র হবে না। জপ ধ্যানে বুদ্ধি সূক্ষ্ম হয়। আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এগুলির সাথে সচেতন ভাবে লড়াই করতে হবে। আমাকে এটা ধারণা করতেই হবে, ধারণা করে গেলে, বুঝতে গেলে আমাকে আমার সমস্ত প্রকারের রিপুর সাথে লড়াই করতে হবে, সাথে সাথে মাটি কামড়ে সাধনা করতে হবে, এই দৃঢ়তা না থাকলে শাস্ত্র কোন দিন বোঝা যাবে না। শাস্ত্র যদি না ধারণা

করা যায় তাহলে কোন কালেই, ধার্মিক পুরুষ, আধ্যাত্মিক পুরুষ হতে পারবে না। জীবনে আমাদের প্রত্যেকের কিছু না কিছু একটা চাই, তা নাহলে কি অবলম্বন করে আমরা বেঁচে থাকব। লোকে টাকা-পয়সা উপার্জন করে তা ভোগের জন্যই তো করে, কিন্তু টাকা-পয়সাকে কেউ ভোগ করে না, এগুলো কোন একটা দিকে আমাদের এগিয়ে দেয়। যখন এগোতে থাকবে তখন বুঝতে পারে যে সব কিছুই সেই একটা দিকেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য এই চারটে পুরুষার্থের কথা বলা হয় – ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। কিন্তু সূক্ষ্ম বুদ্ধি না হলে চারটের মধ্যে কোনটাই হবে না। শাস্ত্র যদি না জানা থাকে, শাস্ত্র ধারণা করার ক্ষমতা যদি না থাকে তাহলে এই চারটের কোনটাই হবে না।

নাসদীয়সূক্তমের সৎ হচ্ছে যেটা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গোচর করা যায়, অসৎ হচ্ছে সেইটা যেটাকে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা গোচর করা যাচ্ছে না কিন্তু বেদের দ্বারা জানা যায়। যদি কেউ বলে আমি বেদ মানিনা, তাহলে তাকে বলতে হবে তুমি ভাই বেদ পড়ো না, নাসাদীয়সূক্তম্ তোমার জন্য নয়। যে বলবে আমি বেদ মানি তখন এই তত্ত্বটা তার জন্য। কেননা এটা হচ্ছে বেদ প্রমাণ যাকে অন্য ভাবে বলা হয় শ্রুতি প্রমাণ। যারা বেদ বা শ্রুতিকে মানে না তারা হলেন চার্বাকপন্থী। নাসাদীয়সূক্তম্ তাদের জন্যই বলা হয়েছে যারা এই সৃষ্টির রহস্যকে আধ্যাত্মিকতার আলোকে জানতে চায়।

তদানীং, মানে সেই সৃষ্টি কালে সৎ ছিল না অসৎ ছিল না। *নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ* - ন আসীদ্ রজো বলছে, এই রজঃ শব্দের অনুবাদ আবার খুব কঠিণ হয়ে যায়। কারণ বেদের ভাষা অনেক পুরনো। যার জন্য পরে যাস্কের নিরুক্তাদির রচনা হয়েছে, তাও বেদের অনেক পরে, তারও পরে সায়নাচার্য এটাকে ব্যাখ্যা করছেন। এখন রজঃ শব্দকেও অনেক ভাবে অনুবাদ করা যেতে পারে। যে ভাবেই আমরা অনুবাদ করব এর অর্থ পুরো অন্য রকম হয়ে যাবে। রজঃকে স্বামীজী অনুবাদ করছেন there was no air, কিন্তু রজঃ কোন অবস্থাতে বাতাস বলে অনুবাদ করা যায় না। আবার স্বামীজী বলছেন firmament, যার অর্থ, যে জিনিষটা ধরে রাখে। স্বামীজী রজঃকে বাতাস বলে অনুবাদ করছেন এটা যে শুধু শব্দকে অনুবাদ করে দিয়েছেন তা নয়, এই শব্দের ব্যাখ্যাটা কি হবে সেটাকে ভিত্তি করে একটা অনুবাদ করে দিলেন। সেই সময় কোন বাতাস ছিল না, বাতাস নেই মানে কোন গতি ছিল না, গতি হচ্ছে রজগুণের ধর্ম। সৎ ছিল না, অসৎ ছিল না বলার পর কি হতে পারে তার ব্যাখ্যা করার জন্য এই শব্দগুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে, রজঃ তাই হচ্ছে ব্যাখ্যামূলক শব্দ। সৃষ্টির আগের অবস্থাটাকে বোঝানোর জন্য বলছে বাতাস ছিল না। বাতাস কোথায় চলে? বাতাসকে চলার জন্য আকাশ দরকার, তাই বলছে *নো ব্যোমা পরো যৎ*, পৃথিবীর উপরে আকাশ, আকাশের উপরে বাতাস। সৎ অসৎ ছিল না, মানে পৃথিবী ছিল না। পৃথিবী ছিল না ঠিক আছে, কিন্তু বাতাস তো ছিল? বিজ্ঞানের মতে প্রথমে বাতাস আসবে তারপর প্রাণী জগত আসবে। কিন্তু বলছে বাতাসও ছিল না। ঠিক আছে বাতাস নেই, তাহলে অন্তরীক্ষ তো আছে। না, আকাশও ছিল না। তাই স্বামীজী যে রজঃ কে বাতাস অনুবাদ করেছেন এখানে এসে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে স্বামীজীর এই অনুবাদটাই সঠিক, স্বামীজী ঋষি কিনা, তাই তাঁর অনুবাদও হবে ঋষিদের মতই, ঋষিরা যা বোঝাতে চেয়েছেন স্বামীজী সেটাকে ধরতে পেরেছেন বলেই এত সুন্দর ও যুক্তিযুক্ত অনুবাদ করেছেন। এখন রজঃ মানে অনেক কিছুই হয়, যেমন বিরজা কথাটা রজঃ থেকে এসেছে। সন্ন্যাসীরা বিরজা হোম করেন। বিরজার অর্থ হচ্ছে যা কলুষ মুক্ত, কিন্তু এখানে রজর কলুষ অর্থ করা যাবে না, করলেই পরের শব্দে *নো ব্যোমা পরো যৎ* এসে গোলমাল হয়ে যাবে। কলুষের সাথে আকাশের কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু বাতাসের একটা সম্পর্ক আছে, বাতাসের বাবা হচ্ছে আকাশ। আবার রজঃ মানে সক্রিয়, মানে শক্তি। শক্তিকেই এখানে ব্যাখ্যা করে বলা হচ্ছে বাতাস রূপে।

বেদে যখন কোন জটিল শব্দ আসে তখন তার আগের শব্দের অর্থের সাথে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে অর্থ করা হয়। এমনকি যদি কোন বিশেষ শব্দের অর্থ যদি নির্দিষ্ট করা থাকে যে এর বাইরে এর অন্য অর্থ করা যাবে না, তখন আগের শব্দের অর্থের সাথে যদি এই অর্থের সামঞ্জস্য না থাকে তাহলে সেই

শব্দের অর্থকে পাল্টে এমন ভাবে ব্যবহার করা হবে যাতে তার আগের শব্দের অর্থের সাথে ধারাবাহিকতা ও সামঞ্জস্য বজায় থাকে, আচার্য তখন বলে দেন – এই শব্দের এই অর্থ। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে একটা শ্লোক আছে *মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ*। (১৩/৬) মহাভূতের অর্থ হচ্ছে স্থুলভূত, যা দিয়ে সৃষ্টি হচ্ছে। আচার্য শঙ্কর মহাভূতের অর্থ করছেন তন্মাত্রা, কিন্তু কোন বইতেই মহাভূত মানে তন্মাত্রা বলা নেই, একমাত্র শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে বলছেন 'এইখানে মহাভূতের অর্থ হবে তন্মাত্রা'। এখানে যদি মহাভূতের অর্থ তন্মাত্রা না করা হয় তাহলে এই শ্লোকের পুরো বক্তব্যটাই গোলমাল হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, গীতার মূল দর্শনটাই পাল্টে গিয়ে অন্য একটা দর্শনের জন্ম নিয়ে নেবে। সাংখ্য দর্শনও পুরো পাল্টে যাবে। কিন্তু সমস্ত শাস্ত্রে মহাভূত হচ্ছে স্থুলভূত। কিন্তু আচার্য এর অর্থ করে দিলেন সূক্ষ্মভূত। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে ব্যাসদেব কেন সূক্ষ্মভূত না বলে মহাভূত বললেন? এর উত্তরও কেউ দিতে পারবে না। ব্যাসদেব কেন করলেন আমরা কেউ জানিনা, হতে পারে সেই সময় তখনও শব্দের অত বৈচিত্র্যতা আসেনি, অনেক কারণ থাকতে পারে। তাই সব সময় বলা হয় আচার্যের কাছে শাস্ত্র না পড়লে কিছুতেই শাস্ত্রের অর্থ বুঝতে পারবে না, আচার্যকেও সব দিক দিয়ে দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জন করে নিতে হয়।

তাই এখানে আমরা স্বামীজী যে অর্থ করেছেন সেইটাকেই নেব, স্বামীজী বলছেন – সেখানে কোন বাতাস ছিল না, আর বাতাসকে ধরে রাখবে সেই আকাশও ছিল না। ব্যোম মানে আকাশ, কিন্তু ব্যোম বলতে অনেক কিছুকেই বোঝায়। ব্যোম বলতে আকাশও বোঝায় আবার অন্তরীক্ষকেও বোঝায়। ফিজিক্সের ভাষায় বলতে গেলে বলা হবে – there was neither space. পরের দিকে বলবে সময়ও ছিল না। এখন আকাশই নেই তাহলে শক্তি কোথা থেকে আসবে, শক্তি যে খেলা করবে, খেলার জন্য যে আকাশ দরকার সেই আকাশই নেই।

পরের লাইনে বলা হচ্ছে – *কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্*। আজকে যে সৃষ্টিকে দেখছি সেটা *কিমাবরীবঃ* কি দিয়ে আবৃত ছিল, *কুহ* কোথায় ছিল, *কস্য শর্মন্ অম্ভঃ* কার অধীনে ছিল। অম্ভঃ শব্দের অর্থ জল, হিন্দু পুরানে এটা একটা অদ্ভুত বিশ্বাস যে সব সৃষ্টি জল থেকে বেরিয়েছে। পৌরাণিক কাহিনীতে সৃষ্টির বর্ণনাতেও আমরা দেখতে পাই নারায়ণ ক্ষীরসাগরে শুয়ে আছেন, এই দৃশ্যটাই আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে যা কিছু সৃষ্টি সব জল থেকে এসেছে। এই জলের দ্বারা কিন্তু নদী বা পুকুরের জলের কথা বলা হচ্ছে না, অম্ভঃ হচ্ছে primordial water, এই অম্ভঃ শব্দটা আমাদের সৃষ্টির আদি তত্ত্বকে ইঙ্গিত করছে। আসলে প্রথম থেকে সমস্ত প্রাণীই জলের উপরে নির্ভরশীল হয়ে আছে, গাছ জল না পেলে শুকিয়ে যায়, মানুষ জল খেয়ে বেঁচে থাকে, আদিম কাল থেকে জলের বিরাট গুরুত্ব। সেইজন্য বেদে বলে অপো নারায়াণঃ, জলই নারায়ণ। এইখানে তাই যেমন বলছে বাতাস নেই, আকাশ নেই, তাহলে কোন্ জিনিষটা থেকে সৃষ্টিটা বেরিয়ে এল, তাই বলছে তাহলে কি সৃষ্টিটা primordial water থেকে বেরিয়ে এসেছে? তাহলে সেই দিব্য জল কোথায় ছিল? আমরা যখনই জিজ্ঞেস করি এটা কোথায় ছিল, তখন যেমন বলি গর্ভে ছিল, সব সমুদ্রের গর্ভে আছে। সেইজন্য বলে সৃষ্টিটা হিরণ্যগর্ভ থেকে বেরিয়ে এসেছে। হিরণ্যগর্ভ কোথায় ছিল? তখন বলছে প্রথমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে শুধু জল আর জল, সেই মহাজাগতিক দিব্য জলে (অম্ভঃ) হিরণ্যগর্ভ ছিল। এই জলকে কেউ দেখতে পায়না, সেখানে একটা সোনার ডিম ভাসছিল, তার নাম হল হিরণ্যগর্ভ, যা কিছু বেরিয়েছে সেখান থেকেই বেরিয়েছে। এটি বেদের খুবই প্রাচীন মত। *কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্,* ওটা কি গভীরে লুকিয়ে ছিল? যে ঋষি এই নাসাদীয়সূক্তম্ আবিষ্কার করেছেন, তিনি এইটা বলছেন।

তারপরের মন্ত্রে বলছেন – ***ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস।।২)*** – তখন মৃত্যুও ছিল না অমৃতও ছিল না। কেন ছিল না? এই প্রশ্ন হয়ই না। বন্ধ্যা নারীকে যেমন প্রশ্ন করা যায় না, তোমার কি সন্তান হয়েছে, সন্তান হলে ছেলে না মেয়ে হয়েছে? এই প্রশ্নের কোন অর্থই হয় না। খ্রীষ্ট ধর্মে ভগবানের একটা গুণের কথা বলা হয়, তারা বলে

ভগবান হচ্ছেন সর্বশক্তিমান, আর তিনিই সব কিছু সৃষ্টি করছেন, তিনিই হচ্ছেন সৃষ্টি কর্তা। এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে – ভগবান কি এমন একটা পাথর সৃষ্টি করতে পারবেন যেটা তিনি তুলতে পারবেন না। যদি এর উত্তরে বলে এই রকম পাথর তৈরী হয় না, তাহলে ভগবানের সৃষ্টির ক্ষমতা নেই বলতে হয়। যদি বলা হয়, না তিনি তুলতে পারবেন না, তাহলে ভগবান সর্বশক্তিমান নয়। এগুলো হচ্ছে অমূলক প্রশ্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ তো একটা ছোট পাথরই তুলতে পারতেন না, লুচি খেতে গিয়ে তাঁর হাত কেটে যেত।

প্রকেতঃ শব্দের অর্থ হচ্ছে ইঙ্গিত বা চিহ্ন করা। এমন কোন চিহ্ন ছিল না যেটা দিয়ে বোঝা যাবে এটা দিন না রাত। আমরা ভাবব এটা কি ধরণের কথা হল, হয় আলো থাকবে না হয় অন্ধকার থাকবে। মৃত্যু কোথায় আছে? যখন সৃষ্টি হয়ে গেছে সেখানে জন্ম-মৃত্যু হবে। সৃষ্টি মানেই দ্বৈত স্বরূপে চলে এসেছে। দ্বৈত মানে দিন থাকবে রাত থাকবে, সুখ থাকবে দুঃখ থাকবে, ধর্ম থাকবে অধর্ম থাকবে, পাপ থাকবে পূণ্য থাকবে, মৃত্যু থাকবে অমরত্ব থাকবে। যেই সৃষ্টির ওপারে চলে যাবে তখন নির্দ্বন্দ্ব, কোন দ্বৈত ভাব থাকবে না। দ্বৈতের পারে চলে গেলে কি থাকবে, দুই থাকবে না, একও থাকবে না আবার শূন্যও থাকবে না, কি থাকবে মুখে বলা যাবে না। অদ্বৈত মানে কখনই এক নয় দুইও নয়, অদ্বৈত মানে এক দুইয়ের পার। ঠাকুর বলছেন এক ঈশ্বর বই আর কিছু নেই। কিন্তু কোথাও তিনি বলেননি যে ঈশ্বর এক। আবার বলছেন তিনি এক দুইয়ের পার, কার্যও নেই কারণও নেই। সৃষ্টি এলেই তবে কার্য কারণ হবে, তখন দিন হবে রাত হবে। এখানে যে অবস্থার বর্ণনা হচ্ছে এটা ঠিক সৃষ্টির পূর্বের। উপনিষদে একটি খুব প্রচলিত প্রার্থনা মন্ত্র আছে যা আমরা নিত্য আবৃত্তি করি – *ওঁ অসতো মা সদ্‌গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাহমৃতং গময়।।* – আমাকে সৎ অসৎ এর পারে নিয়ে চলো আমাকে অন্ধকার থেকে আলোর পারে নিয়ে চলো, আমাকে মৃত্যু থেকে অমৃতের পারে নিয়ে চলো। এটিতো উপনিষদের মন্ত্র, কিন্তু এখানেতো দ্বৈতের কথা বলা হচ্ছে, যারা কিছুই বুঝবে না তাদের জন্য বলা হয়েছে। সাধারণ মানুষ তো সৎ অসতের পার বললে কিছুই বুঝবে না, আলো ও অন্ধকারের পার বললে কিছু ধারণাই করতে পারবে না। তাই প্রাথমিক স্তরে কিভাবে প্রার্থনা করতে হবে? তখন এইখান থেকে শুরু করা হয় – হে ভগবান আমার মন্দ বুদ্ধি দূর করে শুভ বুদ্ধি দাও, হে ভগবান আমার পাপ বুদ্ধিকে দূর করে ধর্ম বুদ্ধি দাও। এরপরে সাধনা করে যখন এগিয়ে যায় তখন বলে – হে প্রভু, আমি যেন পাপ-পূণ্যের পারে যেতে পারে, তুমি আমাকে ধর্ম-অধর্মের পারে নিয়ে চল। এইভাবে আগে তম ও রজ গুণকে অতিক্রম করে সত্ত্বগুণকে ধরতে হবে, সত্ত্বগুণকে না ধরতে পারলে সাধু পুরুষ হওয়া যায় না। সাধু পুরুষ হয়ে গেলেই সব হবে না, এরপরে লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে সত্ত্ব, রজ ও তম তিনটে গুণকেই অতিক্রম করে যেতে হবে।

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ – বলছেন দিন রাতের কথা ছেড়ে দাও সামান্যতম কিছুর আভাসও ছিল না, যাতে বোধ হবে কিছু আছে। স্বামীজী এর অনুবাদ করেছেন torch কিন্তু সঠিক শব্দ হবে indication, দিন ও রাতের যে ধারণা করেবে তারও কোন রকম আভাস ছিল না। একেই বলে কাব্য। প্রথমে বলছেন কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না, এবার বলছেন তার কোন রকম আভাসও ছিল না। যে ঋষিই এই নাসাদীয়সূক্তম্‌কে ছন্দোবদ্ধ করেছেন তিনি সত্যিকারের বিরাট উচ্চ মাপের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন।

এই অবস্থাটাকে অব্যক্তও বলা যাবে না। অব্যক্ত বললেই ব্যক্ত ভাবটাও এসে পড়ে, কিন্তু এখানে যে অবস্থার কথা বলা হচ্ছে তা হল ব্যক্ত অব্যক্তের পারের অবস্থা। অব্যক্ত বলতে সব সময় প্রকৃতি বা মায়াকে বোঝায়, ভগবানকে কখনই অব্যক্ত বলা যায় না। মায়া সব কিছুকে ব্যক্ত করে কিন্তু নিজে অব্যক্ত। ভগবান হচ্ছেন এই ব্যক্ত ও অব্যক্তের পার। এগুলো হচ্ছে সাধনা সাপেক্ষ, শুধু শুনলে বা শাস্ত্র পড়লে এই জিনিষগুলিকে কখনই ধরা যাবে না। যখন Theory of Probability, আইজেনবার্গের Uncertainty Principle প্রথম বেরোল, আইনস্টাইনের মত বিজ্ঞানীও ফালতু তত্ত্ব বলে Theory of Probability কে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, কারণ তিনিও মেনে নিতে পারলেন না যে এটাও হতে পারে আবার ওটাও হতে

পারে। আইজেনবার্গ নিজে যখন এই থিয়োরিকে ফরমুলেট করলেন, তাঁর নিজেরই মাথা ঘুরে গিয়েছিল, যখন এই থিয়োরিটা তিনি বার করলেন। তিনি নিজেই থিয়োরিটাকে দশ বছর চেপে রেখে দিয়েছিলেন। Uncertainty Principle বলছে A x B is not = B x A. এটাকে কেউ মানতে পারে? তাই তিনি দশ বছর চেপে রেখেছিলেন। সেই সময় খবর এল অঙ্কে Matrix Theory আছে যেখানে A x B is not = B x A হয়, সঙ্গে সঙ্গে তিনি এইটা ছেপে দিলেন। এখন তো এই থিয়োরি ক্লাশ নাইন টেনে পড়ান হয়। ছাপা হয়ে যাওয়ার পর আইনস্টাইনের মত সর্বশ্রেষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী পর্যন্ত মানতে পারলেন না, তিনি বললেন যে আমরা কি বিজ্ঞানের কথা বলছি না আগড়ুম বাগড়ুম কিছু কথা বলছি। কারণ তখন পর্যন্ত ফিজিক্স জানত যে A leads to B, B leads to C, so A leads to C, কিন্তু এখন বেরিয়ে গেল A leads to B, B leads to C but A does not lead to C, অথচ আজকে মেট্রিক্স থিয়োরি, uncertainty principle ক্লাশ নাইন টেনে পড়ান হচ্ছে। যে জিনিষটা আইনস্টাইন রাজী হননি সেই জিনিষ এখন ক্লাশ এইটের ছেলেরা পড়ছে। কারণ ব্রেণ এখন তৈরী হয়ে গেছে।

এই জিনিষ গুলিকে ধারণা করার জন্য দরকার প্রচণ্ড রকমের একাগ্রতা, গভীর চিন্তন, সূক্ষ্ম বুদ্ধি আর পবিত্রতা। আমাদের এগুলোর কোনটাই এখন হয়নি সেইজন্য শুনে বা পড়ে আমরা ধারণা করতে পারিনা। কথামৃতে ঠাকুরের অনেক কথা আছে যেগুলো ধারণা করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত দুঃসাধ্য। ঠাকুর বলছেন তিনি এক দুইয়ের পার। এখন কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় এক দুইয়ের পার বলতে কি বোঝায়, উত্তরই দিতে পারবে না।

মূল ব্যাপারটা হচ্ছে যে কোন জিনিষ যার উল্টোটাও হতে পারে তিনি সেটা নন। যখন অস্তিত্বের কথা আসবে তখন অনস্তিত্বের কথাও আসবে, তাই এখানে বলছে তিনি সৎও নন অসৎও নন, তিনি সৎ অসৎএর পারে। আছে আবার নেই এটাকে ধারণা করার জন্য বলেছেন একদিকে দিয়ে বলতে গেলে তিনি অব্যক্ত আরেক দিক দিয়ে গেলে বলতে হয় তিনি ব্যক্ত। অব্যক্তের ‘অ’ টাকে সরিয়ে দিলে এটা অব্যক্তও নয় আবার ব্যক্তও নয়। এগুলো শব্দের কোন খেলা নয়। এটাই হয়, এটা এই রকমই হয় আর যা এই সত্যটাকেই বলা হচ্ছে। যখন ধ্যানের গভীরে যাবে, যখন আমাদের আত্মানুভূতি হয়ে যাবে তখন পরিষ্কার এই সত্যটাই উন্মোচিত হয়ে যাবে। নাসাদীয়সূক্তম্ কোন সাদামাটা একটা বাংলা কবিতা নয়, আর মামুলি কবিতা হলে এইভাবে আমরা আলোচনাই করতাম না। কিন্তু এই কবিতাতে আধ্যাত্মিক সত্যের চরম তত্ত্ব গুলিকে শব্দ ও বাক্য দ্বারা বিন্যাস করা হয়েছে। ঠাকুরের কথায় আছে কাটায় হাত কেটে গেছে, দর্‌দর্ করে রক্ত ঝড়ছে আর বলছে আমার তো কিছু হয়নি। এই একই জিনিষের উল্লেখ পাই স্বামীজী যখন সেই কাহিনী বলছেন যেখানে আলেকজাণ্ডার একজন ঋষিকে ধরে বলছেন – তোমাকে আমার দেশে নিয়ে যাব, তুমি যদি আমার সাথে না যাও তাহলে তোমাকে হত্যা করে রেখে যাব। ঋষি বলছেন – তোমার জীবনে তুমি এর থেকে বড় মিথ্যা কথা কখন বলোনি। আমি আত্মা তুমি আমাকে মারবে কি করে? ঋষি ঐ অবস্থায় পৌঁছে গেছেন যেখানে তাঁর দেহটা আছে এই মাত্র। আলেকজাণ্ডার যদি বলত আমি তোমার দেহটাকে নাশ করে দেব, তাহলে ঋষি বলতেন হ্যাঁ বাপু তা তুমি পারবে, কিন্তু আমাকে কিভাবে মারবে, আমিতো আত্মা, আত্মাকে কেউ কখন কোন ভাবেই নাশ করতে পারে না। যাঁর এই আত্মানুভূতি হয়ে গেছে তাঁর শরীরের প্রতি সেই ভাবটাই হবে যে ভাবটা আমাদের জামা কাপড়ের প্রতি আছে। আমার জামাটা যদি কেউ ছিড়ে দেয় তাহলে আমার খারাপ লাগবে কিন্তু আমার দেহেরতো কিছু হবে না, কেননা জামাটা আলাদা আর আমার দেহটা আলাদা। ঠিক তেমনি যিনি আত্মজ্ঞানী তাঁর যদি দেহটা চলে যায় তাঁর কিছুই হবে না, দেহের সঙ্গে তাঁর একাত্ম বোধ যেদিন তাঁর আত্মানুভূতি হয়েছে সেদিনই নষ্ট হয়ে গেছে।

বেলুড় মঠে একজন মহারাজ ছিলেন তাঁর ক্যান্সার হয়েছিল। যেদিন তাঁর শরীর গেছে তার আগের দিন সবাই এসে ওনাকে বলছেন আপনার তো প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে, চলুন আপনাকে সেবা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাই। উনি অবাক হয়ে বলছেন – কষ্ট! কিসের কষ্ট! আমি সেই ব্রহ্ম, আমি সেই শুদ্ধ আত্মা আমার কিসের কষ্ট।

সবাই অবাক বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছেন। ক্যান্সারের ঐ মারাত্মক যন্ত্রণা কিন্তু কোন অনুভূতিই নেই। চিন্তা করা যায়! শরীর যাবার একদিন আগে এই কথা বলছেন – আমি সেই শুদ্ধাত্মা, আমি সেই ব্রহ্ম আমার কোথায় কষ্ট। শাস্ত্রের বাক্য মুর্ত কিভাবে হয় মহারাজকে ওই সময় যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই দেখেছিলেন।

এই যে এখানে বলছেন *ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি,* যাঁদের আত্মানুভূতি হয় তাঁরা ঠিক এই জিনিষটাকেই স্পষ্ট দেখেন। কিন্তু আমরা তো বুঝতে পারব না, তাই হাজারটা উদাহরণ দিয়ে দিয়ে একটু ধারণা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আচার্যের কাছে যা কিছুই শুনছি এগুলো হচ্ছে আচার্যের বাহ্যিক উত্তেজনার তরঙ্গগুলি তথ্য হয়ে আমাদের ভেতরে যাচ্ছে মাত্র, এতে আমাদের কোন অনুভূতিই হবে না, জ্ঞান যেটা হবে সেটা আমার ভেতর থেকেই হবে, বাইরে থেকে আসবে না। একটা জোক্‌কে যদি ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হয় তাহলে সেটাকে আর জোক্ বলে গণ্য করা হয় না। শাস্ত্র হচ্ছে ঠিক তাই। বলাটা আচার্যের কর্তব্য কিন্তু বোঝার ব্যাপারটা শিষ্যের।

প্রকেতঃ শব্দের অর্থ নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি, প্রকেতঃ হচ্ছে কোন কিছুর ইঙ্গিত দিচ্ছে, বা সূচনা করছে, ইংরাজীতে বলছে indication। এই indication কে দেখানোর জন্য এনারা সংস্কৃতে একটা শব্দকে খুব ব্যবহার করেন, তা হচ্ছে 'ইব', ইব মানে যেন, মত। শঙ্করাচার্য তাঁর গীতা ভাষ্যেও ঠিক এই কথাটাই বলছেন – যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তিনি মানুষ রূপ ধারণ করে যেন জন্ম গ্রহণ করেন। একেবারে পরিষ্কার করে তাঁরা জিনিষগুলিকে বলতেন না। কারণ ভগবানের জন্মকে পরিষ্কার ভাবে বলতে গেলে তিনি জাগতের বস্তু হয়ে যাবেন। মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা বললে কি হয় আমরা যেমন কানে শুনছি চোখে দেখছি, ঠিক এইভাবে জিনিষটা হচ্ছে না, ঠাকুর বলছেন তখন বোধে বোধ হয়। বেদের কিছু ভাবকে যখন আলোচনা করা হয়েছিল তখন বলা হয়েছিল কেন বেদ বোঝা খুব কঠিণ। তার মধ্যে একটা বলা হয়েছিল, যে ভাষা বেদে ব্যবহার করা হয়েছে তা অনেক পুরনো ভাষা, আর সেই ভাষা আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেই অপ্রচলিত হয়ে গেছে, তার মানে আরও কত পুরনো এর ভাষা। পাঁচশ বছর আগে ব্যবহৃত ভাষার অনেক অর্থই আমরা ধরতে পারিনা, আর বেদের ভাষা আড়াই হাজার আগেই ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেছে। সেইজন্য অনেক জায়গাতেই বোঝা যায়না ওনারা ঠিক কি বলতে চাইছেন। এর থেকেও বড় সমস্যা হচ্ছে, যে জিনিষটা ওনারা বলতে চাইছেন তকে মুখে কখন বলাই যায় না। সৃষ্টি তত্ত্ব, আত্মতত্ব, ঈশ্বরের স্বরূপ, মায়া এগুলো মুখে বলাই যায় না। যেটুকু তাঁরা যে ভাষাতে প্রকাশ করতে চাইছেন সেই ভাষাও আড়াই হাজার বছর আগে লুপ্ত হয়ে গেছে। আমাদের মত সাধারণ মানুষ কি করে বুঝবে এই সব ঋষিদের কথাকে। তাই আমাদের সায়নাচার্যের মত কিছু পণ্ডিতদের ভাষ্যের উপরেই নির্ভর করতে হয়। কিন্তু সায়নাচার্যকে আবার অনেকে মানেন না।

এখানে বলছেন যে সৃষ্টির আগের মুহুর্তে দিন আর রাতের কিছুরই বোধ নেই, ঘুণমাত্র যে বোধ হবে সেটাও ছিল না। যা কিছু দ্বন্দ্বমূলক সবটাকেই না করা হচ্ছে। যদি বলা হয় মৃত্যু ছিল না, তাহলে বলব অমৃত ছিল, দিন ছিল না, তাহলে রাত ছিল। না, কোনটাই ছিল না, মৃত্যুও ছিল না, অমৃতও ছিল না, আবার দিনও ছিল না রাতও ছিল না। পরিষ্কার করে বলছেন না যে দিন ছিল না রাতও ছিল না, বলছেন দিন ও রাতের কোন বোধ ছিল না। আমরা দিন ও রাত বুঝি কি করে? কতকগুলি লক্ষণ দেখে বুঝি যে এখন রাত বা দিন, কিন্তু এখানে বলছেন এই রকম কোন ধরণের লক্ষণই ছিল না যে বোঝা যাবে এটা রাত কিংবা দিন। এইটাই হচ্ছ প্রকেতঃ শব্দের সঠিক ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয় মন্ত্রের পরের লাইনে বলছেন – *আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস। আনীৎ অবাতং* তৎ *একম্ স্বধয়া* – এই লাইনটাতে পুরো নাসদীয়সূক্তের মূল বক্তব্যের কেন্দ্রীয় ভাবটাকে বলা হচ্ছে। যেন এই একটা বাক্যকে লেখার জন্যই পুরো নাসাদীয়সূক্তম্‌কে রচনা করা হয়েছে। এই

লাইনটা আর শেষে একটা লাইন আসবে যাতে নাসদীয়সূক্তমের মূল তত্ত্বকে তুলে আনা হয়েছে। এত গুরুত্বপূর্ণ এই লাইনটা যে পরের দিকে স্বামীজী যখন সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন বিশেষ করে যখন নিকোলা টেক্সলা বলে একজন বড় আমেরিকান বিজ্ঞানী, মূলতঃ তিনি ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তার সাথে স্বামীজী এই সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। টেক্সলা স্বামীজীর আলোচনাতে প্রচণ্ড প্রভাবিত হয়েছিলেন। যেখানে স্বামীজী বক্তৃতা দিতেন সেই জায়গাটা খুব ছোট ছিল, টেক্সলা কখনই ভেতরে গিয়ে বসতেন না, বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পুরো বক্তৃতা শুনে বেরিয়ে যেতেন। পড়ে যখন স্বামীজীর সাথে আলাপ হয় তখন স্বামীজী তাঁকে বেদান্তে যে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বলা হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। টেক্সলা সেই আলোচনা শুনে খুব উৎসাহিত হয় বললেন 'পৃথিবীর যত ধর্মে যত সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে বলা হয়েছে সবই গালগপ্প মনে হয় কিন্তু আপনি যে তত্ত্বটা সৃষ্টি সম্বন্ধে বললেন সেটাকে বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত করা যায়। আপনি যেটা বলছেন সেটাকে আমি অঙ্কের মাধ্যমে প্রমাণিত করে দেব'।

পরবর্তি কালে টেক্সলা এই নিয়ে অনেক লেখালেখি করেছিলেন, আর স্বামীজীও এর পরে বেশি দিন দেহে ছিলেন না, তাই টেক্সলা কতটা কি করতে পেরেছিল আমাদের কাছে সঠিক ভাবে জানা নেই। কিন্তু পরে আইনস্টাইন যখন $E = MC^2$ আনলেন, সেই সময় তাঁর টেক্সলা বা স্বামীজীর সঙ্গে আইনস্টাইনের কোন রকমের সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু দেখা যায় সবারই একই ধরণের চিন্তা এখানে এসে মিলিত হচ্ছে। স্বামীজী যেটা বলতে চাইছিলেন, টেক্সলা যাকে গণিতের মাধ্যমে প্রমাণ দিতে চেয়েছিলেন, আইনস্টাইন যেটা দাঁড় করালেন, সবটাই একই ভাবের আবর্তের মধ্যে ঘুরছিল। আইনস্টাইনের থিয়োরি যখন এসেছিল সেই সময় স্বামীজী যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই বলতেন এটা বেদান্তের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

এখানে যে তিনটে শব্দ আমরা পাচ্ছি 'আনীৎ', 'অবাতং' ও 'স্বধয়া', এই তিনটে শব্দকে দর্শনের বিভিন্ন শাখার পণ্ডিতরা নিজেদের মত ব্যাখ্যা করে দেবেন। আনীৎ আসছে আন্ ধাতু থেকে, মানে নিঃশ্বাস নেওয়া, অবাতং এর অর্থ হচ্ছে যার নিঃশ্বাস নেই, তাহলে 'আনীদবাতং' এর অর্থ হচ্ছে যার নিঃশ্বাস নেই সে নিঃশ্বাস নিল, মানে যে নিঃশ্বাস নিতেই পারেনা, সে নিল নিঃশ্বাস। 'স্বধা' এই শব্দটাও অনেক জটিলতার সৃষ্টি করে। স্বধা শব্দের নানা রকমের অর্থ করা যেতে পারে, প্রথমে বলা যায় প্রকৃতি, স্বধয়া হচ্ছে নিজের যে প্রকৃতি সেই প্রকৃতির অনুসারে। স্বধা শব্দের অর্থ মায়াও হতে পারে, স্বধয়া মানে নিজের মায়ার দরুণ। স্বধা আবার শক্তিকেও বোঝায়। স্বধয়া শব্দের অর্থ তিন রকমের পাচ্ছি – প্রকৃতি, মায়া ও শক্তি। প্রথমে বলেছিলেন তখন সৎও ছিল না অসৎও ছিল না, মৃত্যু ছিল না অমৃতও ছিল না, সেইখান থেকে এসে বলছেন তিনি একা ছিলেন তৎ একম্। তিনি একা কি ভাবে রয়েছেন? তিনি নিঃশ্বাস নিচ্ছেন না, তারপরেই বলছেন আনীত, তিনি নিঃশ্বাস নিলেন। কিভাবে নিঃশ্বাস নিলেন? স্বধয়া, যেহেতু এই স্বধয়ার তিন রকম অর্থ হতে পারে তাই বলা যায় তিনি নিজের প্রকৃতির দ্বারাই শ্বাস নিচ্ছেলেন, আবার মায়াতে মনে হচ্ছে তিনি যেন শ্বাস নিচ্ছেন, অথবা তিনি নিজের শক্তির দ্বারা নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন। ভারতে যে কটি আধ্যাত্মিক দর্শন বেরিয়েছে সব এই একটা শব্দকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছে। যখন স্বধয়াকে প্রকৃতি বলছে তখন সাংখ্য দর্শন এসে যাবে, সাংখ্য দর্শনের সাথে যোগদর্শনও এসে যাবে। যখন স্বধয়াকে মায়া অর্থে বলবে তখন বেদান্ত এবং বেদান্তের সঙ্গে জড়িত যত দর্শন হতে সব দর্শনকে বোঝাবে। আবার যখন স্বধয়ার অর্থ করবে শক্তি তখন তন্ত্রদর্শন এসে যাবে আর যে কোন ভক্তিমার্গ বিশেষ করে যেই ভক্তিতে শক্তিকে মানা হয়, সব দর্শন এসে যাবে। অধ্যাত্ম রামায়ণে বলা হচ্ছে সীতা হচ্ছেন শ্রীরামচন্দ্রের শক্তি, এই ধরণের যাবতীয় শাস্ত্র যেখানে এইভাবে শক্তির স্থান করে দিচ্ছে সব শাস্ত্র মান্যতা পেয়ে যাচ্ছে এই একটি কথার জন্য।

আমরা অনেক সময় ভাবি হিন্দুদের এত দর্শন কেন সৃষ্টি করা হয়েছে। এর উত্তর এইখানে এসে পাওয়া যাবে। একটি মাত্র শব্দ তার অর্থ যেভাবে করা হয়ে সেই ভাবে একটা করে দর্শনের আলাদা একটা

শাখা তৈরী হয়ে যাবে। যদি দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত আর অদ্বৈত থেকে তিন জন পণ্ডিতকে দাঁড় করিয়ে গীতার বা উপনিষদের একেকটা শ্লোক বা মন্ত্রকে বিশ্লেষণ করতে বলা হয় তখন দেখা যাবে প্রত্যেকেই যুক্তি দিয়ে অর্থ দিয়ে দেখিয়ে দেবেন যে এই শ্লোকটা তাঁর মতটাকেই প্রতিষ্ঠিত করছে।

এই নাসদীয়সূক্তমের এই লাইনটাকে স্বামীজী যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে দেখা যাবে যে তিনি চতুর্থ আরেকটা তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে দিলেন, যদিও এটা মায়া তত্ত্বের খুব কাছাকাছি। বলছেন - তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউ নেই, তিনি আছেন আর তাঁর স্বভাব আছে, দ্বিতীয় আর কোন সত্তা এখানে নেই। পরের দিকে এসে স্বামীজী একটা তত্ত্বকে দাঁড় করালেন তাতে তিনি আকাশ আর প্রাণকে নিয়ে এলেন। এখানে যে কবিতাটাকে তিনি অনুবাদ করলেন সেখানে বললেন The one breathed windlessly। পরবর্তি কালে স্বামীজী যখন বক্তৃতায় তাঁর অভিমতকে ব্যক্ত করছিলেন সেখানে তিনি প্রায়ই নাসদীয়সূক্তমের এই লাইনটা উল্লেখ করেছেন। সচ্চিদানন্দ হচ্ছেন শুদ্ধ আত্মা, শুদ্ধ আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই। এই যে শুদ্ধ চৈতন্য রয়েছেন, কোন একটা রহস্যময় নিয়মের কারণে, তাঁর মাঝখানে যেন একটা বিভাজন রেখা এসে যায়, রেখার এই পারে যেন পদার্থ ও শক্তির জন্ম হয়ে যায়। মজার ব্যাপার হচ্ছে তখনও কিন্তু আইনস্টাইনের জড় আর শক্তি অভেদ এই তত্ত্ব আবিষ্কার হয়নি, অথচ স্বামীজী বার বার কিন্তু বলছেন জড় আর শক্তি এক, দুটোর মধ্যে কোন রকম পার্থক্য নেই। আসলে এটাই কিন্তু আমাদের প্রাচীন বৈদিক যুগের তত্ত্ব। এই জড়কেই আমাদের চিরাচরিত ভাষায় বলা হয় আকাশ, এই আকাশ আমাদের মাথার উপরে যে আকাশ দেখি সেই আকাশের কথা কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে না। আকাশ হচ্ছে যা কিছু জড় পদার্থ আছে তার অত্যন্ত সূক্ষ্ম অবস্থা। এই সূক্ষ্ম কণা সর্বত্রই আছে। যেখানেই আকাশ সেইখানেই বুঝতে হবে এই সূক্ষ্ম জড়কণা রয়েছে। যেখানেই space আছে সেখানেই আকাশ থাকবে, তাই আকাশ বলতে আমরা যে space বুঝি, এতে কোন ভুল নেই। কারণ এই যে particles আছে এটাকে কখন অনুবাদ করা হয় Space Particles কখন অনুবাদ করা হয় Ether Particles আবার এগুলোর সংশয় থেকে বাঁচার জন্য সোজা আকাশ বলে দেয়। তার কারণ আকাশ শব্দের এই ধরণের তত্ত্ব বা ধারণা যে হতে পারে এটা আর কোন দর্শনে নেই। বৈদিক ধারণায় আকাশকে যে অর্থে ব্যবহার করা হয় এটা না space না ঈথার। আকাশকে তাই আমরা আকাশ বলেই উল্লেখ করব যার অর্থ হচ্ছে জড়ের অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনু আর যাবতীয় যা কিছু আছে সবই এই আকাশ অনু থেকেই সৃষ্টি হয়। এই আকাশ থেকে একটা অন্য আকার নিচ্ছে যেটা আগেরটা থেকে একটা স্থূল, তার থেকে আরেকটা হতে হতে সব শেষে আমরা এই জগতের যা কিছু দেখছি সব সৃষ্টি হয়েছে। যেখানেই space সেখানেই আকাশ আবার যেখানেই আকাশ সেখানেই space।

একটা বেলুনে যখন আমরা ফু দিয়ে বড় করতে থাকি তখন বেলুনটা আয়তনে বাড়তে থাকে। যদি জিজ্ঞেস করা হয় কোথায় বাড়তে থাকে বেলুনের ভেতরের আকাশটা? তার উত্তর হবে আকাশে। আকাশটা এখানে কিভাবে তৈরী হচ্ছে? বাতাস দিয়ে, বাতাস হচ্ছে air particles. কিন্তু ফোলান বেলুনটি আকাশের ফাঁকা জায়গার মধ্যেই সে ফুলেছে, এই আকাশের ক্ষেত্রে তা হয় না। একটা super space ছিল তার মধ্যে আরেকটা নতুন space তৈরী হয়েছে তা নয়। কিছুই ছিল না, যাই থাকুক এই মন দিয়ে সেটাকে ধরা যাবে না, কারণ ওটা মনের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ঠিক এটাই আধুনিক ফিজিক্স বলছে। এখন ফিজিক্স বলছে একটা সময়ে এই আকাশের সৃষ্টি হয়েছিল, একই সময় আকাশ, সময় ও পদার্থ সৃষ্টি হয়েছে। আর এই তত্ত্বকেই নাসাদীয়সূক্তম্ বলতে চাইছে। কত সময়ের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এই আকাশ, কাল আর পদার্থের? ফিজিক্স বলছে এই সেকেণ্ডকে যদি একের পিঠে কোটি কোটি শূন্য লাগিয়ে দেওয়ার পর যে সংখ্যা হবে সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যত সেকেণ্ড হবে সেই সময়টুকুর মধ্যে এই সৃষ্টি হয়েছে। এত দ্রুত পদ্ধতিতে হয়েছে যে তাকে ধারণা করা দূরে থাক, আমরা কল্পনাতেও আনতে পারব না।

যাই হোক, সৃষ্টির পরে তারপরে গোটা ব্রহ্মাণ্ড নিজেকে বিস্তার করতে থাকে। এখন ব্রহ্মাণ্ড যে বিস্তার হচ্ছে, কোথায় বিস্তার হচ্ছে, কিসে বিস্তার করছে? বিজ্ঞানীরা এর উত্তর জানে না। বিজ্ঞানীরা এখন

অনেক হিসেব করে বলছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাইরে কি আছে আমরা কি করে বলব। আর বেদে অনেক কাল আগেই বলে দিয়েছে এটা আলোচনাই হয় না, কেউই বলতে পারবে না। এই প্রশ্ন তোলাই যাবে না। এই প্রশ্ন নিয়ে যদি তোমাকে চলতে হয় তাহলে তোমার জন্য এগুলো নয়, আর এর উত্তরও তুমি কোন দিন পাবে না।

স্বামীজী জড়কে আকাশ আর শক্তিকে প্রাণ বলে সম্বোধন করে বললেন এই প্রাণ বিভিন্ন ভাবে পরিবর্তিত হতে থাকল। আকাশ ও প্রাণ একই, এই দুটো পৃথক কোন কিছু নয়, যমজ ভাইয়ের মত। আকাশ ও প্রাণের একই সাথে উৎপত্তি হয়েছিল। উৎপত্তি হওয়ার পরে প্রাণ আকাশের উপরে আঘাত করতে থাকল, শক্তির ধর্মই এইটা। এইটাই বলছে আনীত অবাতং, নিঃশ্বাস ছাড়তে শুরু করল। কিসের উপরে? মানে আকাশ, আকাশের উপরে। এইটাকেই স্বামীজী বলছেন প্রাণ আকাশের উপরে আঘাত করতে শুরু করল। কোথা থেকে এল এই আকাশ ও প্রাণ? বলছে সেই চৈতন্য কোন এক প্রক্রিয়াতে এই আকাশ ও প্রাণে রূপান্তরিত হয়েছে। কি সেই প্রক্রিয়া? সেইটাই আমরা কেউ জানিনা। এইটাকেই আমাদের বেদের ঋষিরা স্বধয়া বলছেন। এটাকেই মায়া বলছে, এটাকেই কেউ প্রকৃতি আবার কেউ শক্তি বলছে। শক্তি, প্রকৃতি বা মায়া কার? সেই চৈতন্যেরই। সেই চৈতন্য তাঁর শক্তিতে এই আকাশ ও প্রাণের সৃষ্টি করে দিচ্ছে। সৃষ্টি হতেই প্রাণ আকাশের উপরে আঘাত হানতে শুরু করল আর তারপরেই এই জগতের সৃষ্টি হতে শুরু করে দিল। পদার্থ থাকলে সৃষ্টি হতে কত আর সময় লাগবে। এইটাই হচ্ছে সৃষ্টির ব্যাপারে ঋকবেদের বক্তব্য। তদেকং, তিনি একাই আছেন, এক ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই। আর স্বধয়াকে যদি মায়া বলা হয় তাহলে এই যা কিছু দেখছি এগুলোকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারে কারণ এটা মায়া। আর যদি স্বধয়াকে প্রকৃতি বলেন, তাহলে এইটাই তাঁর স্বভাব।

গীতার সপ্তম অধ্যায়ে এসে ভগবান বলছেন – আমার দুই রকমের প্রকৃতি – পরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতি। গীতা নতুন কিছু বলছে না, বেদের এই তত্ত্বগুলিকেই বলা হচ্ছে। এই আকাশ ও প্রাণ স্বামীজীর খুব প্রিয় বিষয় ছিল। এই একটা লাইনের মাধ্যমে বেদ সমস্ত সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলে দিল। কেউ যদি বলে হিন্দু ধর্মের সৃষ্টির সম্বন্ধে কি বিশ্লেষণ আছে? তখন এই লাইনটা বলে দিলেই হবে – *আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং*, বায়ু ব্যতিরেকেও তিনি প্রাণক্রিয়া করছিলেন, আর তিনি নিজের মায়া বা প্রকৃতি বা শক্তির সাথে অভিন্ন হয়ে এই কার্য করছিলেন। এর বাইরে আর কোন প্রশ্ন করা যায় না। এই আপেক্ষিক জগতের মধ্যে থেকে অনন্তের চিন্তা করাই যায় না। ঠাকুর যেমন বলছেন – এক সের ঘটিতে কি পাঁচ সের দুধ ধরে। আমাদের তো এই এতটুকু বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি দিয়ে আজকে ডালের সঙ্গে কি ভাজা খাব এই চিন্তাতেই আমাদের বুদ্ধি খরচ হয়ে যায় এরপর আবার সর্বব্যাপী অনন্ত চৈতন্যকে নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি। আমাদের যতটুকু বুদ্ধি তাই দিয়েই এই স্বধয়াকে বিচার করব, যদি বলি সবই ঠাকুরের লীলা তখন স্বধয়া মানে হয়ে যাচ্ছে শক্তি, আবার যদি তাঁর লীলাকে উড়িয়ে দিয়ে বলি সব মায়া, সব ফালতু, মিথ্যা, তখন হয়ে যাচ্ছে মায়া। আবার যদি বিজ্ঞান সম্মত ভাবে বিচার করে মীমাংসা করতে যাই তখন আমাদের সাংখ্যের প্রকৃতি তত্ত্বের আশ্রয় নিতে হবে। তখন আবার প্রকৃতিকে বলবে ত্রিগুণাত্মিকা সত্ত্ব, রজ ও তম। সেই আকাশের উপরে প্রাণ আঘাত করতে সেখান থেকে বেরোল মহৎ, মহৎ থেকে এল অহঙ্কার, সেই অহঙ্কার থেকে বেরোবে সূক্ষ্ম তন্মাত্রা, সূক্ষ্ম তন্মাত্রা থেকে বেরোবে স্থূলভূত, এই স্থূলভূতের আবার পরস্পরে মিশ্রণ হতে থাকবে, মিশ্রণ হতে হতে ইলেক্ট্রন প্রোটনাদির সৃষ্টি হবে। সেইজন্য সাংখ্যবাদীদের কাছে সৃষ্টিটা মিথ্যা নয় এটা হচ্ছে বাস্তব। ফিজিক্সের থিয়োরি গুলিও সাংখ্যযোগে খাপ খেয়ে যাবে কিন্তু একটা অবস্থার পর ফিজিক্স থেমে যাবে কিন্তু সাংখ্য ও যোগ থেমে থাকবে না, সে আরো এগিয়ে এগিয়ে যাবে।

এই যে *তদেকং* বলছে, *একম্* বলা হচ্ছে মানে তিনি একাই ছিলেন, কাকে নির্দেশ করা বলা হচ্ছে তিনি একাই ছিলেন? তার আগে বলা হয়েছিল আনীদবাতং, নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন না। এতক্ষণ ধরে আমরা যত আলোচনা করে এসেছি সব কিছু মাথায় রেখে বলা যেতে পারে এখানে এই একটা লাইনে এসে পুরো

ব্যাপারটাকে সাংখ্যের প্রকৃতির বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন আমরা এই *একম্*কে পুরো ব্রহ্ম, মায়া ও জীবজগৎ বলছি বা শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর শক্তি ও জগতের ব্যাখ্যা করলাম, ঠিক তেমনি *একম্*কে চৈতন্য না বলে সব ব্যাপারটাকে প্রকৃতি বলে দিলাম। *তদেকং*, সে একা, কে একা? প্রকৃতি। *অবাতং* নিঃশ্বাস নিচ্ছে না, *আনীদ* নিঃশ্বাস নিল, নড়ে চড়ে উঠল। এখন কেন প্রকৃতি নড়ে চড়ে উঠল সেটা অন্য জায়গার কথা। আমাদের যে ছয়টি দর্শন আছে তার মধ্যে সাংখ্য হচ্ছে অন্যতম, সাংখ্যকে সমস্ত দর্শনের জননী বলা যেতে পারে।

সাংখ্য দর্শনের মূল বক্তব্যটা সংক্ষেপে হচ্ছে, সাংখ্য মতে পুরুষ আছেন, এই পুরুষ আমাদের নারী-পুরুষের পুরুষ নয়, চৈতন্য স্বরূপকে পুরুষ বলা হচ্ছে। সাংখ্যে পুরুষ শব্দ যখনই আসবে তখন আমাদের মধ্যে যে আত্মা বা চৈতন্য আছেন অথবা বিরাট যে ঈশ্বর বা ভগবান রয়েছেন তাঁর কথা বলা হচ্ছে। সাংখ্যের পুরুষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে নির্বিকার, নিষ্ক্রিয় সৃষ্টির ব্যাপারে এর কোন মাথা ব্যাথা নেই। ঠাকুর সাংখ্যের এই পুরুষ তত্ত্বকে বোঝাবার জন্য খুব সুন্দর করে বলছেন – বিয়ে বাড়িতে গিন্নি সব কাজ করে যাচ্ছেন, যে পুরুষ বা বাড়ির কর্তাটি আছেন সে বসে বসে শুধু ভুরুর ভুরুর করে তামাক টেনে যাচ্ছেন, আর গিন্নি মাঝে মাঝে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এসে কর্তাকে সব খবর দিয়ে যাচ্ছে। সাংখ্যের পুরুষও কোন কাজ করে না। তাহলে কে কাজ করছে? সৃষ্টিতে প্রকৃতিই সব। এই প্রকৃতি হচ্ছে আবার জড়, তার আবার নড়াচড়া করার কোন ক্ষমতা নেই, চুপচাপ পড়ে থাকবে। কিন্তু হঠাৎ পুরুষ যখন এই জড় প্রকৃতি কাছে চলে আসে, যদিও প্রশ্ন করা হয় যে, পুরুষ আসে কি করে, কারণ পুরুষতো নড়বে চড়বে না, তা যেভাবেই হোক প্রকৃতির কাছে পুরুষ এলেই জড় প্রকৃতি নড়ে চড়ে ওঠে।

মনে করা যেতে পারে বাচ্চারা যে গুলি খেলে, সেই রকম অনেক গুলিকে পর পর সাজিয়ে জড় করে রাখা হয়েছে। কেউ একটা ফুঁ মারলেই গুলিগুলো নড়ে যাবে, যেমনি নড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে গুলিগুলো লাফাতে লাফাতে এদিক ওদিক সারা জায়গায় ছড়িয়ে যাবে। প্রকৃতিতেও এইভাবে একটার পর একটা বিবর্তন হতে থাকে। এই যে পুরুষ যে নির্বিকার ছিল সে এখন প্রকৃতির এই খেলা দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে যায় – কি সুন্দর আলো, কি সুন্দর বাতাস, কি সুন্দর রঙ। এইভাবে পুরুষ প্রকৃতির খেলা দেখতে থাকে আর প্রকৃতিও পুরুষকে যত রকমের খেলা দেখানোর আছে সেও নানা খেলা দেখাতে থাকে। তারপর যখন পুরুষ বলে আমার আর খেলা দেখতে ইচ্ছে করছে না, আমার কিছুতেই কোন প্রয়োজন নেই, তখন প্রকৃতি পুরুষকে ছেড়ে দেয়, প্রকৃতি আবার জড় হয়ে শুয়ে পড়ে। সাংখ্য মতে এই হচ্ছে সৃষ্টির ব্যাখ্যা। এই যে এখানে বলছে *আনীদবাতং স্বধয়া*, মানে সে এখন নিজের প্রকৃতিতে পড়ে আছে। *অবাতং* নিঃশ্বাস নিচ্ছে না, জড় হয়ে পড়ে আছে, *আনীদ*, হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে নড়ে চড়ে উঠল, যে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল না সে নিঃশ্বাস নিয়ে নিল। মানে সৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। এই একটা লাইনের অর্দ্ধাংশ ভারতের সমস্ত দর্শনের চাবিকাঠি, শুধু সে কিভাবে ব্যাখ্যা করবে আর সেই ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে বলে দেবে সে কোন্ দর্শনের কথা বলতে চাইছে। যে কোন দর্শনকে দাঁড় করাতে গেলে সৃষ্টির তত্ত্বকে তার ব্যাখ্যা করতেই হবে। আর সৃষ্টির কথা বলতে গেলে '*আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং*' এই বাক্যটাকে ব্যাখ্যা করতে হবে। প্রথম কথা মনে রাখতে হবে দুটো আলাদা সত্তা নেই, প্রথমে দুই আছে বলা যাবে না। *স্বধয়া তদেকং*, নিজে থেকেই হবে ওর বাইরে থেকে কিছু হবে না, বাইরে থেকে কেউ এসে মনে করিয়ে দিল আর নিঃশ্বাস নিতে আরম্ভ করবে, তা কখন হবে না। আকাশ ও প্রাণকে থাকতে হবে অথচ কিন্তু সমগ্র ব্যাপারটাই হচ্ছে একের খেলা। ভগবান এসে মাটির ঢেলা দিয়ে মানুষ তৈরী করলেন মানে ভগবান ও মাটি এই দুটো আলাদা জিনিষ থাকছে, এগুলো হচ্ছে বাচ্চাদের কল্পনা, অবশ্য কোন কোন ধর্মে সৃষ্টি এইভাবেই হয় বলে মনে করা হয়। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে এই ধরণের তত্ত্ব কখনই গ্রাহ্য হবে না। তাহলে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এরা কি করে ব্যাখ্যা করছে? এরা বুদ্ধি দিয়ে নিজেদের মত করে ব্যাখ্যা করে দেবে। কিন্তু এটাই হচ্ছে নাসদীয়সূক্তমের

সৃষ্টির ব্যাপারে জটিল তত্ত্বের সংজ্ঞা, বিশেষ করে আমরা যে সৃষ্টি তত্ত্বের কথা আলোচনা করছি তার মূল বক্তব্যই হচ্ছে এইটা – *আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং*।

এই লাইনটা একাধারে বলে দিচ্ছে প্রকৃতি একটার পর একটা কিভাবে নিজেকে বিস্তার করছে, আবার বলে দিচ্ছে ব্রহ্ম তাঁর মায়াকে আশ্রয় করে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করছে, এই সৃষ্টিকে আমরা সত্য বলেও মনে করতে পারি আবার মিথ্যা বলেও উড়িয়ে দিতে পারি তাতে কিছু যায় আসে না। আবার এই লাইনটাকেই শিব আর শক্তির খেলা বলে গ্রহণ করতে পারি। যেভাবেই সৃষ্টিকে নিই না কেন এই *আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং* এই তিনটে শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করে দেওয়া যেতে পারে।

তারপরেই বলা হচ্ছে *তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস*, মানে এই *তদেকং* মানে তিনি ছাড়া আর কিছু ছিল না। এই একের পারে আর কোন যে সত্তা থাকতে পারে এই তত্ত্বকে এখানে সম্পূর্ণ ভাবে প্রত্যাখ্যান করা হল। যদি শুধু শক্তিকেও নিই তাহলেও কিন্তু শিব এসে যাবে আর ভগবান শিব আর তাঁর শক্তি আলাদা কিছু নয়। ঠাকুর বলছেন – অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি, দুধ আর তার ধবলত্ব এরা কেউ আলাদা নয়। আমাদের মত সাধারণ মানুষ, যাদের কাছে দর্শনের তত্ত্ব দুর্বোধ্য মনে হয়, তারা বলেন শিব আছেন আর তাঁর শক্তি আছে, এঁরা দুজনে মিলে সৃষ্টির খেলা শুরু করে দেন। কিন্তু শিব আর শক্তি অভেদ, তন্ত্রেও বলছে সচ্চিদানন্দেকম্, সেই সচ্চিদানন্দই আছেন।

সায়নাচার্য ছিলেন ঘোর অদ্বৈতবাদী, এইখানে এসে তিনি সাংখ্য মতকে তীব্র আক্রমণ করে বলছেন – সাংখ্য বলে কোন দর্শন হতেই পারে না। তিনি বলছেন – সৃষ্টির আগে নিজেকে যে আশ্রয় করে আছে কিন্তু এখানে প্রকৃতি কাকে আশ্রয় করে আছে? কাউকেই প্রকৃতি আশ্রয় করে নেই, তাই সাংখ্য দর্শন বলে দর্শন হতেই পারে না। কিন্তু সাংখ্যবাদীরা এর উত্তরে বলে – সে নিজেকে আশ্রয় করে আছে আকাশ ও প্রাণ পরস্পর আশ্রয় করে আছে, সমস্ত কিছুই প্রকৃতিকেই আশ্রয় করে আছে।

বিজ্ঞান যখন সৃষ্টির কথা বলে তখন তারা বিগব্যাং আর ব্ল্যাকহোলের কথা বলে। বিগব্যাং হচ্ছে মহাজাগতিক বিস্ফোরণের পর সৃষ্টির বিস্তার, আর ব্ল্যাকহোল হচ্ছে যখন সৃষ্টি প্রলয়ের পর সঙ্কুচিত হতে হতে একটা পয়েন্টে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। বিগব্যাং এর প্রবক্তারা এই তত্ত্বটাকে গাণিতিক নিয়মে হিসেব করেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যখন সঙ্কুচিত হতে থাকে তখন এনার্জি তাকে ধরে থাকে, আর প্রত্যেক পদার্থ একে অপরকে টানে, যখন টানতে থাকে তখন ছোট হতে থাকে। ছোট হতে হতে একটা বিন্দুর মত আকৃতিতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সঙ্কুচিত হয়ে যায়, কারণ পদার্থ এত চাপতে থাকে যার ফলে এত ঘনত্ব বেড়ে যায় যে কল্পনাই করা যায় না, আলোও সেখান থেকে বেরোতে পারে না। এরই বিভিন্ন অবস্থায় অনেক রকম নাম হয়ে থাকে, কখন হোয়াইট স্টার, কখন রেড স্টার, কখন ব্ল্যাকহোল ইত্যাদি। এখন একটা জিনিষের উপর যত চাপ পড়বে তত তার তাপ মাত্রা বাড়তে থাকবে। এইভাবে তাপমান একটা অবস্থা পর্যন্ত সহ্য করবে তারপরে সে বুম্ করে ফেটে পড়বে। যখন ফাটছে তখন এটাকে বলছে বিগব্যাং। তারপর বিস্তার হতে হতে যখন এনার্জি শেষ হয়ে যাবে তখন আবার সঙ্কুচিত হতে থাকে। সঙ্কুচিত হতে হতে যখন ব্রহ্মাণ্ড যখন একটা বিন্দুর আকার ধারণ করছে তখন দূরত্বের পরিমাপ শূন্য হয়ে যায়। দূরত্ব যখন শূন্য হয়ে যায় তখন তার রেজাল্ট হয়ে যায় অনন্ত। সেইজন্য বিজ্ঞানীরা বলে একটা সীমার পর কি হচ্ছে আমরা বলতে পারব না। ফিজিক্সে এর নাম হচ্ছে পয়েন্ট অফ সিঙ্গুলারিটি। এই পয়েন্টের আগে কি হচ্ছে বিজ্ঞান বলতে পারেনা। ঠিক এই কথাই ঋকবেদের এই নাসদীয়সূক্তমের শেষের দিকে বলছে – *যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ*। যিনি অধ্যক্ষ, অর্থাৎ ভগবান তিনিও এই সৃষ্টির কার্য জানেন কি জানেন না আমাদের জানা নেই। ঋষিরাও এই কথা বলছেন, কারণ যা আছে সেটা মুখে বলা যাবে না। বিজ্ঞানীর কেন বলতে পারছে না? কারণ সমস্ত গাণিতিক নিয়ম, ফিজিক্সের নিয়ম, নিউটনের থিয়োরি, আইনস্টাইনের থিয়োরি, কোয়ন্টাম থিয়োরি সব এখানে এসে হারিয়ে যাচ্ছে, ভেঙ্গে পড়ছে। তাই বলে কি

আমরা বলতে পারি যে বিজ্ঞানের সমস্ত নিয়ম অযৌক্তিক যেহেতু এদের কোন নিয়মই এখানে এসে দাঁড়াতে পারছে না। কখনই তা বলতে পারব না। কারণ সবারই একটা সীমা আছে, এদের সবারই সীমিত ক্ষমতা। ঐ ক্ষমতার বাইরে এরা কখনই যেতে পারেনা।

সংস্কৃতে মেধাকে ব্যাখ্যা করা হয় গ্রহণ, ধারণম্ ও সামর্থম্ এই তিনটে দিয়ে। মেধাবী পুরুষ কে? যিনি একটা জিনিষকে গ্রহণ করতে পারেন, শুধু গ্রহণ করলেই হবে না, তাকে ধারণা করতে পারতে হবে। এই সৃষ্টি তত্ত্বের যাবতীয় যত ব্যাখ্যা করা হচ্ছে এগুলিকে যে গ্রহণ করে ধারণা করতে পারছেন তিনি মেধাবী, যদি মনেও রাখতে পারছেন তাহলে তিনি আরও উচ্চতম মেধাবী। মেধা মানেই তাই। কিন্তু আমাদের মেধা শক্তি খুবই সামান্য, তাই আমাদের শুধু এখন শুনেই রাখতে হবে।

সৃষ্টির সময় কি ছিল সেটা বলবে কে? কারণ সেটাকে দেখার জন্য তখন তো সেখানে কেউ ছিল না। একটা অবস্থার পর আমাদের মন বুদ্ধি কোন কাজ করবে না, যেখানে এসে বিজ্ঞানের সব থিয়োরি, নিয়ম ভেঙ্গে যায়। এই জায়গাটাকেই বলছেন তখন মৃত্যু ছিল না, অমৃত ছিল না, তখন দিনও ছিল না রাতও ছিল না। কিন্তু একটা কিছু ছিল, তাই *তদেকম্* বলছেন, একটা কিছু ছিল না বললে বলতে হবে শূন্য ছিল, আর শূন্য থেকে সব সৃষ্টি হয়েছে। এই যে এখানে এক বলছে সেই এক কিন্তু একজন সত্তা বলে বলা হচ্ছে না, এই এক সৎ ও অসতের পারের অবস্থাতে অবস্থান করেছিলেন। যেই মুহূর্তে তাকে সৎ বলব তখন আর এই জগতের আধ্যাত্মিক সত্তা থাকবে না। তখন এই জগৎ হয়ে যাবে পদার্থ সর্বস্ব ব্রহ্মাণ্ড, যেটা বিজ্ঞান সব সময় বলছে। যদি বলি তিনি অসৎ অবস্থাতে অবস্থান করেছিলেন তাহলে তখন বৌদ্ধদের শূন্যবাদ এসে যাবে। তখন বলতে হবে শূন্য থেকে এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে, যেটাকে আমাদের হিন্দু দর্শন কখনই সমর্থন করবে না, কারণ শূন্য থেকে কিছুই হতে পারেনা, সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এইটাই আমাদের হিন্দুধর্মের স্বীকৃত সৃষ্টিতত্ত্ব। যদিও খ্রীশ্চান ও ইসলাম ধর্ম বলে যে ভগবান সৃষ্টি করলেন কিন্ত এই ধর্মের যারা অতিন্দ্রীয়বাদী সাধক তারাও কিন্তু সৃষ্টি তত্ত্ব বলার সময় এই ভাষাতেই কথা বলেন। আবার যারা রাজযোগের সাধন করেন তারাও একটা অবস্থায় দেখেন মন কিভাবে নিজেকে পরিষ্কার আলাদা করে নিতে পারে। স্থূল ভূত থেকে সূক্ষ্ম ভূত সেখান থেকে ক্ষুদ্র মন আর বিশ্ব মনের যে পার্থক্য সেটাকে স্পষ্ট দেখতে পান। সেখান থেকে পরিষ্কার দেখতে পায় যে এক বিরাট পুরুষই একমাত্র আছেন। এটা যে কোন মনের কল্পনাতে দেখেন তা নয়, পরিষ্কার ও স্পষ্টত তারা দেখতে পান। কিন্তু যখন ভাষায় একে বর্ণনা করতে যান তখন আর তারা বর্ণনা করতে পারেন না। তার ফলে মহম্মদ এক রকম বলছেন যিশু আরেক রকম বলছেন আবার শ্রীরামকৃষ্ণ আরেক রকম ভাবে বলছেন। কিন্তু খুব গভীরে গিয়ে যদি বোঝার চেষ্টা করি তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে এনারা সবাই সেই একই জিনিষকে বোঝাতে চাইছেন। সে *তদেকম্*কে যদি বলে দেয় এইটাই ছিল তখন আর সেটা হিন্দুধর্ম থাকবে না, গোঁড়া বৈষ্ণব হয়ে যাবে অথবা গোঁড়া ইসলাম ধর্ম হয়ে যাবে। কিন্তু এই এককে আমরা নির্গুণ ব্রহ্ম বা সগুণ ব্রহ্ম বলতে পারি আবার জড় প্রকৃতি বলতেও পারি। আমি কি ধরণের মনোভাব নেব সেইভাবে এটাকে ব্যাখ্যা করা যায়। সব থেকে বড় কথা কি ছিল মুখে বলা যায় না। বলে, বোবাকে যদি মিষ্টি খাইয়ে জিজ্ঞেস করা হয় কিহে কেমন মিষ্টি লাগছে, তখন সে আকার ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইবে, কেননা মুখ দিয়ে তার কথা বেরোবে না। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এসে আমরা এই জিনিষকে সত্যি সত্যি দেখতে পাই। তিনি ভক্তদের বলছেন – আজ তোদের আমি সব ফাঁস করে দেব। কিন্তু তারপরেই বলছেন – আমার মুখ যেন কে চেপে দিচ্ছে, বলতে দিচ্ছে না।

অলিম্পিক বা এশিয়ান গেমস্এ পোল ভোল্ট নামে একটা খেলা আছে যেখানে একটা লম্বা লাঠি নিয়ে দৌড়ে এসে একটা উঁচু বাধাকে অতিক্রম করতে হয়। এখানে লম্বা লাঠিটা না থাকলে অত উঁচু বাধাকে সে অতিক্রম করতে পারবে না। আবার শেষ মুহূর্তে যদি লাঠিটাকে সে না ছেড়ে দেয় তাহলেও কিন্তু বাধাটাকে ডিঙোতে পারবে না। মন আর ঈশ্বরের মধ্যেও ঠিক এই সম্পর্ক। মন হচ্ছে লাঠির মত আর ভগবান হচ্ছেন এই মায়া রেখার পারে। মনের সাহায্যে আমরা দৌড় মারছি ঐ মায়ার দড়িকে অতিক্রম

করতে। মন যখন সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন আপনার সময় হয়ে গেছে লাফ মারার, কিন্তু তখনও যদি মনকে ধরে রাখি তাহলে আমরা এই মায়ার জগতেই থেকে যাব। লাঠি যদি ছেড়ে না দেয় সে ঐ দড়িটাকে কোন দিন অতিক্রম করতে পারবে না।

আকাশের দিকে তাক করে যদি একটা গুলি ছুড়ি তাহলে কিছু দূর গিয়ে আবার পৃথিবীর বুকে ফিরে আসবে। কিন্তু যদি এসকেপ ভেলোসিটি, মানে প্রতি সেকেণ্ডে সাত কিলোমিটার গতিতে রকেট ছাড়া হয় তাহলেই সে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অতিক্রম করতে পারবে। যে রকেটগুলিকে চাঁদে পাঠানো হয় সেগুলিকে মোটামুটি প্রতি সেকেণ্ডে এগারো কিলো মিটার গতিতে ছাড়া হয়। যদি সাত কিলো মিটারের সামান্য একটু কম থাকে তাহলে রকেট ঘুরে আবার পৃথিবীতে চলে আসবে। মনকে ধরে রেখে আমরা যতই সাধনা করি না কেন, আমরা সেই মায়ার রাজ্যেই ফেরত চলে আসব। এর সব থেকে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন অদ্বৈত সাধনা করছিলেন তখন ঘুরে ঘুরে তাঁর সামনে মাকালী এসে যাচ্ছেন। কারণ মাকালী মায়ার রাজ্যে মনের মধ্যে গেঁথে আছে, শুধু মাকালীই নন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম যাই বলুন সব হচ্ছে মনের জগতের রাজা। যদি এই মনকেও অতিক্রম করতে হয় তাহলে মাকালীকেও জ্ঞান অসি দিয়ে খণ্ডিত করে দিতে হবে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধি না হলে এসব জিনিষ ধারণা করা খুব কঠিন।

এর পরে আরও এক জটিল তত্ত্ব ঢুকে যাচ্ছেন। তৃতীয় মন্ত্রে বলছেন – ***তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেহপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদং। তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্।।*** সৃষ্টির ব্যাপারে যা কিছু হতে পারে সব বলছেন। *তম আসীত্তমসা* – তখন অন্ধকার ছিল। অন্ধকার কোথায় ছিল? ঐ অন্ধকারের মধ্যেই ছিল। স্বামীজী বলছেন এই হচ্ছে সত্যিকারের কাব্য। তিনি এটাকে অনুবাদ করছেন – At first there was only darkness wrapped in darkness, মানে অন্ধকার অন্ধকারে ঢাকা, এমন অন্ধকার যে মনে হয় অন্ধকার অন্ধকারকে ঢেকে দিয়েছে। অন্ধকারের আমরা অনেক রকম বিশেষণ প্রয়োগ করি, ঘুঁটঘুঁটে অন্ধকার, কালো অন্ধকার, আলকাতরার মত অন্ধকার লেপে দিয়েছে। কালিদাস বলছেন সূচীভেদ্য অন্ধকার, এমন ঘন অন্ধকার যে ছুঁচ দিয়ে তাকে ছিদ্র করা যায় না। ঋকবেদ বলছে – এমন অন্ধকার যেন অন্ধকার অন্ধকারে ঢাকা। যদি কোন ভাবে অন্ধকারের একটা আস্তরণকে তুলে দেওয়া যেতে পারে তাহলে সেই আবার অন্ধকারই চলে আসবে। ঐ আস্তরণটাকে যদি তুলে দেওয়া যায় তাহলেও আবার অন্ধকার। এই রকম কত দূর পর্যন্ত অন্ধকার বিস্তৃত হয়ে আছে? শেষ পর্যন্ত। *তমঃ আসীত্তমসা অগ্রে*, প্রথমে কি ছিল? তমসা, অন্ধকারই ছিল। আর *অপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদং* – পুরো সৃষ্টি যেন জল থেকে এসেছে। এই সলিল শব্দ দ্বারা এনারা ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন এটা বলা মুশকিল। স্বামীজী এটাকে অনুবাদ করছেন All these was only un-illumined water, এখানেও বলতে চাইছেন সৃষ্টি যেন জল থেকে এসেছে। গ্রীক ফিলজফিতেও এই ধরণের বিশ্বাস দেখা যাবে। সেখানেও তারা বিশ্বাস করে যে সমস্ত সৃষ্টি জল থেকে এসেছে। ভারতেও এই মতটা চলে এসেছে যে সব কিছু জল থেকেই এসেছে, আমরাও সমুদ্রের প্রাণী ছিলাম। সেইজন্য আমাদের lungs এ জল দরকার, lungs এ যত পরিমাণ জলের প্রয়োজন তার থেকে একটু জল যদি কম থাকে তাহলেই আমাদের গলা খুশ খুশ করবে আর কাশি হতে থাকবে। এটাই মনে করিয়ে দিচ্ছে যে আমরা সবাই হলাম জলের প্রাণী। সমস্ত প্রাণীরা কোন এক সময়ে জল থেকে ডাঙায় চলে এসেছে। এইজন্য যে কোন প্রাণীর মধ্যে জলীয় পদার্থ বেশি থাকে। আমাদের সবারই উৎপত্তি সমুদ্রে। এগুলো আমরা ইদানিং কালে বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে জানতে পারছি, আগেকার দিনের লোকেরা এত খবর জানতেন না। কিন্তু বৈদিক ঋষিরা প্রথম থেকেই বলছেন যে প্রথম যে সৃষ্টির জল সেখান থেকে, primordial water থেকেই সৃষ্টির উদ্ভব হয়েছে, এই primordial water ঠিক কি বলতে চাইছে আমাদের পক্ষে এখন বলা খুব মুশকিল। পরের দিকে যখন পৌরাণিক আখ্যায়িকার মাধ্যমে এই প্রথম জলকেই বলছেন ক্ষীর সাগরে বিষ্ণু শেষ নাগের উপরে শুয়ে আছেন, সেইখান থেকে সৃষ্টি এসেছে। এই cosmic water এর ধারণা সমস্ত হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীতেই উল্লেখ করা হয়েছে। যখনই

সৃষ্টির কথা আসবে তখনই এই cosmic water এর কথা এনারা বলবেন। এখানে বলছেন – এই cosmic water ছাড়া আর কিছু ছিল না। এখানে আমরা দুটো তত্ত্ব পাচ্ছি – একটা হচ্ছে সৃষ্টি এসেছে cosmic water থেকে আর সৃষ্টি এসেছে অন্ধকার থেকে।

কোন এক গভীর রাতে এক অজানা অচেনা জায়গায় আমরা পৌঁছেছি। সেখানে কি আছে আমরা বুঝতে পারছি না, কেননা পুরো জায়গাটা অন্ধকারে ঢাকা। যখন ভোরের আলো আস্তে আস্তে চোখ মেলতে থাকল তখন যেন সব কিছু জেগে উঠল। তখন মনে হয় যেন এই সব কিছু অন্ধকারের গর্ভ থেকে জন্ম নিল। এর মানে সব জিনিষ আগেই ছিল, নতুন কিছু আসেনি। রাত্রের অন্ধকারে এই সব কিছু যেন এক হয়ে ছিল, যেমনি আলো ফুটতে থাকল, যেগুলো অপ্রকেত ছিল সেই সব জিনিষ প্রকেত হয়ে গেল। অপ্রকেতঃ মানে তখন কোন বহুত্বের চিহ্ন ছিল, সব অন্ধকারে এক হয়ে ছিল। ঠাকুর বলছেন – পায়রাকে দেখলে মনে হবে কিছু নেই, কিন্তু পায়রার গলায় হাত দিলে বোঝা যায় গমের দানায় ভর্তি হয়ে গিজ্‌গিজ্‌ করছে। এই অন্ধকারের মধ্যে সব যেন একত্বের ভাব নিয়ে অবস্থান করছে, যেমনি এটাকে নাড়াচড়া করতে যাব তখনই দেখা যাবে যে আরে এর মধ্যেতো অনেক কিছু রয়েছে। কোথায় ছিল এই সব কিছু? কাব্যের ভাষায় তখন আমরা বলি – অন্ধকার জন্ম দিল নানা জীবের। এখানে যে বলছে *তমসা গূঢ়মগ্রে*, এটা এই ভাবটাকেই ব্যক্ত করছে, আর এটা কোন রাত্রের অন্ধকারের কথা বলছে না, এখানে মহাজাগতিক অন্ধকারের কথা বলছে। সেই মহাজাগতিক অন্ধকার যেন এই সব কিছুর জন্ম দিচ্ছে।

তারপরের লাইনে বলছেন – *তুচ্ছ্যেনাম্ভপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্*। প্রথমে বলেছিল *নাসদাসীন্নো সদাসীৎ*, সেখান থেকে এসে গেছে একে। কিছুই ছিল না, কিন্তু এখন সেখানে এক এসে গেল। এই এক ছাড়া জগতে আর কিছু নেই। বৈদিক ঋষিরা লক্ষ্য করেছিলেন পাখিরা ডিমে তা দিলে ডিম থেকে বাচ্চা বেরিয়ে আসে, আসলে ডিমে তা দেওয়া মানে ডিমের উপরে পাখি তার শরীরের উত্তাপ দিতে থাকে। ঋষিরা এই প্রক্রিয়াটাকে গ্রহণ করে বললেন সেই হিরণ্যগর্ভ থেকে এক বেরিয়ে এলেন। কিভাবে হিরণ্যগর্ভ থেকে সৃষ্টি বেরিয়ে এলো? তাপের শক্তিতে, কোথা থেকে তাপ এল? বলছেন তপসা, তপস্যার মাধ্যমে তাপ প্রবাহ তৈরী হল। তপসার অর্থ এখানে আবার দুই রকম ভাবে ব্যবহার করা যায়। তপসা হচ্ছে তাপ, মহাজাগতিক তাপ। আমরা এখন বিগব্যাং এর কথা বলছি, তখনকার ঋষিরা এই সব থিয়োরি জানতেন না। ফিজিক্সও বলছে তাপের মাধ্যমে বিগব্যাং প্রক্রিয়ায় এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। তপসার অর্থ তপস্যাকেও বোঝায়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলছেন *'স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা'*। তপস্যা হচ্ছে, যখন কেউ একটা ব্রত ধারণ করে নিয়ে সেটাতেই সমস্ত মন ইন্দ্রিয় শরীরকে উৎসর্গ করে দিচ্ছে তখন শরীরে একটা তাপ সৃষ্টি হয়। একাদশী ব্রত করছে, খাচ্ছে না, একটা কিছুতে মনটাকে একাগ্র করে দিচ্ছে সেই দিন, তখন শরীর থেকে তাপ বেরোতে থাকবে। ব্রহ্মচর্য ব্রত নিয়েছে, কিছু দিন ধরে করতে করতে শরীর থেকে তাপ বেরোবে। দিনে তিন চার ঘন্টা আসনে বসে জপ ধ্যান করছে অনেক দিন ধরে, তাপ জন্মাবে। তপস্যার মাধ্যমে এই তাপ যখন সৃষ্টি হয় তখন এই তাপ থেকে অনেক কিছুর জন্ম হতে পারে। তপস্যা হচ্ছে একটা জিনিষকে নিয়ে, একটা ভাবকে নিয়ে তার মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া। তপস্যার এতো শক্তি যে কেউ যদি ঠিক করে নেয় যে আমি প্রত্যেক দিন মন্দিরে দুই ঘন্টা করে আসনে বসে জপ করব আর আমি এই এই ফল চাই, এখন সে যদি দশ বছর এগার বছর ধরে করতে থাকে তাহলে সে ঐ ফল পেতে বাধ্য, হবেই হবে। কেন? মুরগী যখন ডিমের উপরে তা দিচ্ছে মানে তাপ দিচ্ছে, সেই ডিম থেকে একটা বাচ্চা বেরোবে। ঠিক সেই রকম একটা আইডিয়াকে নিয়ে, একটা ভাবকে নিয়ে কেউ যদি বসে পড়েন, তখন কি হচ্ছে? ঐ আইডিয়াকে তাপ দেওয়া হচ্ছে, ঠিক মুহূর্তে ঐ ভাবটা তার কাছে উন্মোচিত হয়ে যাবে। মুসলমানরা রোজার সময় সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত যা তপস্যা করে ওতেই সারা মুসলমান জাতি শক্তি পেয়ে যাচ্ছে। আর শত শত কোটি কোটি মুসলমান এই তপস্যা করে যাচ্ছে বছরের পর বছর। যতই

অসুবিধা এসে যাক মুসলমানরা দিনে পাঁচবার নমাজ পড়বেই। যাই হয়ে যাক মুসলমানরা তিরিশ দিন রোজা রাখবে।

জগৎ সৃষ্টিও ঠিক এভাবেই হয়। এই যে ভেতরে সচ্চিদানন্দ আছেন তিনি তপস্যা করেন। কি তপস্যা করেন? একটি মাত্র আইডিয়া বা চিন্তার উপরে তিনি তপস্যা করেন। সেটা হচ্ছে – সৃষ্টি হোক। আমাদের যেমন কোন কিছু সৃষ্টি করতে গেলে অনেক দিন ধরে ভাবতে হবে, চিন্তা করতে হবে, ভগবানকে এসব করতে হবে না। আমরা চিন্তা করে আর কতটুকু সৃষ্টি করতে পারব? কিন্তু ভগবানকে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জন্ম দিতে হচ্ছে, সেইজন্য তাঁর তপস্যাও সেই রকম হবে।

যে মুহূর্তে তিনি চিন্তা করলেন সৃষ্টি হোক তখন ব্রহ্মার জন্ম হয়। ব্রহ্মা যখন জন্ম নিলেন তখন তিনিও সৃষ্টির জন্ম তপস্যা করতে থাকেন। যে কোন ভক্ত যখন কোন সমস্যা নিয়ে, চাকরি হচ্ছে না, সন্তান হচ্ছে না, বাড়িতে অশান্তি, শরীর ভালো যাচ্ছে না, যে কোন সমস্যা নিয়ে কোন মহারাজের কাছে গেলেই ওনারা বলেন 'খুব করে ঠাকুরকে ডাক আর জপ কর'। ঠাকুরকে ডাকা আর জপ করা মানেই হচ্ছে তপস্যা করা, তপস্যা করলেই যে তাপ সৃষ্টি হবে তাতেই ফল হতে বাধ্য। নাসদীয়সূক্তমে প্রথমে কোন ঈশ্বরের উল্লেখ নেই, ঈশ্বরের কথা অনেক পড়ে আসছে। সৃষ্টি একটার পর একটা হতে থাকে, একটা আইডিয়া আরেকটি আইডিয়ার জন্ম দিচ্ছে। যে কোন একটা আইডিয়াকে নিয়ে যেই তপস্যা করতে বসে যাবে একটা সময় বুম্ করে বেরিয়ে আসবে। যদি কোন আইডিয়াকে নাও নেয় তাহলেও তপস্যা করলে সে তার অন্য ভাবে নিজের মত একটা ফল দিয়ে দেবে। বেদ বা পুরানে যে সব কাহিনী ও যজ্ঞের কথা আছে সবই এই তপস্যার একেকটা রূপ। বেদের যজ্ঞ, ইদানিং কালে সত্যনারায়ণ পূজা, দুর্গাপূজা, চণ্ডীপাঠ ইত্যাদি যে করা হয় সবই একটা সঙ্কল্প নিয়ে যখন করা হচ্ছে তখন তার ফল হবেই। যেমনটি তপস্যা হবে তেমনটি ফল পাবে। কিন্তু তপস্যা করলে ফল পাবেই, কোন ধর্মই বলবে না যে তপস্যা করলে ফল পাবে না। ঠাকুর বলছেন – কাতর হয়ে প্রার্থনা করলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। তিনি কি শুনে ফল দিচ্ছেন? আমি যে প্রার্থনা করছি আসলে আমি তপস্যা করছি।

এখন আমাদের মনে হাজারটা আইডিয়া ঘুরপাক খাচ্ছে, এই চাই সেই চাই। কিন্তু তপস্যা করছে কি? তপস্যা না হলে ফল হবে না। এখানে এই কথাই বলা হচ্ছে। যখন ভগবান এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন তখন যে প্রথম যিনি এলেন তিনিও তপস্যা করছেন। এই আইডিয়াটাই পরবর্তি কালে উপনিষদে বার বার আসবে। সেখানে সব কিছুতেই তপস্যা। প্রশ্নোপনিষদে আছে – দুজন ঋষি আরেক ঋষির কাছে গিয়ে বলছেন আমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, আপনার কাছে জানতে চাই। সেই ঋষি বলছেন – নিশ্চয়ই উত্তর পাবে, তবে এক বছর এখানে থেকে তপস্যা কর, এক বছর তপস্যার পরে প্রশ্নটি করবে, সেই প্রশ্নের উত্তর যদি আমার জানা থাকে তবেই আমি বলব। তারপরে আছে দেবতাদের রাজা ইন্দ্র আর অসুরদের রাজা বৃত্র এরা দুজনে প্রজাপতির কাছে প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছে। প্রজাপতিও তাদের এক বছর তপস্যা করতে বললেন। দুজন মিলে তপস্যা করতে শুরু করলেন। তপস্যা করা মানে, খুব স্বল্পাহারে থেকে, শরীরের সব রকমের সুখভোগ ত্যাগ শুধু ঈশ্বর চিন্তন করা। এক বছর তপস্যা করার পর দুজনে প্রশ্ন করলেন অমৃতত্ব কিভাবে লাভ হয়। প্রজাপতি শুধু দুটি কথা বলে দিলেন – তুমিই সেই। দুজনে ফেরত চলে এল। কিছু দিন পরে ইন্দ্রের আবার মনে সংশয় এসেছে। আবার প্রজাপতির কাছে গেলেন। প্রজাপতি ইন্দ্রকে আবার এক বছর তপস্যা করতে পাঠিয়ে দিলেন। *তপসস্তন্মাহিনাজায়তৈকম্* - এখানে এইটাই বলছেন তপস্যার জোরে *জায়তম একম্*, এই একের সৃষ্টি হল।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে একটা মন্ত্র আছে – *স তপোহতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদগং সর্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ।* যা কিছু আছে আমি তার সৃজন করব, তিনি এই ভেবে তপস্যা করলেন। বেদে কিছু ভাব আছে

বীজাকারে, পরে এই ভাবগুলিকে নিয়েই উপনিষদে আরো বিস্তার করে বলা হয়েছে। তেমনি নাসদীয়সূক্তমে যে তপস্যার কথা পাই ঠিক এই ভাবটাই আবার উপনিষদে এসেছে।

এরপরে প্রশ্ন আসে সৃষ্টি কেন হল। সেই কথা বলতে গিয়ে চতুর্থ মন্ত্রে বলছেন – ***কামস্তদগ্রে সমবর্ত্তুতাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা***। *কামস্তদগ্রে* – এই যে যিনি তপস্যা করছেন তাঁর মনে প্রথমে একটা বাসনা জন্ম নিল। কি বাসনা এল – তৈত্তিরীয় উপনিষদে যেমন বলছে *ইদগং সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ*, যা কিছু আছে আমি তার সৃষ্টি করব। বাসনাকে কাম অর্থেও বলা যেতে পারে, তার ফলে অনেক পণ্ডিত এই কামকে পুরুষ-নারীর মধ্যে যে কামের কথা বলা হয়, সেইটাকে এইখানে ধরেছেন। কিন্তু ভাষ্যকাররা এটাকে পুরো প্রত্যাখ্যান করে বলছেন এখানে সৃষ্টির কথাই বলা হয়েছে। এখন সমস্যা হয় – *আপ্তকামস্য কা স্পৃহা*, যিনি ভগবান তিনি হচ্ছেন আপ্তকাম সুতরাং তাঁর মধ্যে স্পৃহা আসবে কেন? যার অভাব আছে তারই স্পৃহা হবে। ভগবানের তো কোন অভাব নেই তাহলে তিনি সৃষ্টি কেন করলেন? এর কি উত্তর আছে? আসলে এই প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। যে কোন দ্বৈত দর্শনের বিরুদ্ধে, সে ইসলামই হোক বা খ্রীশ্চান ধর্মই হোক এটাই হচ্ছে প্রধান অভিযোগ। এর কোন উত্তর তাদের কাছে নেই। মাণ্ডুক্যকারিকাতে এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। যিনি আপ্তকাম, যিনি পূর্ণকাম তাঁর আবার কিসের স্পৃহা হবে, তিনি কেন সৃজন করতে যাবেন? সমস্ত দ্বৈত ধর্মের সামনে এটা একটা বিরাট সমস্যা। তখন তারা বলবেন যে আমরা যাতে ভালো হই সেইজন্য ভগবান সৃষ্টি করলেন এই কথা বলা হয়েছে। এখানে তুমিটা কোথায়, তুমি কে? তাঁকে যখনই আপ্তকামী বলে দেওয়া হচ্ছে তখন তো আর কিছুই দাঁড়াবে না। ঠাকুর তাই পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন – আম খেতে এসেছ আম খাও, ডাল পাতার হিসাব করতে যেওনা। এই প্রশ্নের কোন উত্তর হয় না। একটা লাইনের পর আর প্রশ্ন করা যায় না। আমি কে, আমি কোথা থেকে এসেছি, কোথায় আমাকে যেতে হবে – এইসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না। কিন্তু এখান থেকে পালাতে কিভাবে হবে তার উত্তর পেয়ে যাবে।

গৌতম বুদ্ধকেও এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনিও কোন উত্তর না দিয়ে বললেন – তোমাকে যদি কেউ বিষযুক্ত তীর মারে তখন তুমি কি জানতে চাইবে কে তীরটা ছুড়েছে? তুমি কি জানতে চাইবে তীরটা কে বানিয়েছিল? তুমি কি জানতে চাইবে যে তীর মেরেছে সে কি সত্যিকারের কোন তীরন্দাজ? তুমি কি তার বংশের পরিচয়, তার জাতের পরিচয় জানতে চাইবে? এই সব খবর না জেনে তুমি আগে তীরটাকে তোমার শরীর থেকে বের করে নেবে, ক্ষত স্থানে শুশ্রুষার জন্য কোন বৈদ্যের কাছে ছুটে যাবে। এগুলোর উত্তর থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে কিন্তু আগে তোমার প্রাণটি বাঁচাও। ঠাকুর যে বলছেন – আম খেতে এসেছ আম খাও। এই কথা কি ঠাকুর একা বলেছেন, বুদ্ধদেবও এই একই কথা বলছেন, যিশুও এই একই সুরে এক কথা বলছেন – এই তো তোমার সামান্য জীবন আগে কোন রকমে প্রাণ বাঁচাও। কিন্তু কোন কোন সময় ফাঁক পেলে মাথায় কিছু কিছু প্রশ্ন উঁকি মারে, তাই বলে দিলেন – *কামস্তদগ্রে*, প্রথমে তাঁর মনে ইচ্ছে জাগল। একেবারেই যদি কিছু উত্তর তাঁরা না দেন তাহলে লোকেদের মনে প্রচুর জিজ্ঞাসা থেকে যায়, সেইজন্য ওনারা দু-চারটে টুকটাক কথা বলে দেন। কিন্তু এটাকে বেশি যদি কাটাছেঁড়া করতে যাই তাহলে মুখ থুবড়ে পড়ে যাব।

গুজরাট ভূমিকম্পে প্রচুর লোক মারা গিয়েছিল। একজন সিনিয়র মহারাজ স্বামী ভূতেশানন্দজীকে প্রশ্ন করেছিলেন – মহারাজ এই যে সবাই বলে কর্মের জন্যই এই রকম হয়, কিন্তু এত এত লোকের কর্মে কি এইটাই ছিল যে এরা সবাই এক সঙ্গে এই ভাবে মারা যাবে? স্বামী ভূতেশানন্দজী একটু গম্ভীর হয়ে বলছেন – লঙ্কা খেলে ঝাল লাগে এটা মানছো তো? বলছেন – হ্যাঁ মানছি। তাহলে কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে, একটা কর্ম করলে তার একটা ফল আছে, এটা মানছো তো? হ্যাঁ মানছি মহারাজ। তখন ভূতেশানন্দজী মহারাজ বলছেন – যেটা তোমার ব্যষ্টিতে লাগাচ্ছ, মানে ছোটতে লাগাচ্ছ, ঐটাকে তুমি বৃহৎটাতেও লাগিয়ে দাও। কেননা, ঠিক ঠিক এর কারণ যদি তুমি খুঁজতে যাও তাহলে কোন দিন এর

কারণ খুঁজে পাবে না। গুজরাট ভূমিকম্পে এত লোক কেন এক সঙ্গে মারা গেল এর উত্তর সারা জীবন যদি খুঁজতে যাও কোন দিন এর উত্তর তুমি পাবে না। তখন কি হবে? তোমার মনটা ওর মধ্যেই ঘুরতে থেকে যাবে, এই জগতে তোমার আর কিছু করা হবে না। কিন্তু মনকে সান্ত্বনা দিতে হবে তো, এত লোক মারা গেলে কেন? লঙ্কা খেলে যেমন ঝাল লাগে, কর্মের ফলের সঙ্গে যেমন কর্মের সম্পর্ক থাকে, ঠিক তেমনি এত লোক যে মারা গেল এদের প্রত্যেকরই কোন কর্ম ছিল। তাহলে এটাই কি একমাত্র সঠিক বিশ্লেষণ? হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। কর্মফল কাদের জন্য? যারা আধ্যাত্মিক পিপাসু তাদের জন্যই কর্মফল। যারা আধ্যাত্মিক পিপাসু তাদের মনে কখন একটা প্রশ্ন খোঁচা দিল, নিজের মনকে শান্ত করার জন্য একটা উত্তর দিয়ে নিজের লক্ষ্যে এগিয়ে চল।

বেদ ঠিক এই জিনিষটাই করছে। মানুষের মধ্যে সৃষ্টি সংক্রান্ত, জগতের নানা প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক, বেদ তখন একটা উত্তর দিয়ে বলে দিচ্ছে – তুমি এর বেশি আর কিছু জানতে চেষ্টা করো না, তোমার জীবন অতি ক্ষুদ্র, খুব অল্প সময় তোমার হাতে আছে, এই সময়টুকুকে কাজে লাগিয়ে তোমার চরম লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চল। উপনিষদেও প্রশ্ন করা হয়েছে – *আপ্তকামস্য কা স্পৃহা*, ভগবান পূর্ণকাম হয়েও কেন তিনি সৃষ্টি করতে গেলেন। এই প্রশ্নের উপসংহার কি? এর উপসংহার হচ্ছে সৃষ্টি বলে আদপেই কিছু নেই। তাহলে এগুলো কি দেখছি? এসব যা কিছু দেখছ এগুলো তোমার মনের ভ্রম। এই তত্ত্বটা কাদের জন্য? যারা খুব উচ্চ আধারের পুরুষ, তাদের জন্য জগৎ বলে কিছু নেই।

কিন্তু আমাদের জন্য বলা হচ্ছে – প্রথমে এসেছিল বাসনা, কামস্তদগ্রে। পরে ফ্রয়েডাদি পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা এরই উপরে অনেক থিয়োরি নিয়ে এলেন। প্রত্যেক মানুষের মনে প্রথম যে বাসনা আসে তা হচ্ছে আমি কিছু সৃজন করব। সৃষ্টিতে প্রথম যাঁর আবির্ভাব হল, তাঁরও মনে সৃষ্টির বাসনা জেগেছিল।

চতুর্থ মন্ত্রের পরের লাইনে বলছেন *সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা* , যাঁরা কবি, এখানে কবি মানে ঋষি, ত্রিকালদর্শি, শুধু ত্রিকালদর্শি নন, যে জিনিষ সাধারণ দৃষ্টিতে অবোধগম্য সেটাও তাঁদের কাছে বোধগম্য। আর যাঁরা মনীষি, অর্থাৎ যাঁদের বুদ্ধি আছে প্রজ্ঞা আছে, যাঁরা যে কোন সমস্যার সমাধান করতে পারেন। এই কবি, মনীষিরা অন্ধকারের আবরণকে ভেদ করে দিতে পারেন। বেদে অবতারের কথা নেই, উপনিষদেও অবতার পাওয়া যাবে না, বেদ ও উপনিষদে যাঁরা উচ্চ আধ্যাত্মিক পুরুষ তাঁদেরকে ঋষি বা কবি বলা হয়। মানুষের মধ্যে কবি হচ্ছে সব থেকে উচ্চ পদ, কবির উপরে আর কেউ নেই। সেই অর্থে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদের ভাষায় একজন কবি। বেদের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ, যিশু এরা কেউ ভগবান বা দেবতা হতেন না, সবাইর উপাধি হত কবি। শ্রীরামকৃষ্ণের মত কবি ও মনীষিরা *সতো বন্ধুমস্তি নিরবিন্দন্ হৃদি*, মানে তিনি যখন ধ্যান করতে শুরু করলেন, ধ্যান করে যখন ধ্যানের গভীরে চলে গেলেন, গভীর থেকে আরো গভীরে চলে গেলেন তখন তিনি সৎ আর অসৎএর, শূন্য আর পূর্ণের মধ্যে কি সম্পর্ক, সেটাকে উপলব্ধি করলেন। কবিরা ধ্যানের গভীরে গিয়ে হৃদয়ে এই সত্যটাকে দেখতে পেলেন। এখানে জ্ঞানের উন্মোচন কিভাবে হয় তার বিবরণ দেওয়া হল। বাইরে থেকে কিছু জ্ঞান লাভ হয় না, যা কিছু জ্ঞান উপলব্ধি হবে সব এই হৃদয়ে হবে। ঠাকুর যখন নির্বিকল্প সাধনার চেষ্টা করে যাচ্ছেন তখন তিনি জ্ঞান অসি দিয়ে মাকালীকে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন, তারপর তাঁর মনটা এই মায়ার রাজ্য ছেড়ে শূন্যে বিলীন হয়ে গেল। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে যে উপলব্ধি হচ্ছে, এই বুদ্ধি ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, বায়োলজির থিয়োরি জানার বুদ্ধি নয়। এইটাই হচ্ছে আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞালোকে তাঁরা বুঝতে পারেন অস্তিত্ব আর অনস্তিত্বের মধ্যেকার যোগসূত্র, সৎ আর অসৎএর সম্পর্ক।

স্বামীজী মায়াকে ব্যাখ্যা করছেন দেশ, কাল ও কারণ দিয়ে। ব্রহ্ম যিনি এই দেশ, কাল ও কার্য-কারণের পারে, তিনিই এই মায়ার ভেতর দিয়ে জগৎ আকারে বহু রূপে প্রতিভাসিত হচ্ছেন। এই এক কি করে বহু হয়ে যায়? দেশ, কাল আর কারণ হচ্ছে পর্দা। আমি, আপনি, গাছ-পালা, ঘরবাড়ি সব আছে, কিন্তু

তথাপি বলছে এই সব কিছু যা আছে তার জন্ম হবার আগে সৎও ছিল না অসৎও ছিল না। তাহলে কে জানল যে *নাসদাসীন্ নো সদাসীৎ*? ঋষিরাই জানলেন। কিভাবে জানলেন? ধ্যানের গভীরে? কোথায় দেখলেন? তাঁদের হৃদয়ে। সেইজন্য বারবার বলা হয়, আচার্যের কাছে যতই শোনা হোক, সারা জীবন ধরে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে যেতে পারে, কিন্তু কিছুই হবে না। এই সব কিছু যা বলা হচ্ছে এগুলি হচ্ছে সাধনা সাপেক্ষ। ধ্যানের গভীরে যতক্ষণ না যাবে ততক্ষণ ধারণা হবে না। জপের গভীরেও নয়, এখানে জপও অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর সাধনা। ধ্যানের গভীরে মানে, যখন দিনে সাত ঘন্টা, আট ঘন্টা এক আসনে একটা ভাবকে নিয়ে বসে আছে। এক দিন দুই দিন নয়, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর করলে একটু একটু করে বোঝা যাবে যে মায়ার আবরণ সরছে। তখন বোঝা যাবে এই সৎ ও অসতের, ব্রহ্ম ও জগত, নিত্য ও অনিত্য, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের মধ্যে কি সম্পর্ক। তখন বোঝা যাবে সৎও নেই অসৎও নেই তথাপি কি করে হঠাৎ সৃষ্টি এসে যাচ্ছে। আবার সেই সৃষ্টির সময় যখন কিছুই ছিল না তার বর্ণনাও দিচ্ছেন। পরীক্ষাগারে গবেষণা করে এটাকে জানা যায় না, ধ্যানের গভীরে গিয়ে ঋষিরা, কবিরা অনুভূব করেন – ও, এই ব্যাপার।

ঠাকুর বলছেন – নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে সমুদ্রে গলে মিশে গেল, তার আর খপর দেওয়া হল না। নুনের পুতুলের সত্তা সমুদ্রের সত্তার সাথে এক হয়ে গেল, তাহলে খবরটা আসছে কোথা থেকে যে নুনের পুতুল সমুদ্রে মিশে গেছে? ঠাকুর বলছেন – আমারও তাই হচ্ছিল, কিন্তু কে যেন আমাকে বাঁচিয়ে দিল, আমাকে পাথর করে দিল, আমার আর গলা হলো না। এর তাৎপর্য হচ্ছে – অনন্ত + এক = অনন্ত। অনন্ত হোটেলে ঢুকে পড়লে আর কেউ বেরোতে পারেনা। কিন্তু কোন কোন নির্দিষ্ট ব্যাক্তি পারেন। কারণ তাঁরা তাঁদের ব্যক্তি সত্তাকে সেই অনন্তের মধ্যেও ধরে রাখেন। নুনের পুতুল সমুদ্রে যাচ্ছিল, যেতে যেতে হঠাৎ এক দৈবশক্তিতে ম্যাজিকের মত নুনের পুতুল হয়ে গেল পাথরের। সে এখন সমুদ্রে ডুবে সব খবর নিয়ে আবার সমুদ্র থেকে বেরিয়ে চলে এল। যদি সে বেরিয়েই চলে এল, তাহলে তো আরেকটা সমস্যা এসে গেল। সমস্যাটা হচ্ছে, সেতো সমুদ্রে একাকার হয়ে যেত পারলো না, তাহলে কি খবর দেবে। কিন্তু আস্বাদন হয় বলে তার একটা অনুভূতি থেকে যায়। মন হচ্ছে সান্ত আর ঈশ্বর হচ্ছেন অনন্ত, সান্ত মন যখন অনন্তের সাথে মিশে যায়, মনের ওখানেই নাশ হয়ে যায়। একটা ছোট পাত্রে গঙ্গার জল আছে, এখন সেই পাত্রটার গঙ্গা জলকে গঙ্গায় ঢেলে দেওয়ার পর পাত্রের জলকে আর আলাদা করে দেখা যাবে না, কেননা সেই জল অনন্ত জলের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এখন যদি কেউ মনে করেন যে আমি ঐ পাত্রে যে জলটুকু ছিল সেই জলটুকুকেই ফেরত নিয়ে যাব। ধরা যাক পাত্রের গঙ্গাজলের চৈতন্য আছে। এখন এই ক্ষুদ্র চৈতন্য সেই বৃহৎ চৈতন্যে মিশে যাবে তখন তার কি হবে আমরা চিন্তাই করতে পারব না। গঙ্গা বলবে আমি যা তুইও তাই। এবার পাত্রটাতে গঙ্গাজল ভরে আবার বাড়িতে ফেরত চলে এল। এখন বাড়িতে যে অন্যান্য আরো পাত্র রয়েছে সে তাদের বলছে গঙ্গা যা আমিও তাই, কিন্তু এখন যে আমি বলছে এই আমিটা হচ্ছে সেই গঙ্গার সঙ্গে নিজেকে অভেদ জ্ঞানে বলছে গঙ্গা যা আমিও তাই। কারণ পাত্র হিসেবে আলাদা কিন্তু গঙ্গা জল হিসেবে গঙ্গা যা আমিও তাই। পাত্র হিসেবে আলাদা আলাদা। তখন অন্য পাত্র বলছে গঙ্গা কতটা বড়? আরে ভাই কতটা বড় তা কি কখন বলা যাবে! কেন বলা যাবে না? স্বামীজী সেই কুয়োর ব্যাঙ আর সমুদ্রের ব্যাঙের গল্পে যেমন কুয়োর ব্যাঙ বলছে – তোমার সমুদ্র কি এই কুয়োটার থেকেও বড়? না। কুয়োর এক দিক থেকে আরেক দিকে লাফ দিয়ে দেখিয়ে বলছে 'তোমার সমুদ্র কি এতটা বড়? আর সমুদ্রের ব্যাঙ ততই বলে যাচ্ছে – না। কুয়োর ব্যঙ বলছে – তুমি ধাপ্পা মারার জায়গা পেলে না। তাই হয়, এই পাত্র যখন গঙ্গা থেকে ফেরত আসবে তখন বাড়ির বাকী পাত্র গুলি তাকে বলবে যত সব অযৌক্তিক আর গালগপ্পো।

ঠাকুরও বলছেন – কাকেই বা বলি আর কেউই বা বুঝবে। কিন্তু ঋষিরা তাঁদের এই জিনিষ গুলিকে সমস্ত মানবজাতি শোনাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে বলেন – *শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্যপুত্রা আয়েধামানি*

দিব্যানি। নান্যপন্থা হয়নায়। সবাই শোন আমরা সবাই হচ্ছি সেই অমৃতের সন্তান, এইটাকে না জানা ছাড়া কোন পথ নেই।

ঠাকুরকে নরেন জিজ্ঞেস করছে – আপনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন? ঠাকুর – হ্যাঁ করেছি। নরেন – আমাকে দেখাতে পারেন? ঠাকুর – হ্যাঁ করাতে পারি। ঠাকুর কিন্তু কখনই ঈশ্বর কি রকম বর্ণনা দিচ্ছেন না। কিন্তু বলছেন আমি দেখেছি তুইও দেখতে পারবি। একটি মেয়ের বিয়ে হয়ে বাড়ি এসেছে, তার বন্ধু জিজ্ঞেস করছে – হ্যাঁরে স্বামী সুখ কি রকম? মেয়েটি বলছে – তোর যখন বিয়ে হবে তখন তুই বুঝতে পারবি। ঠাকুরও নরেনকে কোথাও বলছেন না যে ঈশ্বর এই রকম সেই রকম, বলছেন তুইও দেখতে চাইলে দেখতে পারবি। বেদ উপনিষদেও বলছে আত্মানুভূতি লাভ করতে হলে তোমাকে সব অতিক্রম করতে হবে, এখানে বেঁধে রাখলে হবে না। বাইবেল আর কোরানে সাথে আমাদের এইখানেই পার্থক্য। ওদের কাছে এই জগতটাই হচ্ছে চরম সত্য, কিন্তু আমাদের কাছে এটাও মিথ্যা, একেও অতিক্রম করতে হবে। কারণ এগুলো অনন্তের বর্ণনা করতে চাইছে কিন্তু অনন্তের কখনই বর্ণনা হয় না। সৎ ও বলা যায় না, অসৎ বলা যায় না, কিছু ছিল না তাও বলা যায় না, ছিল তাও বলা যায় না, beyond nothingness and also beyond is ness, এই এক উদ্ভট্ এক জিনিষের সাথে জগতের কি সম্পর্ক আমরা কি করে জানব। কারণ আমরা তো এর অনেক নীচে পড়ে রয়েছি। বাবার জন্মের খবর ছেলে কি করে জানবে। বাবার জন্মের কেউ যদি ভিডিও করে রাখে তাহলে অবশ্য দেখতে পারবে। ঋষিরা যে ধ্যান করে জানছেন এইটাই ঠিক এই ভিডিও দেখার মত।

চতুর্থ মন্ত্রের শব্দগুলি যে যেরকম অর্থ করবে এর অনুবাদও সেইভাবে পাল্টে যাবে। *কামস্তদগ্রে সমবর্তুতাধি* – সৃষ্টির প্রথমে বলছেন সৎ ছিল না, অসৎও ছিল না। ঠিক আছে এটা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু তারপরে কি হল? সেটাকেই বলতে গিয়ে বলা হচ্ছে – যিনি ছিলেন তাঁর মনে হঠাৎ কাম জাগল। এই কাম শব্দকে অনেকে, বিশেষ করে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা কামকে একমাত্র নারী-পুরুষের যৌন ইচ্ছাকেই মনে করে। কিন্তু যারা হিন্দু ধর্মের পরম্পরা ঐতিহ্যকে বিশ্বাস করেন তারা কামের এই ধরণের ব্যাখ্যা কখনই মানবে না। নাসদীয়সূক্তমের এই কামের অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা। এর পরই প্রশ্ন আসবে কিসের ইচ্ছা? সৃষ্টির ইচ্ছা। কিন্তু এইটাই একটা রহস্য, যে ভগবানের একটা নাম হচ্ছে আপ্তকাম বা পূর্ণকাম তাঁর মনে কোন ইচ্ছার উদয় হবে কেন? উপনিষদের একটা জায়গায় বলা হচ্ছে – *আপ্তকামস্য কা স্পৃহা*, মানে যিনি আপ্তকাম তাঁর আবার স্পৃহা কিসের। এই কারণেই বলা হয়, সৃষ্টি বিষয়ক কোন প্রশ্নেরই উত্তর কোন ভাবেই দেওয়া যায় না, যে ভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, সব ব্যখ্যাতেই একটা ফাঁক থেকে যাবে। প্রথমে বলা হয়েছিল এক ছিলেন, সে এক দুইএর পারই বলি আর যাই বলি যা ছিল সেটাকেই বলা হচ্ছে এক ছিল। কিন্তু সেই এক অখণ্ড থেকে বহু হল কি ভাবে? এক থেকে দুই আর মধ্যে যে যোগসূত্র বা বলা হচ্ছে আনীদবাতং, মানে শক্তির খেলা শুরু হল, সবই তো বোঝা গেলে, কিন্তু কেন শুরু হল?

বিজ্ঞানও এই কেনর কোন হদিস খুঁজে পাচ্ছে না। কিছু দিন আগে ফিজিক্সের একটা থিয়োরি বেরিয়েছে তাতে বলছে আমরা এই দৃশ্য জগতের যা কিছু দেখছি, গ্রহ, নক্ষত্র, নক্ষত্রপুঞ্জ সব কিছুর ওজন হচ্ছে সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র ওজনের মাত্র একশ ভাগের পাঁচ ভাগ। তাহলে বাকী ৯৫ ভাগ কি জিনিষ? বিজ্ঞান বলছে এটা জানার কোন উপায়ই নেই, অথচ সেটা আছে। এর মধ্যে যত বস্তু আছে তারা কোন আলোকে শোষণও করে না আবার কোন আলো বিকিরণও করে না। আমরা যখন কথা বলছি সেই সময় এই particles ক্রমাগত আমাদের শরীররে মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর আমাদের একজনের যা ওজন তার ঊনিশ গুণ বেশি ওজনের ঐ বস্তুগুলো এখানে রয়েছে। এইটাই সবার কাছে এক রহস্য, আমাদের ঋষিদের কাছেও এগুলো রহস্যময় ছিল। একটা পয়েন্টের পরে এই সৃষ্টির রহস্যের উত্তর দেওয়া যায় না। কিন্তু সাধারণ মনে প্রশ্ন উঠবে কেন সৃষ্টি হল? তখন বলবে – ইচ্ছা জাগল, কামস্তদ্গ্রে, প্রথমে কাম এল। উপনিষদেও পাই – আমি এক, আমি বহু হব। এই উপনিষদেই এক জায়গায় বলা হচ্ছে –

কামময় এবায়ং পুরুষঃ – প্রথম যিনি পুরুষ তিনি কামময়। সচ্চিদানন্দ সচ্চিদানন্দই, কিন্তু যখন তাঁর মধ্যে ইচ্ছা এসে যায় তখন সচ্চিদানন্দের মধ্যেই যেন একটা বিভেদ এসে গেল। ইচ্ছে যার হবে তার মধ্যে তো চৈতন্য থাকতেই হবে। এই যে বোতলটা আছে এর মধ্যে কোন ইচ্ছে বোধ নেই, কেন নেই? এর কোন চৈতন্য নেই। যদি বোতলটা ভেঙ্গে গিয়ে একশ টুকরো হয়ে যায় তখন এর পেছনে দুটো সম্ভবনা থাকতে পারে। এক, হয় বাইরে থেকে কোন শক্তি এসে একে ধাক্কা মেরে ফেলে ভেঙ্গে দিয়েছে আর দুই, বোতলের ভেতরেই কিছু বিস্ফোড়ণ হয়েছে। এই দুটোর বাইরে তৃতীয় কোন সম্ভবনা নেই।

কিন্তু আমি যদি কিছু করি, আমি এই বোতলের মত নই, আমার মধ্যে চৈতন্য রয়েছে, এখন কিছু করার আগে আমার মধ্যে ইচ্ছাকে জাগাতে হবে – এইটি আমি করব। সৎ আর অসৎ এই দুটোর পারে যখন বলছে তখন কিন্তু চৈতন্যকে বাদ দিচ্ছে না এই ইচ্ছাকে জাগ্রত করাটাই পার্থক্য করে দিচ্ছে। চৈতন্য যখন নিজেকে বহু করছেন তখন বলতে হবে এই বহু হওয়ার আগে তাঁর মনে ইচ্ছা এল। যারা পাগল তাদেরও মনে আগে ইচ্ছা জাগে তারপরই কোন কিছু করে। এইটাকেই এখানে বলছেন *কামস্তদগ্রে সমবর্তুতাধি* – তার মনে আগে কাম জাগল। মনে হতে পারে এটা এমন কি আর নতুন কথা। আমাদের মনের যত রকমের আবেগ রয়েছে, এই কাম বা ইচ্ছাটাই হচ্ছে প্রথম আবেগ। সেইজন্য বলা হয় জগতে যত রকমের সৃষ্ট পদার্থ রয়েছে তাদের সৃষ্টির প্রথমে রয়েছে কাম। কেন থাকে? কারণ, *কামময় এবায়ং পুরুষঃ*, যিনি প্রথম পুরুষ ছিলেন তিনি হলেন কামময়। তাঁর পুরো শরীরটাই কাম দ্বারা গঠিত। এই কাম বা ইচ্ছা কোন খারাপ বা নোংরা কিছু নয়।

এরপরে বলছেন - *মনসো রেতঃ* – এখানে *রেতঃ* এই শব্দের আবার অনেক রকম অর্থ হয়। হিন্দীতে রেত কথার অর্থ হয় বালি। রেত বলতে আবার নারীর শরীর থেকে এক ধরণের fluid নির্গত হয়, সেই fluid কেও রেত বলছে। আবার রেত বলতে যে কোন জিনিষের বীজকেও বোঝায়। এখানে বীজ অর্থেই ব্যবহার করা হচ্ছে – এইটাই হচ্ছে মনের প্রথম বীজ। মনের মধ্যে যাবতীয় যা কিছু হয়, শুধু যে আমার আপনার মনের মধ্যে হচ্ছে তা নয়, ভগবানের মনের মধ্যেও যা কিছু হচ্ছে তার মধ্যে প্রথম যে বীজ সেটা হল কাম। ফ্রয়েড আবার এই কামকে নিয়ে গেলেন libido mertico তে, মানে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রয়েছে desire to mate, পুরুষ-নারীর মিলন, আর সেইখান থেকে চলে গেলেন desire to destroy, শেষ করে দেওয়ার ইচ্ছা। এখানে কিন্তু একেবারেই তা নয়। প্রথম আসে অবিদ্যা, অবিদ্যার পরই আসে কাম, কামের পরেই আসে কর্ম। একটা কাম যখন এসে যাবে তখন একটার পর একটা আসতে থাকবে – কাম ক্রোধকে জন্ম দেবে, লোভকে জন্ম দেবে, একে একে মোহ, মদ, মাৎসর্য্য সব এসে যাবে। এগুলি থেকে নানা রকমে বন্ধন সৃষ্টি হবে, সেই বন্ধনকে জড়িয়ে তার আবার নানা রকমের জটিলতার জন্ম হবে। কিন্তু যিনি ভগবান, যিনি আদি পুরুষ, তাঁর এই সব সমস্যা হয় না, কারণ তিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ দিয়ে তৈরী। তাঁর মধ্যে শুধু সৃষ্টি করার কামটুকুই আছে, সৃষ্টি হয়ে গেলে সেই কাম সেখানেই শেষ হয় যায়। কিন্তু যারা সাধারণ তাদের মধ্যে যখন কামের জন্ম হয় তখন আর সেটা থামে না, কামের প্রক্রিয়া চলতেই থাকে।

মনের প্রথম বীজ হচ্ছে কাম, এই কাম আমরা কাম বলতে যা বুঝি একেবারেই কিন্তু তা নয়, এই কাম হচ্ছে ইচ্ছা। উপনিষদে এনারা যেটাকে একেবারে পবিত্র ইচ্ছা বলছেন, যেটা ভগবানের মনে এসেছিল – *একোহম্ বহুস্যাম্ প্রজায়িনী* – আমি এক, আমি বহু হব। এই ভাবটাই যখন সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তখন বলে আমি আমার এই সন্তানের মাধ্যমে অনেক হব। নিজের সন্তানের মাধ্যমে আমি বহু হব, এই ইচ্ছা এ্যামিবা থেকে শুরু করে ভগবান পর্যন্ত এইটাই এক সাধারণ ইচ্ছা। ঠাকুর যে বলছেন কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ, কিন্তু উপনিষদে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ এই শব্দ নেই। সেখানে আছে পুত্রৈষণা ত্যাগ, এই ত্যাগের অর্থ হচ্ছে – একোহম্ বহুস্যাম্ প্রজায়িনী – আমি এক, আমি বহু হব এই ইচ্ছাটাকে ত্যাগ করে দেওয়া। সন্তান লাভের ইচ্ছাকে ত্যাগ করে দেওয়া। কিন্তু সন্তানের ইচ্ছাকে ত্যাগ করে দিলে কি হবে,

ইচ্ছা ব্যাপারটা কি ত্যাগ হয়ে যাবে? হয় না, তখন এই ইচ্ছাটাই আবার নানান রূপ ধারণ করে নেয় – আমি একটা বই লিখেছি এবার আমি দশটি বই লিখব, আমি একটি বাড়ি করেছি এর পর আমি আরও দশটি বাড়ি করব, একটি গাড়ি করেছি আরও চারটে গাড়ি করব। কোন না কোন ভাবে এই ইচ্ছাটা বর্দ্ধিত হতে থাকবে। সেইজন্য বলা হয় – পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা ত্যাগ করতে। যা কিছু মনের মধ্যে হচ্ছে তার মূলে এই কাম।

তারপরের লাইনে বলছেন *সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা* - এই লাইনে আবার একটা গভীর তত্ত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। চিন্তা করলেই অবাক হয়ে যেতে হয়, আজ থেকে প্রায় সাত-আট হাজার বছর আগে ঋষিরা এই রকম একটা উচ্চ তত্ত্বের চিন্তা করে তাকে বাক্যে প্রস্ফুটিত করেছিলেন। নাসদীয় সূক্তের প্রথম লাইন ছিল – *নাসদাসীন্ নো সদাসীৎ তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ* - তখন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, সৎ হচ্ছে যা কিছু দেখা যাচ্ছে, সৎ হচ্ছে কার্য আর অসৎ হচ্ছে তার কারণ। এখানে এখন বলা হচ্ছে যিনি স্রষ্টা মানে ভগবান যিনি, তিনি কার্যও নন আবার কারণও নন, এই দুটো থেকে তিনি বিলক্ষণ আলাদা। কিন্তু মাঝখান থেকে দুটো উদ্ভট শব্দ এসেছে – অসৎ আর সৎ। হিন্দু ধর্মের এইটাই একটা বিরাট সমস্যা – অসৎ থেকে সৎ এর কি করে উৎপত্তি হল, আবার সৎ থেকে অসৎএর উৎপত্তি কি ভাবে হল। সৎ বলতে অনেক সময় ভগবানকে বোঝায়, কিন্তু সাধারণতঃ বলা হয় ভগবান সৎ অসতের পার। কিন্তু যিনি সৎ, সচ্চিদানন্দ, তিনি মায়াকে জন্ম দিলেন কি করে? যিনি চিৎ তিনি অজ্ঞানকে কি করে জন্ম দিলেন? আমরা দীর্ঘকাল ধরে এই সৎ ও অসৎ এর আলোচনা করে যাচ্ছি, কিন্তু এখনও আমাদের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হচ্ছে না। বেদান্তে একটা কথা আছে রজ্জুতে সর্প ভ্রম। হৃষিকেষের ঐ দিকে এক আশ্রমে এক সন্ত মহাত্মা সব সময় তাঁর শিষ্যদের বোঝাতেন রজ্জু মে সাপ হ্যায়। আশ্রমের বাইরে দুই কাঙালী বসে থাকত কিছু খাবারের আশায়। অনেক দিন একই কথা শোনার পর এক কাঙালী আরেক কাঙালীকে বলছে – ইয়ে এক আজব কা সাপ হ্যায়, সাধুবাবা রোজ তাড়িয়ে দেয় আবার কোথা থেকে চলে আসে। সমস্ত বেদান্ত জুড়ে খালি এই রজ্জু আর সাপ, আমাদেরও এখন নাসাদীয়সূক্তম্ বুঝতে গিয়ে সৎ ও অসৎ নিয়ে পড়েছি।

এখানে যেটা বলতে চাইছে তা হচ্ছে, প্রথম সত্তা হচ্ছে ভগবানের, তিনি সৎ অসৎ এর পার, তিনি সচ্চিদানন্দ। সেখান থেকে এসে গেল অবিদ্যা আর তার কার্য। যিনি সচ্চিদানন্দ, চিৎস্বরূপ, তাঁর অবিদ্যাটা আসে কি করে, এইটাই রহস্য, যেন বলছে দুধ থেকে কালোর জন্ম হচ্ছে। কিন্তু দুধ থেকে কালোর জন্ম কখনই হতে পারে না। ঠিক সেই রকম যিনি সচ্চিদানন্দ তাঁর থেকে কি করে অসৎ এর জন্ম হচ্ছে, অথচ তাঁকে অসৎ বলেও আখ্যা দেওয়া হয় না। আবার সেই অসৎ থেকে সৎ এর জন্ম হচ্ছে। এই চারটে জিনিষের পারস্পরিক সম্পর্ক কিছুতেই মেলানো যায় না। এই চারটে হচ্ছে ঈশ্বর, জীব, জগৎ ও মায়া। ঈশ্বর বলতে আমরা এখানে সেই সচ্চিদানন্দকেই বোঝাচ্ছি। এই সচ্চিদানন্দে যখন মায়া এসে যাচ্ছে তখন আরও দুটো সত্তা এসে যুক্ত হচ্ছে – একটা জীব আরেকটি জগৎ। এখন ঈশ্বরের সাথে মায়াকে কিছুতেই মেলানো যাবে না। অন্য দিকে মায়ার সঙ্গে জীব আর জগৎকেও কিছুতেই মেলানো যায় না। তাই ঈশ্বরের সঙ্গে জীব ও জগৎকে কখনই মেলানো যাবে না। অথচ সমস্ত শাস্ত্রই, ইতিহাস, তন্ত্র, উপনিষদ, পুরান যাই বলুন, সবাই এই চারটের সম্পর্ককে নিয়েই নানান ভাবে আলোচনা করে যাচ্ছে। শুধু মাত্র হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রেই নয়, কোরান, বাইবেল, গুরুগ্রন্থ যেখানেই চোখ রাখব সেখানেই দেখতে থাকব তারা এই চারটে জিনিষকে নিয়েই আলোচনা করছে। কিন্তু ঈশ্বর, সে যারই ঈশ্বর হোক, খ্রীশ্চানের হোক, মুসলমানের হোক, যারই ঈশ্বর হোক, তিনি আছেন আর তিনি হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ। যিনি চৈতন্যস্বরূপ, যিনি আনন্দস্বরূপ, তাঁর মধ্যে নিরানন্দটা কোথা থেকে এলো, যিনি জ্ঞানস্বরূপ মাঝখান থেকে তাঁর মধ্যে এই অজ্ঞানটা কোথা থেকে চলে এল। সবই যদি সেই সচ্চিদানন্দ যদি হয় তাহলে মানুষের মধ্যে হতাশা আসছে কেন, কেন তারা আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে? যিনি সৎ স্বরূপ মানে তিনি সব সময়ই আছেন তাহলে মৃত্যু কেন দেখছি, কত

কিছুর নাশ কেন হয়ে যাচ্ছে? এগুলো কিছুতেই মেলানো যাবে না। অথচ বলছে *সতো বন্ধুমসতি* – সৎ আর অসৎ হচ্ছে এক অপরের বন্ধু, এক অপরকে ছাড়া চলতে পারেনা। সৎ থাকলেই অসৎ থাকবে, অসৎ থাকলেই সৎ থাকবে।

সৎ আর এই অসৎএর মধ্যেকার এই সম্পর্ককে যদি উপমা দিয়ে আলোচনা করা যায় তাহলে ব্যাপারটা আরো ভালো পরিষ্কার হতে পারে। মনে করা যাক আমরা একটা ঘরে বসে আছি, ঘরটা পুরো অন্ধকারে ঢাকা। বাইরে থেকে কেউ যাচ্ছে, সে উচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করছে 'এই ঘরের ভেতরে কেউ আছে'? এখন সবাই যদি চুপ করে থাকে তাহলে সে ভাববে ঘরে কেউই নেই। তার কাছে ঘরটা পুরো অন্ধকারে ঢাকা, পুরো জিনিষটা অসৎ হয়ে গেছে। ঘরটা অসৎ হয়ে গেছে মানে, ঘরে কেউ আছে কি নেই এটা জানার কোন উপায় নেই। এখন হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল, তারপর ঘর থেকে এক এক করে লোক বের হতে শুরু করল। তখন যে মনে করেছিল ঘরে কিছুই নেই সেই অবাক হয়ে ভাববে – বাবা, ঘরে এত কিছু ছিল! সব কিছুই আছে কিন্তু অসৎ, মানে কিছু যে আছে সেটাকে বোঝবার মত কোন চিহ্ন নেই, সৎ হচ্ছে এর ঠিক উল্টো যখন আমরা কোন লক্ষণ দেখে বুঝতে পারে যে এখানে অনেক কিছু আছে। যখন উপায় পাওয়া গেল, আলো এসে গেলে বুঝতে পারলাম যে ঘরে অনেক কিছু আছে। এখানে সৎ অসতের মধ্যে এক হয়েছিল। সৎ এর জন্ম সব সময় অসৎ থেকেই হয়। ভোরের অন্ধকারে যেমন যেমন সূর্য উদয় হতে থাকবে তেমন তেমন আস্তে আস্তে পাখিরা ডাকতে থাকে, তারপর আলো যত একটু একটু করে ফুটতে থাকবে একটা একটা করে গাছ-পালা গুলি চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে, মানুষ, গরু পশু চলাচল করতে শুরু করছে, তারপর সমস্ত কিছুই পরিষ্কার হয়ে সামনে চলে আসে। মনে হবে যে সমস্ত জগৎটা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল। সৃষ্টি যখন হয় তখন ঠিক এই রকমই হয়। অন্ধকার কোথাও কিছু নেই, মনে হয় যেন এখানে কিছুই নেই, তারপর আলো যেই ফুটে গেল তখন একটার একটা পর পর যেন বেরিয়ে আসতে থাকে। এই ভাবেই বলা যায় যে সৎ অসতের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। তথাপি এটার কোন অর্থই হয় না। অসৎ বা অবিদ্যা সচ্চিদানন্দ থেকে জন্ম নিচ্ছে এই ব্যাপারটাও আমাদের যেন চিন্তার বাইরে। অথচ বেদ নাসদীয়সূক্তমের মধ্য দিয়, যে নাসাদীয়সূক্তম্‌কে সমস্ত বিদ্বদজন গভীর দার্শনিক তত্ত্বের উদ্‌গাতা বলে মনে করেন, এই কথাই বলছে।

যখন ম্যাক্সমূলাররা নাসদীয়সূক্তমের অনুবাদ করছিলেন, তাঁরা অবাক হয়ে গিয়েছলেন। ম্যাক্সমূলার এক জায়গায় বলছেন – বেদের ঋষিরা যেন হিমালয় পাহাড়ের চূড়ায় উঠছেন, একটার পর একটা চটিতে উঠেই চলেছেন, যেখানে সাধারণ মানুষের বাতাস নেই বলে বুক ফেটে যাবে, সেখানেও তাঁরা চলে গেছেন। তাঁদের বিবেক বুদ্ধিতে তীব্র সাধনার জোরে যেখানে চলে গেছেন সেখানে তাদের সমস্ত ভয় দূরীভূত হয়ে গেছে, কোন কিছু থেকেই তাঁর আর ভয় পাওয়ার নেই। মানে, যদি মনে করেন যে ব্যাপারটা অযৌক্তিক হয়ে যাচ্ছে, তখনও বলছেন – তাই হোক। কিন্তু তাঁর যে পরিষ্কৃত পবিত্র বুদ্ধি, সাধনা করে করে যে বুদ্ধিটা একেবারে স্বচ্ছ হয়ে গেছে, সেই সাধনাকৃত বুদ্ধি তাঁকে ঐখানে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা বলছি ভগবান থেকে অবিদ্যা কি করে জন্ম নিল, আমরা বলছি অসৎ থেকে সৎ কি করে আসছে? তাঁরা দেখছেন যে এইটাই হবে, এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পছন্দ নেই। ফিজিক্সে অনেক নিয়ম আছে যেখানে অনেক কিছুকে মনে হবে যে এই রকম হতেই পারে না, অথচ ঐটাই হয়।

তারপরে বলছেন - *প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা।* ভগবানের সাথে অবিদ্যার কোন সংযোগ নেই অথচ বলছে সংযোগ আছে, এটাকে কি করে জানছেন? স্বামীজী বলছেন – Sages who have searched their hearts with wisdom, যখন ধ্যান করবে আট ঘন্টা, দশ ঘন্টা দশ বছর, কুড়ি বছর ধরে, ধ্যান করে করে মরে গেল, তারপরে আবার জন্ম নিল, জন্ম নিয়ে আবার চলতে লাগল সেই এক সাধনা, এই ভাবে করে করে – *বহুনাং জন্মনামান্তে,* মানে অনেক জন্ম সাধনা করে করে মন যখন পবিত্র হয়ে যাবে, হৃদয় একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে, তখন যখন প্রজ্ঞার আলোকটা হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয় তখন এই

জিনিষটাই পরিষ্কার হয়ে, স্পষ্ট হয়ে দেখা যায়। আধ্যাত্মিক সত্য এই পরিষ্কৃত শুদ্ধ হৃদয়েই উপলব্ধি হয়। এক জন্মে কিছুই হয় না, জঙ্গল পরিষ্কার করতে, হৃদয়ের আগাছা পরিষ্কার করতে করতেই অনেক জন্ম কেটে যায়। বেদের ঋষিরাও জানতেন যে আমি যে আধ্যাত্মিক সত্যকে দেখতে পারছি, এই সত্যকে সাধারণ মানুষকে কোন মতেই বোঝান যাবে না। গীতা, উপনিষদ, রামায়ণে বারে বারে একটা কথা আমাদের জন্য বলা হয়েছে যে – বাপু, তুমি এটা বুঝতে পারবে না। কেনোপনিষদে আছে গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন, একটার পর একটা কথা বলে যাচ্ছেন, শিষ্য বিরক্ত হয়ে বলছেন – হে গুরুদেব, আপনি আমাকে উপনিষদের শিক্ষা দিন। গুরুও শিষ্যের প্রতি স্নেহ পরবশ হয়ে বলছেন – বোকা, আমি তখন থেকে তোমাকে উপনিষদই বুঝিয়ে যাচ্ছি।

আমরা এখানে ঋষিদের কথাই আলোচনা করছি। আমরা একেকটি কথাকে বোঝাবার জন্য কত রকমের উপমা নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করে করে একটা মন্ত্রের এ চতুর্থাংশও শেষ করতে পারছি না। এতো আলোচনার পরেও আমরা পুরোপুরি সংশয়মুক্ত হয়ে বুঝতে পারছি না। এই জিনিষটাকেই সাত-আট হাজার বছর ধরে ভারতের সব থেকে উচ্চ মস্তিষ্কের অধিকারী ঋষিরা সারাটা জীবন ধরে মুখস্ত করে গেছেন, চিন্তন করে গেছেন, বিভিন্ন ভাষ্য রচনা করে গেছে, বিদেশী পণ্ডিতরা এই সব দার্শনিক তত্ত্ব দেখে হাত তুলে দিচ্ছেন। আর এই সব তত্ত্বকে আমরা বিশ্বাসই করতে পারছি না। সাধুরা যে কালে বলছে তাই মেনে নিচ্ছি। যদি এই তত্ত্বগুলিকে আমাদের নতুন করে আবিষ্কার করতে হত তাহলে, বিজ্ঞানেরও যে কোন তত্ত্বের যে আবিষ্কার হয়, যেমন নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম, আইনস্টাইনের Theory of Relativity বা Laws of Quantum, এই গুলো একদিনে আসেনি, অনেক দিন ধরে খাটতে খাটতে, সাধনা করতে করতে হঠাৎ মনের মধ্যে একটা সত্য উদ্ভাসিত হতেই বুঝে গেল যে এটা থেকে এই হয়। বেদের এই তত্ত্ব গুলিও ঠিক তাই। এই তত্ত্বগুলি কাদের মধ্যে ধরা পড়ে? যে ঋষিদের হৃদয় একেবারে পরিষ্কার হয়ে নির্মল, স্বচ্ছ হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, বলছেন – *ইতি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা,* তাঁরা যখন নিজেদের প্রজ্ঞা, বুদ্ধিকে যখন প্রয়োগ করেন তখন তত্ত্বগুলিকে তাঁরা ধরতে পারেন। আমি আম গাছের তলায় মুখ হাঁ করে বসে আছি আর গাছ থেকে আমটা এসে আমার মুখে পড়বে, তা কখন হয় না।

প্রথমে চলে সাফাইয়ের কাজ, মনটাকে একেবারে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়, তারপর যুক্তি দিয়ে বিচার দিয়ে নিজের প্রজ্ঞা দিয়ে বুদ্ধিকে ক্ষুরধার করা হয়। এই ক্ষুরধার বুদ্ধিকে এইবার প্রয়োগ করতে শুরু করবে, তখন একটা তত্ত্ব বেরিয়ে আসবে। কি তত্ত্ব? যেমন বলছেন সৎ আর অসৎ যুক্ত হয়ে আছে, সৎ এর জন্ম অসৎ থেকে, যা কিছু কার্য আছে তার কারণ হচ্ছে অব্যক্ত। এরপর আমরা বুঝি আর নাই বুঝি তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না। আমাদের সাধারণ বুদ্ধি বলে যদি ছেলে থাকে তাহলে তার মাকেও থাকতে হবে। মাও সন্তান তাই তারও একজন মা আছেন। এইভাবে বিচার করতে করতে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়াবে আমরা ভাবতেই পারব না, কারণ আমাদের বুদ্ধি সেখানে গিয়ে পৌঁছাতেই পারবে না। এই যে আমরা এত বিস্তৃত ভাবে সৃষ্টি তত্ত্বের আলোচনা করছি, সেখানে বলাই হচ্ছে যে এই জিনিষ গুলোকে তুমি ধারণাই করতে পারবে না, যখন দীর্ঘকাল ব্যাপি সাধনা করে করে তোমার হৃদয় পরিষ্কার হবে তখন বুঝতে পারবে। গীতার পঞ্চোদশ অধ্যায়ে ভগবান বলছেন – *উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্। বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ (১৫/১০)*।। মানুষ জাগ্রত অবস্থায় খাচ্ছে দাচ্ছে, কর্ম করছে আবার ঘুমিয়ে পড়ছে, এই সমস্ত কিছুর পশ্চাতে যে আত্মা আছেন বলেই সব হচ্ছে, এটাকে বিমূঢ়া *নানুপশ্যন্তি*, মানে যারা বিমূঢ়, আমাদের মত সাধারণ লোকেরা এটা দেখতে পায় না। তবে কারা দেখতে পান? *পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুসঃ*, যাঁদের জ্ঞান চোখ খুলে গেছে তাঁরাই এটাকে দেখতে পান – এই শরীরে যা কিছু হচ্ছে, কিন্তু শরীর কিছুই না, ভেতরে যে আত্মা আছেন তিনিই সব, তিনি আছেন বলেই শরীর কাজ করতে পারছে। যতই বক্তৃতা শুনি, যতই শাস্ত্র অধ্যয়ন করি কোন কিছুতেই হবে না, এগুলো হচ্ছে সাধনা সাপেক্ষ। সাধনা হচ্ছে হৃদয় মনকে পরিষ্কার করা।

মন পরিষ্কার দুই ধরণের লোকের হয়। এক ধরণের লোক হয় যারা অতি মুর্খ, মানে মুর্খতমের থেকেও মুর্খ যাদের বলা হয়। প্রত্যন্ত গ্রামের আদিবাসীরা চুরি করা, মিথ্যা কথা কখন বলে না। গ্রামের লোকেদের মত সৎ লোক পাওয়া যাবে না, ওরা জানেই না চুরি করা কাকে বলে, মিথ্যা কথা কাকে বলে। খুব সহজ সরল হয়, তাই এদের মনটাও খুব পরিষ্কার। কিন্তু এদের জীবনচর্চার গতি ঐখানেই থেমে থাকে, তাই তাদের দ্বারা কিছু হয়ও না। আরেক ধরণের লোক হচ্ছেন উচ্চতম ঋষি যাঁরা, এঁদের মনটা সব সময় খুব পরিষ্কার। এই দুই ধরণের লোকের মাঝখানে যারা আছে, আমাদের মত যারা, এরা সবাই গোলমেলে। কিছু হলেই বলবে – আপনি কি আমায় মিথ্যেবাদী বলে মনে করেন? মিথ্যেবাদী বলার অপেক্ষা কোথায়, মিথ্যেবাদী তো আছই। প্রত্যেকটি মানুষ হচ্ছে একজন potential criminal, কিছু মানুষ হচ্ছে যারা পুলিশ, সমাজের ভয়ে করতে পারে না, কিছু লোক পরিবারের ভয়ে করে না, আর বেশির ভাগ লোক সুযোগ পায় না বলে করে না। যারা রাষ্ট্র ক্ষমতার বাইরে রয়েছে তারা এখন চেঁচাচ্ছে। কিসের জন্যে? সত্তা চাই। সত্তা যখন পেয়ে যাবে তখন এখন সত্তাধারীরা যা করছে তারাও ঐটাই করবে। আমি এখন সৎ কারণ আমি চুরি করার সুযোগ পাচ্ছি না। কেউ যদি এই কথা শুনে বলে – আপনি কি আমাকে চোর মনে করছেন? চোর মনে করব কি, আসলে তুমি তো বাপু একজন potential ডাকাত। আর এই গ্রামের যে সব লোকেদের কথা বলা হল, এরাও একেক জন potential ডাকাত, ওদের এখনও বুদ্ধি জাগ্রতই হয়নি ডাকাতি করার।

ঠাকুর বলছেন – যে নাচতে যানে তার কখন বেতালা পা পড়ে না, তাকে ঘুম থেকে তুলে দিয় নাচাতে শুরু করলেও বেতালা পা পড়বে না। কেউ যদি ঠাকুর, স্বামীজীর মত মানুষকে দিয়ে কোন ভুল কাজ করাতে যান, ওনারা চেষ্টা করেও ভুল কাজ করতে পারবেন না। খুব সহজ উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। আমরা হলাম চরিত্রবান পুরুষ, অপরের মেয়ের দিকে, পরস্ত্রীর দিকে বা পর পুরুষের দিকে নজর দিই না। আসল কথা হচ্ছে, আমাদের সেই সুযোগই নেই নজর দেব কি করে, আমাদের সেই পরীক্ষাই এখনও হয়নি। মথুর বাবু ঠাকুরকে নর্তকীর বাড়িতে নিয়ে গেছে, ঘরে ঢুকেই ঠাকুর 'মা' 'মা' বলে সমাধিস্ত হয়ে গেলেন, এইটাই হচ্ছে চরিত্র। মানে, ঠাকুর যদি খারাপ কিছু করতেও চাইতেন পারতেন না। ঠাকুরের উপমাতেই বলতে হয় – পরশমণির ছোঁয়া লেগে তলোয়ার সোনা হয়ে গেছে, সেই তলোয়ার দিয়ে আর হিংসার কাজ হবে না। যতক্ষণ না আমাদের সেই পরশমণির স্পর্শ না হয়ে থাকে ততক্ষণ আমরা প্রত্যেকেই, সেই তথাকথিত মহাপুরুষ থেকে শুরু করে একেবারে সামান্য কুলি মজুর পর্যন্ত সবাই সমান, কেউ ঊনিশ আর কেউ সোয়া ঊনিশ। এইটাই কিন্তু ঘটনা। এখন যে মন হচ্ছে একটা potential criminal, একটা potential fraud, যে মন আগাছা আর জঙ্গলে ভর্তি হয়ে আছে, সেই মন দিয়ে কি আর সৎ আর অসৎ পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত, অসৎ থেকে সৎ এর জন্ম হচ্ছে বুঝতে পারবে না ধারণা করতে পারবে। এই তত্ত্বগুলিকে আবিষ্কার করা দূরে থাক, বোঝা বা ধারণা করাই অসম্ভব। এই জিনিষ গুলিকে কারা বুঝবে? যাদের মন একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে তারাই বুঝতে পারেন যে সৎ আর অসৎ হচ্ছে বন্ধু, বন্ধু মানে এই দুটো আলাদা কিছু নয়।

হৃদি প্রতীষ্য মানে হৃদয়ে জানতে পারে। বাইরে কিছু দেখে তার মনে হচ্ছে তা নয়, যেমন আমরা এই বোতলটা দেখতে পাচ্ছি, মাইক্রোফোনটাকে দেখতে পাচ্ছি, এখানে বাইরে থেকে কিছু হচ্ছে না। এই ধরণের সমস্ত জ্ঞান ভেতরে নিজের মনের মধ্যেই পরিষ্কার জাগ্রত হয়। যখন আইনস্টাইন $E = MC^2$ দেখছেন, তিনি কোথায় দেখছেন? আসলে এনারা সবাই এই সত্য গুলিকে মনের মধ্যেই দেখেন। $E = MC^2$ যেটা দেখেছেন সেটা বাইরে অঙ্কের মাধ্যমে কষে কষে বার করেছেন, কিন্তু এর পেছনে বিজ্ঞানের যে সত্যটা রয়েছে, সেটাকে তিনি মনের মধ্যে দেখেছেন। তখন থেকে যে আমরা সৎ অসতের কথা বলে আসছি, এই দুটোর মধ্যে প্রকৃত পক্ষে একটা সম্পর্ক রয়েছে, এই সত্যটাকেই শুদ্ধ মন আর পবিত্র হৃদয়ের দ্বারাই আবিষ্কৃত হয়। এই সত্যই উত্তরকালে একই ধরণের শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী পুরুষের দ্বারা

যাচাই হয়ে যায়। আমাদের মত সাধারণ মানুষ শুধু শ্রবণ করে যাব, ধারণা করা বা উপলব্ধি করা যাবে তখনই যখন আমাদের মনও ঐ রকম শুদ্ধ ও পবিত্র হবে।

পঞ্চম মন্ত্রে বলছেন – ***তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ। রেতোধা আসন্মহিমান আসন্ৎস্বধা অবস্তাৎ প্রযতি পরস্তাৎ।।*** সৃষ্টিটা কিভাবে হল বলতে গিয়ে বলছেন যখন কাম এল তখন সৃষ্টি হতে শুরু করেছে, সৃষ্টি যখন শুরু হয়ে গেল তখন পুরো জিনিষটাকে যেন প্রসারিত করে দিল। জিনিষটা যেটা ছোট ছিল সেটা এখন বাড়তে শুরু করেছে। প্রথমে বলেছিল কিছুই নেই, কেননা অসৎ থেকে সৃষ্টি হচ্ছে, এবার প্রথম আলো যেন বিকশিত হয়ে প্রথম যেন সৃষ্টি এগোতে শুরু করল। এই আলোটাকে ওনারা বলছেন রশ্মি। রশ্মি কথার অর্থ হতে পারে আলো বা কিরণ অথবা দড়ি। মনে করা যাক একটা ঘরে অনেক লোকজন এবং আরও অনেক কিছু রয়েছে। এখন এই ঘরটাকে একটা ছোট করতে করতে একটা পয়েন্ট সাইজে করে দেওয়া হল। ধরা যাক এই পয়েন্ট সাইজটা রাবারের দড়ির মত। এখন কোন সৃষ্টি কর্তা এলেন। তিনি এই পয়েন্ট সাইজের রাবারটাকে টানতে শুরু করলেন। যখন টানতে শুরু করলেন, ঐ পয়েন্ট সাইজটাও আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে তার আগের স্বাভাবিক আকারে ফিরে এল। এর বিস্তারটা চারিদিকে হতে থাকে। ওপর নীচে, ডান দিক থেকে বাম দিকে, মানে আড়াআড়ি আবার লম্বালম্বি ভাবে চারিদিকে বিস্তার হতে থাকে। তিনটে দিকেই যে একসাথে টানতে শুরু করেছে, নীচের দিকে, উপরের দিকে আর আড়াআড়ি। *রেতোধা আসন্মহিমান* – এখানে বলতে চাইছে যখন সৃষ্টি হল তার কিছু কিছু ছিল সাধারণ আর কিছু কিছু ছিল মহিমা যুক্ত মানে powerful। আমরা মনে করছি সৃষ্টিতে সব সমান, ভক্তদের মাঝে কেউ ছোট নয় কেউ বড় নয় সবাই সমান, আসলে কিন্তু তা নয়। *আসন্ৎস্বধা অবস্তাৎ প্রযতি পরস্তাৎ* - এখানেই বলা হচ্ছে যে উঁচু নীচু প্রভেদ প্রথম থেকেই করা হয়েছে। নরেন রাখাল এনারা চিরদিনই আলাদা। ধনী-দরিদ্র চিরকালই আছে, কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনে মাঝে মাঝে ধনী দরিদ্র হয় আর দরিদ্র ধনী হয়, কিন্তু অসাম্য চিরকালই থাকবে। বেদের মতেই বলছে – inequality is the law of life, যেটা খাদ্য সে হচ্ছে ছোট আর যে খাচ্ছে সে হচ্ছে বড়। গাধা যেমন মানুষের বোঝা বহন করে ঠিক তেমনি এই মানুষরাও দেবতাদের বোঝা বহন করে চলেছে। আর আমরা বড়লোকেদের বোঝা বহন করি।

যখন বিগব্যাঙ থিয়োরি আবিষ্কার হয়েছিল তখন আমেরিকায় একটা খেলনা বেরিয়েছিল, যার নাম ছিল Ultimate Plastic, তার মধ্যে একটা ছোট্ট প্লাস্টিকের কিউব্ থাকত যেটাকে টানা যেত। পুরোটাই সলিড প্লাস্টিক, ঐ কিউবের মধ্যে ছোট ছোট বল এমন ভাবে থাকত, টানা হলেও বল গুলির সাইজ পাল্টাত না। বাচ্চাদের বলা হত দুই দিকে দড়ি লাগিয়ে এই কিউবটাকে টানতে থাক। যখন টানা শুরু হত তখন এই ছোট্ট কিউবটা তিন দিকে বাড়তে বাড়তে পুরো ঘরের সাইজের হয়ে যেত। Galaxy গুলোকে দেখানোর জন্য বল গুলো রাখা থাকত।

মডার্ন ফিজিক্সে space এর যে ধারণা করা হয়, এখানে বলতে চাইছেন যে সেই space টাকে যেন সৃষ্টি শুরু হতেই যেন প্রসারিত করে দেওয়া হল। আর এই space এখনও প্রসারিত হয়ে বেড়েই চলেছে। কিভাবে হচ্ছে? জড় আছে আর প্রাণ রয়েছে, প্রাণ এই জড়ের উপরে হাতুরির মত আঘাত করে যাচ্ছে, আগে যেমন বলা হয়েছিল *আনীদবাতং*, এখানেও ঠিক ঐ রকম বলা হচ্ছে। Space, matter যা কিছু আছে তার উপর আঘাত হয়েই চলেছে আর একটার পর একটা সৃষ্টি হয়েই চলেছে।

সৃষ্টি যখন হতে শুরু করল, তখন দুই ধরণের সৃষ্টি হতে থাকল – force and matter and enjoyer and enjoyed, মানে যিনি enjoy করবেন আর যেটাকে enjoy করা হবে, এই দুটোই সৃষ্টি হল। এর মধ্যে যে জিনিষটা enjoy করা হবে সে হচ্ছে inferior আর যে enjoy করবে সে হচ্ছে superior। যেমন খাওয়া, মানুষ আর খাওয়া, মানুষ হচ্ছে উৎকৃষ্ট আর খাওয়াটা হচ্ছে নিকৃষ্ট। এখানে ভাষ্যকারদের বক্তব্য হচ্ছে – যখন সৃষ্টি হতে শুরু হয়েছে তখন প্রথমে এসেছে আকাশ, আকাশ থেকে

বায়ু, এইভাবে একটার পর একটা, অগ্নি, পৃথিবী ও জল সৃষ্ট হয়েছে। এইগুলো সৃষ্টি হওয়ার পরেই জড় পদার্থ সকল আর জীব সকলের জন্ম হল। কিন্তু সৃষ্টি যখন হতে শুরু করল তখন পুরো ব্যাপারটা এত দ্রুত গতিতে সৃষ্টি হতে লাগলো যেন চোখের পলক পড়তে যত সময় লাগে তার থেকেও দ্রুততার সাথে তৈরী হয়েছে, তাই এটা বলা মুশকিল যে আকাশ থেকে বায়ুর সৃষ্টি হল না বায়ু থেকে আকাশের সৃষ্টি হল। তবে পরের দিকে যুক্তির দিক দিয়ে দেখার সময় বোঝা যাচ্ছে যে বায়ু থেকে আকাশের ব্যাপারটা যুক্তি বিচারে দাঁড়াচ্ছে না। ফিজিক্সেও বলছে বিগব্যাঙ যখন বিস্ফোরণ হয় তখন এক সেকেণ্ডের মধ্যে কি হয় বোঝাই যায় না। সেই সময়ের তাপমান যে অবস্থাতে চলে যায় সেটা আমরা কল্পনাই করতে পারিনা। এখানে কিন্তু ঋষিরা বলে দিচ্ছেন কোনটার পর কোনটা সৃষ্টি হয়ে হয়ে শেষে matter and light এই দুটো বেরিয়ে এল। যেটাই যেটার পরে আসুক না কেন, এনারা বলছেন পুরো ব্যাপারটাই এক নিমেষের মধ্যে সৃষ্টি থেকে বেরিয়ে আসছে। সেগুন গাছ লাগান হল, তারপর কবে যে বড় হবে, আর কবে যে তার কাঠ থেকে আসবাব তৈরী হবে আমরা জানিনা, এখানে সৃষ্টি কিন্তু সেই ভাবে হচ্ছে না। নিমেষের মধ্যে হয়ে যাচ্ছে, একটার পর একটা যেন সাজান ছিল আর আঘাত করতেই দুম্ করে বেরিয়ে আসছে। কে আঘাত করছে? শক্তি বা প্রাণ যাই বলা হোক না কেন, সেই আঘাত করে যাচ্ছে।

এখন পরের মন্ত্রে এসে আবার অন্য ধরণের কথা বলছেন। এতক্ষণ সৎ অসতের কথা, *আনীদবাতং* energy matter এর উপর আঘাত করছে, এগুলো ঋষিরা পবিত্র হৃদয়ে জানতে পারেন। এত কথা বলার ষষ্ঠ মন্ত্রে বলছেন – ***কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ। অর্বাগ্‌দবা অস্য বিসর্জনেনাহথা কো বেদ যত আবভূব।।*** এই যে এত কিছু বলা হল এগুলো কে জানে, আর কেই বা বলবে? যিনি বলছেন সেতো দূরের কথা, আদপে এগুলো কেউ জানে কিনা সেটাই কেউ বলতে পারছে না। যেমন আমরা অনেক সময় অনেক কিছু জানি কিন্তু বলতে পারিনা। কিন্তু এখানে বলছেন – বলা তো দূরের কথা, এটা কেউ জানেও কিনা সন্দেহ হয়। এই সমস্ত কিছু কোথা থেকে এসেছে, কিভাবে এদের সৃষ্টি হল এই কথা কে বলবে? মানুষের কথা ছেড়ে দাও, এই যে দেবতারা আছেন, তাদেরও জন্ম সৃষ্টির অনেক পরে। সেইজন্য কে জানে এই সৃষ্টি কোথা থেকে শুরু হয়েছে আর কিভাবে শুরু হয়েছে। একেই বলে সততা, ঋষিরাও স্বীকার করে দিচ্ছেন। একটা অবস্থার পর আর ধরা যায় না, নাসাদীয়সূক্তম্ নিজেই বলে দিচ্ছে যারা খুব নিশ্চিত হয় দৃঢ়তার সাথে যুক্তি দিয়ে সৃষ্টির সম্বন্ধে সব কথা বলে দেন, তাদেরকে বলছেন –বেদের ঋষি, উপনিষদের ঋষিরা কি সত্যিই জানেন জিনিষটা? চতুর্থ মন্ত্রে বলেছিলেন – সেই সব ঋষিরা যখন হৃদয়ের পবিত্রতার পরাকাষ্ঠায় চলে গিয়ে নিজেদের প্রজ্ঞাকে সেখানে লাগিয়েছেন তখন তাঁরা কিছু জিনিষকে আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু প্রমাণ কোথায় তাঁরা যেটা জেনেছিলেন সেটাই ঠিক? কোন ভাবে প্রমাণ করা যাবে না। সেইজন্য বলছেন *কঃ অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ* - কে সত্যিই জানেন আর কে সত্যি সত্যিই বলতে পারবেন? নরেন্দ্রনাথ সবাইকে জিজ্ঞেস করে বেড়াচ্ছেন – মশাই আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন? কে দেখেছে, আর কেউ বা বলবে আমি দেখেছি। তারপরে বলছে *কুত আজাতা* – কোথা থেকে এর জন্ম হয়েছে, কোথায় তৈরী হয়েছে এই সৃষ্টি। দেবতারাও কি জানতে পারেন? এখানে যে দেবতাদের কথা বলা হচ্ছে, যে অর্থে আমরা ইন্দ্র, বরুণ, মিত্রদের জানি, এখানে সেইভাবে দেবতার কথা বলা হচ্ছে না। যখন যজ্ঞ হত, তখন যজ্ঞে যেসব আহুতি দিতেন, সেই আহুতি যাঁদের উদ্দেশ্যে করা হত, ঋষিদের কাছে সেই সব দেবতারা হলেন শ্রেষ্ঠতম পুরুষ। তাই ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ দেবতারা ছিলেন শ্রেষ্ঠতম শক্তি। ঋষিরা বলছেন, আমাদের কথা তো বাদ দাও, সেই শ্রেষ্ঠতম দেবতাদের জন্মও সৃষ্টির অনেক পরে। এখানে আমরা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ধারণাকে পেলাম। আমরা যখন ইন্দ্র, মিত্র, বরুণাদি দেবতাদের কথা বলি, তখন এই দেবতাদের পূজা ঋষিরাও করতেন। কিন্তু ঋষিরা জানতেন যে এই সব দেবতারা এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন না। দেবতারা সৃষ্টি কর্তা নন, এনারা হচ্ছেন প্রকৃতির দেবতা, মানে দেবতাদের শুধু প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেওয়া ছিল। সেইজন্য এখানে বলছেন *অর্বাগদেবা অস্য বিসর্জনেনাহথা* – মানে এই দেবতাদের সৃষ্টির অনেক পরে হয়েছে। আমরা এদের পূজো করি, প্রার্থনাও করছি আমাদের ভালো ভাবে দেখাশুনা

করার জন্য, কিন্তু আমরা এটাও ভালো করে জানি যে এই দেবতাদের জন্ম অনেক পরে হয়েছে। যে জন্মের সময়ে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেই একমাত্র বলতে পারবে সৃষ্টির সময় কি হয়েছিল। কিন্তু কেউই তো সেই সময় ছিল না।

সৃষ্টির ব্যাপারে ঋষিদের এইটাই কিন্তু শেষ কথা নয়, তারপর তাঁরা যখন তাঁদের পবিত্র হৃদয়ে তাঁদের প্রজ্ঞাকে লাগিয়েছেন তখন তাঁরা সৃষ্টির তত্ত্বকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এখন সত্যিই বোঝা যায় এর পরে সৃষ্টির ব্যাপারে যুক্তি দিয়ে আর কিছু বলা যায় না। বিজ্ঞানীরা ফিজিক্সের থিয়োরি প্রয়োগ করে আজকে যে dark matter, dark light বলছে সেটাকে তারা প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছে না, অনুমানের মাধ্যমে বলছে। Dark matter মানে যেটাকে আমরা verify করতে পারিনা। বলা হচ্ছে যে dark matter নাকি অনবরত আমাদের শরীর মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে, আর এই পৃথিবীর যা ওজন তার উনিশ গুণ বেশি ওজন এই পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে। এই পৃথিবী যখন সূর্যের চার পাশে প্রদক্ষিণ করছে তখন নাকি এই পৃথিবী এই dark matter আর dark energyর সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে ছুটে চলেছে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আমরা যা কিছু এখন দেখতে পাচ্ছি তার ওজন, সমস্ত dark matter এর মোট ওজনের মাত্র একশ ভাগের পাঁচ ভাগ। বাকী ৯৫% পদার্থের কোন খবর বিজ্ঞান জানেই না। আমার আপনার মাঝখানে যদি একটা vacuum করে দেওয়া হয়, তাহলে কি ঐ জায়গাটা খালি পড়ে আছে? না, আমার আপনার যে মোট ওজন তার কুড়ি গুণ বেশি ওজনের dark matter দিয়ে ঐ জায়গাটা ভরে আছে। বিজ্ঞানীরা একেবারে হিসেবে করে দেখেছেন, যদি এই রকম না হয় তাহলে হিসেব মিলবে না।

এই যে এত dark matter আর dark light এর কথা বলছে বিজ্ঞান, তারাও বলছেন এগুলো আমরা সরাসরি জানতে পারছি না, এগুলো আমরা indirect পদ্ধতিতে জানতে পারছি। আমরা যে এখানে সৃষ্টির কথা আলোচনা করছি, আমরাও বলছি এই যে সৃষ্টিটা আমাদের indirectly method এ জানতে হবে। কি সেই indirect method? যে ঋষিরা ধ্যানের গভীরে শুদ্ধ পবিত্র মনটাকে এই সৃষ্টির রহস্যে লাগালেন তখন তাঁরা এই সৃষ্টির রহস্যটাকে বুঝতে পেরেছিলেন।

শেষ মন্ত্রে বলছেন – ***ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা না। যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ।।*** বলছেন – যিনি এই সৃষ্টির জন্মদাতা তিনিই হয়তো এই সৃষ্টির রহস্যকে জানেন, কারণ তিনিই জন্ম দিয়েছেন। মা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, মা জানে কবে সন্তানের জন্ম হয়েছে, সন্তানের জানার কোন পথই নেই। আর সন্তানের সন্তান সে কি কখন জানতে পারে তার বাবার বাবার জন্ম কিভাবে হয়েছিল। তাই বলা হচ্ছে যার থেকে এই সৃষ্টি তিনিই এই সৃষ্টি রহস্যকে বুঝতে পারবেন। অথবা *সঃ অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ* - মানে, যিনি স্রষ্টা তিনিও হয়তো এই সৃষ্টির রহস্যকে জানেন না। এই লাইনটার আবার অন্য ব্যাখ্যা হচ্ছে – একমাত্র তিনিই জানেন, *ন বেদ* কথার অর্থ তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। নাসাদীয়সূক্তম্ একটা কবিতা, কবিতার একটা সমস্যা হয় কি, এতে কিছু কিছু শব্দ উহ্য থাকে বলে এর অর্থ পাঁচ ভাবে করে দেওয়া যায়।

আলোচনা করে করে আমরা এখানে এসে সৃষ্টির রহস্য উন্মোচনের শেষ ধাপে পৌঁছে গেছি। সৎ অসতের আলোচনা করে প্রথমে দেখলাম এগুলো ঋষিরা পবিত্র হৃদয়ে দেখতে পান। দ্বিতীয় ধাপে বললেন কে জানতে পারবে এই সৃষ্টির কথা? কারণ আমাদের দৃষ্টিতে যারা সবচাইতে বুদ্ধিমান, সেই দেবতাদেরও সেই সময় জন্ম হয়নি। এবারে তৃতীয় ধাপে এসে আরও জটিলতা তৈরী করে বলছেন – যিনি স্রষ্টা, যিনি অধ্যক্ষ *অস্যাধ্যক্ষঃ* এই সব কিছুর, হয় তিনি এটার রহস্য জানেন বা হয়তো তিনিও জানেন, অথবা একমাত্র তিনিই জানতে পারেন। স্বামীজী এটার অনুবাদ করেছেন – He knows, সৃষ্টি প্রকরণের শেষ কথা হচ্ছে ভগবান নিজেও জানেন কিনা সৃষ্টিটা কিভাবে হয়েছে বা আদপে কোন সৃষ্টি হয়েছে কিনা, বলা যায় না। এইটাই হচ্ছে বেদের মত। এটার আরেকটা ব্যাখ্যা হচ্ছে – যদি সৃষ্টির ব্যাপারে আদপে কিছু

জানেন তা একমাত্র তিনিই জানেন, তাছাড়া আর কারুর পক্ষে জানা অসম্ভব। আমরা জানি যে বেদে ঈশ্বরের কোন কথা নেই। কিন্তু এই শেষ সপ্তম মন্ত্রে যে বলা হচ্ছে *যো অস্যাধ্যক্ষঃ*, যিনি এই সৃষ্টির অধ্যক্ষ, এই উক্তিতে কিন্তু আমরা সেই পরম সত্তার কথা বেদে পাচ্ছি, ঈশ্বর এই নাম না ব্যবহার করেও ঈশ্বরকে বেদ স্বীকার করে নিচ্ছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে বেদের ঋষিরা ভগবান মানতেন না, এই মতটা যে কত ভ্রান্ত ধারণা প্রসুত এইখানে এসে তার প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। ভগবান যিনি, তাঁকে সব সময় অধ্যক্ষ রূপে দেখা হয়। অধ্যক্ষ কি রকম – যেমন আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রী আছেন, রাষ্ট্রপতি আছেন, অন্যান্য বড় বড় প্রশাসকরা আছেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন সর্বেসর্বা, তিনি হচ্ছেন অধ্যক্ষ। রাষ্ট্রপতি আছেন বলেই বাকী সবাই কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী আছেন, তার নীচে আরও আরও অফিসার আছে, তারপর জেলা শাসক, বিডিওরা আছেন। তারা সবাই নিজের নিজের ক্ষেত্রে প্রধান, কিন্তু রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন সবার উপরে, তিনিই হলেন সবার অধ্যক্ষ। তাই আমাদের যে ছোট ছোট নানা সমস্যা আছে সেগুলোর জন্য আমাদের রাষ্ট্রপতির কাছে যাওয়ার দরকার পড়ে না, ছোট ছোট অফিসারদের কাছে গেলেই আমাদের কাজ হয়ে যাবে। বেদের ঋষিদেরও ঠিক এই ভাবনাটা কাজ করত। ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র যত দেবতা আছেন, এছাড়াও আরও ছোট ছোট দেবতারা আছেন, তাদের দ্বারাই ওনাদের কাজ হয়ে যেত, তাই ওনারা অধ্যক্ষের কাছে কোন কিছুর জন্য আবদার করার প্রয়োজন অনুভব করতেন না। কিন্তু যেই উপনিষদে চলে আসব বা বিশেষ করে যখন গীতাতে ঢুকে পড়ব তখন দেখব যে সেখানে এই সব ছোট খাটো দেবতাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলছে ঈশ্বরই আমার সব কিছু করে দেবেন, এইসব ছোট ছোট দেবতাদের কাছে যাবার আমার কি দরকার। বৈদিক যুগ থেকে পরবর্তি হিন্দু ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গিতে এটাই একটা বিরাট রূপান্তর। বৈদিক যুগের ধারণা ছিল যে দেবতাদের দ্বারাই যখন আমার সব কাজ হয়ে যাচ্ছে তখন ভগবানকে কেন বিরক্ত করতে যাব। পরের দিকে হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গিতে এইটাই ঘুরে গিয়ে দেবতাদের গুরুত্ব কমে গেল কারণ তাদের মনে হল যে স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকে যদি আমার সব কিছুর প্রয়োজন মিটে যায় তাহলে কেন আমি এই ছোট ছোট দেবতাদের কাছে ছুটে যাব।

নাসদীয়সূক্তমে উত্তরকালের প্রথম দর্শন সাংখ্যের বীজ প্রসুপ্ত ছিল। কেননা সাংখ্য দর্শনের সৃষ্টি তত্ত্ব নাসদীয়সূক্তমের তত্ত্বকেই অবলম্বন করে প্রকাশিত হয়েছে। সাংখ্যে এই তত্ত্বটা আছে বলে যোগদর্শনেও নাসদীয়সূক্তমের এই তত্ত্বকে গ্রহণ করা হয়েছে। সেখান থেকে বেদান্ত দর্শনও নাসদীয়সূক্তমের সৃষ্টি তত্ত্বের এই ভাবটাকেই গ্রহণ করেছে, মানে শক্তি বা প্রকৃতি জড়ের উপর কার্য করে। তাই প্রথম হচ্ছে প্রকৃতি তারপর সেখান থেকে বিবর্ত হতে থাকে। কিন্তু পুরুষসূক্তমের সৃষ্টি তত্ত্বে ভগবানই সব কিছু হয়েছেন। নাসদীয়সূক্তমে প্রাণই যেন সব সৃষ্টি করছে কিন্তু পুরুষসূক্তমে ভগবান হচ্ছেন সব কিছুর স্রষ্টা, আর তিনি নিজেকেই সব কিছুতে প্রবিষ্ট করেছেন। নাসদীয়সূক্তমের যেটা আসল সৌন্দর্য, তা হচ্ছে সত্যিকারের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সৃষ্টি তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একজন সত্যিকারের দার্শনিক, চিন্তাবীদ যে দৃষ্টিকোণ দিয়ে সৃষ্টিকে দেখেন নাসাদীয়সূক্তম্‌ও ঠিক সেইভাবেই সৃষ্টিকে দেখেছেন। আবার একজন ভক্ত সৃষ্টিকে কিভাবে দেখবে তার দৃষ্টিকোণ দিয়ে পুরুষসূক্তম্‌ এই সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করেছে।

।। পুরুষসূক্তম্ ।।

সৃষ্ঠির রহস্যের অনেক ধরণের ব্যাখ্যা হয়, নাসদীয়সূক্তম্ তার একটা দিক। নাসদীয়সূক্তম্ হচ্ছে পুরোপুরি দার্শনিক তত্ত্বের মাধ্যমে সৃষ্টির ব্যাখ্যা। অন্য দিকে পুরুষসূক্তম্ হচ্ছে সৃষ্টির রহস্যের ব্যাখ্যার ব্যাপারে আরেকটি বিশেষ দিক। নাসদীয়সূক্তমের মত পুরুষসূক্তমের দর্শন খুব একটা জটিল নয়। সৃষ্টি নিয়ে আমাদের যে সচরাচর ধারণা, যেগুলো আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি সেটাকেই পুরুষসূক্তমে পৌরাণিক আকারে কাব্যিক শৈলীতে ব্যক্ত করা হয়েছে।

পুরুষসূক্তমের প্রথম মন্ত্র হচ্ছে – ***সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্টদ্দশাঙ্গুলম্।।*** বেদ পুরুষ শব্দটা অনেক অর্থে ব্যবহার করা হয়। বেদে ভগবান বা ঈশ্বর শব্দ আমরা পাইনা, কিন্তু ভগবান বা ঈশ্বর বলতে যা বুঝি বেদে তাঁকেই পুরুষ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। আবার অনেক সময় এই পুরুষকে ইঙ্গিত করা হয় যিনি অন্তর্যামী রূপে আমাদের হৃদয়ে বাস করেন। তাই পুরুষের দুটি অর্থ হয় – একটি হচ্ছে বিরাট আর দ্বিতীয় হচ্ছে স্বরাট। প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়ে যিনি আছেন তিনিই সেই পুরুষ বা স্বরাট আবার পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভগবান রূপে যিনি বিরাজমান তিনিই পুরুষ। এখানে সেই পুরুষের বর্ণনা করা হচ্ছে, তিনি কি রকম? তাঁর সহস্রশীরষা, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ, সেই পুরুষের হাজারটি মাথা, হাজারটি চোখ, হাজারটি হাত। বেদে হাজার শব্দটা দিয়ে অনন্তকে বোঝায়। আগেকার দিনের মানুষরা গুনতে জানত না, তাই সাধারণ মানুষদের জন্য বিভিন্ন রকম ভাবে এই সংখ্যাগুলোর ধারণা করিয়ে দেওয়া হত। এখনও গ্রামে গঞ্জে যেসব মানুষরা হিসেব বা গুনতে জানে না তারা সব কিছুতে কুড়ি দিয়ে হিসেব করে – এক কুড়ি, দু-কুড়ি, তিন-কুড়ি এইভাবে। আগে মানুষ আঙ্গুলের সাহায্যে গুনতো, দুই হাতে পাঁচ যুক্ত পাঁচ দশটি আঙ্গুল আবার পায়ের দশটা আঙ্গুল, সব মিলিয়ে কুড়িটা আঙ্গুল, এই কুড়ির বাইরে কোন সংখ্যা এদের ধারণা ছিল না। কুড়ির বাইরে তারা তাই এক-কুড়ি, দু-কুড়ি এই ভাবে হিসাব করত। যদিও বেদের ঋষিরা সংখ্যার হিসাব জানতেন, কিন্তু কবিতায় কাব্যিক ভাবকে ফোটাবার জন্য ওনারা অনন্তকে বোঝাবার জন্য সহস্র বলে দিলেন।

ঠিক এই ভাবটাই আমরা উপনিষদ ও গীতাতেও পাব, বিশেষ করে গীতাতে খুব প্রচলিত একটি শ্লোক আছে যেখানে বলা হচ্ছে – *সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্। সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।।* (১৩/১৩) – ভগবানের সর্বত্র পা, সর্বত্র তাঁর চোখ, সর্বত্র তাঁর মাথা, সর্বত্র তাঁর কান। এর অর্থ হচ্ছে, ভগবান স্বরূপতঃ নির্গুণ নিরাকার এবং সর্ব্ব্যাপী। তাই তাঁর যে অঙ্গ আছে তা সব জায়গাতেই বিদ্যমান হবে। আবার এইভাবেও ব্যাখ্যা করা হয় – এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সব তাঁরই চোখ, তাঁরই হাত, তাঁরই মুখ। ভগবানের যে সত্যিকারের হাজারটা হাত, পা, মুখ আছে তা নয়, তিনি অনন্ত। কিন্তু অনন্তকে বর্ণনা করা যাবে না, সংখ্যা দিয়ে তাঁকে মাপা যাবে না, সেইজন্য হাজার শব্দ দিয়ে সেই অনন্তকেই বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আরেকটি ব্যাখ্যা হয় – ভগবান তিনি সবার সাথেই জুড়ে আছেন, সবার সঙ্গে এক হয়ে আছেন সেইজন্য সব হাতই তাঁর হাত সব চোখই তাঁর চোখ, সব মুখই তাঁর মুখ। মা যেমন সন্তানকে বলে – বাবা, তুমি খেলেই আমার খাওয়া হয়। কেন বলছে মা? কারণ মায়ের সাথে সন্তানের এমন একত্ববোধ যে সন্তান খেলেই মায়েরও খাওয়া হয়ে যাচ্ছে। এখানে মা সন্তানের সাথে জুড়ে আছেন।

প্রথম মন্ত্রের দ্বিতীয় লাইনে বলছেন – *স ভূমিং বিশ্বত বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্* - এখানে ভূমিং বলতে শুধু এই পৃথিবীকেই নয় সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বোঝাচ্ছে। এই পুরুষ পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে রয়েছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে রয়েছেন কিন্তু তিনি নিজে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে একটু বেশি। কতটা বেশি? দশাঙ্গুলম্, মানে দশ আঙ্গুল বেশি। এখন কে মেপে দেখেছে যে ভগবান এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে দশ আঙ্গুল বেশি?

কেউই দেখেনি, এইটাই হচ্ছে ভগবানের মহিমার কাব্যিক ব্যঞ্জনা, এইটাই হচ্ছে কবিত্ব। ফিজিক্সের থিয়োরি অনুযায়ী ব্রহ্মাণ্ড যতই বিস্তার হতে থাকুক কিন্তু বেদের কবিতায় পুরুষ সব সময়ই ব্রহ্মাণ্ড থেকে দশ আঙ্গুল বেশি থাকবেন, তার মানে ভগবান সব সময় বড়ই থাকবেন। আমরা যে বলছি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভগবান, তার মানে এই নয় যে এই ব্রহ্মাণ্ড যেখানে গিয়ে শেষ হয়ে যাবে ভগবানও সেইখানেই শেষ হয়ে যাবেন, ব্রহ্মাণ্ড যতই বাড়তে থাকুক ভগবান সব সময় তার থেকে দশ আঙ্গুল বেশি থাকবেন। ভগবান সব সময়ই বড়ই থাকবেন। ভগবানের এই বৈশিষ্ট্যতাকে যতটা কাব্যিক ভাবে প্রস্ফুটিত করা যায় বিজ্ঞানের দ্বারা বোঝা যাবে না। একজন কবি একটা কবিতা লিখেছিলেন A man is born in every second and a man dies in every second. এখন এক বিজ্ঞানীর হাতে যখন এই কবিতাটা পড়েছে তখন সে ঘোর আপত্তি করে বলছেন – মহাশয়, আপনার কবিতাতে একটা ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে, মৃত্যু ১.৩ সেকেণ্ডে হয়। কিন্তু কবিতার জন্য ১.৫ সেকেণ্ড মেনে নেওয়া যেতে পারে। কেন বললেন? কারণ কবিতাকে মেলাতে হবে তো। যখন কোন কবি কিছুর বর্ণনা করবেন তিনি একটা ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এক ভাবে বলবেন, আবার কোন যুক্তিবাদী যখন সেই জিনিষটাকেই বর্ণনা করবে তখন সে অন্য ভাবে বলবেন। কিন্তু বিষয় বস্তুর ভাবের মধ্যে কোন তারতম্য থাকবে না।

এই দশাঙ্গুলমের যে ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া হয়েছে, পরবর্তি কালে অনেক পণ্ডিতরা এই জিনিষটাকে আবার অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা বলছেন, নাভীমূল হল আমাদের সমগ্র শরীরের কেন্দ্রবিন্দু, এই কেন্দ্রবিন্দু থেকে ঠিক দশ আঙ্গুল উপরে পুরুষের বাস। এখন আমরা সবাই জানি যে নাভিস্থল থেকে দশ আঙ্গুল মেপে মেপে যে জায়গাটায় আসবে সেটাকেই বলা হয় হৃদয়, এই হৃদপদ্মেই আমাদের ইষ্টের ধ্যান করতে বলা হয়। ভগবান কোথায় বাস করেন? এই প্রশ্ন করলে মোটামুটি সব ভক্তই বলে দেবেন যে তিনি হৃদয়ে বাস করেন।

মানুষ কুকুরকে ভয় পায়, সেইজন্য যাদের বাড়িতে কুকুর আছে সেই বাড়ির দরজার উপর নোটিশ লাগান থাকে, কুকুর হইতে সাবধান। কিন্তু এইটাই আশ্চর্য যে মানুষ ভগবানকে কখনই ভয় করে না। কোথাও কি লেখা থাকে 'ভগবান হইতে সাবধান'? আমরা কি কেউ ভগবানকে ভয় পাই? একজন মহিলা নিজের স্বামীকে দাবিয়ে রাখে কিন্তু একটা টিকটিকি আরশোলা দেখলে ভয়ের চোটে চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করে দেব। স্বামী বেচারাদের অবস্থা টিকটিকি আরশোলার থেকেও অধম। আমরাও কুকুরকে ভয় পাই কিন্তু ভগবানকে ভয় পাইনা, কারণ মিথ্যে কথা বলা, চুরি করা, ছলচাতুরি করা সব করছি। ভগবান কুকুরের থেকেও অধম আমাদের কাছে। কিন্তু ঋষিদের কাছে তা ছিল না, তাঁদের কাছে ঈশ্বর হচ্ছে অত্যন্ত উচ্চ, তাই তাঁরা ভগবানকে স্থান দিলেন অত্যতিষ্টদ্দশাঙ্গুলম্, আমাদের শরীরের কেন্দ্রস্থল থেকে ঠিক দশ আঙ্গুল উপরে হৃদয়ে, ভগবানের বাস সবার হৃদয়ে। কিন্তু আমাদের হৃদয়ে ভগবান ছাড়া বাকি সব কিছুই আছে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য এইগুলিতেই আমাদের হৃদয় পূর্ণ হয়ে রয়েছে। আমাদের বেদের ঋষিদের ধারণা ছিল – যদি আমি সেই পুরুষকে অন্তর্যামী রূপে দেখে, স্বরাট রূপে দেখি তখন তিনি আমাদের হৃদয়ে বাস করছেন। আবার যখন বিরাট রূপে দেখি তখন তিনি সবটাতেই আছেন আবার যতটুকু এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার থেকেও আর বেশি আছেন। আসল ভাব যেটা বলতে চাইছেন ঋষিরা তা হচ্ছে তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই, সব চোখ তাঁর চোখ, সব মুখ তাঁর মুখ, সব হাত তাঁর হাত, সব পা তাঁর পা। এইটাই গীতাতে যে শ্লোকটা আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম তাতে খুব সুন্দর করে বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হচ্ছে – ***পুরুষ এবেদগং সর্বম্ যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্। উতামৃতাত্বশেসানঃ যদন্নেনাতিরোহতি।।*** *যদ্ভূতং* যা কিছু হয়ে গেছে, *যচ্চ ভব্যম্,* যা কিছু হবে, *পুরুষ এবেদগং* – এই সবটাই ঈশ্বরই হয়েছিলেন আবার হবেন। ঠাকুর বলছেন – ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু। এই কথাতে সবাই মনে করেন ঈশ্বরই বস্তু আর বাকী সব ফালতু জিনিষ। আদপেই তা নয়, বক্তব্য হচ্ছে ঈশ্বরই আছেন, তিনি

ছাড়া আর কিছুই নেই। এই যে বোতলটা আছে এটাকে আমরা কি বলব? বস্তু না অবস্তু? ঈশ্বর রূপে এই বোতলটা বস্তু, আর বোতল রূপে দেখলে অবস্তু। কিন্তু এই বোতলও ঈশ্বরের একটা রূপকে প্রকাশিত করছে। কিন্তু যখনই আমরা এই ঈশ্বরের রূপকে সরিয়ে বস্তু রূপে দেখবে তখনই সেটা অবস্তু হয়ে যাবে। টাকাকে মানুষ কিভাবে দেখে? সবই যদি তিনি হন, তাহলে টাকাকেও ঈশ্বর রূপে দেখতে হবে, গয়নাগাটিতেও ঈশ্বর দেখতে হবে। কিন্তু পুরুষদের সমস্যা হয় তারা একমাত্র টাকাতেই ঈশ্বর দেখে আর মেয়েরা গয়নাতেই ঈশ্বরকে দেখে, এর বাইরে আর কোথাও ঈশ্বরকে দেখতে চায়না। কিন্তু পুরুষসূক্তমে বলছে – *যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্*, যা কিছু হয়েছিল যা কিছু হবে সবই ঈশ্বর, ঈশ্বর বই আর কিছুই নেই। টাকা-পয়সা, সোনার গয়নাতে যে ঈশ্বর দেখছে এতে কোন ভুল নেই, সেখানে ঈশ্বর দেখুক সব ঠিক আছে, কিন্তু এই টাকা-পয়সা, গয়নার বাইরে মানুষ কি দেখছে? স্বামীজীকে এক আমেরিকান বিদূষী মহিলা বলছেন – স্বামীজী আপনি আত্মা, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব সব যা বলছেন শুনতে খুবই ভালো লাগছে, সবই ঠিক বলছেন কিন্তু আমি আমার আত্মার ছবি আমার গয়না, আমার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, আমার নাম যশ প্রতিপত্তির মধ্যেই দেখতে পাই'। স্বামীজী বলছেন 'ম্যাডাম্ আপনি তাই দেখতে থাকুন, কোন আপত্তি নেই, হাজার হাজার জন্ম ধরে এই গুলোর মধ্যে আপনি আপনার আত্মাকে দেখতে থাকুন, আপনার যেখানে দেখে আনন্দ হবে সেখানেই দেখুন, কারণ আনন্দ হচ্ছে ঈশ্বরেরই একটি গুণ, তিনি সচ্চিদানন্দ কিনা। তারপর কোন জন্মে যখন তুমি আঘাত পাবে, কষ্ট পেয়ে চেঁচামেচি করবে, কান্নাকাটি করবে তখন তুমি ঘুরে দাঁড়াবে'। যেখানেই নিরানন্দ সেই জায়গাটা যেন মনে হচ্ছে ঈশ্বরের বাইরে। না সেইটাও ঈশ্বরের মধ্যে, কেননা যা কিছু সবই ঈশ্বর। এইটাই আমাদের মূল সমস্যা, আমরা কিছু জিনিষকে দেখে আনন্দ পাই, কিছু জিনিষকে দেখলে মনে নিরানন্দের ভাব এসে যায়। অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষের জন্যই আমাদের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট, কেননা আমরা কিছু পছন্দ মত কর্ম করতে চাই, আমরা আমাদের নিজেদের কিছু পছন্দের লোকের সাথে কথা বলতে চাই, কিছু পছন্দের লোকের সঙ্গ পেতে চাইছি, তারফলে আমাদের যত রকমের দুঃখ-কষ্ট, কথায় বলে যার আছে ভালোবাসা তার আছে ঘৃণার মত দুর্বাসা। অথচ ভগবান যে সবার মধ্যে রয়েছে সেটাকে ভুলে আমরা ভগবানের থেকে দূরে পালাবার চেষ্টা করে চলেছি, কিন্তু পালিয়ে যেখানেই হাজির হচ্ছি সেখানেও ভগবান আগে থাকতেই আমার জন্য বসে আছেন। যখন আমরা কোন কিছুর থেকে পালাচ্ছি, তার মানে এইটি আমার কাছে ভগবান নয়, তার মানে হচ্ছে আমার মধ্যে গলদ রয়েছে। কারণ যার মনে কোন রকমের গলদ থাকবে না তার কাছে *যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্*, যা কিছু আছে সব ভগবানই। যদিও এটাকে তত্ত্বগত ভাবে মেনেও নেওয়া যায়, মেনে নিয়ে বিশ্বাস করে বলছি আমি জানি তিনিই এই সব কিছু হয়েছেন কিন্তু আমি এখন সব কিছুতে তাঁকে দেখছি না, আমি জানি একদিন আসবে যখন আমি এটা প্রত্যক্ষ করব যে তিনিই সব কিছু, এইটুকুও যদি কেউ ভাবতে পারে তাহলে বুঝে নিতে হবে সে আধ্যাত্মিক পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষতো মানতেই চায়না, এইসব কথা শোনার বা জানার সুযোগই পায়না। কেউ সুযোগ পেলে শুনতে চায়না, কানে আঙ্গুল চাপা দিয়ে দেয়। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে অনেকে এসে ঠাকুরের কথা শুনছে, তাদের সঙ্গের বন্ধুরা যারা এসেছে কানের কাছে এসে বলছে আর কতক্ষণ চল না এবার। শেষে যখন উঠছে না দেখছে তখন রেগেমেগে বলছে তুই এইখানে থাক আমরা নৌকাতে গিয়ে বসছি। এইসব আধ্যাত্মিক কথাকে এদের মস্তিষ্ক নিতে পারেনা। পশু জন্ম থেকে প্রথম মানুষ জন্ম হলে এই রকমই হয়ে থাকে।

এই যে সর্ব্ব্যাপী চৈতন্য, যা কিছু আছে সবই চৈতন্যময়, এটা আমি বুঝতে পারছি না এটা আমার দোষ, আমি মানতে পারছি না এটা আমার দোষ। কিন্তু সত্য হচ্ছে ঠাকুর ছাড়া কিছুই নেই। স্বামী নিখিলানন্দজী আমাদের কথামৃতের প্রথম ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন, তাছাড়া তিনি গীতা উপনিষদও ইংরাজীতে অনুবাদ করেছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ মিশনে ওনাকে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলা যেতে পারে। পূর্ব জীবনে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। গীতা উপনিষদের যে অনুবাদ করেছেন বিশ্বে আজ পর্যন্ত কেউ এত নিখুত অনুবাদ করেননি। শেষ বয়সে ওনার একজন আমেরিকান সেবক ছিলেন। ওনার

সেবক কিছু দিন আগে একটা খুব সুন্দর ঘটনা বলেছিলেন। নিখিলানন্দজীর তখন অনেক বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। একদিন কি একটা কথার পিঠে স্বামী নিখিলানন্দ বলছেন – এইতো আমার সময় হয়ে গেল, আর বেশি দিন হয়তো বাঁচবো না। নিখিলানন্দজী একবার দুইবার এই কথাটা বললেন। অনেকবার এই কথা বলার পর ওনার সেবক, যিনি নিখিলানন্দের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন, খুব বিরক্ত হয়ে হঠাৎ ইংরাজীতে বলে উঠলেন – Till Sri Ramakrishna is there it does not matter to me who lives, who dies. যতক্ষণ ঠাকুর আছেন ততক্ষণ কে মরল কে বাঁচল তাতে আমার কিছুই যায় আসে না। আমরা এখানে মন্ত্রের যে অংশটি আলোচনা করছি, খুব গভীর ভাবে চিন্তা করলে সেবকের এই উক্তির মধ্যে এই মন্ত্রের গূঢ়ার্থটা ধরতে পারব।

মনে করা যাক এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কিছু নেই, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন একটা কাঁচের জার আর এই কাঁচের জারটাকে শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর মনে করা যাক। এই জারের মধ্যে তরল পদার্থে ভর্তি, সেখানে অনেক ধরণের ছোট ছোট মাছ ও অন্যান্য ছোট ছোট প্রাণী রয়েছে। এখন শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে, শ্রীরামকৃষ্ণের আকৃতিটাও ওর ভেতরে রয়েছে, আর যত গ্রহ, নক্ষত্র, তারা, তারামণ্ডলী সব ঠাকুরের আকৃতির ঐ কাঁচের জারের মধ্যে রয়েছে। এখন এই কাঁচের জারের মধ্যে কেউ মরল কি বাঁচল তাতে কি আসে যায় যতক্ষণ এই শ্রীরামকৃষ্ণ রূপী কাচের জারটা আছে, কেননা তিনিই তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে রয়েছেন। কারণ যা কিছু ওর মধ্যে আছে সবই তো শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর।

নর্থ পোল আর সাউথ পোলে জল জমে বরফ হয়ে যায়। সেখানে বরফের নানান রকমের আকৃতি হয়ে রয়েছে। এখন কোন কারণে একটা বরফের আকৃতি গলে গেল। এখন গলে গিয়ে সেটা কি হবে? জলই তো হবে। জল থেকে বরফ আবার বরফ থেকে জল হয়েই চলেছে, মাঝখানে নানান আকৃতি হচ্ছে। ঠিক সেই রকম আমি মরে গেলাম কি সে মরে গেল তাতে কি আর হবে। মরে গিয়ে যাবেটা কোথায়, রামকৃষ্ণের বাইরে তো সে কোন ভাবেই যেতে পারছে না, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া তো আর কিছুই নেই। *ইদম্ সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্,* মানে যা কিছু আছে শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া কিছু নেই, যা কিছু হবে শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া কিছুই হবে না। আমি আপনি শ্রীরামকৃষ্ণেরই একটা আকৃতি আবার যখন আমি আপনি মরে যাব সেই শ্রীরামকৃষ্ণতেই অন্য রূপে থাকব। আমার আপনার যে অস্তিত্ব সেটাও শ্রীরামকৃষ্ণ, আমার আপনার যেটা অনস্তিত্ব সেটাও শ্রীরামকৃষ্ণ। এই ভাবটা যার মধ্যে দৃঢ় ভাবে বসে গেছে সে কি আর কোন মৃত্যু জনিত দুঃখ বা আঘাত পাবে? ঠিক এই জিনিষটাকেই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন – *অশোচ্যানান্যশোচস্ত্বং প্রজ্ঞা বাদংশ্চ ভাষসে*। ঈশ্বর ছাড়াতো কিছু নেই। নিখিলানন্দজী সেবকের এই কথা শুনে এত প্রভাবিত হয়ে গিয়েছিলেন যে সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার বিভিন্ন সেন্টারে ফোনে বলতে লাগলেন যে – দ্যাখো, আমার সেবক কি সুন্দর একটা কথা বলেছে – Till Sri Ramakrishna is there how does it matter to me, who lives or who dies. আনন্দে উদ্দিপ্ত হয়ে বললেন যে এতদিনে তাঁর একজন শিষ্য এই জিনিষটাকে ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছে। সত্যি কথা বলতে কি এইগুলো কে নিয়ে যখন গভীর ভাবে চিন্তা করা যায় তখন আমাদের মনের অনেক আজেবাজে ধরণের আবেগগুলি মাথা তুলতে পারবে না। আর যখন উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবকে নিয়ে মনন করতে থাকবে তখন শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই নেই, এইটা দৃঢ় থেকে দৃঢ় হতে থাকবে। নর্থ পোলে জল ছাড়া কিছুই নেই, ঐ জলটাই বরফ হয়ে নানান আকৃতি নিচ্ছে আবার বরফ গলে গিয়ে সেই জলেই পরিণত হয়ে যাচ্ছে, জল ছাড়া কিছুই নেই।

আর কি বলছেন *উতামৃতত্বস্যেশানঃ যদন্ননাতিরোহতি* – এই যে পুরুষের কথা বলা হচ্ছে তিনি হচ্ছেন অমৃতে লোকের মালিক, আবার নশ্বর লোকেরও প্রভু। *যদন্নেনাতিরোহতি* – মানে যারা অন্ন খেয়ে বড় হয় বা বেঁচে থাকে, তাদের যদি অন্ন না জোটে তা হলে তারা মারা যাবে, মানে যারা মৃত্যুলোকের বাসী, তাদেরও তিনি প্রভু। এখানে বলা হচ্ছে – জড়, জীব আর অমৃত এই তিনটিরই তিনি প্রভু। ঈশান, মানে যিনি শাসণ করেন, তিনি হচ্ছেন রাজা, তিনিই সব কিছুর নিয়ন্তা। এখানে তাঁকে পুরুষ বলা হচ্ছে,

আবার পুরানে যেখানে ভাগবত ধর্মের কথা বলা হয়েছে সেখানে যাকে ভগবান বলা হয়েছে, সেই একই পুরুষের কথাই এখানে বলা হয়েছে, আমরা যাঁকে ঈশ্বর বলছি, যাকে ক্রিয়াত্মক শক্তি বলা হচ্ছে সবই সেই পুরুষ। পুরুষের বিশেষত্ব কোথায়? তিনিই সব কিছু হয়েছেন। কেউ বলতে পারবে না যে আমি ঈশ্বরের বাইরে বা আমি ঈশ্বরের অধীনে নই। এত কিছুর পরেও আমরা ঈশ্বরের থেকে কুকুরকে বেশি ভয় করি – কুকুর হইতে সাবধান, কেন বলি কারণ আমরা ভগবানকে ভয় পাইনা।

ভক্তির দিক থেকে পুরুষসূক্তম্ অনেক বেশি প্রভাবশালী। বেদে গায়ত্রী মন্ত্রের পরই পুরুষসূক্তমের গুরুত্ব। দক্ষিণ ভারতের হাজার হাজার ব্রাহ্মণরা এখনও স্নান করার আগে বা স্নান করার পর পুরুষসূক্তম্ পাঠ করেন।

কিছু দিন আগে একটা গবেষণামূলক তথ্য বেরিয়েছে যাতে বলা হচ্ছে যে – কয়েকজন নিউরো বিজ্ঞানী কিছু পুরুষ মহিলার মুখে মাথায় অনেকগুলো সেনসার্স লাগিয়ে দিয়েছিল। আর সবার অজান্তে ঐ সেনসার্সের গুলোর মাধ্যমে রেমোটের সাহায্যে এই সব পুরুষ মহিলাদের বিভিন্ন কথাবার্তাগুলোকে রেকর্ড করা হচ্ছিল। পরে দেখা গেল যখনই এই সব মহিলা পুরুষরা গ্রাম্য কথা মানে পরনিন্দা পরচর্চা, সাধারণ কথাবার্তা করছে, তখনই তাদের প্রত্যেকের মস্তিষ্ক এক অসন্তুষ্টির অবস্থাতে চলে যাচ্ছে। আবার এরা যখনই কোন গভীর বিষয় নিয়ে কথা বা আলোচনা করছে তখন লক্ষ্য করে দেখা যাচ্ছিল যে এদের মস্তিষ্ক শান্ত অবস্থায় চলে যাচ্ছে। এরা কিন্তু বুঝতে পারছে না কখন কি রেকর্ডিং হচ্ছে, আবার বিভিন্ন ধরণের আলোচনার সময় মস্তিষ্ক যে সব ধরণের তরঙ্গ ছাড়ছে সেটাও রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। এরা কি কথা বলছে সেই সময় মনের মধ্যে কি ধরণের তরঙ্গ উঠছে, মস্তিষ্ক কি ধরণের তরঙ্গ ছাড়ছে সবই রেকর্ড হয়ে যাচ্ছিল। এইভাবে বেশ কয়েক দিন ধরে বিজ্ঞানীরা কয়েক জনের উপরে পরীক্ষা চালাল। এই গবেষণা থেকে দেখা গেল যে যখনই এরা জাগতিক বা সাংসারিক কথাবার্তা বলছে তখনই মস্তিষ্ক অস্থির হয়ে পড়ছে, মন বিক্ষুব্ধ হয়ে যাচ্ছে, প্রত্যেকের মধ্যেই একই জিনিষ পাওয়া গেল, কারুর মধ্যে এর এতটুকু ব্যাতিক্রম নেই। যখনই কোন গভীর তত্ত্ব আলোচনা করছে, তা যে কোন তত্ত্বই হোক না কেন, সাহিত্য, কবিতা, দর্শন নিয়ে আলোচনা করছে তখনই মন সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্তির অবস্থায় চলে যাচ্ছে।

এই গবেষণা পত্রটি সত্যিই খুব তথ্যমূলক। এই যে বলে, আগেকার দিনে বেশির ভাগ ব্রাহ্মণরা রোজ সকালে উঠে চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ, পূজা-অর্চনা করতেন তাঁদের মুখচোখের মধ্যে একটা সৌম্য শান্ত ভাব লেগে থাকত। ভোগের ইচ্ছা, মানসিক চাহিদা সমাজে চিরদিনই ছিল, কিন্তু সামাজিক অনুশাসনে সেগুলো চাপা থাকত, কিন্তু বর্তমান সমাযে এই অনুশাসনের রাশটা আলগা করে দেওয়া হয়েছে। সেদিন আর বেশি দেরী নেই, মানুষের মৃত্যুর কারণ কোন রোগভোগ হবে না, বেশির ভাগ মানুষের মৃত্যুর কারণ হবে আত্মহত্যা। আজকের খবরের কাগজেই তিন চারটে আত্মহত্যার ঘটনা আছে। মন যখন চঞ্চল হয়ে যায়, নিজের মনের উপর যখন সমস্ত রকমের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে তখনই মানুষ আত্মহত্যা করে। মন কেন চঞ্চল হয়? তার একমাত্র প্রধান কারণ হচ্ছে পরনিন্দা আর পরচর্চা। যত পরনিন্দা আর পরচর্চাকে প্রশ্রয় দেবে ততই জীবন বিপজ্জনক পরিণতির দিকে এগোতে থাকবে। কিন্তু যারা ধর্মপথে চলে, ধর্মাচরণ করেন তাদের কেউই কক্ষণ আত্মহত্যা করতে যাবে না। এটা গেল একটা দিক, আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে যারাই ধর্মপথে থাকবে তাদের মনে কখনই বিমর্ষ ভাব আসবে না। এখানে যারা শুধু ধর্মীয় আচরণ করছেন তাদের কথাই বলা হচ্ছে, আধ্যাত্মিক মনোভাবাপন্নদের ধরা হচ্ছে না, তাঁরা আরও উচ্চস্তরের মানুষ। যাদের মন সব সময় হতাশায় আচ্ছন্ন, যাদের মধ্যে আত্মহত্যার মনোভাব আছে এরা কখনই ধর্মীয় ব্যাক্তি নন, কারণ এদের ভগবানে কোন আস্থা নেই। যার ভগবানে আস্থা আছে তার কক্ষণ হতাশার ভাব আসবে না, আসতেই পারে না। ভগবানে আস্থা আছে আর মন হতাশাগ্রস্থ এই দুটো কথাই হচ্ছে পরস্পর বিরোধী। কারণ যিনি আনন্দস্বরূপ তাঁকে চিন্তন করলে কারুর মনে কি নিরানন্দ ভাব আসতে পারে? হতাশা, আত্মহত্যার মনোভাব এগুলো হচ্ছে নিরানন্দ অবস্থার ফসল, আমার মনে কোন আনন্দ নেই ভাবলেই বোঝা

যাবে হতাশা তাকে গ্রাস করে নিয়েছে। ভগবান হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ, চিরন্তন, চিরকালের, অফুরন্ত আনন্দের উৎস। সেই উৎসের সাথে একবার নিজেকে যুক্ত করতে পারলে কি তার মনে কখন দুঃখ, হতাশা, বিমর্ষ ভাব আসবে?

এখন যারা ঈশ্বর বিশ্বাস করে না, ভগবান-টগবান মানে না, তারা কি করবে? খুব ভালো কথা, আপনাকে ঈশ্বর মানতে হবে না, আপনি ঈশ্বরের কথা চিন্তা নাই বা করলেন, কিন্তু আপনি উচ্চ চিন্তন নিয়ে থাকুন, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, নান্দনিক শিল্প নিয়ে থাকুন। এর ফলস্বরূপ আপনার মন কখনই বিক্ষিপ্ত হবে না, মন এতেও শান্ত থাকবে। কিন্তু আমাদের মন ইন্দ্রিয়ের পোষা কুকুরের মত, ইন্দ্রিয় সব সময়ই ভোগ করতে চাইছে, আর মন বুদ্ধিও ভোগের পেছনে ছুটে চলেছে। যে বুদ্ধি দিয়ে উচ্চ চিন্তন হবে, যে বুদ্ধি দিয়ে মন দিয়ে ঈশ্বর দর্শন পর্যন্ত হচ্ছে সেই মন বুদ্ধির সমস্ত তেজ ভোগের রসদ জোগাড় করতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে, ভোগ করার শক্তিটাও হারিয়ে ফেলছে। যখন অনেক দিন ধরে দেখে যে তেঁতুল আর আমড়া খেয়েই চলেছি তখন বাপু সুইসাইড করাই ভালো।

পৃথিবীতে যত প্রাণি আছে, সবারই একেকটা শরীর একেকটা জিনিষকে ভোগ করার জন্যই উপযুক্ত। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বাদশ অধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দজীকে এক মহারাজ বলছেন – মহারাজ, আমার তো অনেক কিছুই হল, কিন্তু মাংস খাওয়ার সাধ এখনও মিটল না, তা আমার কি হবে মহারাজ? ভূতেশানন্দজী বলছেন – কি আর হবে, আগামী জন্মে শকুন হয়ে জন্মাবে, তখন খুব করে মাংস খাবে। এই শুনে ঐ মহারাজ ভয়ে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছেন। কারণ এটা ঋষির কথা কিনা। ততক্ষণে ভূতেশানন্দজী ওনার মনের অবস্থা বুঝে নিয়েছেন, তখন ওনাকে ভরসা দিয়ে বলছেন – না না, আমি এমনি মজা করে বলছিলাম। এর তাৎপর্য কি, এই মানব শরীরটা মাংস খাবার পক্ষে উপযুক্ত নয়। মাংস খাওয়ার শরীর কাদের? সিংহ, বাঘ, শকুন, এরা মাংস খেয়েই থাকে। আমাদের কিছু হলেই ডাক্তাররা বলেন রেড মীট্ খাবেন না। অথচ সিংহ বাঘ এরা মাংস খেয়েই থাকে, আর কি তার প্রচণ্ড শক্তি, কি তার যৌবন। বাঘ, সিংহ কখন ভাত খায়না, ঘাসও খায়না। কিন্তু আমাদের মাংস খেতে বারণ করছে। এদের শরীরের থেকে যে ধরণের রাসায়নিক পদার্থ নিঃস্বরণ হয় যেটা ওরা যে মাংস খাচ্ছে সেটাকে কার্বোহাইড্রেডে রূপান্তরিত করে দিচ্ছে। আমাদের শরীরে সেই ক্ষমতাই নেই। যখনই কেউ মদ পান করছে তার শরীরের ক্ষমতা থাকা চাই সেই মদের কেমিক্যালসকে ভাঙ্গার। ভারতীয়দের শরীরে সেই ধরণের জিনই নেই যে মদকে ভাঙ্গবে। বিদেশীদের শরীরে সেই জিন আছে, সেইজন্য ইউরোপ, আমেরিকার লোকেরা মদ খেয়ে মাতলামো করে না। কিন্তু আমাদের এখানে পেটে একটু মদ পড়লেই মাতলামো শুরু হয়ে যাবে। মানুষের এই শরীর এক উচ্চ অবস্থাকে প্রাপ্ত করার জন্য, ধর্ম লাভের জন্য, দর্শনের উচ্চ চিন্তনের জন্য, তোমার এই শরীর মাংস খাবার জন্য নয়, মদ খাবার জন্য নয়। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই মাংস আর মদের পেছনেই বেশি অর্থ ব্যয় করে চলেছে। যখন ভগবান দেখবেন যে তোমাকে একটা এত সুন্দর মানব শরীর দিলাম যাতে তুমি এক উচ্চ আদর্শকে লাভ করতে পার, কিন্তু সেই চেষ্টা না করে তুমি মাংস, মদ, যৌন লিপ্সাতে মত্ত হয়ে গেলে, তখন ভগবান তাকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেবে মানে এমন এক যোনিতে পাঠিয়ে দেবে যেখান তোমার এই উচ্চ আদর্শের চিন্তা করতে হবে না খালি মাংস খেতে থাকবে আর বংশবৃদ্ধি করতে থাকবে।

প্রত্যেক মানুষ যেমন যেমন চিন্তা করবে তার শরীর থেকে সেই চিন্তা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের আলোর আভা বেরোতে থাকে। যখন মানুষ কোন জাগতিক চিন্তা করে তখন তার শরীর থেকে লাল আলো, ভালো উচ্চ চিন্তা করে তখন সাদা আলো আবার মন যখন ক্রোধ, রাগ, হিংসাতে ভরে যায় তখন কালো আলোর আভা ছাড়তে থাকে। মানুষের মন যখন কোন গভীর উচ্চ চিন্তাতে নিমগ্ন হয়, সে যে কোন উচ্চ চিন্তাই হোক না কেন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্মীয়, আধ্যাত্মিকতার মত যে কোন কিছুর উচ্চ চিন্তা, তখনই সেই মানুষের শরীর খুব শুদ্ধ উচ্চ তন্মাত্রা ছাড়তে থেকে। তখন লাল আলো, কালো আলো বেরনো একেবারে

বন্ধ হয়ে যায়। তখন দেখা যায় সবাই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাকে সবাই ভালোবাসতে থাকে, ব্যাক্তিত্বের মধ্যে একটা আকর্ষণী শক্তি চলে আসে। এগুলো কোন কাল্পনিক কিছু নয়, এই ধরণের আলো সত্যি সত্যি বেরোতে থাকে। আমাদের চোখ ওটা দেখতে পায়না কিন্তু মন ঠিক দেখতে পায়।

এই যে আমরা এখন পুরুষসূক্তম্ আলোচনা করতে যাচ্ছি, এটা অত্যন্ত খুব গভীর উচ্চ চিন্তার বিষয়, রোজ এর তত্ত্বকে যদি চিন্তন মনন করা যায় তাহলে যে কোন মানুষের ব্যাক্তিত্ব পুরো পাল্টে যাবে, কারণ এটা কোন সাধারণ জিনিষ নয়, আমাদের যে আসল সত্তা আছে সে সব সময় তার নিজস্ব স্বভাবকে উন্মোচনের জন্য ছটফট্ করে যাচ্ছে। এই পুরুষসূক্তমের উচ্চ ভাব তার সত্তাকে জাগ্রত করার সুযোগ এনে দিচ্ছে। বেদে ঈশ্বর ব্রহ্ম শব্দ আসেনা, আর ব্রহ্ম শব্দও সেই অর্থে বেদে আসেনা যে অর্থে পরের দিকে উপনিষদে পাই। বেদে দেবতার কথাই বেশি আসে, ইন্দ্র, বরুণ অগ্নি। কিন্তু যখন ভগবান বলতে আমরা যা বুঝি সেই ভগবানকে যখন বেদের ঋষিরা বোঝাতে চাইতেন তখন ওনারা এই পুরুষ শব্দটাকেই বেশির ভাগ সময় ব্যবহার করতেন।

আমরা আগেই বলেছি যে পুরুষ দুটো অর্থ করা হয় একটা হচ্ছে স্বরাট, যিনি আমাদের ভেতরে আছেন, আর আরেকটি হচ্ছে বিরাট। *সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ* - তাঁর সহস্র মাথা, সহস্র চোখ, সহস্র পা বলে বোঝাতে চাইছেন পুরুষ হচ্ছেন অনন্ত। আবার আরেকটি অর্থও করা যায় – সব মাথাই তাঁর মাথা, সব চোখই তাঁর চোখ, সব পা তাঁরই পা। তাঁর বাইরে কিছুই নেই। পুরুষ ছাড়া কিছুই নেই, শুধু তাই নয়, অতীতে যা কিছু হয়েছে ভবিষ্যতে যা কিছু হবে ভগবান ছাড়া কিছুই হবে না, তিনিই আছেন, God alone exists। স্বামীজী এবং জোসেফিন ম্যাকলাউডের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পত্রের আদান প্রদান হয়েছিল। তার একটি চিঠিতে ম্যাকলাউড স্বামীজী লিখছেন – আপনি যে তত্ত্ব আমাদের শিখিয়ে এসেছেন আমি এত দিনে সেটা বুঝতে পারছি যে all is God, সবই ঈশ্বর। স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিচ্ছেন – সব রামায়ণ বলে দেওয়ার পর প্রশ্ন করছে সীতা কার বাবা, জোসেফিন তুমি আদপেই আমার তত্ত্ব কিছুই বুঝলেনা। আমি কখনই বলিনি যে সবই ঈশ্বর, আমি সব সময়েই তোমাদের বোঝাতে চেয়েছি যে ঈশ্বরই সব। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মকে জোসেফিন বুঝলেন সবই ঈশ্বর। কিন্তু তাই বলে কি এই বোতলটা ঈশ্বর? এই চকটা, এই মাইক্রোফোনটা কি ঈশ্বর? না, বোতলটা, এই চকটা, এই মাইক্রোফোনটা যদি ঈশ্বর হন তাহলে ঈশ্বর সঙ্কীর্ণ হয়ে যাবেন। ঈশ্বরই এই বোতল, এই চক, এই মাইক্রোফোন হয়েছেন। এইজন্য বলা হয় ধর্মের তত্ত্ব বুঝতে গেলে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধির দরকার। সূক্ষ্ম বুদ্ধি হয় শুদ্ধ সাত্ত্বিক আহার গ্রহণের মাধ্যমে। গীতায় আছে কোন্ কোন্ আহার সাত্ত্বিক আহার। কাড়ি কাড়ি ভাত মাংস খেলে সূক্ষ্ম বুদ্ধি হয় না। আগেকার দিনের ঋষিরা, ব্রাহ্মণরা হবিষ্যান্ন খেতেন, রাত্রে প্রায়ই উপোস করে থাকতেন, তার ফলে তাঁদের সূক্ষ্ম বুদ্ধি জাগ্রত হয়েছিল। সবই ঈশ্বর আর ঈশ্বরই সব এই দুটি কথা শুনতে অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার মনে হবে। কিন্তু এই দুটোর মধ্যে যে অন্তর্নিহিত গূঢ় পার্থক্য রয়েছে সেটাকে ঠিক মত না ধরতে পারলেই সমস্ত শাস্ত্র উলোট পালট হয়ে যাবে। আমরা এর আগে এই দুটো মন্ত্রকে নিয়ে আলোচনা করেছি।

পরের তৃতীয় মন্ত্রে বলছেন – ***এতাবনস্য মহিমা অতো জায়াগৃশ্চ পুরুষঃ। পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি। ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।।*** *এতাবানস্য মহিমা* – এই যে জগৎ বলে যা কিছু আছে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বলে যা কিছু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বোধগম্য হচ্ছে, জড়, সজীব, নির্জীব যা কিছু আছে এই সব কিছুই হচ্ছে সেই পুরুষের মহিমা। আসলে সৃষ্টিটাই হচ্ছে ঈশ্বরের মহিমা। *অতঃ জায়াগৃশ্চ পুরুষঃ* – কিন্তু তাঁর এই সব মহিমা থেকেও তিনি আরও মহিমান্বিত। তাঁর যে মহিমা, তাঁর যে শক্তি, তাঁর যে ক্ষমতা, তাঁর যে ঐশ্বর্য তিনি এই সবের থেকে আরও অনেক অনেক বেশি। একজন কাঙালী সারাদিন খেটেখুটে একশটি টাকা আয় করে, তার সমস্ত কাজের মূল্য হচ্ছে একশটি টাকা, এই একশ টাকাতেই তার সব ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। এ হচ্ছে আমাদের সেই গালাগাল দেওয়ার মত, যেটা আমরা প্রায়ই ব্যবহার করি – দু-পয়সার কাঙাল আবার বড় বড় কথা বলতে আসছে। তার মানে তোমার যা ক্ষমতা ঐখানেই শেষ। এই সৃষ্টিটা হচ্ছে মহিমা,

তাহলে কি ভগবান এই সৃষ্টিটা যতটুকু ততটুকুই? কখনই না, যা তুমি দেখছ ভগবান এতটুকুই নন, এর থেকেও তিনি অনেক বেশি। বড় বড় দোকানের মালিকরা শোকেসে কিছু কিছু জিনিষ সাজিয়ে রাখে, কিন্তু দোকানে এইটুকুই মাল নেই, গোডাউনে এর থেকে আর অনেক ঢের মাল রাখা থাকে। এই সৃষ্টিটা হচ্ছে ভগবানের শোকেস, গোডাউনে তাঁর আরও অনেক কিছু রাখা আছে। এইটাকেই বলা হচ্ছে এতাবানস্য *মহিমা*। কিন্তু *জায়াগৃশ্চ পুরুষঃ* – পুরুষের এর থেকে অনেক বেশি মহিমা।

তৃতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয় লাইনে বলছেন, এই সৃষ্টির থেকে তাঁর মহিমা কতটা বেশি। *পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি* – এই যা সৃষ্টি দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে ভগবানের এক পাদ মাত্র। আসলে সংস্কৃতে পাদ কথাটা খুব তাৎপর্য্য পূর্ণ। মানুষ সব সময়ই দ্বিপাদ, মানে দুই পা বিশিষ্ট। কিন্তু যখনই পাদ শব্দটা আনবেন তখনই এনারা চতুষ্পাদ নিয়ে বলবেন। পাদের ঠিক আগে চার বলছে, তার মানে পাদ বলতে সমগ্রকে বোঝায় আর চতুষ্পাদ বললেই বুঝতে হবে সমগ্রকে চারটে ভাগ করে তার এক ভাগ বলা হচ্ছে, আমরা যেমন বলি চতুর্থাংশ। যখনই পাদ কথাটা আসবে তখন বুঝতে হবে যে চার ভাগের এক ভাগ বলা হচ্ছে। এখানে বলা হচ্ছে *পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি* – এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আছে এটা হচ্ছে পুরুষের চার ভাগের এক ভাগ। আর *ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি* – এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাইরে মানে সৃষ্টির বাইরে যা কিছু আছে সব হচ্ছে অমৃত মানে immortal অর্থাৎ পুরুষের চার ভাগের এক ভাগ হচ্ছে mortal আর তিন ভাগ হচ্ছে immortal। জন্ম মৃত্যু, সৃষ্টি প্রলয় স্থিতি যাবতীয় যা কিছু সব এই চারভাগের এক ভাগের মধ্যেই হচ্ছে, বাকি তিন ভাগে কিছুই হয় না।

এখন যদি কেউ প্রশ্ন করেন এই তিন ভাগ কি অব্যক্ত? আমরা এই দৃশ্যমান এক চতুর্থাংশকে যখন পুরুষের ব্যক্ত বা প্রকাশিত বলছি তাহলে কি তিন-চতুর্থাংশকে কি অব্যক্ত বলব? কখনই এই তিন চতুর্থাংশকে অব্যক্ত বলা যাবে না। কারণ বাংলায় যে অব্যক্ত শব্দ ব্যবহার করা হয় সংস্কৃতে বিশেষ করে শাস্ত্রে এর অর্থ পুরো আলাদা হয়ে যায়। এখানে অব্যক্ত বলা যাবে না, তার কারণ হচ্ছে যা কিছু মায়া বা প্রকৃতি তাকেই অব্যক্ত বলা হয়, এখন এই এক চতুর্থাংশকে যদি ব্যক্ত বলে বাকি তিন চতুর্থাংশকে অব্যক্ত বলা হয় তাহলে ঈশ্বরকে মায়া বা প্রকৃতি বলা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ঈশ্বর হচ্ছে ব্যক্ত, অব্যক্ত, মায়া, প্রকৃতি এই সব কিছুর পারে। এই তিন চতুর্থাংশ আসলে কি তা কেউ বলতে পারেনা। নাসদীয়সূক্তে বলেছে *কো অদ্ধা বেদ*, কে জানে, কে বলতে পারবে? মানে যদি কিছু জানেন তবে তিনিই জানেন। এই যে আমরা এক চতুর্থাংশ বা তিন চতুর্থাংশের কথা বলছি এটা কি কেউ দাঁড়িপাল্লা দিয়ে মেপে দেখে নিয়ে তারপর এইসব কথা বলছে? কেউই জানে না। কিন্তু কিছু একটা বোঝাবার জন্য এইভাবে বলছে যা আছে তার এক চতুর্থাংশ হচ্ছে যা কিছু ব্যক্ত দেখছি, আর বাকি চতুর্থাংশের কোন খবর আমরা জানি না, কিন্তু সেইটাই হচ্ছে অমৃত। অমৃতের নীচে যদি একটা লাইন টানা হয় তাহলে এর নীচে হচ্ছে দৃশ্যমান জগৎ অর্থাৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, আর লাইনের ওপরে যা আছে তা ব্যক্ত ও অব্যক্তের পারে। এখন এই লাইনটাকে বলা হচ্ছে অব্যক্ত বা মায়া বা প্রকৃতি। যেমন পুরুষকে বলা যায়না যে তিনি মায়ামুক্ত বা মায়াবদ্ধ, এই লাইনটাকে নীচ থেকে যে অতিক্রম করে উপরে চলে যাব তখন সেটা কি আর মুখে বলা যাবে না, এইটাকেই বলে তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্তের পারে। মায়ামুক্ত বললেই বুঝতে হবে যে তিনি কোন না কোন সময়ে মায়াতে বদ্ধ ছিলেন। মায়াধীশ বলা হচ্ছে বোঝানর জন্য, আসলে মায়ার সাথে ঈশ্বর বা পুরুষের কোন সম্পর্কই নেই। মায়া, প্রকৃতি, ব্যক্ত, অব্যক্ত যত কথা আছে সব এই লাইনের নীচে। এর ওপরে কি আছে মুখে বলা যাবে না। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন – কালাপানিতে জাহাজ গেলে আর ফেরে না, মানে আর কোন খপর আসে না। এই লাইনের ঘুনাংশ উপরে গেলেই সব কথা বন্ধ।

ওখানে কি আছে কেউ জানে না, কিন্তু লোকেদের বোঝানর কিছু শব্দের সাহায্য নেওয়া হয়, সেইজন্য ঋষিরা বলছেন অমৃত। অমৃতের অর্থ যে ওখানে গেলে অমর হয়ে যাবে তা নয়, অমৃত মানে ওখানে কোন ধরণের রূপান্তর নেই, কোন ধরণের বিকার নেই। তাহলে আমরা বুঝলাম একপাদের মধ্যেই

যত ধরণের লীলাখেলা চলছে আর বাকি তিনপাদের ব্যাপারে কোন কথা বলা যাবে না। সব কিছুর পার, জীবন-মৃত্যুর পার, সুখ-দুঃখের পার, বাক্য মনের অতীত। অব্যক্ত শব্দ যেই অর্থে বাংলাতে ব্যবহার করা হয় সংস্কৃতে এই ধরণের কোন শব্দই হয় না। ব্যক্ত অব্যক্ত হচ্ছে যেটা দেখা যায় আর যেটা দেখা যায়না, তার মানে হচ্ছে কার্য আর কারণ, কার্য হচ্ছে জগত, তার কারণ হচ্ছে প্রকৃত, সেইজন্য প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতির ওপরে যিনি আছেন তাঁকে নিয়ে কোন কথাই বলা যাবে না। নির্বিকল্প সমাধিতে যে লাইনটার কথা বলা হয়েছিল সেই লাইনটাকে ভেঙ্গে এক হয়ে যায়, সেইজন্য নির্বিকল্প সমাধিতে কি হয় তার কোন উত্তর দেওয়া যায় না, কারণ মন যে পর্যন্ত যা যাবে সে ততটুকু পর্যন্তই ভাষায় ব্যক্ত করবে, কিন্তু যখন লাইনটাকে ভেঙ্গে সেই তিন চতুর্থাংশের সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছে তার আগেই মন নাশ হয়ে যাচ্ছে। মন কিছুতেই লাইনকে অতিক্রম করতে পারেনা।

পাশ্চাত্যের দার্শনিকরা ভগবানের কথা বলতে গিয়ে বলেন God is Transcendent and immanent, এর সব কিছুতেই তিনি আছেন, আর তিনি কি সেখানেই শেষ? না। বাড়িতে আলুর দম রান্না করা হয়েছে। এখন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে আলু গুলো কোথায়? আলুর দম করে দিয়েছি। আলু গুলি কোথায় আছে? সব শেষ হয়ে গেছে। কোথায় শেষ হয়েছে? আলুর দমে। যে আলু সেটাই আলুর দম হয়ে গেছে। তাহলে তো সব একটা জায়গায় গিয়ে শেষ হয়ে গেল। ঈশ্বর আর সৃষ্টি কি আলু আর আলুর দম? না। যতটুকু সৃষ্টি হওয়ার হয়ে গেল, কিন্তু ঐ সৃষ্ট যা কিছু হয়েছে ঈশ্বর তার অনেক অনেক বেশি আর তারও অনেক ওপরে। ভারতীয় আধ্যাত্মিক পরম্পরার এইটাই মহিমা যে এই গূঢ় তত্ত্বগুলিকে কাহিনী আকারে সাধারণ মানুষকে বোঝান হয়। এই তত্ত্বটাকেই একটা বাচ্চাদের কাহিনীতে খুব সুন্দর করে বলা আছে।

কুবেরের কথা আমরা সবাই জানি, বলে নাকি কুবেরের থেকে বেশি ধন সম্পদ আর কারুর কাছে নেই। প্রচলিত আছে যে ভগবান বিষ্ণুর যখন বিয়ে হয়েছিল, তখন কনেকে সাজাবার জন্য বিষ্ণু কুবেরের থেকে রত্ন ধার করেছিলেন। সেই ধারটাকে মেটানোর জন্য সবাই এখন তিরুপতিতে গিয়ে সোনা, টাকা সব ঢালে। মানে তিরুপতিতে যত প্রণামী পড়ে সব কুবেরের কাছে চলে যাচ্ছে। ভগবান বিষ্ণু এত টাকা কুবেরের থেকে ধার নিয়েছিলেন যে এখনও সেই টাকা শোধ হয়নি। সেই কুবেরের এখন অহঙ্কার হয়েছে, সারা ব্রহ্মাণ্ডে আমার মত এত ধন, সম্পদ, রত্ন কারুর নেই। এত অহঙ্কার হয়েছে যে কুবেরের একবার ইচ্ছে হল শিবকে তার নিজের ঐশ্বর্য দেখাবে। তাই এখন মাঝে মাঝেই কুবের শিবকে গিয়ে আকুতি মিনতি করে বলছে যে – প্রভু আপনি যদি কৃপা করে একবার আমার কুটিরে আপনার পাদস্পর্শ দিয়ে আমার ঘরে দুটি অন্ন যদি গ্রহণ করেন তাহলে আমি ধন্য হয়ে যাই। আসলে কুবের চাইছে শিব আমার ঘরে এসে আমার ঐশ্বর্যটা দেখুক। এদিকে শিব নানান টালবাহানা করে কুবেরকে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। শিব হচ্ছে অন্তর্যামী, কুবেরের মনের ভাব শিব বুঝে গেছেন। এদিকে কুবেরও খুব পীড়াপীড়ি করেই চলেছে। শেষে শিব বললেন – তুমি আমার গণেশকে একদিন নিয়ে তোমার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তোমার মনের মত তৃপ্তি করে ওকে খাইয়ে দাও। কুবের একটু হতাশ হয়ে গেছে। কি আর করবেন, শিব যখন যেতেই পারছেন না, ঠিক আছে তাহলে গণেশকেই নিয়ে যাওয়া যাক।

গণেশ কুবেরের বাড়িতে এসেই কুবেরকে বলছে – আমার খুব খিদে পেয়েছে, তোমার ঘরে কি খাবার দাবার আছে আমাকে খেতে দাও। এখন কুবেরের ঘরে যত রকমের খাবার দাবার রান্না করা ছিল, যত রকমের ফল ফলাদি ছিল সব গব্‌গব্‌ করে খেয়েই চলেছে। কুবেরের ঘরে খাবার দাবারের বিশাল ভাণ্ডার। সেই খাদ্য ভাণ্ডারে যত রকমের খাবার ছিল গণেশ খেয়েই চলেছে। এত তাড়াতাড়ি সব খাবার শেষ করে দিচ্ছিল যে পরিবেশনের যত লোকজন ছিল সব দৌড়াদৌড়ি করে খাবার পরিবেশন করেই চলেছে। এদিকে যত খাবার মুজত ছিলে সব গেল শেষ হয়ে। তখন আবার নতুন করে খাবার দাবার বানাতে শুরু করে দিয়েছে। পরিবেশন করতে দেরী হচ্ছে দেখে গণেশ গেছে প্রচণ্ড রেগে। রেগে গিয়ে গণেশ বলছে – খাওয়াতে যখন পারছ না তাহলে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করলে কেন, কোথায় তোমার রান্না

হচ্ছে, কোথায় তোমার রান্নাঘর। চেঁচামেচি করে রান্নাঘরে ঢুকে গেছে। রান্না ঘরে যত রকমের খাবার ছিল সব শুড় দিয়ে টেনে নিয়ে খেয়েই বলছে – তোমাদের খাবারের ভাণ্ডার ঘরটা কোথায়, আমার পেট ভরছে না। এদিকে গণেশের চেঁচামেচিতে চাকর বাকর সব প্রাণের ভয়ে পালিয়েছে। এখন কুবেরের ঘরে যা কিছু ছিল সব গণেশ তাঁর শুড় দিয়ে টানছে আর পেটে চালান করে দিচ্ছে। কিছুই যখন আর অবশিষ্ট রইল না, তখন গণেশ কুবেরকে বলছে – তোমার বাড়িতে এসে আমার পেট একটুও ভরল না, তাই এখন আমি তোমাকেই খাব। তুমি খেতে আমাকে ডেকেছ কেন, আর যদি ডাকলেই তাহলে আমার পেট ভরাতে পারছ না কেন? বলেই কুবেরের পেছনে তাড়া করেছে। কুবের এখন প্রাণপনে ছুটেছে, ঘাম ফেলতে ফেলতে ছুটে এসে শিবের কাছে এসে তাঁর পায়ে পড়ে বলছে – প্রভু আপনি আমাকে রক্ষা করুন। শিব আগে থাকতেই সব বুঝেই গেছেন। তিনি কুবেরকে কিছু না বোঝার ভান করে বলছেন – তোমার আবার কি বিপদ হল? কুবের বলছে – আমি তো গণেশের পেট ভরাতে পারলাম না, এখন গণেশ বলছে আমাকেই খাবে। তখন শিব গণেশকে বলছেন – এই গণেশ তোমার কি হয়েছে, তুমি অমন চেঁচামেচি করছ কেন? গণেশ বলছেন – আমার খুব খিদে পেয়েছে। শিব তখন গণেশকে মৃদু তিরস্কার করে বলছেন – খিদে পেয়েছে তো মার কাছে যাও, অপরকে কেন খাওয়ার জন্য জ্বালাতন করছ। গণেশ শিবের এক কথাতেই সুরসুর করে মায়ের কাছে চলে গেল। কুবের তখন ভাবছে – আমার অক্ষয় ভাণ্ডারের খাবার দিয়েও গণেশের পেট ভরাতে পারলাম না, অথচ মা পার্বতী এই গণেশকে রোজ পেট ভরে খাওয়াচ্ছেন কি করে।

বাচ্চাদের এই কাহিনীর তাৎপর্যটা কোথায়? এই ব্রহ্মাণ্ডের যে সব থেকে ধনী সে হচ্ছেন কুবের। কিন্তু গণেশের কাছে কুবেরের ধন রত্ন কিছুই নয়। অথচ দুই বেলা মা পার্বতী গণেশকে পেট ভরে তৃপ্তি করে খাইয়ে যাচ্ছেন, মা পার্বতীর কাছে কোন ব্যাপারই নয়। কিন্তু কুবের এক বেলাও তার সর্বস্ব দিয়েও গণেশকে তৃপ্তি করতে পারল না। শিব ধমক দিয়ে গণেশকে বললেন – খিদে পেয়েছে তো মার কাছে যাও অন্যকে কেন বিরক্ত করছ। যেন এটা কোন ব্যাপারই নয়। এই যে পুরুষসূক্তে বলা হচ্ছে - *পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি* এক পায়ে ভগবানের সমস্ত সৃষ্টি, এখানে মানে এই এক পাদের মধ্যে যা আছে গণেশ সব খেয়ে নিতে পারে কিন্তু এক পাদের বাইরে গিয়ে আর গণেশকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এক পাদের উর্দ্ধে সব হচ্ছে অনন্ত, ওখানে আমাদের কিছুই চলবে না, ওখানে গিয়ে সব শেষ হয়ে যাবে, শিব ভগবান কিনা। ভগবান অনন্ত ঐশ্বর্যবান, এটাকে বাচ্চাদের কি করে বোঝাবে। তাই একটা খুব সুন্দর সহজ সরল গণেশের কাহিনী দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হল। কুবের, যিনি এই সৃষ্টির মধ্যে সব থেকে বড়লোক, কিন্তু কুবেরের ঐশ্বর্য ভগবানের ঐশ্বর্যের সামনে একটা চিনির দানার থেকেও ক্ষুদ্র। কুবেরের কাছে যা সম্পদ আছে এটাও শিবের, কিন্তু শিবের ঐশ্বর্য এরও পারে। পুরানের মধ্যে যত রকমের আজগুবি কাহিনী আছে তার যে কোন একটা কাহিনীকে যদি চোখ কান বন্ধ করে বেছে নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে তার মধ্যে বেদের কোন একটা মন্ত্রের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত তত্ত্ব রয়েছে, সেই তত্ত্বকে খুঁজে পাওয়া যাবে। বেদের একেকটা ভাবকে নিয়ে ঋষিরা যুগোপযোগী করে আমাদের মত সাধারণ মানুষের জন্য এই পৌরানিক আখ্যায়িকা গুলি রচনা করে বেদের তত্ত্বগুলিকে আমাদের মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। শিব ও পার্বতী হচ্ছেন অনন্ত ঐশ্বর্যের মালিক, তাঁদের কোন দিন চিন্তা করতে হয় না যে ঘুম থেকে উঠে গণেশকে কি খাওয়াবেন এমনই তাঁদের অক্ষয় ভাণ্ডার, গণেশও কোন দিন টের পায়না কিভাবে তার পেট ভরে যাচ্ছে দুবেলা, এমনই ভগবানের ঐশ্বর্য।

চতুর্থ মন্ত্রে এই ভাবটাকেই আরও বিস্তৃত করে বলা হচ্ছে – ***ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎপুরুষঃ পাদোঽস্যেহাঽভবাৎপুনঃ। ততো বিশ্বঙ্ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি।।*** এই সব মন্ত্রের মধ্যে এত গভীর উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সব রয়েছে যে, যে কোন একটা মন্ত্রের ভাবকে নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ধ্যান করা যায়। যে ভাগটাকে ত্রিপাদ বলা হচ্ছে, এই ত্রিপাদকেও একটা অংশের ভাগ বলা হচ্ছে, কিন্তু তিনি এই ত্রিপাদেরও উর্দ্ধে, তিনি সমস্ত পাদকেও অতিক্রম করে যান। এই ত্রিপাদেই কোন বিকার নেই। আর *পাদোঽস্যেহাঽভবাৎপুনঃ* কিন্তু যে এক পাদের কথা বলা হয়েছে এইখানেই জন্ম-মৃত্যুর খেলা চলতে

থাকে। এই এক পাদের মধ্যে সমস্ত প্রাণীকে বার বার বিভিন্ন যোনির মধ্য দিয়ে আসা যাওয়া করতে হয়। ত্রিপাদে কক্ষণ কিছু হয় না, ওখানে কোন ধরণের বিকার নেই, কিন্তু এই এক পাদে সব কিছু বার বার পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে, বার বার দৃশ্যের পরিবর্তন হচ্ছে। মানুষ যা কিছুই করুক না কেন, ধর্মের প্রশিক্ষণ তার যেমন যেমন হবে, সেই শিক্ষাকে ভিত্তি করে তার বিজ্ঞান হচ্ছে, সাহিত্য হচ্ছে, তার কলা থেকে সব কিছুই হচ্ছে। পাশ্চাত্যের এই যে আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণা গুলো খ্রীষ্ট ধর্মেরই দান, তাই পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা খ্রীশ্চান ধর্মের পরম্পরাতে যে সৃষ্টির ধারণা আছে তার থেকে কিছুতেই বেরোতে পারেনা, আইনস্টাইনও পারেননি, অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও সেখান থেকে বেরোতে পারেনি। ইদানিং কালে যখন অত্যাধুনিক গবেষণার ফলে বিজ্ঞানের ধারণা গুলো খ্রীশ্চানদের ধারণা থেকে সরে অন্য দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এখনও তারা সেই পুরনো ধ্যান ধারণাকে ছাড়তে পারছে না।

বিজ্ঞানের একটা ধারণা হচ্ছে যে ভগবান এই সৃষ্টিটা একবার করে দিয়ে চালু করে দিয়েছেন, আর এর মধ্যে যা কিছু হবার, আসা যাওয় সব এর মধ্যেই চলছে। এই সৃষ্টি একবার হয়ে গেছে আর সৃষ্টি হবে না। পরে ফিজিক্সের বিগব্যাঙ থিয়োরি এল। এখন এই থিয়োরিতে বিজ্ঞান বলছে সৃষ্টির এক সেকেণ্ডের মধ্যে কি হয়েছিল সেটা আমরা বলতে পারবো না, কিন্তু তারপর থেকে আমরা সৃষ্টির সব বলে দিতে পারি। এই কথা বলে দেবার পর বিজ্ঞান দেখছে অনেক কিছুই হিসেবে মিলছে না। তারপর দশ বারো বছর আগে ফিজিক্সের আরেকটি নতুন থিয়োরি এলো যে কিনা আগের সব থিয়োরিকে পুরো উড়িয়ে দিল। তাদের থিয়োরিতে বলছে বিগব্যাঙ হয়ে সৃষ্টি হচ্ছে তারপর আবার সঙ্কুচিত হতে হতে একটা পয়েন্টে সাইজে গোটা সৃষ্টি চলে যাচ্ছে, তারপর আবার বিগব্যাঙ বিস্ফোরণ হয়ে সৃষ্টি সামনে আসছে আবার ছোট হতে হতে পয়েন্ট সাইজে চলে যাচ্ছে আবার বিগব্যাঙ – এইভাবে সৃষ্টি একবার আসছে আবার যাচ্ছে। ফিজিক্স আর গণিতের হিসেবে এই থিয়োরি দেওয়া হয়েছে, তারা বলছেন এই হিসেবটা না হলে সৃষ্টিকে কোন ভাবেই ব্যাখ্যা করা যাবে না। এই থিয়োরির নাম দেওয়া হয়েছে Cyclic Theory of Universe, যদিও এখনও অনেক পদার্থ বিজ্ঞানী এই থিয়োরিকে মানে না। আমাদের কাছে এই থিয়োরির নাম হচ্ছে কল্প। হাজার হাজার বছর আগে আমাদের ঋষিরা আজকের বিজ্ঞানের এই সৃষ্টিতত্ত্বকে বলেছিলেন কল্প। কল্প মানে? *যথাপূর্বং অকল্পয়ন্*, এর আগের বারে সৃষ্টি যেমনটি হয়েছিল এবারেও সৃষ্টি ঐভাবেই ঐ একই প্রণালীতে এগোবে, নতুন কিছু হবে না। এখন ফিজিক্সও এই একই কথা বলছে। এই যা সৃষ্টি হচ্ছে এটা এই এক পাদের মধ্যেই আর বাকী তিন পাদে কিছুই হয় না, ওখানে যা আছে তা এক ভাবেই আছে, কোন কিছুর বিকার নেই সেইখানে। আমরা চিন্তাই করতে পারিনা ত্রিপাদে কি আছে। আমরা সমুদ্রের উপমা নিয়ে চিন্তা করতে পারি, যেমন সাতটি সমুদ্র আছে, সমুদ্র যেমন আছে তেমনই থাকে কিন্তু নর্থ পোল আর সাউথ পোলে যে সমুদ্র আছে সেখানে ঠাণ্ডার সময় জল জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে আবার গরমের সময় বরফ গলে জল হয়ে যায়। সৃষ্টি হচ্ছে অনেকটা এই রকম। ভগবান হলেন এই সমুদ্রের মত, এই সমুদ্রে কিছুই হয় না, তাঁরই এক ছোট্ট অংশে কখন সমুদ্রেরই জল বরফ হয় আবার কখন বরফ গলে সমুদ্রের জল হয়ে যায়। যেখানে বরফ হচ্ছে সেইটাও তিনি, এই অংশটাও সমুদ্রের বাইরে নয়। সৃষ্টির বাইরে যা আছে সেটাও তিনি আবার জলটাও তিনি বরফটাও তিনি। *অভবৎ পুনঃ* জল থেকে বরফ আবার বরফ থেকে জল এটা বার বার হচ্ছে, হয়েই চলেছে, একবার হয়েই যে শেষ হয়ে যাবে তা নয়।

আমাদের শাস্ত্রাদিতে নানান রকমের যে সৃষ্টিতত্ত্বের ধারণার কথা বলা হয়েছে, এই যে বলা হচ্ছে যুগ যুগ ধরে চলছে, অবতাররা আসছেন আবার চলে যাচ্ছেন, সব কিছুই এই মায়ার লাইনের নীচেই হয় – *অস্য ইহ অভবৎ পুনঃ*, যা কিছু বিকার, যা কিছু সৃষ্টি প্রলয় স্থিতি সব এই এক চতুর্থাংশের মধ্যে।

ততঃ বিশ্বঙ্ব্যা-ক্রামৎ - *বিশ্বঙব্যর* অর্থ হচ্ছে বিবিধ সৃষ্টি। কি বিবিধ? বিভিন্ন প্রকারের প্রাণী মানে দেবতা, মানুষ, তির্যক যোনি, পশু, পাখি সব তিনিই হয়েছেন। *অক্রামৎ*, তিনিই সব কিছুতেই ব্যপ্ত হয়ে আছেন, সে সাপ হোক বিছে হোক, দেবতা হোক, মানুষ হোক সব কিছুতেই তিনিই ব্যপ্ত। *সাশন অনশনে,*

সাশন হচ্ছে যে খাওয়া দাওয়া করে আর *অনশনে* মানে যে খাওয়া দাওয়া করে না। এবারে পুরো অর্থটা দাঁড়াচ্ছে দেবতারা যারা আছেন অন্যান্য জীব যারা আছে, যারা খাওয়া দাওয়া করে। দেবতারা খাওয়া দাওয়া করে না, দেবতাদের খাওয়ার প্রয়োজনই হয় না, সূক্ষ্ম জিনিষেই তাঁদের সব মিটে যায় কিন্তু মানুষ, পশু, পাখি, কীট-পতঙ্গ এদের খাওয়া দাওয়া করতে হয় তা নাহলে শরীর থাকবে না, আর কারা খায়না, যেমন পাথর, পাহাড়, নদী এরা খাওয়া দাওয়া করে না। এদের সবেতে কে আছেন? ভগবানই ব্যাপ্ত, *বিশ্বঙব্য-ক্রামৎ*, ভগবান নিজেকে সব কিছুতে ছড়িয়ে ব্যাপ্ত করে রেখেছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন কিছু নেই যেটা ঈশ্বরের ব্যাপ্তির বাইরে রয়েছে। আর এই ব্রহ্মাণ্ড কতটুকু? বলছেন ভগবানের খুব ছোট্ট একটা অংশ হচ্ছে এই ব্রহ্মাণ্ড। গীতাতে দশম অধ্যায়ে শেষ লাইনে ভগবান এসে বলছেন – *বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ*(১০।৪২)। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন – তোমাকে আর কি বেশি বলব, শুধু এইটুকু জেনে নাও যে আমার একটি ছোট্ট অংশে এই পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান হচ্ছে। এই শ্লোকটা পড়ে মনে হবে যেন শ্রীকৃষ্ণ আত্মশ্লাঘা করছেন। এটি কোন ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের আত্মশ্লাঘা নয়, এই উক্তিটা সরাসরি বেদ থেকে এসেছে। এটা কোন দাঁড়িপাল্লা দিয়ে কিংবা স্কেল দিয়ে মাপার জিনিষ নয়, এই ভাবটাই এখানে বলতে চাইছেন যা কিছু জড় বস্তু আছে তার থেকে চৈতন্য অনেক উপরে।

গীতার সপ্তম অধ্যায়ে এই ব্যাপারটাকে নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে ঈশ্বরের দুটো প্রকৃতি, একটা হচ্ছে পরা প্রকৃতি আরেকটি হচ্ছে অপরা প্রকৃতি। সেখানে দুটি শ্লোকে এই জিনিষটাকে খুব সুন্দর আরো পরিষ্কার করে ভগবান বলে দিয়েছেন – *ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরস্টধা।।৪।। অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ।।৫।।* ভগবানের যে পরা প্রকৃতি আছে সেখানে কিছুই হয় না, সেখানে না আছে কোন বিকার, না আছে বৃদ্ধি বা ক্ষয়, না আছে জন্ম না আছে মৃত্যু। যা কিছু এই অপরা প্রকৃতিতেই হবে। অপরা প্রকৃতি হচ্ছে জড়, জড় হলেও তার স্বাভাবিকতাও সেই চৈতন্য, সেইজন্য জীব, দেবতা এরাও এই অপরা প্রকৃতির মধ্যে অন্তর্গত। যারা খাওয়া দাওয়া করে আবার যারা খাওয়া দাওয়া করে না তারাও আছে। তার মানে বলতে চাইছে সমস্ত কিছু জড় প্রকৃতি, চেতন প্রকৃতি, জীব জগৎ সবটাই তিনি।

পঞ্চম মন্ত্রে বলছেন – ***তস্মাদ্বিরাডজায়ত বিরাজো অধি-পুরুষঃ। স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ।।*** পুরুষসূক্তমের এটি খুব কঠিণ একটি মন্ত্র। এখানে দুটো তিনটে পুরুষের কথা এসে যাবে। বলছেন তস্মাৎ মানে সেই আদি পুরুষ, আদি পুরুষ হচ্ছেন ভগবান, যেহেতু বেদ ভগবান বলে না, এখানে বেদ বলছে আদি পুরুষ। সেই আদি পুরুষ থেকে বিরাড জায়ত, বিরাট জন্ম নিয়েছে। এই বিরাটকে বলা হচ্ছে যে সেই আদি পুরুষ থেকে ডিম রূপে বিরাটের জন্ম হল, যাকে বলা হয় হিরণ্যগর্ভ, মানে সোনার ডিম। সেই ডিমের আকার বিশাল। বলছেন সৃষ্টির যা কিছু হবে সেটা প্রথমে ডিম আকারে জন্ম নেয়। প্রথমে বললেন সেই আদি পুরুষ থেকে বিরাটের জন্ম, সেই বিরাটের থেকে আবার *বিরাজো অধি-পুরুষঃ* অধি-পুরুষের জন্ম হচ্ছে। কেউ যদি বলি বাবার থেকে ছেলের জন্ম আবার সেই ছেলের থেকে বাবার জন্ম হল, এটা কি কখন বোঝা যায়? আমাদের বেদে প্রায়ই একটা ধারণার খুব উল্লেখ পাওয়া যায় তাহল – ‘ক’ থেকে ‘খ’ এর জন্ম আবার ‘খ’ এর থেকে ‘ক’ এর জন্ম হচ্ছে। যেমন অনেক জায়গায় বলা হচ্ছে যে জিনিষ থেকে ইন্দ্রাদির জন্ম আবার ইন্দ্রাদির থেকে সেই জিনিষের জন্ম হচ্ছে। এটা বেদের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য। পুরানেও একটা ধারণার উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে বলছে ব্রহ্মা প্রথমে নিজের মন থেকেই সৃষ্টিকে এগিয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু মন থেকে সৃষ্টি করতে গিয়ে ব্রহ্মা দেখলেন এতে প্রচুর সময় অপচয় হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে সৃষ্টি এগোচ্ছিল না, ব্রহ্মা চাইছিলেন সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় একটা গতি দিতে। তখন ব্রহ্মা নিজেকে দুটো ভাগে বিভক্ত করে দিলেন। তিনি নিজেকে একটা ভাগে পুরুষ আরেকটা ভাগে নারী করে নিলেন। এই নারী আর পুরুষ থেকে সৃষ্টিটা এগোতে লাগল।

পুরুষসূক্তমের এই অধি-পুরুষের মনু তিনটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পুরানের এই ধারণাকে ভিত্তি করে মনু বলছেন, ব্রহ্মা, যিনি সৃষ্টিকর্তা, তাঁকে পুরুষ বলে সম্বোধন করা হয়। তারপর ব্রহ্মা যখন নিজেকে পুরুষ আর নারীতে দুই ভাগে বিভক্ত করলেন, তার যে পুরুষ অংশ তাকেও পুরুষ বলা হয়। আর তাদের থেকে যে পুরুষদের জন্ম হল তাকেও পুরুষ বলা হয়। সেইজন্য এইখানে বলা মুশকিল পুরুষকে কি অর্থে বলতে চাইছেন। কিন্তু এর সহজতম ব্যাখ্যা হচ্ছে, বিশেষ করে পরের দিকে আমাদের শাস্ত্রাদিতে যেটা ব্যাখা করা হয়েছে এবং বেদান্তও যেটা মেনে নিয়েছে, সেটা হচ্ছে সৎ, চিৎ ও আনন্দের মধ্যে যখন মায়ার আবরণ এসে যায়, যেমন একটা বিরাট আলো আর তার সামনে একটা বড় পর্দা টাঙানো হয়েছে, এখন এই পর্দার মধ্যে যখন আলোটাকে দেখা হবে তখন আলোটা অন্য রকম দেখাবে। এখন যদি পর্দার বদলে যদি একটা আতস কাচ সূর্যের আলোর সামনে ধরা হয় তখন আতস কাচটা যেখানে যেখানে ধরা হবে সেখানেই আলো পড়বে আবার কাচের রঙ যেমন যেমন হবে আলোর প্রতিফলনের রঙও সেই রকম হবে। এই আতস কাঁচটি হচ্ছে মায়ার মত। এখন এই সূর্যের আলো সর্বব্যাপী। এবারে একটা আতস কাচ লাগিয়ে দিলে সেইখানে আরেকটা সূর্যের জন্ম হয়ে গেল। সেই সূর্য এখন নীচে চলে গেছে, আকাশের সূর্যও সূর্য আর আতস কাচের মধ্য দিয়ে যে সূর্য প্রতিফলিত হচ্ছে সেটাও সূর্য। এবার নীচে যে সূর্য দেখা যাচ্ছে এটাও একটা পুরুষ। ঠিক এই রকম সচ্চিদানন্দ যখন মায়াকে ভেদ করে নীচে যে ভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে সেটাও একটা পুরুষ। তার মানে দাঁড়াল মায়ার ওপারে যে পুরুষ, সেই ভগবান, সেই সচ্চিদানন্দকে মায়ার এপারে যখন দেখা যাচ্ছে তারও নাম আরেকটি পুরুষ। সেই সচ্চিদানন্দকে বলা হচ্ছে আদি পুরুষ আর মায়ার নীচে যে সচ্চিদানন্দকে দেখা যাচ্ছে তাঁর নাম হচ্ছে অধি-পুরুষঃ। মায়া শব্দ কিন্তু বেদে নেই। কিন্তু সৃষ্টির সময়কার কথা বলতে গিয়ে যে বলা হচ্ছে একটি পাদ, ঐ এক পাদকেই বলছে বিরাট। এই বিরাটের মধ্যেই যেটা সব থেকে বেশি ব্যক্ত হচ্ছে তাঁকেই বলা হচ্ছে ভগবান। আমরা যেমন নর্থ পোল আর সাউথ পোলের কথা বললাম, এখন মনে করা যায় সেখানে হিমালয়ের সাইজের বরফের পাহাড় হয়েছে আর সেখানে বরফের একটা ছোট্ট টুকরোও আছে। বরফের হিমালয় আর বরফের টুকরো দুটো স্বভাবত একই জিনিষ, কারণ দুটো জিনিষই বরফ দিয়ে তৈরী, কিন্তু হিমালয় হিমালয় আর বরফের ছোট টুকরো টুকরোই। বরফের টুকরোটা এখন বলতে পারে – ওহে হিমালয় তুমিও যা আমিও তা। কোন অর্থে এক বলতে পারে? যে জিনিষ দিয়ে আমরা দুজনে তৈরী হয়েছি, সেই অর্থে বরফের টুকরো আর বফের হিমালয় এক। কিন্তু দুজনকে এক বলার আগে তাদের দুজনকে জলে পরিণত হতে হবে। কিন্তু যতক্ষণ বরফ রূপে আছে ততক্ষণ হিমালয় বিরাট, আর বরফের টুকরো ক্ষুদ্র। এই যে চার ভাগের এক ভাগের কথা বলা হয়েছে, এই একপাদ হচ্ছে বিরাট রূপে ভগবান বা ঈশ্বর, আর ছোট যে বরফের টুকরো সেটা হলাম আমরা। এই হচ্ছে শিব আর জীবের স্বরূপ। শিব হচ্ছে সব থেকে বৃহৎ প্রকাশ আর জীব হল অতি ক্ষুদ্র রূপে আমরা বিভিন্ন প্রাণী। যেটাকে জড় বলছি সেটাও একই, সজীব নির্জীব দুটোই সেই চৈতন্যেরই, সেই আদি পুরুষরেই অভিব্যক্তি। পার্থক্য মাত্র তার আকারে, বিশালত্বতে।

এখানে যে অধি-পুরুষঃ বলছেন এই অধি-পুরুষ হচ্ছেন ঈশ্বর। আর এই ঈশ্বর হচ্ছেন এক চতুর্থাংশের যা কিছু আছে তার শাসন কর্তা। গীতাতে এই আদি পুরুষ আর অধি-পুরুষকে একই বলা হচ্ছে, ঈশ্বর আর ব্রহ্মকে এক বলা হয়। ব্রহ্ম আর ঈশ্বরের মাঝখানে মায়া রয়েছে বলে আলাদা মনে হবে কিন্তু মায়াকে সরিয়ে দিলে ঈশ্বর আর ব্রহ্মে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু এই মায়ার জগতে ঈশ্বর হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই আদি পুরুষ থেকে সৃষ্টি, সৃষ্টির মাঝখান দিয়ে যখন সেই আদি পুরুষকে অবলোকন করা হচ্ছে তখন তিনিই হয়ে যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শিব, বুদ্ধ, যিশু। মায়ার আবরণে সেই সচ্চিদানন্দকে বিভিন্ন যুগে এই এই রূপে দেখা যায়। এঁকেই পুরুষসূক্তমে অধি পুরুষ বলা হচ্ছে।

পঞ্চম মন্ত্রে পরের লাইনে বলছেন – *স জাতো অতিরিচ্যতে পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ* যিনি নিরাকার তিনি যখন সাকার রূপ ধারণ করলেন, সেই আদি পুরুষ যখন অধি পুরুষ হলেন তখন এই সৃষ্টির জগতে

তাঁর নানা রকমের ক্ষমতা এসে গেছে। এখন তিনি নিজেকে বিস্তার করে সৃষ্টিকে এগিয়ে দিতে শুরু করলেন। কি রকম ভাবে তিনি সৃষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন? এখন যেন বিরাট থেকে জড় আর আত্মা বা চৈতন্য আলাদা হয়ে গেছে। বিরাট হচ্ছে জড় রূপে আর পুরুষ আত্মা রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। এখন এই জড়কে নিয়ে তিনি সৃষ্টির কাজ শুরু করলেন। তাঁর কাছে অফুরন্ত পদার্থ এসে গেছে সেই পদার্থ দিয়ে নিজেকে বিস্তার করতে করতে তিনি চারিদিকে ছড়িয়ে গেলেন। সেইখান থেকে পৃথিবীর জন্ম হল, তারপর নানা রকমের জীব জন্তুর জন্ম হল। আসলে এটি হচ্ছে একটি খুব উচ্চ মানের কবিতা, এই কবিতার মধ্য দিয়ে একটা সহজ তত্ত্বকে বোঝাতে চাইছেন, তা হচ্ছে ঈশ্বর ছাড়া কিছুই নেই। এই একটি তত্ত্বকে কবিতার শৈলীতে, নানা তুলনাত্মক বিষয় দিয়ে, নানা কথার মাধ্যমে বোঝাতে চাইছেন।

এখানে যেটা মূল কথা বলতে চাইছেন তা হচ্ছে, তিনি সৃষ্টি করে তার মধ্যেই আবার ঢুকে যান। খুব সহজ উপমা হচ্ছে, মানুষ একটা বাড়ি তৈরী করল তারপর সেই বাড়িতে ঢুকে গেল। এই জগৎকে তিনিই সৃষ্টি করলেন তারপরে তার মধ্যেই তিনি প্রবেশ করে গেলেন। তাই এই সৃষ্টিটাও পুরুষ আর তিনি নিজেও পুরুষ। কিন্তু ঈশ্বর ছাড়া কিছুই নয়, এই জড়টাও ঈশ্বর, তাঁরই একটা অংশ যেন জড়ের মত দেখাচ্ছে। আর সেই জড়ের মধ্যেই তিনি আবার ঢুকে যান। যখন তিনি জড়ের মধ্যে ঢুকে যান তখন তিনি আত্মা রূপে, যেমন দেহের মধ্যে আত্মা রূপে অবস্থান করেন। কিন্তু এই দেহ যেটা আছে সেটাও আত্মা ছাড়া কিছুই নয়, আবার এই দেহের ভেতরে যিনি জীব আছেন তিনিও আত্মা ব্যতিরেকে কিছুই নন। তবে এর একটা হচ্ছে উৎকৃষ্ট বা পরা প্রকৃতি আরেকটি হচ্ছে নিকৃষ্ট বা অপরা প্রকৃতি। পরা প্রকৃতি হচ্ছেন সেই আত্মা আর অপরা প্রকৃতি হচ্ছে এই দেহ। দেহের সৃষ্টি আছে আবার যার সৃষ্টি আছে তার নাশও আছে। কিন্তু আত্মার সৃষ্টিও নেই নাশও নেই। এক চতুর্থাংশের কথা যেটা বলা হয়েছে এই অংশটুকুই বারবার সৃষ্টি হচ্ছে আবার লয় হচ্ছে, ঐটুকুর মধ্যেই জন্ম-মৃত্যুর খেলা চলতে থাকে। জড়ের আবার জন্ম-মৃত্যু কেন হচ্ছে? ওর মধ্যে তিনি ঢুকেছেন বলেই জড়ের নানান খেলা চলে। তিনি যদি জড়ের মধ্যে না প্রবেশ করেন তাহলে কিছুই হবে না।

ষষ্ঠ মন্ত্রে বলছেন – ***যৎপুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত। বসন্তো অস্যাসীদাজ্যম গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ।।*** এই মন্ত্রটাও একটি কবিতা, কবিতার মাধ্যমে সেই তত্ত্বটাকেই প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটা দুর্ধর্শ রূপককে ব্যবহার করা হচ্ছে, তিনিই এই সব কিছু হয়েছেন। বলছেন, দেবতারা ঠিক করলেন এই যে পুরুষ, যে পুরুষ এক চতুর্থাংশের মধ্যে রয়েছেন, সেই অধি পুরুষকে আমরা যজ্ঞে বলি দেব। দেবতারা এখন যজ্ঞ করবেন আর সেই যজ্ঞে এই অধি পুরুষকে বলি দেবে। তখন তো সৃষ্টি হয়নি, জীব জন্তু কিছুই জন্ম নেয়নি, যজ্ঞ করতে গেলে নানান রকমের জিনিষের দরকার। অগ্নিকুণ্ড দরকার, অরণি কাষ্ঠের দরকার, ঘৃত ও আরও আনুষাঙ্গিক অনেক কিছুর দরকার। তাহলে দেবতারা কিভাবে যজ্ঞ করল? তাই দেবতারা মনে মনে এই যজ্ঞটা শুরু করল। *বসন্তো অস্যাসীদাজ্যম গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ* দেবতারা আহুতি দেওয়ার জন্য বসন্ত ঋতুকে ঘি বানালেন, গ্রীষ্ম ঋতুকে অরণি কাষ্ঠ বানালেন, শরৎ ঋতুকে হবি করলেন। অনেকে প্রশ্ন করেন যে দেবতারা হঠাৎ কি করে ঠিক করলেন যে বসন্ত ঋতুকে ঘৃত করা হবে? এর উত্তরে বলা হয় যে দেবতারাও নাকি ধ্যান করলেন। কি ধ্যান করলেন? আগের কল্পে সৃষ্টিটা কিভাবে হয়েছিল। ধ্যানের মাধ্যমে দেবতারা জানলেন যে আগের কল্পে বসন্ত ঋতুকে এই ভাবে যজ্ঞের ঘৃত করা হয়েছিল। যখন ধ্যানে দেখলেন যে এর আগের কল্পেও এইভাবেই যজ্ঞ করা হয়েছিল, তখন তারা ঠিক করলেন এই কল্পেও আমরা যজ্ঞ করব, সেই যজ্ঞে বসন্ত ঋতুকে ঘি করা হবে, গ্রীষ্ম ঋতু হবে কাঠ আর শরৎকাল হবে তার হবি। তখন কিছুই নেই কিন্তু দেবতারা এসে গেছেন, দেবতাদের সৃষ্টি হয়ে গেছে। এখন দেবতারা যদি যজ্ঞ না করেন তাহলে বাকি অংশের সৃষ্টি হবে না। এখানে যদিও পুনরাবর্তশীল সৃষ্টিকে বোঝাতে চাইছে কিন্তু এখানে যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে এর সবটাই হচ্ছে মানসিক প্রক্রিয়া। সবটাই মনে মনে, ধ্যানের মধ্যে দিয়ে হচ্ছে। তার থেকেও বড় ব্যাপার, যা কিনা এই পুরুষসূক্তমের মূল নীতি তা হচ্ছে – যা কিছু

সৃষ্টি হচ্ছে সব পুরুষ নিজেই হয়েছেন। তাই এই ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আছে সব তিনি নিজেই হয়েছেন, তিনি ব্যতিরেকে অন্য কিছু নেই। যজ্ঞে সেই পুরুষকে বলি দেওয়া হল, তাঁর অঙ্গ থেকে পৃথক পৃথক হয়ে হয়ে যা যা হচ্ছে সব তিনি নিজেই সেই সেই বস্তু হচ্ছেন। সোজা কথায় বলতে গেলে বলা যেতে পারে ভগবানকে কেটে কেটে বলি দিয়ে নানান জিনিষের সৃষ্টি হল। কারা বলি দিলেন? এই দেবতারা। কি ভাবে বলি দিলেন? ধ্যানের মাধ্যমে। এই ধ্যানের ব্যাপারটাকেই একটা কাব্যিক আঙ্গিনায় বর্ণনা করা হচ্ছে। যতই কাব্যিক হোক না কেন, আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে সেই সত্যকে, সেই সত্য হচ্ছে ভগবানই সব কিছু হয়েছেন। এখানে পুরুষকে যজ্ঞের পশু রূপে বলি দেওয়া হচ্ছে। বলি দেওয়ার পর তাঁর শরীরেরই বিভিন্ন অঙ্গ থেকে এই জগতের যা কিছু আছে সব সৃষ্টি হল। এখন যজ্ঞের পশু এসে গেছে, ঘৃত এসে গেছে, অরণি এসে গেছে, হবিও তৈরী হয়ে গেছে তাই যজ্ঞ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রের আর কোন বাধা রইল না।

সপ্তম মন্ত্রে বলা হচ্ছে – ***তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন পুরুষং জাতমগ্রতঃ। তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে।।*** দেবতারা যখন মনে মনে ঠিক করলেন এই যজ্ঞ করা হোক, তখন সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকজন এসে গেলেন। তাঁরা হচ্ছেন, সাধ্য – মানে এক শ্রেণীর উচ্চস্তরের সিদ্ধপুরুষ, আর ঋষিরা। তখনও কোন কিছুই সৃষ্টি হয়নি কিন্তু দেবতারা এসে গেছেন, ঋষি ও সিদ্ধগণও যজ্ঞ দেখার জন্য এসে গেছেন। এনারা সবাই সেই পুরুষকে বদ্ধ করে তাঁর উপরে জল ছিটিয়ে দিলেন, এবার তাঁকে বলি দেওয়া হবে। তার আগে সেই পুরুষকে কুশ ঘাসের উপরে রাখা হল। এখন দেবতারা সেই পুরুষকে ধরে যজ্ঞের আসনে উপবেশন করালেন। সিদ্ধগণ ও ঋষিগণ এই যজ্ঞটাকে অবলোকন করবেন।

অস্টম মন্ত্রে এসে বলা হচ্ছে – ***তস্মাদ্যজ্ঞাৎ-সর্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যম্। পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যান্ আরণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে।।*** এখন সেই পুরুষের বলি দেওয়া হচ্ছে। পুরুষকে যখন বলি দেওয়া শেষ হয়ে গেছে তখন সেই পুরুষ থেকে কি কি জন্ম নিল? এই পুরুষের অঙ্গ থেকে ঘিয়ের জন্ম হল, এর আগের যে ঘিয়ের কথা বলা হয়েছিল সেই ঘি ছিল কল্পনার। এবার যে ঘিয়ের জন্ম হল এটা হচ্ছে আসল ঘি, ঘি হচ্ছে দুধের সার। তারপর সেই পুরুষ থেকে বাতাসে চলাফেরা করে সেই সকল প্রাণির উদ্ভব হল, মানে পাখিদের জন্ম হল। অরণ্যে যে সব পশুরা থাকে সেই সব পশুদের জন্ম হল, আর যারা গ্রামে বা লোকালয়ে যে পশুরা বাস করে তাদেরও জন্ম হল। পুরুষসূক্তম্ একটা কবিতা কিনা তাই কবিতার ভাবে বলা হচ্ছে যে পাখিরা জন্ম নিল, বন্য পশু আর গৃহপালিত পশু সবারই জন্ম হল এই পুরুষের থেকে। কেউ বলবে যে গরুতে ভগবান আছে আর বাঘের মধ্যে ভগবান নেই, তা বললে হবে না, গরুতেও তিনি বাঘেতেও তিনি। তিনিই সব হয়েছেন, এইটাকে বোঝাবার জন্যে একটা একটা জিনিষকে সামনে নিয়ে এসে কবিতার আকারে ব্যখ্যা করে বোঝান হচ্ছে।

নবম মন্ত্রে বলছেন – ***তস্মাদ্যজ্ঞাৎসর্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাগংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়ত।।*** দেবতাদের যজ্ঞ যখন সমাপ্ত হয়ে গেলে তখন সেই যজ্ঞ থেকে বেদ বেরিয়ে এল, বেদের সাথে বেদের যে চারটি অঙ্গ, সেই চারটি অঙ্গও বেরিয়ে এল। *ঋচঃ* – ঋক, ঋচ হচ্ছে ঋক। বলা হয় পুরুষসূক্তমেই আমরা প্রথম ঋকবেদ হিসেবে ঋচের উল্লেখ পাই। *সামানি* – যজ্ঞ থেকে সামগান বেরোলে। *ছন্দাংসি* – এই যজ্ঞ থেকে ছন্দের উদ্ভব হল। এখানে যে ছন্দের কথা বলা হচ্ছে এই ছন্দকে অনেকে কবিতার বিভিন্ন যে ছন্দ আছে সেই ছন্দের কথা বলছে, আবার অনেকে পুরুষসূক্তমের এই ছন্দ অথর্ববেদকে বোঝাচ্ছে। *যজুস্তস্মাদজায়ত* – সেইখান থেকে যজুর্বেদ বেরোল।

ভারতীয় পণ্ডিতদের মতে বেদ চারটি, কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা সব সময় তিনটি বেদের কথা বলেন। কেন পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা তিনটি বেদের কথা বলেন? তার কারণ হচ্ছে – এক জায়গাতে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে বেদের আরেকটি নাম হচ্ছে ত্রয়ী। এই ত্রয়ীর অর্থ হচ্ছে ঋক, সাম ও যজু। এই ত্রয়ী শব্দ থেকেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা তিনটি বেদের কথা বলে আসছে। আসলে এই ঋক, সাম ও যজুকে যখন বেদের

অর্থ হিসেবে বলা হয়েছিল তখন সংখ্যার কথা না বলে ছন্দ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে – ঋক হচ্ছে এক বিশেষ ছন্দ, সাম হচ্ছে যেটা গান হিসাবে ব্যবহার করা হয় আর যজু হচ্ছে গদ্যাকারে ছন্দ, যা যজ্ঞে আহুতির সময় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ফলে এখানে আমরা কবিতা, গান আর গদ্যকে পেয়ে গেলাম, তাহলে অথর্বকে আমরা কি বলব। সেই কারণে অথর্বের কথা বেশি আসত না বলে বেদকে ত্রয়ী বলা হত। পরবর্তি কালে এই অথর্ববেদের আরেকটা নাম দিল ছন্দ এবং একে এক বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্য রূপে গণ্য করতে শুরু করল, কারণ অথর্ববেদের মধ্যে আমরা পদ্য ও গদ্য দুটোই পাই। এই কারণে অথর্ববেদকে নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়। এই সব কারণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা যে করেই হোক দেখাবেন যে বেদ তিনটেই ছিল আর পরের দিকে অথর্বকে বেদের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। আমাদের পণ্ডিতরা কখনই পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের কথাকে স্বীকার করেন না, তাঁরা মনে করে এই চারটে বেদ এক সাথেই আর একই পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয়েছিল। পুরুষসূক্তমেই তার উল্লেখ করা হচ্ছে – ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব এই যজ্ঞ থেকেই বেরিয়েছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা আবার এর উত্তরে বলেন যে ঋকবেদে এই পুরুষসূক্তমকে পরে ঢোকান হয়েছে, মানে পুরুষসূক্তম্ লেখা হয়েছে পরে কিন্তু ঢুকিয়ে দিয়েছে আগে। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা ভাবলেন না যে যারা বেদ মুখস্ত করতেন তাঁরা কি এতই মুর্খ ছিলেন যে পরের দিককার রচনাকে আগের রচনার সাথে মিশিয়ে দিয়েছে, বেদের ঋষিরা কেন আর কি উদ্দেশ্যে এত বড় একটা জালিয়াতি করতে যাবেন? এই হচ্ছে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দৃষ্টিভঙ্গী, এক কানাকড়ি এদেরকে বিশ্বাস করা যায় না। এরা প্রাণপনে চেষ্টা করে যাবে যে পুরুষসূক্তম্ অনেক পরে রচিত হয়েছে। স্বামীজী পাশ্চাত্যের মানুষদের বলছেন – আমাদের পূর্বপুরুষরা যখন বেদ লেখা শেষ করে দিয়েছে তখনও তোমাদের পূর্বজরা নিজের গায়ে মুখে রঙ লাগিয়ে বন জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত, তোমরা কি করে আমাদের ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনা করতে আস। গতকাল পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড আমেরিকার লোকেরা ছিল বর্বর জলদস্যু, তারা আবার এগুলোকে নিয়ে আলোচনা করতে আসে।

তারপর দশম মন্ত্রে বলছেন – ***তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ। গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ।।*** ঐ যে আদি পুরুষ, যাঁকে যজ্ঞে বলি দেওয়া হয়েছে, সেইখান থেকে এখন জন্ম নিল ঘোড়া। এমন সব প্রাণীরা জন্ম নিচ্ছে যাদের দুটি করে চোয়াল আছে, মানে ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল ও গরু। এখানে গরুকে বিশেষ কোন স্থান দেওয়া হয়নি, অন্য সব পশুর মতই গরুরও জন্ম হয়েছে। কিন্তু পরের দিকে বিশেষ করে পৌরানিক সাহিত্যে গরুকে একটা বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে। তার কারণ তখনকার মানুষরা এত বেশি গরু খেতে আরম্ভ করে দিয়েছিল যে চাষবাসের জন্য গরুর আকাল হয়ে গিয়েছিল। তখন গরুকে মা, দেবী বানিয়ে এই গোহত্যাকে কোন রকমে আটকান হয়েছিল। বেদে এইজন্য গরুকে বিশেষ কোন মাহাত্ম্য দেওয়া হয়নি, কারণ ছাগলের যেখান থেকে জন্ম গরুরও সেইখান থেকে জন্ম হয়েছে। এই পর্যন্ত সব ঠিকঠাক চলছে, কারুর মনে কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু তারপরের মন্ত্রেই প্রশ্ন উঠছে।

একাদশ মন্ত্রে এই প্রশ্নই করা হচ্ছে – ***যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন। মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কাবূরূ পাদাবুচ্যেতে।।*** এই যে যজ্ঞ হল, যজ্ঞে এই যে বলি দেওয়া হল, এখন সেই আদি পুরুষকে কিভাবে বলি দেওয়া হয়েছিল, তাঁকে কটি টুকরো করা হয়েছিল? সেইখান থেকে আর কি কি জিনিষের উৎপত্তি হল, যেগুলো উৎপন্ন হল তাদের আকার কি রকম হল? সেই পুরুষের হাতগুলো কি হল, তাঁর মুখ কি হল, তাঁরা উরু, পা এগুলোর কি অবস্থা হল? অর্থাৎ এই যে পুরুষকে বলি দেওয়া হল, তাকে যে ভাবে টুকরো করা হয়েছিল, সেই টুকরো থেকে কি কি সৃষ্টি হল সেটাকে আরেকটু ব্যাখ্যা করে বলার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এইখানে এসে সব থেকে বিতর্কমূলক একটি মন্ত্রের উল্লেখ পাই। এই একটি মন্ত্রকে নিয়ে আম্বেদকর থেকে শুরু করে যত নেতা, রাজনীতিবিদরা এখনও চেঁচামেচি করে যাচ্ছেন। কিছু দিন আগেও একটা গোষ্ঠি থেকে দাবী তোলা হয়েছে যে পুরুষসূক্তমের সব কয়টা কপিকে জ্বালিয়ে দেওয়া উচিৎ।

দ্বাদশ মন্ত্রে সেই বিতর্কমূলক কথা বলা হচ্ছে – ***ব্রাহ্মণোহস্যমুকমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাগং শূদ্রো অজায়ত।।*** সেই আদি পুরুষ, যাঁকে বলি দেওয়া হল, তাঁর যে মুখ সেই মুখ

থেকে ব্রাহ্মণের জন্ম হল, তাঁর যে বাহু, সেইখান থেকে ক্ষত্রিয়ের জন্ম হল, যদিও ক্ষত্রিয় শব্দটা বলা হয়নি, এখানে বলা হয়েছে রাজন্যঃ, রাজন্যঃ বলতে বোঝায় যারা রাজ কর্ম করেন। সেই পুরুষের ঊরু থেকে বৈশ্যদের জন্ম হল। আর তাঁর পা থেকে শূদ্রের জন্ম। যারা জাতিপ্রথাকে আঁকড়ে রেখেছেন তারা এই মন্ত্রটাকে খুব নিন্দা করেন। তারা বলেন পুরুষসূক্তম্ ব্রাহ্মণদের বড় করেছে যেহেতু তারা সেই পুরুষের মুখ থেকে উৎপন্ন হয়েছেন। যেহেতু সেই পুরুষের পায়ের থেকে শূদ্রের জন্ম হওয়ার কথা বলেছে তাই শূদ্রকে ছোট করা হয়েছে। এটা গেল পুরুষসূক্তমের সমালোচনার একটা দিক। দ্বিতীয় যেটা তারা সমালোচনা করে তা হচ্ছে – পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা মনে করে যে বৈদিক যুগে কোন ধরণের জাতিপ্রথা ছিল না, এই যে এখানে চারটে বর্ণের কথা বলা হয়েছে, এই চারটে বর্ণ নাকি বেদের সময়ে ছিল না। তার মানে যখন এই ধরণের চারটে বর্ণকে যে মন্ত্র উল্লেখ করেছে, নিশ্চয়ই তাহলে এই মন্ত্র পরে লিখে ঋকবেদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণরা নিজেদের বড় করার জন্য এইভাবে পুরুষসূক্তম্ রচনা করে ঋকবেদের মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছে।

এই দুটো সমালোচনাই আমাদের মতে সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন। কারণ শুধু মাত্র পুরুষসূক্তমের মধ্যেই নয়, এর আগেও বেদের বিভিন্ন জায়গায় জাতি হিসেবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা যখন বেদের আলোচনা শুরু করেছিলাম সেখানে যজুর্বেদের একটা মন্ত্রের কথা উল্লেখ করে আমাদের আলোচনা শুরু করেছিলা, সেই মন্ত্রে এই চারটে জাতির কথা বলা আছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, যখন কোন সমাজ ব্যবস্থায় একটা শ্রেণী যখন বিশেষ সুযোগ সুবিধা নিতে শুরু করে, আর এই সুযোগ সুবিধা নেওয়াটা দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে এবং আরেকটা শ্রেণীর উপর শোষনের নিপীড়ন চলতে থাকে তখন সমাজের মধ্যে একটা উচ্চ-নীচ ভেদের মনোভাব জন্ম নেয়। যে কোন সমাজে শোষক ও শোষিত যদি থাকে তখন এই উচ্চ-নীচ ভেদাভেদের মনোভাব আসবেই আসবে।

যদি একটা চিনির পুতুল বানান হয়, আর চারজনকে এই চিনির পুতুলটাকে খাওয়ার জন্য বলা হল। একজন মুণ্ডুটা নিল, একজন হাতটা নিল, একজন ঊরূর অংশটা নিল আরেকজন পায়ের অংশটাকে নিলেন। এখন এই চারজন কি কোন আলাদা জিনিষ পেলেন? একজনের অংশটা তেতো, আরেক জনেরটা মিষ্টি, অন্য জনেরটা নোনতা আর চতুর্থজনের টা কি ঝাল লাগবে খাওয়ার সময়? যে পায়ের দিকটা পেয়েছে সে যদি যে মাথা পেয়েছে তার সাথে মারামারি শুরু করে – তুমি কেন মাথা নিলে আমাকে কেন পা দিলে? এর কি কোন সমাধান আছে? সবটাই তো চিনি। আচ্ছা, এবার এই চারজনের প্রত্যেককে এক কাপ করে চা দেওয়া হল। এখন চায়ের কাপে যে মাথাটা পেয়েছিল সে মাথাটা ঢেলে দিল, যে পা পেয়েছিল সে সেই পা টাকে চায়ের কাপে মিশিয়ে দিল, এখন কি এদের একজনের চা কি ঝাল হবে আরেকজনের চা কি তেতো হবে? সবার চা মিষ্টিই হবে। কিন্তু যদি এরা মাথা, পা, হাত নিয়ে মারামারি শুরু করে দেয় – আমি কেন প্রত্যেক দিন এই চিনির পা টাই পাব, মাথা কেন পাবো না? এই ধরণের ছেলে মানুষী কথার কি কোন সদুত্তর আছে? পুরুষ, যিনি সচ্চিদানন্দ, যিনি নারায়ণ, যিনি নিরাকার তাঁর মাথা আর পায়ের মধ্যে কি কোন পার্থক্য করা যায়? এই সাধারণ ব্যাপারটাকে আমাদের দেশের নেতারা কিছুতেই বুঝতে পারল না। চিনির পুতুলের মাথা আর পায়ের মিষ্টত্বের পার্থক্যটা বাস্তবে না থাকলেও আম্বেদকরের মত বরেণ্য অগ্রগণ্য কিছু নেতাদের মাথার মধ্যে পার্থক্যটা বসে আছে। এখন যদি উল্টোটা হত, ব্রাহ্মণরা যদি বড় না হয়ে শূদ্ররা বড় হয়ে যেত তখন জিনিষটা অন্য রকম হয়ে যেতে। এরা পা আর মাথাকে কেন ছোট বড় করছে? কারণ আমার যে মাথা মানে আমার যেটা বড় জিনিষ সেটা আমার থেকে যে বড়, জেষ্ঠ্য, শ্রেষ্ঠ তাঁর পায়ে গিয়ে পড়ছে। এখন যদি মনে করি পা একটা নীচের জিনিষ সেখানে গিয়ে আমার মাথাটা পড়ছে, এটাতো আমার চিন্তা। কিন্তু একজন যে প্রতিবন্ধী, তার কাছে পা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা মনে করি মাথাতে চিন্তা হয়, মাথাতে বুদ্ধি আছে তাই মাথা হচ্ছে পায়ের থেকে বড়। এগুলো হচ্ছে বালবুদ্ধির পরিচয়। কিন্তু আসল সমস্যার জন্ম হয়েছে শোষন আর নিপীড়ন থেকে। যে

শোষিত হয়ে আসছে, যে নিপীড়িত হয়ে আসছে তাদের মধ্যে একটা ভুল ধারণাকে ঢুকিয়ে দেওয়ার ফলে এই মন্ত্রটি নিয়ে এত বিতর্কতার জন্ম দেওয়া হয়েছে। আসলে নারায়ণ যিনি, তাঁর শরীরের কোন্ অংশ থেকে কি সৃষ্টি হচ্ছে এটা কোন পার্থক্যই তৈরী করছে না।

কোন্টা ঠিক আর কোনটা ঠিক নয় এই বিচার করতে আমরা এখানে আসিনি, পুরুষসূক্তমে কি আছে সেটাকে জানা আর তার দর্শনকে হৃদয়ঙ্গম করে আমাদের মানব জীবনের উদ্দেশ্যকে সফল করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। এখানে মূল কথা হচ্ছে এই যে চারটি বর্ণ বা জাতি, এই চারটি জাতিই ভগবান থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এই তত্ত্বটাই গীতায় এসে ভগবান বলছেন – *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ। তস্য কর্তারামপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্।। (৪/১৩)।।* এই চারটি বর্ণ আমিই সৃষ্টি করেছি, আমার থেকেই এদের সৃজন হয়েছে। এই জগতের এমন কিছু নেই যেটা আমার থেকে আলাদা, যেটা আমার থেকে সৃষ্টি হয়নি। ঈশ্বরের থেকেই সব হয়েছে, তিনিই এই সব কিছু হয়েছেন, যা কিছু আছে সবই তিনি। এই যে বর্ণ ব্যবস্থা মানবজাতির মানসিক প্রবণতাকে সঠিক ও সফল রূপদান করা জন্য, এটাও তাঁরই সৃষ্টি।

ত্রয়োদশ মন্ত্রে বলেছেন – ***চন্দ্রমা মনসো জাতঃ চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত। মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুর-জায়ত।।*** সেই পুরুষ, যাঁকে বলি দেওয়া হল, তাঁর মন থেকে চন্দ্রমা বেরিয়ে এল। যেখান থেকে যা যা বেরিয়েছে, পরে ধীরে ধীরে সে সেইটারই দেবতা হয়ে গেছে। যেমন এইখানে বলছে পুরুষের মন থেকে চন্দ্রমার জন্ম হয়েছে, এখন আমাদের মনের দেবতা হচ্ছেন চন্দ্রমা। যারা মানসিক রোগী তাদেরকে ইংরাজীতে বলা হয় lunatic patient, লুনাটিক শব্দটা এসেছে ইংরাজী Lunar থেকে। লুনার মানে চাঁদ, অর্থাৎ চাঁদের স্থান খারাপ হয়ে গেলে মানুষের পাগলামি বেড়ে যায়। এই জন্যই হয়তো সত্যি সত্যি দেখা যায় পূর্ণিমা অমবস্যাতে পাগলদের পাগলামো বেড়ে যায়। কারণ পূর্ণিমা অমাবস্যাতে মন উত্তাল হয়ে যায়, সেইজন্য একাদশী ব্রত করতে বলা হয়, একাদশী ব্রত করলে শরীরের শক্তিটা একটু কমে যায় তাই তিন দিন বাদে যখন পূর্ণিমা অমবস্যা হবে তখন মনটা শান্ত থাকে। *চক্ষোঃ সূর্যঃ অজায়ত* – সেই পুরুষের চোখ থেকে সূর্যের জন্ম হল, সেইখান থেকেই সূর্য হয়ে গেলেন চোখের দেবতা। বলা হয় চোখ আর সূর্যের সাথে নাকি একটা যোগ আছে। সম্রাট আকবর এক সময় সূর্যের উপাসনা শুরু করেছিলেন, খালি চোখে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। *মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুর অজায়ত* – সেই পুরুষের মুখ থেকে ইন্দ্র আর অগ্নির জন্ম হল, তাঁর নিশ্বাস থেকে বায়ু জন্ম নিল, যার জন্য বায়ু হচ্ছে প্রাণের দেবতা।

চতুর্দশ মন্ত্রেও একই ভাবে বলা হচ্ছে সেই পুরুষের শরীরের কোন কোন অংশ থেকে কি কি জন্ম নিল – ***নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষম্ শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্তত। পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাৎ তথা লোকাগং অকল্পয়ন্।।*** এই যে অন্তরীক্ষ, এর জন্ম নিল সেই পুরুষের নাভি থেকে। তাঁর মাথা থেকে স্বর্গের সৃষ্টি হল, এখানে স্বর্গ হচ্ছে অন্তরীক্ষের উপরে যে লোক সেই স্থানের কথা বলা হচ্ছে। তাঁর পা থেকে ভূমির সৃষ্টি হল, দশটি দিক তাঁর কর্ণ থেকে জন্ম নিল। এইখান থেকে কর্ণের দেবতা হলেন দিকসমূহ। *তথা লোকাং অকল্পয়ন্* - এই ভাবেই দেবতারা বিভিন্ন লোকের কল্পনা করলেন। এখানে শব্দটা হচ্ছে *অকল্পয়ন্*, এই শব্দ দিয়ে সামগ্রিক সৃষ্টিটাকে বোঝাচ্ছে। আসলে দেবতারা এইভাবেই জগতের একটা আকার দিয়েছিলেন অথবা এইভাবেও বলা যায় যে এই যে জগতকে আমরা দেখছি, এটাকে দেবতারা এই ভাবেই মনে মনে কল্পনা করেছিলেন। এই যজ্ঞটা হচ্ছে পুরো মানসিক যজ্ঞ, এখন পশুকে যেমন যজ্ঞে বলি দেওয়া হয় ঠিক সেইভাবে পুরুষকে বলি দেওয়া হচ্ছে, দেবতারা এখন বলি দিয়ে দিয়ে জগতকে এইভাবে একটা আকার দিলেন, আর দ্বিতীয়তঃ এটা হচ্ছে মানসিক যজ্ঞ, এখন জগত এইভাবে সৃষ্টি হোক এইটা দেবতারা মনে মনে কল্পনা করতে লাগলেন। মহানির্বাণ তন্ত্রেও এইভাবেই নিজের যে চিন্তা ভাবনা আছে সেই চিন্তা ভাবনাকে দিয়ে এটাকে জল, এটাকে ফুল, এটাকে বস্ত্র ভাবা হবে।

এর পরে সৃষ্টিকে নিয়ে যখন আমি ধ্যান করব তখন ব্রাহ্মণকে যখন চিন্তা করব তখন ভাবব যে এই ব্রাহ্মণ হচ্ছে সেই পুরুষের মাথা, যখন শূদ্রকে দেখব তখন ভাবব সে হচ্ছে তাঁর চরণ। কার চরণ? শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ। আমাদের মাথা তো সর্বদা তাঁর চরণেই দিতে চাইছি। আমরা কি আর শ্রীরামকৃষ্ণের মাথায় গিয়ে আমাদের মাথা ঠেকাই? যখনই কোন শূদ্রের সামনে গিয়ে দাঁড়াব তখন আমরা ভাবব যে সে হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ, এখানেই আমার মাথাকে নত করতে হবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে যে শ্রদ্ধার ভাব নিয়ে দেখব, একজন শূদ্রকেও ঠিক সেই একই শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতে হবে। কারণ আমাদের সব কিছু, আমার আমিত্ব, ব্যাক্তিত্ব সব শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে সমর্পিত। এই গভীর উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবটা পুরুষসূক্তমের মাধ্যমে আমাদের কাছে আসছে, শ্রদ্ধার সঙ্গে, বিনম্র ভাবে, গভীর ভাবে হৃদয়ে এই ভাবটাকে ধ্যান করতে হবে।

পঞ্চদশ মন্ত্রে বলছেন – ***সপ্তাস্যাসন্‌পরিধয়ঃ ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ। দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানাঃ অবধ্নন্‌ পুরুষং পশুম্‌।।*** যজ্ঞে বলি দেবার জন্য যে পশুকে রাখা হয়েছে, বলা হচ্ছে সেই পশুকে সাত রকম ভাবে ঘিরে রাখা হয়েছে। এইটা হচ্ছে যজ্ঞের একটা বিধি। এটারই আবার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয় যে, বেদে যা সাতটি ছন্দের কথা বলা আছে, সেই সাত রকমের ছন্দ দিয়ে যজ্ঞের পশুকে ঘিরে রাখা হয়েছে বা সাত রকমের ছন্দ দিয়ে তাঁর অর্চনা করা হচ্ছে। *ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ* – যজ্ঞের জন্য কটি কাঠ লাগবে? সাত গুণিতক তিন, মানে একুশটি কাঠের টুকরো যজ্ঞের জন্য লাগবে। ভারতীয় পরম্পরার ঐতিহ্যে সাত সংখ্যাটি খুব পবিত্র সংখ্যা রূপে ভাবা হয়। এই সাত সংখ্যা দিয়েই সপ্তদ্বীপ, সপ্ত সাগর, অগ্নির সাত রকমের জিহ্বার কথা বলা হয়েছে। এই ভাবে সব আয়োজন করে দেবতারা যজ্ঞ পশুকে বলি দিল। কে যজ্ঞ পশু? সেই আদি পুরুষ।

শেষ মন্ত্রে বলছেন – ***যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ তানি ধর্মাণি প্রথমান্যসন্‌। তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্তে যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ।।*** পুরুষসূক্তমের প্রথম মন্ত্রটি হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এর মূল ভাবটা শেষ মন্ত্রে এসে প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে। এই যে কথাটা *যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ* – যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞের পূজা সম্পন্ন হল, কিভাবে করল? দেবতারা সেই পুরুষকে যজ্ঞে বলি দিয়ে। আমরা যখন কালী পূজায় পশু বলি দিই তখন সেই পশুকে বলির দ্বারা মা কালীকেই অর্পণ করছি। ঠিক সেই রকম এখানেও বলি দেওয়া হল, কার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হল? সেই পুরুষের প্রতি উৎসর্গ করার জন্য বলি দেওয়া হল। কাকে বলি দেওয়া হল? সেই পুরুষকেই। তার মানে, যেটা করা হচ্ছে সেটা যজ্ঞ, বলি দেওয়া হল এটাও যজ্ঞ, যাকে বলি দেওয়া হল সেও সেই পুরুষ, বলি দেওয়াটাও যজ্ঞ, যার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হল সেও সেই পুরুষ, তিনিও যজ্ঞ। সবটাই যজ্ঞ। যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞের প্রতি যজ্ঞ করা হল। দেবতারা কিভাবে পুরুষের পূজা করলেন? যজ্ঞের দ্বারা। কিভাবে যজ্ঞ করা হল? পুরুষকে বলি দিয়ে। তিনটেই এখানে যজ্ঞ। যাকে বলি দেওয়া হচ্ছে সে যজ্ঞ, যার প্রতি বলি দেওয়া হচ্ছে তিনিও যজ্ঞ, আর যজ্ঞ প্রণালীটাও যজ্ঞ। ঠিক এই ভাবটাই আমরা পাই প্রতিদিন মঠ মিশনে খাওয়ার আগে দুই বেলা গীতার যে শ্লোকটা আমরা আবৃত্তি করি – *ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্‌। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা।।(৪/২৪)।।* যেটা অর্পণ করা হচ্ছে সেটাও ব্রহ্ম, যেটা দিয়ে অর্পণ করা হচ্ছে সেটাও ব্রহ্ম, যাকে দেওয়া হচ্ছে সেও ব্রহ্ম, পুরো পদ্ধতিটাই ব্রহ্ম, সবই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নেই। এখানেও এই একই কথা বলা হচ্ছে, সেই পুরুষের যে পূজো হল সেটা যজ্ঞের দ্বারাই পূজো দেওয়া হল।

ঈশ্বরের পূজা ঈশ্বরকে দিয়েই করা হল, এই ভাবে ছাড়া আর অন্য কোন ভাবে ঈশ্বরের পূজা করা যায় না। আমি যাকে ভালোবাসি তাকে তার ভালো লাগার জিনিষই তাকে দেব। ঈশ্বরের যজ্ঞ যেটা সেটা একমাত্র ঈশ্বর নিজেই, তাছাড়া আর কোন কিছুতেই তাঁর যজ্ঞ হয় না। সেইজন্য তাঁকে দিয়েই তাঁকে অর্পণ করা হল। *তানি ধর্মাণি প্রথমান্যসন্‌* - এইটাই হচ্ছে সৃষ্ঠির প্রথম ধর্ম। সৃষ্টিতে প্রথম যে ভালো কাজ সেটা এইটা দিয়েই শুরু হল, ভালো কাজ মানেই হচ্ছে ধর্ম। এই জগৎ আসলে হচ্ছে একটা জগৎ রূপী বিকার –

জগদ্রুপানাং বিকারাং ধর্মং। ধর্ম কি? এই জগৎ সব সময় ছিটকে যাচ্ছে, কিন্তু এটাকে যে ধারণ করে আছে সেইটাই হচ্ছে ধর্ম। ধর্ম যদি ধারণ না করে থাকত তাহলে এই জগৎ ছিটকে বেরিয়ে চলে যেত। জগতের সৃষ্টির পর সেই সৃষ্ট জগতকে ধারণ করে আছে, এইটাই ধর্ম, কারণ এইটাই জগতকে ধারণ করে আছে। প্রথম ধর্ম হচ্ছে প্রভুর পূজা। প্রভুর পূজা প্রভুকে দিয়েই হয়। আর পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে মনসা, মনে মনে। যখন আরণ্যকে আসবে তখন ঠিক একই জিনিষ হবে, তখন অশ্বমেধের মত যত যজ্ঞ আছে সব মনে মনে কল্পনা করে সম্পন্ন করা হয়। যারা প্রচুর জপ ধ্যানাদি করতে চান তাদের পক্ষে এই ধরণের একটা ভাবকে অবলম্বন করা খুবই কার্যকরী। শ্রীরামকৃষ্ণই সব কিছু হয়েছেন, যা কিছু দিয়েই প্রভুর অর্চনা করছি সেইটা তিনিই হয়েছেন, তাঁরই জিনিষ দিয়ে তাঁকেই আরাধনা করছি। গঙ্গা জল দিয়েই গঙ্গা পূজা করা হয়।

বলছেন – *তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্তে। যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ*। এখানে এই যে যজ্ঞ হল, এই যজ্ঞের ফল হল স্বর্গপ্রাপ্তি, যারা যজ্ঞ করেছিলেন তার স্বর্গ পেয়ে গেলেন। এইটাই হচ্ছে প্রথম পূজা, আর যারা এইগুলো সম্পন্ন করলেন তারা অন্তিমে উচ্চতম স্বর্গ লাভ করবেন যেখানে আদি দেবতারা সবাই বাস করেন। আমরাও যখন এই ভাবে কল্পনা করব যে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই। স্বর্গের অনেক স্তর রয়েছে, কিন্তু এখানে বলছেন এই দেবতারা উচ্চতম স্বর্গ পেয়ে গেলেন যেখান আদি পুরুষ ও আদি দেবতাদের বাস। যিনিই এই ভাবে যজ্ঞ করবেন, কিভাবে? ঈশ্বরই সব হয়েছেন, ঈশ্বর থেকেই সব কিছু বেরিয়েছে, তাঁর পূজা তাঁকে দিয়েই করতে হয়।

এখানে আমরা দুটো ভাব পেলাম – যিনি ঈশ্বর তিনিই সব কিছু হয়েছেন। যারা ধ্যান করেন, জপ করেন, ভজন করেন, পূজা করেন তাদের জন্য এটি একটি খুব উচ্চতম ভাব, এই ভাবকে অবলম্বন করে তার ধ্যান ও ভজন করতে পারেন, যা কিছু আছে সেটা তিনিই। যখন পূজা করছি, জল, কোশাকুশি, ফুল, চন্দন, ধূপ, বিগ্রহ, আসন, পূজারী সব তিনিই হয়েছেন। এইটাই হচ্ছে পুরুষসূক্তমের দর্শন, সেটাকেই কাব্যিক রূপে বর্ণনা করে আধ্যাত্ম-পিপাসু মানুষের জন্য উপস্থাপনা করা হয়েছে।

।। গায়ত্রীমন্ত্র ।।

(ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ

গায়ত্রীমন্ত্র হচ্ছে বেদের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র। আমরা এর আগে পুরুষসূক্তম্ নিয়ে আলোচনা করেছি। আলোচনার সময় বলা হয়েছিল যে পুরুষসূক্তম্ বেদের একটি অন্যতম প্রধান মন্ত্র, সারা দেশের বহু মানুষ আজও রোজ এই পুরুষসূক্তম্ আবৃত্তি করে চলেছে। আর যারা শিবভক্ত তারা শিবের মন্ত্র – *ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্। উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মাহমৃতাৎ* আবৃত্তি করেন। এটাও বেদ থেকে এসেছে, তাই এটাও বেদমন্ত্র। এই রকম বেদের অনেকগুলো মন্ত্র এখনও বহু মানুষ প্রতিদিন আবৃত্তি করে। কিন্তু সবার থেকে গায়ত্রীমন্ত্রের বেশি পরিচিতি। বিভিন্ন ক্যাসেটের দৌলতে, আর মোবাইলে ফোন করলে এই গায়ত্রীমন্ত্র শোনা যায়, তাই এখন মোটামুটি প্রায় সবাই বিশেষ করে যারা হিন্দু পরম্পরাকে এখন ধরে রেখেছেন তার এই গায়ত্রীমন্ত্র মুখস্ত করে জপ করেন।

গায়ত্রীমন্ত্র খুবই নৈর্ব্যক্তিক মন্ত্র, অর্থাৎ কোন দেবী বা দেবতার দিকে নির্দেশ করা নেই। যেমন স্বামীজী যে আরাত্রিক ভজন, 'খণ্ডন ভববন্ধন' রচনা করেছেন, এই স্তবটি বিশেষ কোন ঠাকুর দেবতার দিকে নির্দেশ করছে না। যদিও আমরা সবাই ঠাকুরের সামনে বসে আরতির সময় ভজন করি, কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে কোথাও ঠাকুরের কোন নামের উল্লেখ করা নেই। খণ্ডন ভব বন্ধন আমরা শ্রীরামচন্দ্রের নামেও গাইতে পারি আবার শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করেও গাইতে পারি, আর পরে যে অবতারই আসুক না কেন তাঁদের উদ্দেশ্যেও গেয়ে দিতে পারব। স্বামীজীর এই আরাত্রিক ভজন একেবারের নির্বিশেষ ভজন। ঠাকুরের আরতির সময় রোজ গান করা হয় বলে এখন এই ভজন ঠাকুরের নামে হয়ে গেছে। ঠিক সেই রকম গায়ত্রীমন্ত্রও হল নির্বিশেষ মন্ত্র। কিন্তু গায়ত্রীমন্ত্রের সঙ্গে দুইজনকে যোগ করে দেওয়া হয়েছে। প্রথম হল সূর্য দেবতা আর দ্বিতীয় হল গায়ত্রীদেবী, যার জন্য এই মন্ত্রের নামই হয়ে গেছে গায়ত্রীদেবী। কিন্তু সূর্য দেবতা বা গায়ত্রীদেবীর সাথে গায়ত্রীমন্ত্রের আদপেই কোন সম্পর্ক নেই। অথচ আমরা গায়ত্রীদেবীর অনেক মুর্তি বা ছবি, দেবী পদ্মের উপরে বসে আছেন দেখতে পাই, এমনকি গায়ত্রীদেবীর অনেক মন্দিরও হয়ে গেছে। যেহেতু সুর্যোদয়ের আগে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে হয় বলে অনেকে গায়ত্রীমন্ত্রকে সূর্য দেবতার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। কিন্তু গায়ত্রীমন্ত্রের অর্থকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব যে এই মন্ত্রের সাথে কোন দেব দেবীর কোন সম্পর্কই নেই।

হরিদ্বারে কৈলাশ আশ্রম আছে, সেখানে যে কেউ গিয়ে সন্ন্যাস নিয়ে নিতে পারে। অবশ্য ওখানে মেয়েদের সন্ন্যাস দেওয়া হয় না। ওখানে নিয়ম আছে কত বছর গায়ত্রীমন্ত্র জপ করলে শিবরাত্রির দিন সন্ন্যাস দেন। তবে কোন সন্ন্যাস আশ্রম থেকে পরিচিতি ও অনুমতি পত্র নিয়ে যেতে হবে। আমাদের বেলুড় মঠ থেকে লিখে দিলেও সন্ন্যাস দিয়ে দেন।

বেলুড় মঠে যখন কেউ প্রবেশ করে তখন প্রথম তিন বছর সাধারণ ভাবে থাকবে। তারপর দুই বছর ট্রেনিং সেন্টারে থাকে। ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ শেষ হয়ে যাওয়ার পর প্রত্যেককে উপনয়ন করিয়ে গায়ত্রীমন্ত্র দেওয়া হয়। সেদিন থেকে তাকে সকাল সন্ধ্যা ইষ্টমন্ত্র জপ করার মত গায়ত্রীমন্ত্রও জপ করতে হয়। সন্ন্যাস হয়ে যাওয়ার পর গায়ত্রীমন্ত্র আর জপ করতে হয় না। সন্ন্যাসীদের জন্য তখন আবার আলাদা একটি গায়ত্রীমন্ত্র দেওয়া হয়, যার নাম হচ্ছে পরমহংস গায়ত্রী। কিছু বিশেষ মন্ত্র আছে যা একমাত্র সন্ন্যসীদেরই দেওয়া হয়, সন্ন্যাসী ছাড়া অন্য কাউকে এই মন্ত্র দেওয়া হয় না। কোন সন্ন্যাসী কোন অবস্থাতেই কাউকে এই মন্ত্র বলবে না। কিন্তু এক সন্ন্যাসী অন্য সন্ন্যাসীকে বলতে পারে। এই মন্ত্র কোথাও লেখাও পাওয়া যাবে না। সন্ন্যাসীদের অন্যান্য যা মন্ত্র আছে তার সবটাই কোনটা এই বেদে কোনটা ঐ বেদে পাওয়া যাবে, কিন্তু এই বিশেষ মন্ত্রটি, যে মন্ত্রটি সন্ন্যাসীকে সন্ন্যাসী বানায়, সেটি কোথাও পাওয়া

যাবে না। কেউ যদি বলে আপনি কিসের সন্ন্যাসী, গেরুয়া পড়ে যত চালবাজী করছেন। না, সন্ন্যাসী এই কারণে যে তিনি ঐ মন্ত্রটা জানেন। যাক, এগুলো আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

বেলুড় মঠে যখন ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করা হয় তখন, যারা ব্রাহ্মণ বংশ থেকে এসেছেন তারা আগে থাকতেই গায়ত্রী মন্ত্র জানেন, তাদের কে নিয়েও আর সবাইকে গায়ত্রীমন্ত্র দেওয়া হয়। স্বামী গম্ভীরানন্দ যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন তিনি একবার এই রকম প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্রহ্মচারীদের গায়ত্রীমন্ত্র দিয়ে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করেছিলেন। সেই সময় একজন ব্রহ্মচারী গায়ত্রীমন্ত্র পাওয়ার পর স্বামী গম্ভীরানন্দজীকে জিজ্ঞেস করছেন 'মহারাজ, এই গায়ত্রীমন্ত্র জপ করার সময় ঠাকুরের ধ্যান করতে পারি'? স্বামী গম্ভীরানন্দজী তখন বলছেন 'হ্যাঁ, অবশ্যই ঠাকুরের ধ্যান করতে পার, যদি এই মন্ত্র থেকে তোমার মনে হয় এর ভাব গুলো ঠাকুরের সঙ্গে মিল খাচ্ছে তাহলে অবশ্যই করবে'। স্বামী গম্ভীরানন্দের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যটি আমাদের অনেকের দৃষ্টি খুলে গিয়েছিল। আমাদের মনের মধ্যে কথাগুলো চিরদিনের মত গেঁথে গিয়েছিল। আমরা ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছে যে গায়ত্রীদেবীকে দেখতে এই রকম, গায়ত্রীমন্ত্র হচ্ছে সূর্যোপসনা আরও কত কি শুনেছি। কিন্তু হঠাৎ গম্ভীর মহারাজ এই রকম কথা বললেন যে ঠাকুরকে যদি তোমার এর ভাবের সঙ্গে মিল দেখতে পাও তাহলে অবশ্যই ধ্যান করবে।

কিন্তু এর পরে আরও যেটা দৃষ্টি খুলে দিয়েছিল তা হল, যারা গম্ভীর মহারাজ থেকে ব্রহ্মচর্য পেয়েছিলেন, তাদের যখন সন্ন্যাস হয় তখন স্বামী ভূতেশানন্দজী ছিলেন মঠের অধ্যক্ষ। সন্ন্যাসের পর সন্ন্যাসীদের কিছু নির্দেশিকা দেওয়া হয়, তার মানে তুমি এখন সন্ন্যাসী হয়েছ এখন তুমি এই এই জিনিষ করবে, এই এই জিনিষ করবে না। সেই সময় একজন নতুন সন্ন্যাসী আনন্দ করে স্বামী ভূতেশানন্দজীকে বলছেন 'মহারাজ আর তো গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে হবে না'? মহারাজের এই কথা শুনে উনি খুব বিরক্ত হয়ে বলছেন 'গায়ত্রী জপ কেন করবে না? গায়ত্রী জপে তোমার কি সিদ্ধিলাভ হয়ে গেছে'? আসল ব্যাপার হচ্ছে, প্রথমে গুরুর কাছে ইষ্টমন্ত্র নিয়েছিল, সেই ইষ্টমন্ত্র জপ করতে হয়, আবার সন্ন্যাসীর বিশেষ মন্ত্র আছে, সেটাও জপ করতে হয়। এখন মাঝখান থেকে স্বামী ভূতেশানন্দজী গায়ত্রীমন্ত্রটাকেও চালিয়ে যেতে বলে দিলেন। এর পর নতুন সন্ন্যাসীরা ভাইস প্রেসিডেন্ট মহারাজের কাছে গিয়ে বলছেন 'মহারাজ, স্বামী ভূতেশানন্দজী তো আমাদের গায়ত্রীমন্ত্রও জপ করতে বলে দিয়েছেন'। উনি কি শুনলেন ঠিক বোঝা গেল না কারণ তিনি বললেন 'উনি বলে দিয়েছেন তো গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে হবে না'। তখন সবাই বললেন 'না, তিনি তো করতে বলেছেন'। ভাইস প্রেসিডেন্ট মহারাজও একটু যেন অবাক হয়ে গেছেন, কারণ সাধারণত জপ করতে বলা হয় না।

আবার বিকেলে দিকে মিটিং এর সময় মহারাজরা গিয়ে স্বামী ভূতেশানন্দজীকে বললেন 'মহারাজ আপনি কি গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে বলেছেন'? স্বামী ভূতেশানন্দজীর একটা বিশেষ হাসি ছিল, যে হাসিতে তিনি সব কিছুকে উড়িয়ে দিতেন। মহারাজের এই কথা শুনে উনি সেই হাসিটাকে মিশিয়ে বললেন 'তোমার কি সিদ্ধি হয়ে গেছে'? মানে, তুমি সন্ন্যাসীই হও আর যাই হও, যেখান থেকেই হোক তুমি একটা মন্ত্র নিয়েছিলে, এখন সেই মন্ত্রে তো তোমার সিদ্ধিই হল না, তাহলে তুমি মন্ত্রটা ছেড়ে দেবে কি করে। অধ্যক্ষ মহারাজের মন্ত্রের ব্যাপারে এই সিদ্ধান্তটি আমাদের অনেকেরই চোখ খুলে দিয়েছিল। কোন মন্ত্র যখন কোন গুরুর কাছে থেকে নেওয়া হয় তখন তার একটাই উদ্দেশ্য, তা হচ্ছে সেই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করা।

প্রত্যকে মন্ত্র একটা ভাবকে বহন করে। বিজ্ঞানের ভাষায় যখন CO_2 লেখা হয়ে গেল, তখন এই CO_2 অনেক কিছুকেই প্রতিনিধিত্ব করছে। এই CO_2 শুধু যে কার্বনডাই অক্সাইডকেই বোঝাচ্ছে তা নয়, এতে বলছে কার্বনের একটা এ্যটম আছে, অক্সিজেনের দুটো এ্যটম আছে, এর অন্য মলিকিউলের ওজন এত, এই ভাবে অনেক কিছু এই ছোট্ট CO_2 মধ্যে দিয়ে বলা হচ্ছে। ঠিক তেমনি যে কোন মন্ত্র, যেমন 'ওঁ নমঃ শিবায়' মন্ত্রে অনেক কিছু বলা হচ্ছে। কিন্তু এই যে CO_2 বলা হল, এটার মধ্যে শুধু কয়েকটা

টেকনিক্যাল তথ্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যখন বলা হচ্ছে ‘ওঁ নমঃ শিবায়’ তখন এর মধ্য দিয়ে শুধু মামুলি কিছু তথ্য দিচ্ছে না, এই মন্ত্রের মধ্যে যে ভাবটা সুপ্ত আছে বাস্তবে সেই ভাবটাকে আমাদের দর্শন করতে হবে। যেমন আমরা যখন CO_2 বলছি তখন আমরা ভালো ভাবেই জানি, কয়লাকে পোড়ালে CO_2 তে রূপান্তর হয়, যেটা আমরা যখন চাইব যখন ইচ্ছে হবে যে কাউকে দেখিয়ে দিতে পারি।

এখন যখন ‘ওঁ নমঃ শিবায়’ বলা হচ্ছে তখন বলা হয় এই মন্ত্র হচ্ছে শিবের প্রতিমুর্তি। একজন এসে বলছে, আপনি কি দেখছেন সাক্ষাৎ শিব বসে আছেন? আমি তো দেখছি না। কিন্তু এই মন্ত্রের ‘ওঁ’ আর ‘শিব’ এই দুটোই এক। কিন্তু এটা আমরা শুনেছি কিন্তু অনুভব কি করেছি? হয়নি। তাহলে এই মন্ত্রটা একটা মামুলি তথ্যই রয়ে গেলে আমাদের কাছে। নবম বা দশম শ্রেণির ছাত্ররা যেমন ফিজিক্স কেমিস্ট্রির ফরমুলা মুখস্ত করে, মন্ত্রও আমাদের কাছে ঠিক সেই রকমের হয়ে গেছে। আমরা তো মন্ত্রকে কোন কাজে লাগাতে পারছি না। কাজে লাগানো তো অনেক দূরের কথা, মন্ত্রের মধ্যে যে সত্যটা রয়েছে, বাস্তবে যা প্রত্যক্ষ করা যায় সেই ব্যাপারে আমাদের কোন ধারণাই নেই।

ভিআইপি দের প্রোটেকশানের জন্য পুলিশদের এক ধরণের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অনেক দিন ধরে এই প্রশিক্ষণ চলে। এখন প্রশিক্ষণের পর পুলিশদের পরীক্ষা নিয়ে দেখে নেওয়া হয় তারা ঠিক ঠিক প্রশিক্ষণ পেয়েছে কিনা। এই রকম একটা পরীক্ষাতে পুলিশদের প্রশ্ন করা হয়েছে ‘প্রধানমন্ত্রীর কনভয় যাচ্ছে সেই সময় একটা আওয়াজ হল, এখন তুমি কি করে বুঝবে যে এটা কিসের আওয়াজ’? মানে যে আওয়াজটা হয়েছে সেটা বন্দুকের গুলির আওয়াজ, না বোমা ফাটার আওয়াজ, না পটকার আওয়াজ, না কোন গাড়ির টায়ার ফেটেছে, না কি কোন বোতল ফাটার আওয়াজ। তখন সঙ্গে একজন দাঁড়িয়ে বলছে ‘স্যার, বইতে তিনটি পয়েন্টের কথা বলা হয়েছে’। সবাই হেসে উঠেছে, বইতে লেখা আছে সেটা জেনে আমার কি হবে। তোমাকে তো বাস্তবে আওয়াজ শুনে বুঝতে হবে এটা কিসের আওয়াজ। যারা খুব দক্ষ পুলিশ অফিসার তারা আওয়াজ শুনেই বলে দেবে কি ধরণের বন্দুকের থেকে গুলি বেরিয়েছে। একজন এই রকম খুব নামকরা পুলিশ অফিসার বলছিলেন কি করে তারা বুঝতে পারেন। সেই অফিসারের এক বিয়ে বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল। তিনি তার বডিগার্ড সহ গেছেন অনুষ্ঠানে। বিয়ে বাড়িতে নানান ধরণের বাজি ফাটছে, সেই বাজির আওয়াজের মধ্যে হঠাৎ একটা ফায়ারিং এর আওয়াজও হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ওনার বডিগার্ডরা ছুটে এসে বলছে ‘স্যার আওয়াজ হো গিয়া’। ‘আওয়াজ হো গিয়া’ মানে ফায়ারিং হয়েছে। ঐ পুলিশ অফিসার বিয়ে বাড়িতে নিমন্ত্রিত ছিলেন তিনি বলে দিলেন যে এখানকার থানার যে ইনচার্জ সে বুঝে নেবে। ওখানকার পুলিশ কিন্তু ব্যাপারটা ছেড়ে দিল না, পরের দিন পুলিশ খোঁজ নিয়ে জানল যে বিয়ে বাড়ির কেউ বরযাত্রিকে স্বাগত জানাতে আকাশে কয়েক রাউণ্ড ফায়ারিং করেছিলে। সেই পুলিশ অফিসার বলছিলেন তারা কি করে বুঝতে পারেন – বন্দুকের ফায়ারিং হলেই দুম্ করে প্রথমে আওয়াজ হলেও শেষে একটা মেটালিক টিং শব্দ হয়, এই মেটালিক টিং শব্দটাকে দিয়ে এনারা বুঝে নেন এটা রিভলবারের থেকে ছেড়েছে, না পিস্তল থেকে ছেড়েছে, না রাইফেল বা বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে।

এখন ঐ পুলিশ কনস্টেবল যে বলছে কিতাব মে লিখা হ্যায়, এই রকম জেনে কি হবে। দীক্ষা নিয়ে মন্ত্রের ব্যাপারেও আমাদের এই একই অবস্থা। মন্ত্রের অন্তর্নিহিত সত্যকে যতক্ষণ না উপলব্ধি না হচ্ছে ততক্ষণ তার কোন মূল্য নেই। এখন গায়ত্রীমন্ত্রের আমরা দুটো দিক পেলাম, একটা স্বামী গম্ভীরানন্দজী যেটা বলেছেন আর দ্বিতীয় স্বামী ভূতেশানন্দজী যেটা বললেন। স্বামী ভূতেশানন্দজী বলছেন ‘তোমার কি সিদ্ধি হয়ে গেছে যে তুমি মন্ত্র ছেড়ে দেবে’? আর স্বামী গম্ভীরানন্দজী বলছেন ‘তুমি যদি মনে করে শ্রীরামকৃষ্ণের এই জিনিষগুলো রয়েছে তাহলে তুমি যখন গায়ত্রীমন্ত্র জপ করবে তখন তুমি ঠাকুরের ধ্যান করতে পার’।

গায়ত্রীমন্ত্রের প্রধান যেটা বৈশিষ্ট্য তা হচ্ছে গায়ত্রীমন্ত্র সম্পূর্ণ একটি নিরপেক্ষ, নির্বিশেষ মন্ত্র, অর্থাৎ কোন দেবী দেবতার সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, আর অত্যন্ত শক্তিশালী মন্ত্র। মুসলমানদের যে প্রণাম মন্ত্র, লাইল্লা ইল্লাললাহা, এটাও খুব নির্বিশেষ মন্ত্র। মুসলমানদের এই মন্ত্রের মত গায়ত্রী মন্ত্রেও আধ্যাত্মিকতার যা যা গুণ আছে সব একত্রিত করা আছে।

গায়ত্রী মন্ত্রটি হচ্ছে – ***ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ***। গায়ত্রীমন্ত্রের প্রথমে ওঁ দিয়ে শুরু আবার শেষে ওঁ দিয়ে বলে মন্ত্রকে বন্ধ করতে হয়। ওঁ দিয়ে শুর করে ওঁ দিয়ে শেষ করে আবার ওঁ দিয়ে শুরু করতে হয়। যেমন ওঁ নমঃ শিবায় মন্ত্রে প্রথমে একবার ওঁ বলে শুর করতে হয়, শেষে আর ওঁ লাগায় না, কিন্তু গায়ত্রীমন্ত্রে দুটো ওঁ দিতে হয়। গায়ত্রীমন্ত্রের শেষ অংশটা '*ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ*' এইটাই হচ্ছে প্রার্থনা, এখানে '*নঃ*' মানে হচ্ছে আমাদের। প্রচোদয়াৎ মানে হচ্ছে নিয়ে যাওয়া। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতীকের তলাতে যেমন লেখা আছে 'তন্নো হংসঃ প্রচোদয়াৎ' – ঐ যিনি পরমহংস আছেন আমাদের যেন তিনি নিয়ে যান। গায়ত্রী মন্ত্রের এখানে কিরকম অন্য রকম মনে হবে – বলছেন ধিয়ো মানে ধি, বুদ্ধি, তিনি যেন আমাদের বুদ্ধিকে আলোকিত করেন। প্রচোদয়াৎ কথার প্রকৃত অর্থ আধ্যাত্মিক জগতে খুব জটিল। বর্তমান যগের নিরিখে এই প্রচোদয়াৎকে আমরা আলোকিত করার অর্থে নিতে পারি – মানে আমাদের বুদ্ধিকে আলোকিত করে দাও। যারা ভক্ত তারা বলবেন – প্রভু আমাদের মনটাকে তোমার দিকে নিয়ে যাও। গায়ত্রীমন্ত্রের এই শেষা লাইনটাতে জ্ঞান আর ভক্তির দুটোরই অর্থ করা যায়। প্রচোদয়াৎ দুটো অর্থেই লাগান যেতে পারে – একটা হচ্ছে আমাদের বুদ্ধিকে আলোকিত করে দাও, আমাদের বুদ্ধির শক্তি যেটা সেটা যেন বৃদ্ধি পায়, আরেকটা অর্থ করা যেতে পারে আমাদের বুদ্ধিকে যেন তিনি তাঁর দিকে টেনে নিয়ে যান।

মূল প্রার্থনা হচ্ছে – May we become divine. এখন আমাদের বুদ্ধিটা হচ্ছে জড়। খুব সাধারণ জিনিষকেই আমরা ধরতে পারিনা। মনের খুব সাধারণ ছোট ছোট আবেগ থেকেও বেরোতে পারিনা। বুদ্ধি মানে আমরা বুঝি একটা জিনিষ ঠিক, আরেকটা জিনিশ যে ভুল এটাকে জানা, আসলে বুদ্ধি মানে তা নয়। বুদ্ধি মানে হচ্ছে যেট ঠিক সেটাকে ধরে রাখা। ঠিক জিনিষটাকে শুধু জানলেই হবে না, সেই ঠিকটাকে ধরে রাখাই হচ্ছে বুদ্ধির ঠিক ঠিক অর্থ। আমাদের সমস্যা কি হয়, আমরা অনেক ভালো কথা, ঠিক কথা এখান ওখান থেকে শুনে থাকি, কিন্তু যেগুলো শুনলাম সেগুলো আমরা করতে পারিনা। করতে পারিনা কারণ আমাদের বুদ্ধি নেই। ঠিক জিনিষটাকে যাতে ধরে রাখতে পারি, সেই বুদ্ধিটা যাতে হয় সেইজন্য এই গায়ত্রীমন্ত্র জপ করা। এখন যদি একটা ক্লাশ ফাইভের বাচ্চা ছেলেকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় দুইয়ে দুইয়ে যোগ করলে কত হবে? সে যদি বলে চার হবে। তাহলে বুঝতে হবে ছেলেটির বুদ্ধি আলোকিত হয়েছে, illumined mind, এখন যদি বলে দুই যোগ দুই পাঁচ, তাহলে বুঝতে হবে তার বুদ্ধিতে গোলমাল আছে। এখানে যে বুদ্ধির কথা বলা হচ্ছে – এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হবে যা দিয়ে জাগতিক বিষয়কেও বোঝার ক্ষমতা আর emotional life এ ঠিক জিনিষকে ধরে রাখা, তৃতীয় যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে যেটা আধ্যাত্মিক নয় সেটাকে বাদ দিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা। গায়ত্রীমন্ত্রের প্রার্থনাটা এই তিনটেকে একসাথে নিয়ে করা হয় – আমাদের বুদ্ধিকে তিনি প্রকাশিত করুন বা আমাদের বুদ্ধিকে তার দিকে নিয়ে যান। এইজন্য বেশির ভাগ জায়গায় যখনই গায়ত্রীমন্ত্রের অনুবাদ দেখা যায় তখন এই দুই ভাবেই দেখা যায়। যিনি বলছেন তিনি তাঁর শিষ্যদের মত করে বলেন বলে গায়ত্রীমন্ত্রের অর্থের পার্থক্য হয়ে যায়। তাতে দোষের কিছু হয় না।

যারা ক্লাশ পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র তাদের জন্য গায়ত্রীমন্ত্র খুব প্রয়োজন, যারা গৃহস্থ তাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, আর স্বামী ভূতেশানন্দজী সন্ন্যাসীকে বলে দিলেন – তুমিও গায়ত্রীমন্ত্র জপ কর। কেন বললেন? কারণ ব্রহ্ম আর মায়ার কথা আমরা সবাই শুনি, ব্রহ্ম যে কি বস্তু, মায়া যে কি বস্তু আমরা জানিনা, কিন্তু ব্রহ্ম আর মায়াকে তফাৎ করতে আমাদের শিখতে হবে। কিন্তু বুদ্ধি যদি জড় হয়, মন যদি

অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে তাহলে এই ব্রহ্ম আর মায়া এই দুটোকে পৃথক করা আমাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তারজন্য দরকার মনের শক্তির। মনের শক্তির বিকাশ হয় একমাত্র এই গায়ত্রীমন্ত্র জপের মধ্য দিয়ে সম্ভব।

এখন এই মন্ত্র দ্বারা আমরা কার কাছে প্রার্থনা করছি? প্রার্থনা যখন করা হচ্ছে তখন দুটো জিনিষকে নেওয়া হচ্ছে। যে দেবতার উদ্দেশ্যে এই প্রার্থনা করা হচ্ছে সেই দেবতার দুই ধরণের গুণকে নেওয়া হচ্ছে – একটা হচ্ছে জাগতিক গুণাবলী আর আরেকটি হচ্ছে তাঁর আধ্যাত্মিকতার গুণগত দিক। প্রথমে বলা হচ্ছে ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তারপরে বলছেন তৎ, মানে ঐ দেবতাকে এই প্রার্থনা করছি। আমরা যখন এর বাংলা বা ইংরাজীতে অনুবাদ করতে যাব তখন এর যে শব্দের বিন্যাসটা রয়েছে সেটা পুরোপুরি পাল্টে যাবে। এখন ওঁ শব্দের অর্থ আমরা জানি, তারপরে আসছে ভূর্ভুবঃ, ভূর্ভুবঃ এর সন্ধি বিচ্ছেদ করলে হয় ভূঃ ভুবঃ ও পরে স্বঃ আসছে। ভূঃ হচ্ছে এই পৃথিবী লোক, অর্থাৎ এই দৃশ্য জগৎ। স্বঃ এর অর্থ হচ্ছে স্বর্গলোক। নীচে ভূঃ লোক ওপরে স্বঃ স্বর্গলোক আর মাঝখানে হচ্ছে অন্তরীক্ষ লোক, যাকে বলা হয় ভুবঃ। এখন এই ভূঃ ভুবঃ আর স্বঃ এই তিনটেকে অন্য ভাবেও অর্থ করা যায় – ভূঃ হচ্ছে দৃশ্যলোক, ভুবঃ হচ্ছে মনোজগৎ এবং স্বঃ হচ্ছে আধ্যাত্মিক জগৎ। আমরা এখানে সোজাসাপ্টা যা অর্থ হচ্ছে সেটাকে ধরেই এগোব। ভূঃ, ভুবঃ আর স্বঃ এর অর্থ করছি ভূঃ পৃথিবীলোক যেখানে জীব বাস করে, স্বঃ স্বর্গলোক, যেখানে দেবতারা বাস করেন। আর মাঝখানে ভুবঃ অন্তরীক্ষলোক। এই ভুবঃ বা দ্যুলোককে শঙ্করাচার্য খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন, তিনি বলছেন যেখানে পাখিরা চলাচল করে সেটাই হচ্ছে ভুবঃ। এই তিনটি লোককে যিনি সৃষ্টি করেছেন বা এই তিনটে লোকের যিনি অধিপতি তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে। এখন এই তিনটে লোকের অধিপতি কে? এই তিনটে লোকের যিনি স্রষ্টা, তিনটে লোকের যিনি কর্তা, তিনটি লোকের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তিনি কে? যে কেউ হতে পারেন। এটা নির্ভর করছে আমি যাকে মনে করি তিনিই অধিপতি হবেন। প্রথমের দিকে আমরা যেটা বলেছি, পুরোপুরি নিরপেক্ষ ও নির্বিশেষ, যে কেউ এর অধিপতি, দেবতা, কর্তা, স্রষ্টা হতে পারেন। হিন্দুরা স্বভাবে হচ্ছেন সূর্যোপসাক। সেইজন্য প্রাচীন কাল থেকে গায়ত্রীমন্ত্রের সাথে সূর্য দেবতাকে যুক্ত করে দিয়েছিলেন। তদুপোরি এইখানে যে প্রচোদয়াৎ শব্দটা বলা হয়েছে তাতে অর্থ করা হয়েছে আমাদের বুদ্ধিকে আলোকিত করা হোক। আলো বললে আমরা সূর্যকে মনে করি আর আলোর সাথে সূর্যের একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে আমরা সবাই ধরে নিই। সেইজন্য গায়ত্রীমন্ত্রে তারা সূর্যের উপাসনা করতেন। কিন্তু সূর্যের সঙ্গে গায়ত্রীমন্ত্রের কোন সম্পর্ক নেই। এখন যিনি গায়ত্রীমন্ত্র দিচ্ছেন তিনি যার উপর ধ্যান করতে বলবেন আমাদের সেই দেবতার উপরই ধ্যান করা উচিৎ। আর তা নাহলে গুরুকে জিজ্ঞেস করে নিতে হয় আমি অমুক জিনিষকে ধ্যান করতে পারি কিনা।

যার উপরেই আমি গায়ত্রীমন্ত্র জপের সময় ধ্যান করিনা কেন আমাকে মনে করত হবে তিনি এই তিনটে লোকের স্রষ্টা আর এর কর্তা বা অধীশ্বর। তৎ শব্দটাও বেদ ও উপনিষদের উভয়েরই খুব প্রচলিত শব্দ। উপনিষদেই আমরা পাই বিখ্যাত মন্ত্র *তত্ত্বমসি* – তৎ ত্বম অসি, মানে সেটা তুমিই। তৎ মানে সেটা। আঙ্গুল দিয়ে নির্দেশ করে দেখিয়ে দিচ্ছে। সেটা কোনটাকে বলছে? তৎ হচ্ছে ভগবানেরই একটি নাম। গীতাতে আছে ওঁ তৎসৎ ইতি নির্দেশো, তৎ হচ্ছে ভগবানের দিকে ইশারা করে নির্দেশ করা। আবার তৎ হচ্ছে সেটা। আমরা ভগবান বলতে নারায়ণ বুঝি, বিষ্ণুকে বুঝি, কিন্তু এখানে তৎ বলতে ভগবানকে বোঝাচ্ছে। এখন তৎ বলতে ভগবানকে কেন বোঝাচ্ছে? আসলে ভগবানের কোন বিশেষণ নেই, আমরা আমাদের নিজেদের সুবিধার্থে তাঁকে কিছু বিশেষণ দিয়ে দিচ্ছি। উপনিষদে বলছে নেত নেতি, সেখানে বলা হচ্ছে ভগবানকে জানা হয় নেতি নেতি করে, ভগবান এটা নয়, এটা নয়। অথচ ভগবানকে বলা হচ্ছে সচ্চিদানন্দ। এখন সচ্চিদানন্দ বলতে বোঝাচ্ছে সৎ, চিৎ ও আনন্দ। সৎ মানে যিনি আছেন, কিন্তু আমি কি বুঝতে পারছি না আমি আছি? চিৎ মানে যার চেতনা আছে, বুদ্ধি আছে, তা আমি কি বুঝতে পারছি না যে আমার বুদ্ধি নেই? আর আনন্দ! একবার বিরিয়ানি খেতে পারলে আনন্দের কি শেষ আছে। তাহলে নেতি

নেতি কিভাবে হবে। অর্থাৎ ঈশ্বর যে সৎ, তিনি যে চিৎ আবার তিনি যে আনন্দ স্বরূপ এই তিনটেরই আমাদের ধারাণা আছে। আমি একটা জিনিষকে দেখে তার ব্যাখ্যা করছি, আমি একজনকে দেখে আনন্দ পাচ্ছি, সৎ, চিৎ ও আনন্দের ধারণা আমাদের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু বলছে ঈশ্বরকে নেতি নেতি করে জানা যায়। ঈশ্বরকে যে সৎ চিৎ আর আনন্দ বলা হচ্ছে এটা ঠিক আবার তাকে কোন নাম দিয়ে উপাধি দিয়ে জানা যায় না, নেতি নেতি করে জানা হয়, এইটাও ঠিক। কিন্তু এই দুটোকে মেলান যাবে কিভাবে? যুক্তিতে কোথাও এই দুটোর সাথে মিল থাকতে হবে। নেতি নেতি বলতে বোঝায় যা কিছু জগতে দেখছি তার সাথে ভগবানের কোন মিল নেই আবার এই জগতের সব কিছুর ব্যাপারে আমাদের যত রকমের ধারণা আছে তার সাথেও ভগবানের কোন মিল নেই। আসলে বলতে চাইছে ব্রহ্মই হচ্ছে সৎ আর বাকি সব অসৎ, আমি যে নিজেকে আছি বলে মনে করছি আসলে এর কোন অস্তিত্বই নেই, আসল সৎ তিনিই। ঠাকুর বলছেন ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, তার মনে ঈশ্বরই সৎ বাকি সব অসৎ। আমি যেটাকে সৎ বলে জানছি, আমি যেটাকে সৎ বলতে বুঝি সেটা সৎ নয়, আমার মনের মধ্যে যে সৎ ধারণাটা রয়েছে সেই সৎ একমাত্র তিনি। আমিই অসৎ, সেই জন্য নেতি নেতি করে ঈশ্বরকে জানতে হয়। আমাদের কাছে থাকা মানে হচ্ছে শরীর মন, শরীর মন না থাকলে আমরা বলি নেই, তিনি শরীর মন নন, তিনি আলাদা। সেইজন্য মনে তিনি নেই, কিন্তু তিনিই আছেন। ঠিক তেমনি আমাদের কাছে চিৎ মানে হচ্ছে বুদ্ধি, আমাদের কারুর ডাক্তারি বুদ্ধি আছে, কারুর ম্যানেজমেন্ট বুদ্ধি আছে, কারুর কারিগরি বুদ্ধি আছে। কিন্তু এগুলো যে বুদ্ধিতে হচ্ছে সেই বুদ্ধিটা আসলে জড় আর ব্রহ্মের যে চিৎ সেটাই হচ্ছে প্রকৃত চেতনা। কারণ প্রকৃতি এলাকায় যা কিছু আছে সব জড়। আমাদের কাছে যেগুলো মন, বুদ্ধি এগুলো সব প্রকৃতির এলাকার বস্তু তাই এরা সবাই জড়। ব্রহ্মের যে বুদ্ধি সেটাই হচ্ছে চৈতন্য। এই যে টিউব লাইটের আলো এই আলোটা জড়ের আলো। কিন্তু যখন ব্রহ্মের জ্যোতির কথা বলা হয় তখন সেটাই হচ্ছে চৈতন্যের আলো। ঠাকুর মা ভবতারিণীকে ‘মা তুই দেখা দিবিনি’ বলেই তিনি গলায় খড়্গ চালাতে গেছেন। সেই মহুর্তে মা যেন তাঁর হাতকে ধরে ফেলেছেন, আর ঠাকুর দেখছেন চৈতন্যের জ্যোতি তাঁকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে, তিনি যেন এ জ্যোতির সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছেন। চৈতন্যের জ্যোতিটা যে কি, এটাকে আমরা কোনদিন বুঝতে পারব না, যে অনুভব করেছেন তিনিই একমাত্র বলতে পারবেন। আর এটা কাউকে বলে বোঝান যায় না।

প্রথমে আমার যা কিছু আছে, আমার শরীর, আমার মন, আমার বুদ্ধি, এগুলো সব জড়, কিন্তু এর ওপরে আমার একটা সত্তা আছে সেটাই হচ্ছে চৈতন্য। তৎ যখন বলা হচ্ছে তখন এই জিনিষটাকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। জগতের যা কিছু আছে তার ব্যাপারে আমার যে ধারণা আছে তার সাথে এর কখনই মিল খাবে না। মিল খাবে না বলে দূর থেকে আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত করে দেওয়া হচ্ছে। আঙ্গুল যখন দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে তখন এইটাই হয়ে যাচ্ছে নেতি নেতি, মানে এইখানে যা কিছু আছে এগুলোর সাথের এর কোন মিল নেই, তথাপি তিনি আছেন। শিশু মায়ের কোলে উঠে বলছে ‘মা আমি চাঁদ দেখব’। মা তখন তার আঙ্গুলটাকে চাঁদের দিকে দিয়ে বাচ্চাকে বলছে ‘এই আঙ্গুলের ডগার দিকে তাকিয়ে সোজা আকাশের দিকে তাকাও, তাহলেই দেখতে পাবে চাঁদকে’। বাচ্চা দেখছে আঙ্গুলের নখ, চাঁদের দিকে নজর দিতে পারছে না। ঈশ্বরের সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয় সবই হচ্ছে এই আঙ্গুল দেখানো। যা কিছু বলা হচ্ছে সব হচ্ছে ইশারা করা। আমাদের সমস্যাটা ঐ বাচ্চার মত, ঈশ্বরের সম্বন্ধে যা কিছু বলা হচ্ছে সেগুলো দিয়ে ঈশ্বরের দিকে ইশারা করা হয়, যে জিনিষকে ইশারা করছে সেই জিনিষটাকে কেউ দেখছে না, আমরা ঈশ্বরের দিকে না দেখে সেই জিনিষগুলির দিকেই তাকাই, আঙ্গুলের নখটাকেই দেখছি। ঈশ্বরের সম্বন্ধে যখনই কোন শব্দ বলা হল তখন আমরা শব্দের উৎপত্তি, শব্দের কি বিন্যাস ইত্যাদি জিনিষকে নিয়েই মেতে থাকি। এখানে তৎ বলতে শুধু যে ঈশ্বর তা নয়, এই তৎ অনেক কিছুকে বোঝাচ্ছে। এই তৎ নারায়ণ বা বিষ্ণুর থেকে আরও অনেক কিছুকে বলছে। যখন আমরা নারায়ণ বা বিষ্ণু বলে দিচ্ছি তখন আমরা নির্দিষ্ট একটা কিছুকে বলছি। প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে যিনি বাস করেন, যিনি জলের উপরে শয়ন করেন তিনি নারায়ণ, এখানে তাঁকে সাকার করে দিচ্ছি। কিন্তু যখন তৎ বলছি তখন তিনি নির্গুণ নিরাকার হয়ে গেলেন। নির্গুণ নিরাকার

যখনই করে দেওয়া হল তখনই বুঝে নিতে হবে যে তাঁকে কোন কিছু দিয়ে বোঝান যাবে না। তাহলে কি তৎ কি শুধু নির্গুণ নিরাকারে জন্যই বলা হচ্ছে? কখনই না, এই তৎ শব্দ যেমন নিরাকার নির্গুণকে বোঝাচ্ছে ঠিক একই ভাবে তৎ সগুণ সাকারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। সগুণ সাকারের যে গুণগুলি আরোপিত করা হচ্ছে এই গুণগুলো কোন জাগতিক গুণের কথা বলা হচ্ছে না, জাগতিক গুণগুলির থেকে সগুণ সাকারের গুণ একেবারেই আলাদা।

যদিও গায়ত্রীমন্ত্রে ভগবান বলছে না এখানে তৎ বলেই ছেড়ে দিয়েছে। এখন তৎ বলতে আমরা কাকে নেব? এই তৎ কে আমরা মা কালীকে নিতে পারি, দুর্গাদেবীকে নিতে পারি, শিবকে নিতে পারি, শ্রীরামকৃষ্ণকে নিতে পারি, আবার যদি বলি অহং ব্রহ্মাস্মি আমিই সেই, তখন আত্মাকে নিতে পারি। এইজন্য আমরা গায়ত্রীমন্ত্রকে বলছি নৈর্ব্যক্তিক। এই তৎ কে যদি ঠাকুর মনে করি তখন গায়ত্রীমন্ত্র জপের সময় ঠাকুরের ধ্যান করতে কোন আপত্তি হবে না।

গায়ত্রীমন্ত্রের ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই প্রথম অংশে তৎ এর জাগতিক প্রকাশের শক্তিটাকে বলা হয়ে গেল। ছন্দকে রাখার জন্য তৎ শব্দটাকে পরের লাইনে আনা হয়েছে। তারপরে বলা হচ্ছে সবিতু, সবিতুর অর্থ হচ্ছে যেটা জ্যোতিষ্মান। যেমন সূর্যের আরেকটি নাম হচ্ছে সবিতা, সবিতু হচ্ছে যিনি সূর্যের মত আলোকিত। ভগবান যিনি, তাঁকে সব সময় জ্যোতির্ময়ের সাথে সমীকরণ করা হয়, ঈশ্বরত্বকে কখনই অন্ধকারের সাথে গণ্য করা হয় না। সেইজন্য দেখতে পাই যখন ধ্যান করতে বলা হয় তখন বলে দেওয়া হয় হৃদয়ে যে জ্যোতি আছে তাকে সব সময় উদীয়মান সূর্যের জ্যোতি রূপে কল্পনা করে ধ্যান করবে। কারণ একটাই, ঈশ্বর আর জ্যোতি যেন এক হয়ে আছে, জ্যোতির সাথে ঈশ্বরকে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, সব সময় জ্বলজ্বল করছে। শুধু জ্বলজ্বল করছে না, এই জ্যোতি হচ্ছে সচল সজীব আলো। এই জিনিষটা ধ্যান করে সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত বোঝা যায় না।

এখন আমরা ধ্যান করছি। কার উপর মনকে একাগ্র করছি? তাঁর উপর ধ্যান করছি যিনি এই ত্রিলোকের (ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ) প্রভু, যিনি স্বভাবে দেদিপ্যমান। এটা যে কোন অন্ধকার কালো মুর্তি তা নয়, আমরা যেমন মা কালী বলতে কালো অন্ধকারময় মুর্তির কথা ভাবি। কিন্তু ঠাকুর যখনই মা কালীর কথা বলছেন সব সময় তিনি চিন্ময়ীর কথা বলছেন। কারণ দেদিপ্যমান আর চৈতন্য এই দুটো পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। তারপরে আসছে বরেণ্য। বরেণ্য হচ্ছে, যিনি শ্রেষ্ঠতম, যিনি হচ্ছেন একমাত্র বরণীয়, বরণ করার একমাত্র যোগ্য যিনি। গীতাতে দুটো কথা খুব ব্যবহার করা হয়েছে একটা হচ্ছে মচ্চিত্তঃ আর মৎপরঃ, মচ্চিত্তঃ মানে যার চিত্ত অর্থাৎ মনটা শ্রীকৃষ্ণময় হয়ে আছে। আর তার সাথে যিনি মনে করেন শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছে সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ – এইটাই হচ্ছে মৎপরঃ এর অর্থ। এখানে বলা হচ্ছে বরণ্যং, এখন একটা মানুষের মন টাকা পয়সার দিকে যেতে পারে, মন ভোগের দিকে যেতে পারে, আমি জানি ভগবানই একমাত্র বরণ্য কিন্তু আমার মন এখন ভোগকে বরণ করেছে। স্বামীজী বলছেন – When you make a compromise admit that you are making a compromise, but from that don't lower the ideal. তুমি যদি কোথাও compromise করতে বাধ্য হচ্ছে কর, কিন্তু তোমার আদর্শকে কখনই নীচে নামিয়ে দেবে না। তুমি বল আমি পারছি না, আমি দুর্বল, আমি মেনে নিচ্ছি কিন্তু আদর্শকে কখন ছোট করে দিও না। এইটাকেই গীতা বার বার বলছে মচ্চিত্তঃ ও মৎপরঃ। শঙ্করাচার্য এই মচ্চিত্তঃ আর মৎপরঃ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন – একটা ছেলে যে একটা মেয়েতে যখন অনুরক্ত হয় তখন তার চিত্তে মেয়েটিই সব সময় বিরাজ করে থাকে, কিন্তু সেও জানে যে ভগবান এই মেয়েটিরও ওপরে। ছেলেটি ভালো করেই জানে যে ভগবানই শ্রেষ্ঠ এই মেয়েটি কখনই শ্রেষ্ঠ নয়। এখানে এইটাকেই বলছে – হে ঠাকুর আমি তোমাকে পূজো করছি, আমি তোমাকে ধ্যান করছি, তা আমি পূজা করছি কটি টাকার জন্য? আমার দৃষ্টিভঙ্গীকে পাল্টাবার জন্য চেষ্টা করতে হবে। এই যে টাকা আছে, ধনদৌলত আছে, যত ভোগ্য সামগ্রী আছে, এ সবই তোমার দিকে যাওয়ার জন্য।

যারা সংসার ধর্ম করছে, কিসের জন্য সে সংসার ধর্ম করছে? আমার মনে কিছু একটা দুর্বলতা ছিল, আমি বিয়ে করে সংসার করলাম, আমার সন্তান হল, স্ত্রী-সন্তানের নিরাপত্তার কথা ভাবতে হবে। তার জন্য আমাকে অর্থোপার্জন করতে হচ্ছে। এই সবই হচ্ছে আমার জীবন-জীবিকাকে ঠিকঠাক রেখে সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে জীবনকে চালানোর প্রক্রিয়া। কিছু টাকা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে রাখলে আমার আর খাওয়া পড়ার চিন্তা হবে না। এই প্রক্রিয়াকে ঠিক রেখে আমি এবার ভগবানের দিকে বেশি করে মন দেব। আমার সাধারণ খাওয়া পড়াতেই চলে যাবে, এখন আমি ভগবানে বেশি মন দিতে পারব। আমরা কিন্তু এর ঠিক উল্টোটা করি। আমরা রোজ গিয়ে ভগবানকে ধরি, ধরে তাকে বলি – হে ঠাকুর, দেখো আমার সন্তানরা যেন ঠিক থাকে, আমার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সটা যেন বাড়তে থাকে, শেয়ার মার্কেট যেন ঠিক থাকে। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সংসারের কাঁধে দাঁড়িয়ে ভগবানকে ধরে রাখা, কিন্তু আমরা কি করছি? ভগবানের কাঁধে দাঁড়িয়ে সংসারটাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছি। এই জন্যই আমাদের কষ্টের পর কষ্ট বেড়েই চলে। গায়ত্রীমন্ত্র এই জিনিষটাকেই কেটে দিতে বলছে, গায়ত্রীমন্ত্রে যে বরেণ্যং বলা হচ্ছে তা ভগবানকে বলা হচ্ছে, তাকে বরণ কর, একমাত্র তিনিই হচ্ছেন বরণীয়। কিন্তু আমরা সংসারকেই বরণ্যেম করে রেখেছি। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে দাঁড়িয়ে একজন বলছে – একবার নাতির চাঁদ মুখটা দেখে আসি, নাতির চাঁদ মুখ দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। ঠাকুর বলছেন – চাঁদ মুখ না পোড়ার মুখ। তাহলে কে আমাদের কাছে বরেণ্যম রয়ে যাচ্ছে? সংসার। কেন? ঠাকুরের কাঁধে দাঁড়িয়ে আমরা জগতকে বরেণ্য করতে যাচ্ছি। কিন্তু জগতের ঘাড়ে চেপে ঠাকুরকে ধরতে হবে। জগতের যা কিছু আছে সব কিছুই আমাদের মুক্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটেই হচ্ছে মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়ার জন। সংসারে থাকতে গেলে টাকার দরকার, আমি খেটেখুটে কিছু টাকা পেয়ে সেই প্রয়োজনটা মিটে গিয়ে আমার মনটা পরিষ্কার হয়ে গেল, এইবার আমি ঠাকুরকে ধরব। আমার একটু বাসনা ছিল, বাসনা মিটে গেছে, এখন আমি বাসনা থেকে মুক্ত, যেই এই ভাবটা এসে গেল তখন পুরো মনটা সেই বরেণ্যম যিনি, ঈশ্বরের দিকে ফেলে দিলাম। কিন্তু আমাদের কিছু টাকা হয়ে গেলে আরও টাকা কি করে হবে তার পেছনে ছুটতে থাকি, একটা দুটো বাসনা মিটে গেল আরও দশটা বাসনাকে টেনে পুরো মনটাকে সংসারে জড়িয়ে রাখছি।

বরেণ্যম কে? সেই তৎ। সেই তৎ টা কে? ভূঃ, ভুবঃ স্বঃ এই তিনটে লোক যিনি রচনা করেছেন, একমাত্র তিনিই হচ্ছেন বরেণ্য। এখন তুমি যদি না পার তাহলে বল আমি পারছি না, আমার মন এখনও ভোগে পড়ে রয়েছে, আমার মনে ভোগের ইচ্ছা এত প্রবল আমি পারছি না। ঠিক আছে তোমাকে পারতে হবে না। তুমি এই বরণ্যেমকে মেনে নাও, তার কথা ভাব, আর এই গায়ত্রীমন্ত্র জপ করে যাও। কোন সিনিয়র মহারাজদের কাছে কোন দুঃখ-কষ্টের কথা বলতে এলে ওনারা বলেন – তুমি নিজে মন্দিরে ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে সব জানাও, আর প্রার্থনা করে বল – প্রভু আমি পারছিনা, তুমিই একমাত্র বরণ্যেম তুমি আমাকে শরণাগতি দাও। তোতা পাখির মত, টেপরেকর্ডারের মত বলতেই থাক। এই ভাবে বছরের পর বছর বলতে থাক। দশ বছর, পনের বছর, তিরিশ বছর ধরে যখন সকাল সন্ধ্যা ঠাকুরের সামনে মাথা ঠুকে ঠুকে বলতে থাকবে ঠাকুর আমায় শরণাগতি দাও। তখন হঠাৎ একদিন তোমার মনের একটা দরজা খুলে যাবে আর তুমি নিজের মনেই বলবে যে – এতদিন আমি ঠাকুরের কাছে শরণাগতি চাইছিলাম, এতদিন আমি এই প্রার্থনা করছিলাম, ওঃ এখন বুঝলাম, শরণাগতি হচ্ছে এই। যখন এই বোধটা আমাদের মধ্যে এসে যাবে তখন আমরা বুঝতে পারব যে আমাদের মধ্যে চৈতন্য শক্তি সুপ্ত হয়ে ছিল সেটা চলতে শুরু করেছে। তার মানে আজ হোক কিংবা কাল হোক আমাদের শরণাগতি হবেই হবে, কেউ একে আটকতে পারবে না। যন্ত্রের মত যে প্রার্থনাটা করা হচ্ছিল সেটাও যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে কোন দিনই তার আর হবে না, সে আরও সংসারের আবর্তে জড়িয়ে পড়তে থাকবে।

একজন মহারাজের জীবনের একটা ঘটনা আছে যেটা আমাদের কাছে খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। প্রথম জীবনে তিনি ব্রহ্মচারী হয়ে মঠে জয়েন করেছিলেন। তার কিছু দিন পরেই কোন কারণেই তিনি ঠিক করে

নিলেন যে মঠ ছেড়ে সংসারে ফিরে যাবেন। অনেক আগেই একটি মেয়ের সাথে তার বিয়ের সম্বন্ধ করা হয়েছিল, সেই মেয়েটিকেই বিয়ে করবেন ঠিক করে ফেলেছেন। দুই তিন দিন পরেই বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। আজকেই মঠ ছেড়ে চলে যাবেন। সে নিজের সেন্টার ছেড়ে জয়রামবাটী মঠে চলে এসেছে। জয়রামবাটীতে এসে মায়ের মন্দিরে প্রণাম করে বলছে – মা তোমাকে ছেড়ে চললাম, সংসারে ফিরে যাচ্ছি, বিয়ে করব। অনেক আগেকার ঘটনা। মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে এক সিনিয়র মহারাজকেও প্রণাম করে বলছে – মহারাজ, আমার দ্বারা মঠে থাকা হল না, আমি আজকেই মঠ ছেড়ে চলে যাচ্ছি, দুই দিন পরে আমার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। তখন সেই মহারাজ তাকে বলছেন – বিয়ে করতে যাচ্ছ, ঠিক আছে যাও। যেখানেই থাক মায়ের সঙ্গে যে সম্পর্ক সেটা চিরদিনের সম্পর্ক এই কথাটা মনে রেখো, আর বিয়ে থা করেতো আর কখন সুযোগ হবে কি হবে না তাই যাওয়ার আগে তুমি আমার কথা মত মায়ের মন্দিরে মায়ের সামনে পনের মিনিট একটু গিয়ে চুপচাপ বস।

মন্দিরে গিয়ে পনেরো মিনিট বসে রইল। পনেরো মিনিট পরে উঠে এসে জয়রামবাটি মন্দিরের অধ্যক্ষকে গিয়ে বলছে – মহারাজ, আমি বিয়ে করব না। মঠ ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। আমার জীবনে একটা বিরাট ভুল হয়ে যাচ্ছিল। এই ঘটনাটা তিরিশ বছর আগেকার, তিনি এখনও সন্ন্যাসী হয়ে বেলুড় মঠে আছেন। তিনি কি এর আগে মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করেননি? করেছেন নিজের মত গেছেন যান্ত্রিক ভাবে প্রার্থনা করে বেরিয়ে এসেছেন। কিন্তু সেদিন এক সিনিয়র মহারাজের কথায় মন্দিরে গেছেন, এতদিন যেটা মেকানিক্যাল প্রার্থনা ছিল সেটা খট্ করে খুলে গিয়ে চৈতন্য হয়ে গেল। ঠিক সেই রকম গায়ত্রীমন্ত্র মেকানিক্যাল ভাবে জপ করে যাচ্ছি, সেখানে বরেণ্যম্ বলছি, কিন্তু আমার কাছে ঈশ্বর ছাড়া সব কিছুই বরন্যেম্, আমার ছেলে বরেণ্যম, আমার মেয়ে বরেণ্যম, আমার টাকা বরেণ্যম্, আমার গাড়ি-বাড়ি, মান-সম্মান সব বরণ্যম। ভগবানকে তো আমি চাকর বানিয়ে রেখেছি। চাকরকে যেমন বলি – এই তুই দাঁড়া আমি তোর ঘাড়ে উঠে আমড়া পাড়ব, আমরাও ভগবানের কাঁধে পা দিয়ে আমড়া পাড়ছি, আমড়া হচ্ছে আমার সন্তান, আমার স্ত্রী, আমার স্বামী, আমার টাকা-পয়সা, মান-সম্মান যাবতীয় জিনিষ।

ভর্গো মানে হচ্ছে আলো, সবিতুর অর্থও হচ্ছে আলো। কিন্তু সবিতুর আলোটাকে বোঝায় দেদিপ্যমান, জ্বলজ্বল করছে সব সময়। ভর্গোর যে আলো সেটা বোঝাচ্ছে অন্ধকারকে দূরীভূত করাকে। ভর্গো আর সবিতুর মধ্যে অনেক মিল আছে। গায়ত্রীমন্ত্রের প্রার্থনটা হচ্ছে ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ, আমার বুদ্ধিকে আলোকিত কর। তিনি হচ্ছে জ্যোতির্ময়, জ্যোতিষ্মান, আবার তিনি অন্ধকারকে সরিয়ে দেন। তিনি হচ্ছেন সবিতু আর তিনি হচ্ছেন ভর্গো, তিনি সেই আলোর প্রভু যে আলো অন্ধকারকে দূর করে দেন। তারপরে বলছেন দেবস্য, দেবস্য মানে হচ্ছে দেবতা, তিনি হচ্ছেন সমস্ত দেবতাদের দেবতা, শ্রেষ্ঠ প্রভু। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন লোকের প্রভু যিনি তিনিই দেবস্য, সব কটি বিশেষণ পরস্পরের সাথে এক হয়ে আছে। তৎ, যিনি ভগবান তাঁর ওপরে এই এই বিশেষণ গুলো আরোপিত করা হয়েছে। প্রথম বিশেষণ হচ্ছে তিনি এই ত্রিলোকের রচয়িতা, প্রভু। দ্বিতীয় বিশেষণ হচ্ছে মনোজগতের ব্যাপার, তিনি বরেণ্যম্। তার পরে পরে বিশেষণ গুলো হচ্ছে তিনি সবিতু, তিনি ভর্গঃ এবং তিনি দেবস্য। ধীমহি হচ্ছে – আমরা তাঁকে ধ্যান করি। এখানে অহং ধীমহি বলতে পারি, মানে আমি ধ্যান করছি। ধীমহিতে যেটা ধ্যানের কথা বলা হচ্ছে এটা প্রার্থনার জন্য বোঝাচ্ছে। আমরা যখন কারুর প্রশংসা করি তখন বলি আমি তোমারই চিন্তা করছিলাম। মানে আমার মন তোমার উপরেই একাগ্র করছি, অথবা আমার মনটা তোমার উপরেই পুরোপুরি পড়ে রয়েছে। বরেণ্যম্ হচ্ছে মৎপরঃ এই ভাবকে নিয়ে আসছে আর ধীমহি মৎচিত্ত এই ভাবকে প্রকাশ করছে। আপনি যে শুধু বরেণ্যম্ তাই নয়, বরেণ্যম্ বলেই ছেড়ে দিচ্ছি না, আপনাকে আমি আমার মনে ধরে রেখেছি। গীতাতে এই সুন্দর ভাবটাকে বলা হচ্ছে মৎপরঃ আর মৎচিত্তঃ তে, তুমিই শ্রেষ্ঠ আবার তোমাতেই আমার মন, এই দুটোই এসে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন – তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা। জীবনের ধ্রুবতারাটা হচ্ছে বরেণ্যম্ আর তোমারেই করিয়াছি যেটা সেটাই হচ্ছে ধীমহি। বিল গেটস্ পৃথিবীর

সব থেকে ধনী লোক, তাতে আমার কি, ভগবান হচ্ছেন ত্রিলোকের স্রষ্টা, তাতে আমার কি। আমার কাছে তিনি এই যে আমি তাঁরই ধ্যান করছি, ধ্যান করা মানে আমার মনটা তাঁর চিন্তা দিয়েই ভরিয়ে দিচ্ছি, যিনি এই সব কিছুর রচয়িতা, যিনি আলোকময়, সবিতু, যিনি ভর্গো অর্থাৎ যিনি অজ্ঞান অন্ধকারকে সরিয়ে দিয়ে আমাদের অন্তরকে আলোকিত করে দেন, মানে যিনি এই জগতকে আলো দিচ্ছেন আবার মনেও আলো দিয়ে আমাদের অন্তর জগতকে উদ্ভাসিত করে দেন, আর যিনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ, বরেণ্যম। বিল গেটস্ সবথেকে ধনী হতে পারেন কিন্তু আমি বিল গেটসের ধ্যান করতে যাচ্ছ না।

আমরা কেন তাঁর ধ্যান করছি? আমার যে ধী, মানে আমার যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিকে তিনি যেন প্রচোদয়াৎ, আমার বুদ্ধিকে তিনি যেন তাঁর দিকে এগিয়ে দেন। তাঁর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া মানে, আলোকিত কর, প্রকাশিত কর। সূর্যের যত কাছে যাব ততই সূর্যের আলো বেশি বেশি করে প্রকাশ হতে থাকবে। কিন্তু এখানে যে আলোর কথা বলা হচ্ছে সেটা সূর্যের আলো নয়, সবিতু আর ভর্গো তে জ্যোতির কথা বলা হচ্ছে সেই জ্যোতির আলোতে আমাকে প্রকাশিত, আলোকিত করার অর্থ হচ্ছে, যে কোন ভুল জিনিষ আছে, বিশেষ করে আমাদের জাগতিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে জানার ক্ষেত্রে ভুলটাকে ধরে ফেলব, মনের জগতে আমি আর আজেবাজে জিনিষে নিজেকে আবদ্ধ করব না, আর আধ্যাত্মিক জগতে ঠিক ঠিক অধ্যাত্ম পুরুষে রূপান্তরিত হয়ে যাব।

।। দেবীসূক্তম্ ।।

বেদে দেবতাদের সম্বন্ধে যত বর্ণনা আছে সেই তুলনায় দেবীদের সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু নেই। দেবীসূক্তম হচ্ছে বেদে দেবীর ব্যাপারে একটি অত্যন্ত দুর্লভ সূক্তম্। দেবীসূক্তমের মত মেধাসূক্তম্ও দেবীকে নিয়ে। যেটুকুই বলা হয়েছে দেবীর ব্যাপারে, ততটুকুতেই আমরা পুরো একটা দর্শনকে পেয়ে যাই। তন্ত্র দর্শন ছাড়া হিন্দু দর্শনে দেবীর ব্যাপারে আমরা খুব বেশি কিছু পাইনা। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে যে লক্ষ্মীর কথা পাই, হিন্দু দর্শনে তাঁকেও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে খুব বড় একটা ভূমিকাতে আমরা পাইনা। বেদান্তে যেখানে মায়াকে নিয়ে বলছে সেখানেও দেবীশক্তিকে খুব বেশি একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। একমাত্র শক্তি সাধনাতেই পুরোপুরি দেবীকে নিয়েই সব কিছু, এ ছাড়া আর কোথাও দেবীশক্তির বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু বেদে দেবীসূক্তম্ আর মেধাসূক্তমের মধ্যেই দেবীর শক্তি ও তাঁর কার্যাবলীর এবং দর্শনের ব্যাপারে অনেক কিছুই পাওয়া যায়। পরের দিকে যে তন্ত্রশাস্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে তার বেশির ভাগই এই দেবীসূক্তমকে আধার করেই হয়েছে। চণ্ডীতে একেবারে শেষের দিকে রাজা সূরথ ও বৈশ্য যখন দেবীর সম্বন্ধে সব কিছু জেনে নিয়ে সাধনা শুরু করলেন তখন এই দেবীসূক্তম্কে অবলম্বন করে এবং দেবীসূক্তম্ পাঠ করেই তাঁরা সাধনা করেন। তাই আমরা এখন একটি বেদের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিককে নিয়ে আলোচনা করছি।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে বেদের প্রত্যেকটি সূক্তম্ আর প্রত্যেকটি মন্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বেদে এটা কম গুরুত্ব এটার বেশি গুরুত্ব, এই রকম কিছু নেই। যেমন অনেকে চণ্ডীতে এই অংশটাতে স্তব আছে, এখানে স্তুতি আছে, এইখানে যুদ্ধের বর্ণনা আছে, এইভাবে ভাগ করে বেশি গুরুত্ব আর কম গুরুত্ব এই ভাবে শ্রেণী বিভাগ করেন। বেদে কিন্তু এই ভাবে কোন শ্রেণী বিন্যাস করা হয় না, বেদের সব কয়টি মন্ত্রকেই সমান গুরত্ব দিতে হবে। তবে ব্যাক্তি বিশেষে পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার এসে যায়। কেউ এই অংশটাকে বেশি পাঠ করেন, কেউ অন্য একটা অংশতে বেশি জোর দেন।

বেদে মূল যে দেবীদের কথা পাই তাঁরা হচ্ছেন পৃথ্বী, রাত্রি, শ্রী। এনারাই হচ্ছেন বেদের আসল দেবী। দেবীসূক্তমে আমরা যেটা পাচ্ছি ঠিক কতকটা এই রকমই একটা ঘটনা পাই কেনোপনিষদে, যেখানে উমা হৈমবতীর কথা বলা হয়েছে। পরে পুরানে এসে এই উমা হৈমবতীই পার্বতীর জীবনের সাথে যেন যুক্ত করে দেওয়া হল। সাহিত্য সৃষ্টিতে সাহিত্যকাররা আগের কিছু ঘটনাকে নিয়ে বর্তমানের সাথে যোগ করে দেন। দেবীসূক্তমের দেবী হচ্ছে বাক্ দেবী। দেবীসূক্তমের একটা দিক হচ্ছে এই মন্ত্রগুলো বাক্ দেবীকে উৎসর্গ করা হয়েছে, আরেকটি দিক হচ্ছে এই বাক্ দেবীই পরে সরস্বতি রূপে পূজিত হয়েছেন।

দেবীসূক্তমের প্রথম মন্ত্র হচ্ছে – ***অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ। অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা।।১।।*** বাক্ দেবী বলছেন আমি রুদ্র, বসু এদের সঙ্গে চলে বেড়াই। এখানে যে রুদ্রের কথা বলা হচ্ছে, রুদ্রের এক নাম হচ্ছে শিব, কিন্তু এইখানে রুদ্র মানে শিব নন, এক শ্রেণীর দেবতাদের রুদ্র বলা হয়, তাদের কথাই বলা হচ্ছে। আট জন বসু ছিলেন। শুধু রুদ্র আর অস্টবসুদের সঙ্গেই চলি না, দ্বাদশ আদিত্য, বিশ্বদেব এদের সাথেও চলি। আমি এদের সাথে না থাকলে এরা সবাই নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। বিদ্যুতের খেলনা গুলো বিদ্যুতের শক্তিতে নড়াচড়া করে, প্লাগ থেকে তারটা খুলে দিলে খেলনাগুলো অচল হয়ে পড়ে থাকে। রুদ্র, বসু, আদিত্য, বিশ্বদেব এই দেবতারা যে এত লাফালাফি করছে কারণ আমি এদের সঙ্গে চলি। আমি আছি বলেই এরা চলাফেরার শক্তি পাচ্ছে। অধ্যাত্ম রামায়ণে ঠিক এই ভাবটাই পাওয়া যায়। যখন সীতা বনবাসে আছেন সেখানে তিনি বলছেন – আমি এই বনবাসে থেকে যে এত তপস্যা করছি এতেই শ্রীরামচন্দ্র এত শক্তিমান হয়েছেন, আমি যদি চাই, আমার তপস্যার যা তেজ আছে তাতেই আমি এক্ষুণি রাবণকে ভষ্ম করে দিতে পারি। কিন্তু এইভাবে রাবণকে ভষ্ম করে দিলে আমার তপস্যার শক্তি শেষ হয়ে যাবে। রাবণকে শেষ করে দিতেই যদি আমার শক্তি ফুরিয়ে

যায় তাহলে শ্রীরামচন্দ্র যে কাজের জন্য নরদেহ ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছেন সেই কাজ তিন আর পূরণ করতে পারবেন না। এটা হচ্ছে শক্তি সাধনা, শক্তি সাধনাতে শক্তির প্রশংসা করা হচ্ছে। আমরা যখন শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে এসেছি তখন অনেক কিছু আমাদের মেনে নিতে শিখতে হবে, অনেক কথাকে বাস্তবসম্মত ভাব নিয়ে নিতে নেই। এই জিনিষ গুলোকে যাঁরা কবি তাঁরা রচনা করেছেন, কবিরা অনেক সময় তাঁদের কল্পনার লাগামকে খুলে দেন, তার ফলে কল্পনা সীমা রেখাকে অতিক্রম করে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। শাস্ত্রকে যদি যেমনটি আছে ঠিক তেমনটি নিয়ে নিলে আমাদের অনেক সময় অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। ঠাকুর যেমন বলেছে – শাস্ত্রে চিনিতে বালিতে মেশানো আছে, বালিটুকু সরিয়ে চিনিটুকু নিতে হয়। অধ্যাত্ম রামায়ণের যে বিষয়টাকে আমরা উত্থাপন করলাম সেখানেও চিনিতে বালিতে মিশে আছে, শ্রীরামচন্দ্রের শক্তি কি শুধু সীতার জন্য? আমরা বলতে পারব না। আমরা যেটা জানি তা হচ্ছে, যার জন্য অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রসঙ্গকে টানা হল, শ্রীরামচন্দ্র দাঁড়িয়ে আছেন সীতার শক্তিতে, এই ধারণার বীজ নিহিত রয়েছে এই দেবীসূক্তমে, যেখানে বলা হচ্ছে রুদ্র, বসু, আদিত্য আর বিশ্ববসু এদের সাথে আমি চলি বলেই এদের এত ক্ষমতা। এনারা বেদের খুব ক্ষমতাশালী দেবতা। তাহলে কি বেদের সত্যতাকে নিয়ে প্রশ্ন করা যাবে? আমরা কখনই তা পারিনা, বেদে যা আছে তার বিরুদ্ধে কোন প্রশ্নই আমরা করতে পারিনা, কারণ হিন্দুরা বেদকে এইভাবেই দেখেন। এখানে শক্তির কথা বলা হচ্ছে, শক্তি মুর্ত ও অমুর্ত দুটোই হতে পারে। অধ্যাত্ম রামায়ণে সীতা হচ্ছেন শক্তির মুর্ত দেবী আর দেবীসূক্তমের বাক্ হচ্ছেন শক্তির অমুর্ত রূপ। বাক্ দেবী হচ্ছেন শক্তিস্বরূপিনী, শক্তি ছাড়া তো সব কিছুই অচল, জড়। ব্রহ্ম যিনি, তাঁরও যদি শক্তি না থাকে তাহলে ব্রহ্মাণ্ড হবে না। ঠাকুর বলছেন – যে বাবুর বাগান নেই, বাড়ি নেই, সেই বাবু কিসের বাবু। ব্রহ্মের যদি সৃষ্টি নাইই থাকে, ব্রহ্মাণ্ড যদি নাইই হয় তাহলে সেই ব্রহ্মকে নিয়ে আমার কি হবে। যে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য নেই সে কিসের ঈশ্বর।

বেদের অর্থ বুঝতে গেলে সায়নাচার্যের ভাষ্যকে পড়তে হবে। এদিকে সায়নাচার্য স্বভাবে ছিলেন অদ্বৈতবাদী বেদান্তী। তিনি এখানে বলছেন – এটা কি করে হবে যে বাক্ দেবী দেবতাদের সঙ্গে চলেন। সেইজন্য সায়নাচার্য তার অদ্বৈতবাদের সুরে বলছেন – আসলে বাক্ দেবীর বলা উদ্দেশ্য হচ্ছে জগতে যা কিছু হয়েছে সব আমারই রূপে হয়েছে আর জগতে যা কিছু আছে অধিষ্ঠান রূপে আমিই রয়েছি। ঠাকুরের কথাই যেন এখানে সায়নাচার্য বলছেন – অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি, দুধ আর তার ধবলত্ব, ব্রহ্ম আর তার শক্তি অভেদ। জগতে যা কিছু আছে, তার মধ্যে ভগবানও আছেন, তার সব কিছুর অধিষ্ঠান হচ্ছে শক্তি। বাক্ দেবী হচ্ছেন সেই শক্তির প্রতিমুর্তি। তা তিনি কিভাবে চলেন? শ্রীরাম যেমন সীতার সাথে চলছেন সেইভাবে চলছেন না। এখানে বলা হচ্ছে – তিনি হচ্ছেন সব কিছুর অধিষ্ঠান। সব কিছুর অধিষ্ঠান বলতে কিরকম বোঝায়? যেমন যত ধরণের গহনা আছে সব ধরণের গহনার অধিষ্ঠান যেমন সোনা, যেমন যত রকমের মাটির পাত্র আছে সব পাত্রের অধিষ্ঠান যেমন মাটি, ঠিক তেমনি জগতে যা কিছু আছে তার অধিষ্ঠান হচ্ছে শক্তি। বাক্ দেবী বলছেন আমিই সেই শক্তি। সেইজন্য যাবতীয় যা কিছু আছে, যেটা হয়েছে, যেটা হবে আর যেটা হয়েছিল তার সবটাই আমি। পুরুষসূক্তমে যেমন বলা হয়েছিল - *যদ্ভুতং যচ্চ ভব্যম্* এখানে বলছেন আমিই সেই। এগুলো হচ্ছে সেই যে পরাশক্তি সেটা একটাই, দুই নেই।

পরের লাইনে বলছেন - *অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা* , বেদে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ হচ্ছেন সব থেকে ক্ষমতাশালী দেবতা। বলছেন এই মিত্র আর বরুণকে আমিই ধরে আছি। সুক্তিতে যে রজত ভ্রম হয় সেখানে সুক্তিটাই সত্যা রূপাটা মিথ্যা, একটা দড়ি পড়ে আছে, অন্ধকারে দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা সাপ পড়ে আছে। এখানে দড়িটাই সত্য সাপটা মিথ্যা। সায়নাচার্য বলছেন – এই ইন্দ্র, মিত্র, বরুন এগুলো হচ্ছে ভ্রম। তাহলে সত্যটা কি? এই বাক্ দেবীই সত্য। *বিভর্মি অহম্* - আমার শক্তিতেই দেবতারা দাঁড়িয়ে আছে। কল্পনা করা যাক রাত্রিবেলা একটা গয়নার দোকানে একজন মানুষ পূর্ণ চেতনা নিয়ে বসে আছেন, হঠাৎ দোকানের সব গহনাগুলো জীবন্ত হয়ে গেল আর সবাই একে অপরের সঙ্গে

কথা বলছে। একজন বলছে আমি বড় আরেকজন বলছে আমি বড়। এই নিয়ে সব গহনাগুলো তুমুল ঝগড়া শুরু করেছে। সেই সময় হঠাৎ সোনা তার চৈতন্যকে জাগ্রত করে সব কটা গহনাকে বলছে – আমি আছি বলেই তোমরা এখানে আছ। মিত্র, ইন্দ্র, বরুণ যে যত বড়ই হোক না কেন, আমি (বাক্ দেবী) আছি বলেই তোমরা দেবতারা আছ।

দ্বিতীয় মন্ত্রে বলছেন - ***অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্। অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে এ যজমানায় সুন্বতে।।২।।*** দেবতারা শক্তি পেতেন সোমরস থেকে। এখন এই সোমরস যখন তৈয়ার করা হয় তখন তরল সোমরসকে এক পাত্র থেকে আরেক পাত্রে অনেকক্ষণ ঢালাঢালি করতে হয়। যেমন লস্যি তৈরী করার সময় ঘোলটাকে অনেকবার ঢালাঢালি করে। এই সোমরসকে যখন এক পাত্র থেকে আরেক পাত্রে ঢালে সেই সময় একটা বিশেষ ধরণের আওয়াজ হত, এই শব্দটাকে বলা হয় অহনসম্, অহনসম্এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে শত্রুনাশ করার শক্তি। যারা খুব মদ পান করে তারা যখন গ্লাশে মদ ঢালার আওয়াজটা শোনে তাতেই তাদের মদের নেশা ধরে যায়। বাক্ দেবী বলছেন – ঐ যে শক্তি যে শক্তিতে মানুষের মনের মধ্যে নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে সেই শক্তি হচ্ছি আমি। আমি আছি বলেই এই আওয়াজটা হচ্ছে আর সেই আওয়াজ যে শক্তিতে অন্যকে আকৃষ্ট করছে সেটাও আমি। ত্বষ্টা, ভগ সব দেবতাদের নাম, ত্বষ্ট হচ্ছেন যিনি এই বিভিন্ন লোকের সৃষ্টি কাজে নিযুক্ত থাকেন, আর ভগ এক দেবতারও নাম আবার ভগ শব্দের অর্থ হচ্ছে আলো, দুটোই হয়। বলছেন যে এই সব দেবতাদের যে দ্যুতি বা আলো সেটা আমি অথবা এর অর্থ করা যায় – এই দেবতাদের যা বুদ্ধি, যা কিছু শক্তি সেগুলো আমিই।

অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে এ যজমানায় সুন্বতে – যারা যজ্ঞ-যাগ করছেন, আর এই যজ্ঞ-যাগের ফলে যে সম্পদ হয়, ব্রাহ্মণরা যে দক্ষিণা পাচ্ছেন অথবা কোন কিছু করার পর তার থেকে যে সফলতা আসে সেই সব কিছু আমার কাছ থেকেই পায়। আমরা যে মনে করি, এই যা যজ্ঞ-যাগ যে দেবতার উদ্দেশ্যে হচ্ছে সেই দেবতাই সন্তুষ্ট হয়ে সব কিছু দেন, কিন্তু এখানে দেবী বলছেন – *অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে* – যারা যজ্ঞ-যাগ করে যখন সফল হয় তখন যে ধন-সম্পদ পাচ্ছে তা আমিই তাদের দিই। *সুপ্রাব্যে এ যজমানায় সুন্বতে,* - আগেকার দিনে পুরোহিতরা যজমানদের নিয়ে যে বিভিন্ন ধরণের যজ্ঞ-যাগ করত, সেই যজ্ঞ-যাগ অনেক রকম ভাবে করা হয়ত, এখানে সোমযাগের কথা বলা হচ্ছে, এই যে বিভিন্ন ধরণের যজ্ঞ-যাগের দ্বারা দেবতাদের পূজো করছে এদের সবারই সাফল্য আমার মাধ্যমেই আসে। এই মন্ত্রের মূল ভাবটা হচ্ছে, ধর্মীয় কাজ যখন যে কেউ করে, তার ফলে তার যে প্রাচুর্যতা আসছে সেটা এই বাক্ দেবীই যোগান দেন।

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্। তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভুরিস্থাত্রাং ভূর্যা বেশয়ন্তীম্।।৩।। আমিই হচ্ছি এই পুরো বিশ্ব ভূমণ্ডলের সার্বভৌম রানী। রাষ্ট্র বলতে আমরা যে অর্থে বুঝি, ভারত, পাকিস্থান, আমেরিকা, জাপান এইগুলো হচ্ছে একেকটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। কিন্ত এখানে শুধু পৃথিবীরই নয়, এই মহাজগতে, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মিলিয়ে যা আছে সেইটাকে রাষ্ট্র বলা হচ্ছে, বাক্ দেবী হচ্ছে সেই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রী মানে সম্রাজ্ঞী। সায়নাচার্য বলছেন – সর্বস্য জগৎ ঈশ্বরী, পুরো জগতের যিনি ঈশ্বরী তাঁকে বলা হচ্ছে রাষ্ট্রী। সাধারণতঃ আমাদের কাছে ঈশ্বর শব্দটাই আসে, ঈশ্বরী শব্দ ব্যবহার হতে খুব একটা দেখা যায় না, কিন্তু এখানে দেবীকে ঈশ্বরী রূপে বলা হচ্ছে। এখন রাজা হলেই তো হবে না, রাজার রাজকার্য আর রাজ্য চালাতে সম্পত্তিরও দরকার। তাই এখানে বলছেন এই রাষ্ট্রের যাবতীয় ধনরাশি আমিই সংগ্রহ করে আমার মুঠোয় রাখি। এর অর্থ হচ্ছে দেবী একদিকে লক্ষ্মী, লক্ষ্মী এই অর্থে বলা হচ্ছে যার কাছে সমস্ত ধন-সম্পদ রয়েছে, আবার তিনি হচ্ছে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্রাজ্ঞী। আর বলছেন – যাদের নামে আহুতি দেওয়া হয়, তাদের মধ্যে আমি হচ্ছি শ্রেষ্ঠতম। সেইজন্য দেবতারা তাদের বিভিন্ন কর্মের জন্য আমাকে অনেক জায়গায় অধিষ্ঠাত্রী করে রেখেছেন। *চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্* - বলছেন দেবী যে শুধু মাত্র সমস্ত ধন-সম্পদ সংগ্রহ করছেন, তিনি যে শুধু ঈশ্বরী, সম্রাজ্ঞী তাই নয়, এমন কি তিনি ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত

দিয়ে দিতে পারেন। দেবী যে সর্বোচ্চ জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে দিতে পারেন, এইটাই আবার দেখতে পাই কেনোপনিষদে উল্লেখ করা হয়েছে। যখন উমা হৈমবতী এসে দেবতাদের বলছেন – ত্বং ব্রহ্ম হোবাচ।

কাহিনীটা হচ্ছে – একবার দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে। সেই যুদ্ধে দেবতারা যখন অসুরদের পরাজিত করলেন তখন সব দেবতারা নিজেদের মধ্যে বলতে শুরু করল এই যুদ্ধটা আমার জন্যই যেন জয়লাভ করেছি। সেখানে তিন জন মূল দেবতা ছিলেন – ইন্দ্র, বায়ু আর অগ্নি। হঠাৎ এই তিন দেবতা দেখেন যে দূরে এক অচেনা বস্তু দাঁড়িয়ে আছেন। কি সেই বস্তু? এই সন্ধানে প্রথমে অগ্নি দেবতা গেলেন। তখন সে অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করলেন – তুমি কে। অগ্নি বললেন – আমি অগ্নি দেবতা আমার আরেকটি নাম বৈশ্বানর ইত্যাদি। সে তখন খুব অবজ্ঞা করে জিজ্ঞেস করলেন – তোমার কি কাজ। অগ্নি বলছে – জগতে যা কিছু আছে আমি ভস্ম করে দিই। সে তখন একটু সামান্য শুকনো ঘাস অগ্নির সামনে দিয়ে বললেন – তুমি একে ভস্ম করতো। অগ্নি দেবতা তখন পুরো শক্তি লাগিয়ে প্রাণপনে পোড়াতে চেষ্টা করেও ঘাসের কিছুই করতে পারলেন না। লজ্জায় নত মস্তকে অগ্নি সেখান থেকে ফিরে এলেন। তারপরে বায়ু দেবতাকে পাঠান হল। সেও বায়ু দেবতাকে জিজ্ঞেস করলেন – তুমি কে, তুমি কি কি কাজ কর? বায়ু দেবতা তখন বললেন – আমার নাম বায়ু, আমার আরেকটি নাম হচ্ছে মাতরীশ্ব। মানে দেখা যাচ্ছে দেবতাদের কত অহঙ্কার, দু চারটে কার নাম থাকে? যার সম্মান বেশি। আগেকার দিনে রাজারা তাই দুটো, চারটে, পাঁচটা নাম রাখতেন। সে জিজ্ঞেস করছে তুমি কি কর? আমার কাজ হচ্ছে এই জগতে যা কিছু আছে সব কিছুকে উড়িয়ে নিয়ে যাই। বায়ু দেবতাকেও ঘাসের একটা টুকরো দিয়ে বলছেন – এই ঘাসটুকুকে উড়িয়ে দেখাও তো তোমার কত ক্ষমতা। বায়ু দেবতা অনেক চেষ্টা করেও ঘাসটাকে এক চুলও নাড়াতে পারল না। লজ্জায় মুখ চুন করে বায়ু দেবতাও ফেরত চলে এসেছেন।

এরপর শেষে দেবতাদের রাজা ইন্দ্র গেছেন। যিনি ওখানে ছিলেন তিনি ইন্দ্রকে পাত্তাই দিলেন না, ইন্দ্র যাবার সাথে সাথেই তিনি সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তখন ইন্দ্র দেখতে পেলেন আকাশে এক অতি সুন্দরী নারী মুর্তি। সেই নারী মুর্তি তখন ইন্দ্রকে বললেন – তোমরা এতক্ষণ যেটা দেখছিলে সেটাই হচ্ছে ব্রহ্ম, তাঁর শক্তিতেই তোমাদের দেবতাদের শক্তি। এখন ইন্দ্র ঐটাকে প্রথম দেখল, জানল বলে ইন্দ্র দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দেবী ভোগ অপবর্গ দুটোই দেন, সেইটাই এখানে বলা হচ্ছে।

ময়া সো অন্নমতি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি যঈং শৃণোত্যুক্তম্। অমন্তবোমান্ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধিশ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি।।৪।। মানুষ যা কিছু খাদ্য ভক্ষণ করে সেটা আমার জন্যই খেতে পারে, আমি যদি না থাকি তাহলে খাদ্য তার আর ভেতরে যাবে না। এই ভাবটাই পরে পঞ্চপ্রাণের ধারণাতে পর্যবসিত হয়েছে। এই যে প্রাণ, অপান, সমানা, উদানা ও ব্যায়ানা, এই পঞ্চ প্রাণের ধারণা এইখান থেকেই এসেছে। আমরা যে নিঃশ্বা নিচ্ছি বলে অপান বায়ু ভেতরে গেল, যখন নিঃশ্বাস ছাড়ছি তখন প্রাণ বায়ু বেরিয়ে গেল। বলছেন – এই যে সমস্ত প্রাণী যে আহার করছে প্রত্যেক দিন, আমি যদি সেখানে না থাকি তাহলে সে আর খাওয়ার খেতে পারবে না। মানুষ যা কিছু দেখে আমার জন্যই দেখে। মানুষ যা কিছু কথা বলে, যা কিছু কর্ণে শ্রবণ করছে সব আমার জন্যই সম্ভব হচ্ছে। কেনোপনিষদে ঠিক এই ধরণের একটি মন্ত্র আছে – শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্ মনসো মনোঃ – য কিছু শ্রবণ করা হয়, তার পেছনে আরেকটি শক্তি আছে বলে সে শুনতে পারছে। যা কিছু দেখছে, তার পেছনে আরেকটি শক্তি আছে। এইখানে বাক্ দেবী বলছেন – আমিই সেই শক্তি যার জন্য মানুষ আহার, শ্রবণ, দর্শন সব কিছু করতে পারছে। শ্রদ্ধিবং তে বদামি – আমিই হলাম সমস্ত প্রাণীর ঠিক ঠিক শ্রদ্ধার পাত্রী, তাই যদি তোমাকে কারুকে শ্রদ্ধা করতে হয় ভক্তি করতে হয় তাহলে একমাত্র এই দেবীকেই করতে হবে। কারণ মানুষ যাবতীয় যা কিছু করছে সব আমারই মাধ্যমে করছে, আমি আছি বলেই সব করতে পারছে।

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ। যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্।।৫।। শুধু তাই না, আমি নিজেই এই কথাগুলো তোমাকে বলছি। এটা কোন পাগল এসে তোমাকে বলছে তা নয়, আমি সেই দেবী, আমিই তোমাকে বলছি। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ঠাকুরের শেষ সময়ে স্বামীজী ভাবছেন ইনি যদি এখন এই অবস্থায় নিজে বলেন যে আমি অবতার তাহলে আমি মেনে নেব। ঠাকুর স্বামীজীর মনের ভাব বুঝে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলছেন – এখন অবিশ্বাস। যিশুও বলছেন – I am in my Father and Father is in me, অনেক পাগলও তো এই ধরণের কথা বলে, সেই কারণে সাধারণ মানুষের পক্ষে পার্থক্য করা খুব মুশকিল। গীতাতেও অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন – *স্বয়ৈঞ্চব ব্রবীষি মে*।, আপনি নিজে আমাকে এই কথা বলেছেন। কোন বাবাজীর চেলারা যদি এসে বলে ইনি অবতার, তাহলে এই কথার কোন দাম থাকবে না, বাবাজীকে নিজে বলতে হবে। ইদানিং অনেক বাবাজী বলছেন সেইই নাকি এখন আসল অবতার। এখানে দুটো জিনিষ খুব গুরুত্বপূর্ণ, একটা হচ্ছে যিনি ঈশ্বর, যিনি অবতার এটা তাঁকে নিজে বলতে হবে। আবার যারা পাগল তারাও বলে আমিই শ্রেষ্ঠ। এখন কেউ যদি বলে আমি অবতার তাহলে আমরা বুঝব কি করে? এইটাকে বোঝার জন্যই অধ্যাত্ম শাস্ত্র পড়তে হয়। যে বলছে আমি অবতার, তার এই কথার কি দাম সেটা বুঝতে হলে তার অন্যান্য জিনিষ গুলিকে বিচার করতে জানতে হয়। যখন তাঁর মধ্যে সাধুর সমস্ত গুণ বিদ্যমান থাকবে তখন সে যদি বলে আমি অবতার তাহলে সেই কথার দাম থাকে। যারা গোলমেলে তাদের ভালো করে খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে তার সাধুত্বের মধ্যে অনেক গলদ আছে। তাদের এই কথাও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ – আমি যে কথাগুলো বলি তার সব কথাই দেবতা আর মানব জাতির সবার মঙ্গলের জন্যই বলি। এখানে মনে রাখতে হবে এই বাক্ দেবী বেদের অন্য দেব-দেবীর মত কোন সাধারণ দেবী নন। ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ এনারা হচ্ছেন সাধারণ দেবতা, দেবীসূক্তমের বাক্ দেবী হচ্ছেন সেই সচ্চিদানন্দের সাথে এক। *যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্* - আমি যার প্রতি প্রসন্ন হই তাকে আমি শক্তিমান বানিয়ে দিই, যাকে চাই তাকে আমি ব্রাহ্মণ করে দিই, ব্রাহ্মণ মানে তার মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব দিয়ে দিই, যাকে আমি চাই তাকে আমি ঋষি বানিয়ে দিই, আর যাকে আমি চাই তাকে আমি মেধা শক্তি দিয়ে দিই। বাক্ দেবীকে কেন সাধারণ দেবতার সঙ্গে এক ভাবা হচ্ছে না তার কারণ ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র এই দেবতাদের এই ধরণের কোন ক্ষমতা নেই। ইন্দ্র হয়তো কিছু দিতে পারে, বরুণ সেটা দিতে পারেনা, আবার বরুণ যেটা দিতে পারে সেটা আবার ইন্দ্র বা মিত্র দিতে পারেনা। কিন্তু বাক্ দেবী ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই করে দিতে পারেন। যে শক্তি চাইছে তাকে মেধা, যে মেধা চাইছে তাকে মেধা, যে ব্রাহ্মণত্ব বা মহৎ মানবিক গুণ চাইছে তাকে তাই দিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা দেবীর আছে। আবার যিনি ত্যাগ বৈরাগ্য চাইছে, অর্থাৎ যিনি ঋষি হতে চাইছেন, দেবী তাকে ঋষি বানিয়ে দিতে পারেন।

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ। অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবা পৃথিবী আবিবেশ।।৬।। এখানে যে রুদ্রের কথা বলা হচ্ছে এই রুদ্রকেই পরে শিবের সাথে এক করে দেওয়া হয়েছিল, শিব হচ্ছেন পৌরাণিক দেবতা। শিবের অস্ত্র হচ্ছে ধনু। শিবের আরেকটি নাম হচ্ছে ত্রিপুরহর। ত্রিপুর নামে এক প্রচণ্ড শক্তিশালী ও ক্ষমতাশালী অসুর ছিল, শিব এই ত্রিপুরাসুরকে নাশ করেছিলেন বলে তাঁর আরেক নাম ত্রিপুরহর। শিব যে ধনু দিয়ে এই অসুরকে নাশ করেছিলেন, সেই ধনু পরে জনকরাজার কাছে রাখা ছিল। এই ধনুই শ্রীরামচন্দ্র ভেঙ্গে সীতাকে পেয়েছিলেন। দেবী বলছেন – অহং রুদ্রায় ধনুঃ – রুদ্রের যে ধনুতে যে শক্তিতে ছিলা বা দড়ি লাগানো আছে সেই শক্তি আমি বা সেই দড়িটা আমি। আমি না থাকলে শিব সেই ধনুতে জ্যা রোপণ করতে পারতেন না। *ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ* – রুদ্র কাকে বধ করেছেন? *ব্রহ্মদ্বিষে*, যারা ব্রাহ্মণ শক্তির বিদ্বেষী, সেই বিদ্বেষীদের শিব নাশ করেছেন। মূল কথা হচ্ছে যে কোন শক্তি তা মেধা বা বুদ্ধি রূপেই হোক, ত্যাগ বৈরাগ্য রূপেই হোক বা ধন-সম্পদ রূপেই হোক, সব শক্তিই আমার জন্যই। অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবা পৃথিবী আবিবেশ – এই যে পৃথিবী আর দ্যাবা

মানে অন্তরীক্ষ লোক সর্বব্যাপী রূপে আমিই ধরে আছে, আমার বাইরে আর কিছুই নেই। প্রথম থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাব যে দেবী অন্তর্জগতের যা কিছু, মেধা, বুদ্ধি, ত্যাগ, বৈরাগ্য, ব্রাহ্মণত্ব, আবার যা কিছু শক্তির খেলা তা ধন-সম্পদ বা শারীরিক বা মানসিক, আবার এই বহির্জগতের যা কিছু দেখা যাচ্ছে আবার যা দেখা যাচ্ছে না সবটাতে তিনিই আছেন।

অহং সুবে পিতররমস্য মূর্ধন্ মম যোনিরপস্ব(অ) হন্তঃ সমুদ্রে। ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বো তামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি।।৭।। কোথাও কোথাও বর্ণনা করা আছে, পুরুষসূক্তমে যদিও পরিষ্কার করে বলা নেই কিন্তু বলা হয়েছে যে পুরুষ যিনি মানে ভগবানের ভ্রুকুটি হচ্ছে স্বর্গ, অন্তরীক্ষটা হচ্ছে ভগবানের ভ্রু। *পিতররমস্য মূর্ধন্* - দেবী বলছেন ভগবানের ভ্রু থেকে যে অন্তরীক্ষ জন্ম নিল এটা আমার জন্যই হয়েছে। মম যোনিরপস্ব(অ) হন্তঃ সমুদ্রে – এই জায়গাটা আবার অনেক জটিল অর্থ হয় বলে অনেকে অনেক রকম ব্যাখ্যা করেন। দেবী বলছেন আমার জন্ম সমুদ্র থেকে। এখানে সমুদ্রের একটা অর্থ হয় পরমাত্মা। পৌরাণিক কাহিনীতে বলা হয় সৃষ্টির আগে ভগবান ক্ষীর সাগরে অশেষ নাগের উপরে শুয়ে আছেন। দেবী বলছেন আমার জন্ম হচ্ছে পরমাত্মা থেকে, আবার সমুদ্রের একটা অর্থ হয় পরমাত্মা, ক্ষীর সাগরে বিষ্ণু শয়ন করে আছেন, মানে যিনি ভগবান তিনি হচ্ছেন যেন সমুদ্র, আর ভগবান বিষ্ণুর যে সাকার রূপ সেটা এই নিরাকারের উপরে শায়িত, কারণ নিরাকারটা দেখান হয় সমুদ্রের উপমা দিয়ে, যেটা পুরানে বলে ক্ষীর সাগর। তিনি শুয়ে আছেন কিসের উপরে? শেষ নাগের উপরে। শেষ নাগ হচ্ছে অনন্তের উপমা, এই অনন্তের উপরে ভগবান শুয়ে আছেন সাকার রূপে। সেই ভগবান বিষ্ণুর থেকেই সৃষ্টিটা প্রথম এগোতে শুরু করে। পুরান আর দর্শনের তত্ত্ব এইভাবে দুটোর মধ্যে একটা যোগসূত্র করা হয়েছে। শক্তি ছাড়াতো সৃষ্টি হবে না। সৃষ্টি যখন শুরু হচ্ছে তখনই শক্তির খেলা আরম্ভ হয়। এবারে পরিষ্কার বোঝা যাবে দেবী কেন বলছেন আমার জন্ম সেই পরমাত্মা থেকে। যা কিছু সৃষ্টি হচ্ছে আর সেই সৃষ্ট বস্তুর সাথে ভগবানের যে সম্পর্ক করা হয় সেটা আমার মাধ্যমেই করা হয়। এইটাই শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার বলছেন – ব্রহ্ম আর শক্তি, কালী আর ব্রহ্ম। এইটাই আবার বেদান্তে যখন আসছে তখন মায়ার একটা বিভাজন রেখা আনা হচ্ছে। সাংখ্যে প্রকৃতি আবার তন্ত্রে শক্তির একটা বিভাজন রেখা এসে যাচ্ছে। এই শক্তির বিভাজনটাকেই এখানে বলা হচ্ছে।

ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বো তামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি – বলছেন, সেই সমুদ্র বা সেই পরমাত্মার থেকে যখন আমার জন্ম হয় তখন সেইখান থেকে আমি সমস্ত কিছুতে ছড়িয়ে পড়ি, আমার শরীরের দ্বারা সব লোককে আমি স্পর্শ করি, আর সব জীবের মধ্যে আমি প্রবেশ করি। মূল ভাবটা হচ্ছে – যিনি নিরাকার ঈশ্বর, তাঁর থেকে যখন শক্তির প্রকাশ হয় তখন সেই শক্তি থেকেই আকাশ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, সমস্ত লোক, সমস্ত ভূত উৎপন্ন হচ্ছে।

অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা। পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ তাবতী মহিনা সংবভূব।।৮।। এই ত্রিভুবনে যাবতীয় যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে, তার যে রূপ, তার যে আকার, তার যে গুণ, বৈশিষ্ট্য সব আমার থেকেই হয়েছে। দেবী বলছেন – এই পৃথিবী, এই অন্তরীক্ষ, এই স্বর্গ আমার শক্তিতেই হয়েছে কিন্তু এই সব কিছুর থেকে আমি আরও বিরাট। পুরুষসূক্তমে বলছে – *ত্রিপাদূর্ধ্ব*, গীতাতে বলা হচ্ছে – *একাংশেন স্থিতো জগৎ*, মানে ভগবানের যে ছোট্ট অংশ ঐটুকুতেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু, বাকী তিন চতুর্থাংশের এর বাইরে। এই তিন চতুর্থাংশ হচ্ছে নিরাকার, কোন আকার নেই। এইখানে দেবী ঠিক এই একই কথা বলছেন *পরো দিবা পর এনা পৃথিবৈ* – এই স্বর্গলোক, অন্তরীক্ষলোক, ভূর্লোক এইগুলোরও পারে আমি। *তাবতী মহিনা সংবভূব* – দেবী নিজের মহত্ত্বের কথা বলে বলছেন। যা কিছু ভালো সেটাই আমার সব কিছু নয়। এই যে দেবতারা তাদের শক্তি দেখাচ্ছে সেই শক্তি আমার থেকেই এসেছে, ধন, সম্পদ, বল, জ্ঞান, মহৎ গুণ সবই আমার জন্য। আর আমি ভগবানের সাথে এক, আলাদা কিছু নয়। যখন

আমি নিজেকে প্রকাশ করতে চাইব তখনই এই সৃষ্টির খেলা শুরু হয়, কিন্তু আমি এই সৃষ্টি থেকে অনেক অনেক উপরে।

নাসদীয়সূক্তম্, পুরুষসূক্তম্ এবং শেষে দেবীসূক্তম্ আলোচনার মাধ্যমে বেদের ফিলজফিটা কি আমরা জেনেছি। বেদের দর্শনের একটা চিত্র তুলে ধরার জন্য এইগুলো আলোচনা করা হল। এখন আরেকটি সূক্তম্ যেটা পাশা খেলাকে নিয়ে বলছে তার অল্প আলোচনা করতে যাচ্ছি। এর মধ্যে খুব সুন্দর একটা স্তোত্র আছে। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা এটাকে একটা মামুলি জাগতিক কবিতা বলে মনে করে। এই কবিতার একেবারে শেষের দিকে বলছে – হে ভাই, তোমরা শোন, তোমরা কেউ জুয়া খেলতে যেও না, জুয়া খেলা বন্ধ করে মন দিয়ে ভালো করে চাষবাস কর। চাষবাস করে যা অর্থ উপার্জন করবে তাতেই আনন্দে থাকো। হে জুয়াড়ি, তোমার যাবতীয় যা কিছু ধন-সম্পদ ছিল, জুয়া খেলে সব চলে গেল।

এই জুয়া খেলা, যেটা আগে পাশা খেলাতে বেশি হত, যেই রোগটা যুধিষ্ঠিরেরও ছিল। এখানে স্তোত্রে এই পাশার ঘুটি গুলোকে একটা শক্তি রূপে দেখান হচ্ছে, তবে অশুভ শক্তি রূপে। আর তাকে প্রার্থনা করা হচ্ছে – হে পাশা, আমাদের উপরে আনন্দ বর্ষণ কর। কিভাবে আনন্দ দিতে বলছে? বলছে – তুমি যাকে জাপটে ধরবে সে সব দিক দিয়ে শেষ, সেইজন্য মাথা নত করে তোমার কাছে প্রার্থনা করি আমাকে তুমি জড়িয়ে ধরো না। তোমার যাবতীয় ক্রোধ, তোমার সব শক্তি দিয়ে তুমি আমাদের শত্রুদের ভালোবেসে জড়িয়ে ধরো। হে দ্যুত তুমি আমার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে আমাদের শত্রুদের প্রতি দৃষ্টি দাও। তারাই জুয়া খেলুক। এখানে বলা হচ্ছে না যে আমি জুয়া খেলায় জিতি আর আমার শত্রুরা হেরে যাক। বলা হচ্ছে জুয়া খেলার নেশাটা যেন অন্য দিকে যায়।

এখানে যে প্রার্থনা করছে তার আগে খুব জুয়া খেলার নেশা ছিল। এখন বেদের একটা ধারণা ছিল যে কোন শক্তি তা শুভই হোক আর অশুভই হোক, সবারই একটা সত্তা বা মুর্তরূপ ছিল। সেই সত্তাকে যদি এইভাবে প্রার্থনা করা হয় তাহলে সেই সত্তা তার খারাপ প্রভাব থেকে মুক্ত করে ভালোর দিকে নিয়ে যাবে। এইখানেও ঠিক তাই হচ্ছে, যদি কারুর জুয়া খেলার নেশা থাকে আর সে যদি এই স্তোত্রটা পাঠ করে তাহলে তার জুয়ার নেশাটা চলে যাবে। এখানেই আমাদের এত দিনের বেদ আলোচনা শেষ করছি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

।।ওঁ শ্রীরামাকৃষ্ণারর্পণমস্তু।।